১

বিমল কর

একটি ফোটো চুরির রহস্য

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৩

হঠাৎ একটা রব উঠল। আঁতকে ওঠার।

পথচলতি লোজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছিল দৃশ্যটা। গেল গেল রব।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভয়ঙ্কর কিছু ঘটল না। লোকটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোনওরকমে সামলে নিল। তবু ফুটপাথেই ছিটকে পড়েছিল।

ট্রাম দাঁড়ায়নি। চলে গেল সোজা। ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো লোকগুলো দেখল মানুষটাকে।

কাটাও পড়েনি। চাকার তলাতেও যায়নি। তবে আর ট্রাম বাস থামবে কেন! কলকাতা শহরে হামেশাই ট্রাম বাস মিনিবাস থেকে লোকজন ছিটকে পড়ছে রাস্তায়, তার জন্যে গাড়িটাড়ি দাঁড়াবেই বা কোন দুঃখে?

রাস্তায় ছিটকে-পড়া লোকটা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কাছাকাছি পথচলতি মানুষের নানান মন্তব্য : "আর একটু হলেই তো হয়ে গিয়েছিলেন, দাদা; বরাত জোর...।" অন্য কে যেন বলল, "রাখে হরি মারে কে! বেঁচে গিয়েছেন, মশাই।" এক ছোকরা মশকরা করে বলল, "দাদু, এল বি হয়ে যাচ্ছিলেন যে! লেগ চাকার তলায় চলে যাচ্ছিল। আম্পায়ার বাঁচিয়ে দিয়েছে। এ্যাত্রায়।"

ভিড় সরে গেল। কাজের মানুষ সবাই, কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিকিরার নজরে পড়েছিল দৃশ্যটা। এগিয়ে এলেন সামান্য তফাত থেকে।

"আরে, পাতকী না?"

লোকটা ততক্ষণে নিজের হাত-পা দেখছে। হাত ছড়েছে দু' জায়গায়, কনুইয়ে লেগেছে, হাঁটু সোজা করতে কষ্ট হচ্ছিল।

কিকিরার দিকে তাকাল লোকটা। তার নাম পাতকী নয়। পিতৃদত্ত নাম পতাকী। কিকিরা তাকে পাতকী বলে ডাকেন।

কিকিরাকে দেখে পাতকীর চোখে জল এসে গেল। যন্ত্রণাও হচ্ছিল।

"দেখলেন বাবু, আমি নামতে যাব, আমায় ল্যাং মেরে ফেলে দিল।" বলেই পতাকী চারপাশে দেখতে লাগল। আমার ব্যাগ?"

"ব্যাগ!"।

পতাকী খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্রাম লাইন পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দেখল। নজর করল এপাশ-ওপাশ। তারপর প্রায় কেঁদেই ফেলল। “আমার সর্বনাশ হয়ে গেল রায়বাবু। এখন আমি কী করব?”

“কেমন ব্যাগ?”

“ছোট ব্যাগ! আধ হাত চওড়া হবে। বুকের কাছে ধরে রাখি...।”

“চামড়ার? প্লাস্টিকের মতন দেখতে?”

“কালো রং।”

কিকিরা বললেন, “সে তো একটা ছোকরা উঠিয়ে নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তোমার সঙ্গেই নেমেছিল ট্রাম থেকে।”

“পকেটমার। চোর। প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা! রঙিন গেঞ্জি? লাল-সাদা চাকা চাকা গেঞ্জি।”

“তাই তো দেখলাম।”

“দেখেছেন বাবু! আমি ঠিক ধরেছি। বেটা আমায় তখন থেকে নজর করছিল। পিছু নিয়েছিল। ওকে আমার সন্দেহ হচ্ছিল আগাগোড়া। ওরই জন্যে আগে আগে নেমে পড়তে গেলাম ট্রাম থেকে। ...আমার এখন কী হবে বাবু?”

কিকিরা বললেন, “টাকা-পয়সা ছিল?”

“টাকা বেশি ছিল না। সোয়া শ’ মতন। আদায়ের টাকা। কয়েকটা কাগজপত্র, রসিদ, টুকটাক...”

“অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে হে! এত ছটফট করো না।”

“টাকার জন্যে নয় বাবু। ওর মধ্যে একটা অন্য জিনিস ছিল। কী জিনিস আমি জানি না। জহরবাবু বলে দিয়েছিলেন, খুব সাবধানে আনতে।”

কিকিরা অবাক হলেন। দেখলেন পতাকীকে।

“ঠিক আছে। পরে কথা হবে। এখন চলো চাঁদনিচকের উলটো দিকে আমার চেনা একটা ওষুধের দোকান আছে, তোমার কাটা-ছেঁড়া জায়গাগুলোর ব্যবস্থা করা যাক।”

পতাকী বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিকিরা কান করলেন না। বাধ্য হয়েই পতাকীকে এগিয়ে যেতে হল।

সামান্য এগিয়েই ওষুধের দোকান।

পতাকী দোকানের বাইরের দিকের একটা বেঞ্চিতে বসে থাকল, একটি রোগামতন ছেলে, ওষুধের দোকানের, অভ্যস্ত হাতে পতাকীর কাটা-ছেঁড়া জায়গাগুলো পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিল, দু-এক জায়গায় ব্যান্ড-এইড। তারপর এক ইনজেকশন।

পতাকী নানা করছিল। তার কাছে পয়সাকড়ি না-থাকার মতন। কিকিরা শুনলেন না। রাস্তার ধুলোবালি লেগে মরবে নাকি! পয়সার ভাবনা করতে হবে না তোমায়।

ইনজেকশনের পর কয়েকটা ট্যাবলেটও পতাকীর হাতে গুঁজে দেওয়া হল। তার আগে ব্যথা-মরার একটা বড়িও সে খেয়েছে।

পতাকীকে নিয়ে উঠে পড়লেন কিকিরা।

"চলল হে পাতকী, কোথাও বসে একটু জিরিয়ে নেবে চলো। চা খাওয়া যাবে।"

পতাকীকে ভাল করেই চেনেন কিকিরা। বড়াল লেনের শরিকি বাড়ির একটা ঘরে থাকে। মাথার ওপর ওইটুকুই তার আশ্রয়। সংসার রয়েছে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে। পতাকী আগে হালদারদের স্টুডিয়োয় কাজ করত। সারাদিনই পাওয়া যেত দোকানে। স্টুডিয়োর কর্মচারী। হালদার স্টুডিয়ো'র বুড়ো মালিক রামজীবনবাবু তখন বেঁচে। তিনি বেঁচে থাকলেও এককালের নামকরা পুরনো হালদার স্টুডিয়ো তখন ডুবতে, মানে উঠে যেতে বসেছে। নতুন নতুন স্টুডিয়ো, তাদের জেল্লা, রকমারি কায়দা কানুনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না, আদ্যিকালের ব্যবস্থা কি একালে চলে!

রামজীবনবাবু মারা গেলেন, ষাটের ঘরে এসেই। পায়ের সামান্য একটা কারবাঙ্কল বিষিয়ে কী যে হয়ে গেল–! বাঁচানো গেল না। দোকানটা অবশ্য থাকল। রামজীবনের ছেলে জহর নিজেই বসতে লাগল দোকানে। তাদের সংসারের অবস্থা মাঝারি। নিজেদের বাড়িও আছে মলঙ্গা লেনে। দিন আনি দিন খাই–না করলেও চলে। তা ছাড়া জহরের একটা চাপা আত্মমর্যাদা রয়েছে। তার বাবার হাতে গড়া হালদার স্টুডিয়োর জন্ম সেই উনিশশো বিশ বাইশে। সোজা কথা! বাবার তখন ছোকরা বয়েস, টগবগে রক্ত, স্বদেশি করার জন্যে মাসকয়েক জেলও খেটেছেন। বাবার মাথায় কেন স্টুডিয়োর চিন্তা এসেছিল কেউ জানে না। তবে তাঁর হাত আর চোখ ছিল ভাল, ফোটো তোলায় ভীষণ ঝোঁক। কলকাতা শহরে তখন কটাই বা স্টুডিয়ো!

হালদার স্টুডিয়ো বেশ নাম করেছিল তখন।

সময় বসে থাকে না। জল গড়িয়ে যাওয়ার মতন সময়ও চলে গেল। রামজীবন নেই। কিন্তু তাঁর স্মৃতির সঙ্গে কিছু পুরনো কাজও আছে-যার মূল্য কম কী!

পতাকীকে বাবা যখন রাখেন দোকানে, তখন তিনি প্রৌঢ়। পতাকী ছোকরা। আজ পতাকীর বয়েস অন্তত চল্লিশ।

বড়বাবু বেঁচে থাকলে কী হত পতাকী জানে না। তবে জহর অনেক ভেবেচিন্তেই পতাকীকে সারাদিনের জন্যে দোকানে রাখতে চায়নি। আজকের দিনে একটা মানুষকে সারাদিনের জন্যে রাখতে হলে যত টাকা দেওয়া দরকার জহর তা পারে না। কাজেই সে অন্য ব্যবস্থা করে নিয়েছে। পতাকী বাইরে আর দুটো কাজ করুক, তাতে তার রোজগার বাড়বে খানিকটা, সেইসঙ্গে হালদার স্টুডিয়োর কাজ।

পতাকী তাতেই রাজি। সে অন্য অন্য কাজের সঙ্গে হালদার স্টুডিয়োর কাজ করে। তার কোনও অভিযোগ নেই। জহরকে সে নাম ধরেই ডাকে দোকানে, জহরদা; বাইরে বলে জহরবাবু। জহরও তাকে পতাকীদা বলে ডাকে।

পতাকী মানুষ হিসেবে সাদামাঠা সরল। কিন্তু অনেক সময় এমন সব গোলমাল পাকায়, ভুল করে বসে যে মনে হয়, তার বুদ্ধির পরিমাণটা অত্যন্ত কম। জহর বিরক্ত হয়, রাগ করে, তবু পতাকীর সরলতা আর বোকা স্বভাবের জন্যে তাকে কড়া কথাও বলতে পারে না। কী হবে বলে! অবশ্য বিরক্তি আর অসন্তোষ তো চাপা থাকে না, লুকনো যায় না সবসময়। তাতেই পতাকী যেন নিজের অক্ষমতার জন্যে কুঁকড়ে যায়।

.

চা খেতে খেতে কিকিরা পতাকীকে বললেন, “তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? জহর কিছু বলবে না।”

“বলবে না! না রায়বাবু, জহরদা আমায় বারবার করে বলে দিয়েছিল, জরুরি জিনিস, কাজের জিনিস, সাবধানে নিয়ে যেতে!”

কিকিরা হাসলেন। হালকা গলায় বললেন, “তোমার মাথায় সত্যি কিছু নেই। জরুরি কাজের জিনিস হলে ওভাবে কাউকে নিয়ে আসতে বলে! তোমার আধ হাতের পুরনো প্লাস্টিকের ব্যাগে কোন মহামূল্যবান জিনিস আনতে বলবে জহর? নিশ্চয় হিরে-জহরত নয়, পঞ্চাশ একশো ভরি সোনাদানাও নয়।”

“আজ্ঞে না, তেমন কিছু তো নয়।”

“তবে?”

“আমি জানি না বাবু। শুধু জানি, একটা শক্তপোক্ত খাম ছিল। খামের ওপরের কাগজটা পুরু। মোটা নয় খামটা। তবে শক্ত। খামের মুখ বন্ধ। সিল করা। রেজিস্টারি চিঠির মতন অনেকটা।”

কিকিরা অবাক হলেন। দেখছিলেন পতাকীকে। কী বলছে ও? একটা সিল করা খাম অত জরুরি হয় নাকি? খামের মধ্যে কী থাকবে? টাকা! টাকা থাকলেও কত আর হতে পারে!

“মোটা, পুরু, ভারী খাম নাকি?” কিকিরা বললেন।

“এমনিতে খামটা মোটা নয়, ভারীও নয়। তবে ভেতরটা শক্ত বলেই মনে হয়েছিল।”

“লম্বা খাম?”

“আজ্ঞে না; মাঝারি মাপের। ধরুন লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক, চওড়ায় চার পাঁচ ইঞ্চি হবে।”

“কিছু লেখা ছিল না ওপরে?”

“না।”

“কার কাছ থেকে আনছিলে?”

“ঠনঠনিয়ার পাঁজাবাবুর কাছ থেকে।” কিকিরা পাঁজাবাবুকে জানেন না, চেনেন না! পাতকীও চেনে না বলল। অনেক আগে হয়তো দু-একবার দেখেছে।

“তিনি তোমায় কিছু বলে দেননি?”

“না। শুধু বলেছিলেন, জহরকে দিয়ে দেবে। দরকারি জিনিস।”

“কিকিরার মাথায় কিছুই এল না। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, “একটা কাগজ নিয়ে এসো তো!”

পতাকী দোকানের মালিকের কাছ থেকে একচিলতে কাগজ এনে দিল।

কিকিরার কাছে ডট পেন ছিল। তিনি নিজের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে কাগজটা পতাকীর হাতে দিলেন।

“এটা জহরকে দিয়ে দিয়ে,” কিকিরা বললেন, “তুমি যে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছ, তোমার হাতের ব্যাগ খোয়া গিয়েছে, চোরছ্যাঁচড় নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমাকে সাক্ষী মানতে পারো। জহর তোমায় অবিশ্বাস করবে না। ...আর ওকে বলো, আমায় ফোন করতে। দরকার হলে ফোন করবে। আজ সন্ধেতেও করতে পারে। আমি বাড়িতেই থাকব। কাল সকালেও পারে। এনি টাইম।...এখন তুমি যেতে পার। সাবধানে যাবে। ওষুধগুলো মনে করে খেয়ো। নয়তো ভুগবে।”

পতাকী কেমন করুণ গলায় সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, “বাবু, আপনার টাকাগুলো দিতে পারছি না এখন।”

“ঠিক আছে। ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। এখন এসো। পকেটে খুচরো আছে, না তাও গিয়েছে?”

পাতকী মাথা নাড়ল। পকেটে খুচরো আছে কিছু। চলে যেতে পারবে।

“তবে এসো।”

চলে গেল পাতকী।

কিকিরার চুরুট ছিল না পকেটে। ফুরিয়ে গিয়েছে। চায়ের দোকানের ছোকরাটাকে ডেকে টাকা দিলেন বাইরের পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিতে।

দোকানে এতক্ষণ তেমন একটা ভিড় ছিল না। সবে শুরু হল। দু’চারজন এইমাত্র কথা বলতে বলতে ঢুকল। অফিসের বাবু।

এখনও পুরোপুরি গরম পড়েনি, ফাল্গুনের মাঝামাঝি। দোকানের পাখাগুলো ধীরে ধীরে চলছে। বাইরে রোদ পড়ে এসেছে। দুপুরের ঝলসানি নেই, আলো যথেষ্ট। বিকেল হয়ে গেল।

সিগারেটের প্যাকেট হাতে পেয়ে কিকিরা অন্যমনস্ক ভাবে প্যাকেট খুললেন, সিগারেট ধরালেন একটা।

পাতকীর কথাই ভাবছিলেন। ও যে ঠিক কী বোঝাতে চাইল, কিকিরা ধরতে পারেননি। কলকাতা শহরে পকেটমারের অভাব নেই। বিশেষ করে এই সময়টায়, অফিস ছুটির মুখে ওদের ব্যস্ততা খানিকটা বাড়বে যে, তাতে আর সন্দেহ কোথায়! কিন্তু পাতকীর কথামতন

ওই ছোকরা অনেকক্ষণ থেকে তাকে নজরে রেখেছিল কেন? পাতকী ট্রাম থেকে নামার সময় গায়ে গায়ে লেগে ছিল। কেন? কিকিরার হাতের মামুলি ছোট ব্যাগটায় কত টাকা বা কী এমন সোনাদানা থাকতে পারে যে, তার গন্ধে গন্ধে ছোকরা পাতকীর পিছনে লেগে থাকবে! জানবেই বা কেমন করে। তবে কলকাতা শহরের পকেটমারগুলোর চোখ, অনুমানশক্তি দারুণ। বেটাদের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। স্যাকরা বাড়ি থেকে দোকানের বিশ্বস্ত কর্মচারী রেশন ব্যাগের মধ্যে সোনার হার বালা চুড়ি নিয়ে কোনও জানাশোনা খরিদ্দারের বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে, অদ্ভুতভাবে সেই ব্যাগ হাওয়া হয়ে গেল! তা থাক, সে অন্য কথা। পাতকীর ব্যাপারটি আসলে কী! কিকিরা অবাকই হচ্ছিলেন।

২.

সন্ধেবেলায় ফোন। তারাপদদের সঙ্গে গল্পগুজব হাসি-তামাশা করছিলেন কিকিরা। এমন সময়ে ফোন।

কিকিরা মনে মনে আন্দাজ করে নিলেন কার ফোন হতে পারে। "হ্যালো?"

"রায়কাকা? আমি জহর।"

"হ্যাঁ, রায় বলছি। তোমার কথাই ভাবছিলাম। পাতকীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"আমি একটু বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি পতাকীদা দোকানে বসে আছে। শুকনো মুখ, হাতে পায়ে তাপ্পি লাগানো। কাঁপছে। জ্বর এসে গিয়েছে যেন।"

"শুনলে সব?"

"শুনলাম। আপনার লেখা কাগজের টুকরোটাও পেলাম।"

"পাতকী আছে, না, চলে গিয়েছে?"

"চলে গেল খানিকটা আগে। আমিই বললাম, তুমি এভাবে তখন থেকে বসে আছ! যাও, বাড়ি যাও।"

"ভালই করেছ! ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল। বেচারি পড়েছেও বিশ্রীভাবে। আর একটু বেকায়দায় পড়লে ট্রামের চাকার তলায় চলে যেতে পারত। ভাগ্য ভাল; অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে।"

"আপনি সব দেখেছেন?"

"দেখেছি। ...মানে চোখে পড়ে গিয়েছে হঠাৎ। এই সময় আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম।"

জহর একটু চুপ করে থেকে বলল, "কী হল বলুন তো? পকেটমারের কেস? ছিনতাই? পতাকীদার কথা শুনে মনে হচ্ছে–" জহর কথাটা শেষ করল না।

"কী হল আমি কেমন করে বলব! তুমিই বলতে পারো। পাঁজাবাবুর বাড়ি থেকে পাতকী কী এমন আনতে গিয়েছিল যে–"

কিকিরাকে কথা শেষ করতে দিল না জহর। বলল, "ফোনে অত কথা বলা যাবে না রায়কাকা। আমি নিজেই বোকা হয়ে গিয়েছি। আপনি কাল সকালে বাড়ি আছেন?"

"কোথায় আর যাব। বাড়িতেই আছি।"

"তা হলে কাল আমি যাচ্ছি। দেখা হলে সব বলব।"

"চলে এসো।"

"তা হলে ফোন রাখছি। কাল দেখা হবে।"

কিকিরাও ফোন নামিয়ে রাখলেন। তারাপদরা কিকিরার কথা শুনছিল। অনুমান করছিল, কিছু একটা ঘটেছে। কী, তা তারা জানে না। কিকিরা বলেননি।

"কী কেস, সার? আপনি তো কিছু বলেননি আমাদের?" চন্দন বলল। বলে তারাপদকৈ আড়চোখে কীসের যেন ইশারা করল।

তারাপদ বলল, "আপনি আজকাল হাইডিং করছেন, কিকিরা। ভেরি ব্যাড।"

কিকিরা বললেন, "হাইডিং নয় হে, ওয়েটিং। দেখছিলাম,

ব্যাপারটা তুচ্ছ, না, পুচ্ছ।"

"কার সঙ্গে টক করছিলেন?"

"জহর। হালদার স্টুডিয়ো, মানে ফোটোগ্রাফির দোকানের একটি ছেলে। মালিক। আমাকে কাকা বলে। ওর বাবাকে আমরা দাদা বলতাম।"

"মোদ্দা ব্যাপারটা কী?"

"আজকের ঘটনাটা বলতে পারি শুধু। বাকিটা আমি জানি না। কাল জহর আসার পর জানতে পারব মোটামুটি।"

"আজকেরটা শুনি।"

কিকিরা দুপুরের ঘটনা বর্ণনা করলেন সবিস্তারে।

তারাপদরা মন দিয়ে শুনছিল।

কিকিরার বলা শেষ হলে তারাপদ উপেক্ষার গলায় বলল, "এটা আবার কোনও কেস নাকি সার! আপনি আমি চাঁদু সবাই জানি চাঁদনিচক একটা বাজে জায়গা। জ্যোতি সিনেমার চারদিকে পিকপকেট-অলাদের রাজত্ব। ওটা ওদের এলাকা। একবার পকেট কাটতে পারলে এ-গলি ও-গলি, মায় চাঁদনির ওই বাজারে ঢুকে পড়তে পারলে কার বাবার সাধ্য ওরকম গোলকধাঁধার মধ্যে তাকে খুঁজে বার করে। অসম্ভব।... আপনি যাই বলুন, এটা সিম্পল পিকপকেট কেস! তিলকে তাল করার কোনও দরকার নেই।"

কিকিরা মাথা দোলাবার ভঙ্গি করে বললেন, "আমারও প্রথমে সেরকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু জহরের ফোন পাওয়ার পর খটকা লাগছে।"

"কেন?"

"মামুলি পকেটমারের ব্যাপার হলে ও বলেই দিত, চোর ছ্যাঁচড়ের ব্যাপার, পাতকী নিজের বোকামির জন্যে ব্যাগ খুইয়েছে। তা তো বলল না, বরং কাল দেখা করতে আসবে বলল।"

চন্দন কী যেন ভাবছিল। বলল, "আপনি পতাকীনা পাতকীকে কতদিন চেনেন?"

"তা অনেকদিন। কেন?"

“লোকটা চালাক, না বোকা?”

“চালাক-চতুর বলে জানি না। তবে নিরীহ। খানিকটা কাছাখোলা ধরনের। তুমি এসব কথা বলছ কেন?”

“ওই জহর না কী নাম বললেন, তাকেও চেনেন অনেকদিন, তাই?”

“চিনি। ওর বাবাকেই বেশি চিনতাম।”

“আপনার কাছে নানারকমের লোক আসে। পুরনো আলাপী লোককেও আসতে দেখেছি। কই জহর বলে কাউকে তো দেখিনি কোনওদিন।”

কিকিরা মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, “তোমরা দেখোনি তাতে কী হয়েছে গো। আমার বয়েসটা কত হল খেয়াল করেছ! বুড়ো গাছের অনেক ডালপালা। তা সে যাকগে।... তুমি তারাবাবু যা বলতে চাইছ, আমি নিজেও ভাবছিলাম সেরকম। পাতকীর ব্যাগ হাতিয়ে পালানোর ব্যাপারটা নেহাতই চোর-পকেটমারের কাণ্ড। বোকা হাবাগোবা মানুষকে হাতের কাছে পেয়েছে, সুযোগ ছাড়েনি।”

“তা ছাড়া আবার কী!” তারাপদ বলল, “এ সেরেফ পাতি পকেটমারের কাণ্ড। একটা কথা, সার। লোকটা জেনেশুনে আপনার পাতকীর ব্যাগ ছিনতাই করেছে-হতেই পারে না। সে জানবে কেমন করে কী আছে ব্যাগে? টাকা-পয়সা থাকা স্বাভাবিক, তা পঞ্চাশ একশোই হোক বা কম-বেশি!”

“তোমার যুক্তি ঠিক। আমি আগেও বলেছি। কিন্তু জহরের ফোন পেয়ে মনে হচ্ছে, একটা গণ্ডগোল রয়েছে কোথাও!”

“কেন?”

“নয়তো জহর ফোনে ওভাবে কথা বলত না। বলত, পতাকীদার পকেটমার হয়েছে তো হয়েছে। অমন হয়, পতাকীদা অকারণ ভাবছে, এটা তার গাফিলতি। বারবার আপনাকে ফোন করে সাক্ষী মানতে বলছে। বোঝাতে চাইছে তার কোনও দোষ নেই।” কিকিরা পকেট হাতড়াতে লাগলেন, বোধ হয় নেশা খুঁজছিলেন। বললেন, “কিন্তু এখন দেখছি, ব্যাপারটা অত তরলং নয়।”

“তরলং মানে?”

“মানে জলবৎ তরলং নয় বোধ হয়। গোলমাল একটা আছে নিশ্চয়।”

“তরলং নয়। জটিলং..” চন্দন হাসল।

“ধরে নিচ্ছি। নয়তো জহর নিজে কেন কাল এসে দেখা করতে চাইছে! একটু খোঁচা থাকবে না হে!”

তারাপদ চুপ করে গেল। কিকিরার কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতন নয়। সামান্য ও স্বাভাবিক ব্যাপার হলে সত্যি সত্যিই জহরের এত তড়িঘড়ি করে কিকিরার কাছে আসার দরকার ছিল না। সে নিশ্চয় কিছু বলতে আসবে।

কৌতূহল বোধ করলেও তারাপদদের পক্ষে, কাল-পরশু বিকেলের আগে কিছুই জানতে পারবে না। তারাপদদের অফিসে এখন কাজের চাপ বেশি। টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে ছ'টা বেজে যায়। এই মাসটা এইরকমই চলবে। আর কাল চন্দনের দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে হবে।

আরও খানিকটা বসে তারাপদ উঠে পড়ল। "চলি, সার। পরশু দেখা হবে। তখন শুনব আপনার জহর কী বলে গেল। চল রে চাঁদু।"

ওরা চলে গেল।

কিকিরা বসেই থাকলেন। ভাবছিলেন। জহরের সঙ্গে তাঁর মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে যায় রাস্তাঘাটে। ওর দোকানে শেষ গিয়েছেন কিকিরা মাসকয়েক আগে। কোনও কাজে নয়, এমনি। যাচ্ছিলেন এক কাজে, হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে যাওয়ায় মাথা বাঁচাতে গিয়ে হালদার স্টুডিয়োর দোকানটা চোখে পড়ে গেল। ঢুকে পড়লেন।

দোকানে লোক ছিল না। জহর ডার্করুমে কাজ করছিল, বেরিয়ে এল।

আধঘণ্টাখানেক ছিলেন কিকিরা। গল্পগুজব হল। জহরের বাড়ির খবর ভাল নয়। মায়ের অসুখ। হার্টের গোলমাল। ওর স্ত্রী ভুগছে চোখ নিয়ে। লাফ মেরে মেরে পাওয়ার বাড়ছে। ডাক্তার বলছে, এভাবে চললে শেষমেশ কী দাঁড়াবে কে জানে। আর ওর ছেলেটা একেবারে দস্যু হয়ে উঠছে। সামলানো যায় না।

দোকানের কথা তুলেছিলেন কিকিরা। "পুরনো দোকান, আজকাল ব্যবসার বাজারে খানিকটা চাকচিক্য প্রয়োজন, জহর। তুমি তো নিজেই বুঝতে পারো, পুরনো ব্যাপারগুলো সব পালটে যাচ্ছে, কতরকম ক্যামেরাই তো এসে গিয়েছে বাজারে। কালার ফোটোগ্রাফির এখন রমরমা।"

জহর জানে। রঙিন ফোটো সেও তোলে। তবে তার বাবার আমলে রং সেভাবে আমদানি হয়নি। বাবার তোলা সমস্ত ছবি সাদা কালো।

আসলে জহর যদি মোটাসোটা টাকা ঢালতে পারত দোকানে, হালদার স্টুডিয়োর চেহারা-চমক পালটে দিত। তার অত টাকা নেই। টাকা না থাকা যদি প্রধান কারণ হয়, দ্বিতীয় কারণ জহরের মতে, একজন ভাল ফোটোগ্রাফার যদি আর্টিস্টের ধারেকাছে পৌঁছতে চায়, তাকে সাদা কালোয় কাজ দেখাতে হবে।

কিকিরা বুঝুন বা না-বুঝুন জহরের কথাগুলো তাঁর ভালই লাগে। ছেলেটার গুণ আছে, জেদও রয়েছে।

নিজের বসার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েন কিকিরা। ঘরের মধ্যে পায়চারি করারও জায়গা নেই। একেবারে ঠাসা। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। বাতাস আসছে ছোট পার্কটার দিক থেকে।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। জহরের ফোন নম্বরটা নেওয়া হয়নি। খেয়াল ছিল না। অবশ্য টেলিফোনের গোবদা বইটায় হালদার স্টুডিয়োর ফোন নম্বর পাওয়া কঠিন কাজ নয়। পেতেই পারেন কিকিরা। তবে অত ব্যস্ততার কী আছে। তা ছাড়া জহর দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে এতক্ষণে! তার বাড়িতে ফোন হয়তো আছে। কার নামে কে জানে!

খুঁজেপেতে নম্বরটা পাওয়া গেলেও লাভ কী ফোন করে!

কিকিরার কী খেয়াল হল, কেন হল, তাও জানেন না, নিজের জায়গায় ফিরে এসে ফোন তুললেন।

রিং করতেই সাড়া এল।

“পানুদা, আমি কিঙ্কর কথা বলছি।”

ক্রিমিনাল কেসের ওকালতি করতে করতে পানু মল্লিক বা পান্নালাল মল্লিকের গলার স্বর খেসখেসে কর্কশ হয়ে গিয়েছে।

“রায়। কী ব্যাপার! তুই–?”

পানু মল্লিক কিকিরাকে তুমি’ ‘তুই’–যখন যা মনে আসে, বলেন।

“আপনি কি মক্কেল নিয়ে বসে আছেন?”

“না। আমি ওপরে রয়েছি। নীচে নামিনি। প্রেশার সামলাচ্ছি। আজ কোর্টে বড় দমবাজি করতে হয়েছে। টায়ার্ড।... তা তুমি ব্রাদার ফোন করছ! কোথা থেকে?”।

“বাড়ি থেকে। আমার একটা ফোঁ হয়েছে।”

“ফোঁ?”

“ফোন!”

“সু-খবর। তোমার টিকি ধরা যাবে। নাম্বারটা বলে রেখো।... ইয়ে, হঠাৎ আমায় মনে পড়ল কেন ভায়া। বেকায়দা কিছু করেছ?”

কিকিরা হাসলেন। কে কাকে বেকায়দায় ফেলে। পানুদাই তার গলায় হরিচন্দনবাবুর ঝামেলা জুটিয়েছিলেন।

“পানুদা, আপনি যেদিকে থাকেন সেখানে পাঁজাবাবু বলে কাউকে চেনেন?”

“পাঁ-জা! আমাদের ওখানে?”

“ঠনঠনিয়া পাড়ায়।”

“কই মনে পড়ছে না। কী করে? গলি, বাড়ির নম্বর?”

“এখনও জানি না। কাল জানতে পারব।”

“জানিও খোঁজ করব। কী দরকার বলো তো।” বলেই চুপ করে গেলেন পানুবাবু। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় বললেন, “তুমি কি বিনয় পাঁজার কথা বলছ?”

“বিনয় পাঁজা! চেনেন?”

“আলাপ নেই। নাম শুনেছি। আমি তো ঠিক ঠনঠনিয়া পাড়ার লোক নই।... তা কী দরকার তোমার?”

“পরে বলব। আমি ঠিক এই মুহূর্তে জানি না কিছু। কী করেন উনি? মানে পাঁজাবাবু?”

“বলতে পারব না। তবে শুনেছি ভেরি ওল্ড ফ্যামিলি। কত ওল্ড কে জানে! বাড়িটা দেখেছি। তেতলা ইটের পাঁজা। তুমি কোথাও প্লাস্টার দেখতে পাবে না। খড়খড়িঅলা সেকেলে দরজা জানলা। তেতলায় বিস্তর পায়রা উড়ে বেড়ায়। আগে একটা ফিটন গাড়ি দেখতাম, এখন দেখি না। বোধ হয় ঘোড়া মরে গেছে।... সে যাকগে, তুমি পাঁজামশাইয়ের খবর নিচ্ছ কেন?”

“পরে বলব। কালও বলতে পারি। এখন আমি কিছু জানি না, পানুদা। নাথিং ।”

“ঠিক আছে। রাত্রে ফোন করো।... তোমার ফোঁ-নম্বরটা বলল একবার, টুকে রাখি।”

কিকিরা নম্বর বললেন।

.

৩.

পরের দিন জহর এল। সকাল সকালই এসেছে।

কিকিরা বললেন, "এসো। আমি ভাবছিলাম তোমার না দেরি হয়!"

কিকিরাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল জহর। বড় পরিবারের ছেলে; সহজ শিষ্টাচার, সহবত ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

জহরকে দেখতে সাধারণ। মাঝারি লম্বা। স্বাস্থ্য ভালই। পলকা নয় আবার মেদবহুল নয়। মাথার চুল কোঁকড়ানো। চোখ-নাক পরিষ্কার। সামনের একটা দাঁত আধ-ভাঙা। তবে ওর চোখ দুটিতে কেমন একটা আবেগ মাখানো। মনে হয়, ভাবুক বা কল্পনাপ্রবণ।

"বোসো, চা-টা খাও। তাড়া নেই তো?" জহর বসবার আগেই কিকিরার জন্যে অপেক্ষা করল। "আপনি বসুন।"

কিকিরা বসলেন।

"আমি প্রথমে পতাকীদার বাড়ি গিয়েছিলাম। কেমন আছে খবর নিয়ে এলাম।"

"কেমন আছে?"

"পায়ে হাতে প্রচণ্ড ব্যথা। রাত্রে জ্বরও এসেছিল। সকালে কম। এখন দু-তিনদিন বসে থাকতে হবে বাড়িতে।"

"জোরেই পড়েছিল। ...তা ও আসবে না। তোমার দোকান?"

"ও ব্যবস্থা করে নেব। আজ একজনকে বলে এসেছি দোকানটা খুলে দেবে। দশটায় খুলি। এখান থেকে ফিরতে ফিরতে যদি দশটা বেজে যায়–তাই বলে এসেছি। দুপুরে একবার বাড়ি যাব, খাওয়া দাওয়া সেরে আসতে। বিকেল থেকে দোকানেই থাকব।"

জহরের বাড়ির খবরাখবর নিলেন কিকিরা অভ্যাসমতো।

"তারপর," কিকিরা বললেন। "কাজের কথা শুনি। ব্যাপারটা কী, জহর?"

জহর বলল, "কাকা, আমি নিজেই জানি না ভেতরের ব্যাপারটা কী! গত পরশুদিন আমায় এক ভদ্রলোক, পাঁজাবাবু, দোকানে ফোন করে বললেন যে, আমাদের ভোলা ভোলা ফোটো, তাঁর মায়ের, ওঁদের বাড়িতে রয়েছে। সেই ফোটো থেকে ফুল সাইজ, মানে পুরো বড় সাইজের একটা এনলার্জড কপি করে দিতে হবে। কোথাও কোথাও রিটাচ' দরকার।"

"তোমাদের দোকানের, মানে স্টুডিয়োতে ভোলা ফোটো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের ভোলা, তবে স্টুডিয়োতে নয়। ওঁদের বাড়িতে গিয়ে ভোলা।"

"তা ও বাড়ি থেকে ফোটো পাঠাবে কেন? তোমাদের স্টুডিয়োয় ছবিটার নেগেটিভ নেই?"

জহর মাথা নাড়ল। আলগা ধরনের হাসি। বলল, "না। সব ফোটোর কি নেগেটিভ রাখা যায়! স্পেশ্যাল হলে রাখা যায়। আছেও আমাদের। এমনি অর্ডিনারি ফোটোর নেগেটিভ রাখব কেন! সম্ভব নয়। কাস্টমারকেই দিয়ে দিই। আমাদের স্টুডিয়োয় ইম্পরট্যান্ট ঘটনা, বিশিষ্ট বিখ্যাত মানুষজনের কারও কারও ফোটোর নেগেটিভ এখনও আছে। প্রিন্টও আছে কিছু। কিন্তু রাম-শ্যাম যদু মধুর নেগেটিভ নেই। রাখি না? কেউ রাখে না। তা ছাড়া, কাকা, আগেকার দিনের ফিল্মের কোয়ালিটি আজকের মতন ছিল না। রাখলেও নষ্ট হয়ে যেত।"

"ফোটোটা কে তুলেছিল?"

"আমি।"

"কতদিন আগে?"

"আমার সঠিক মনে নেই। উনি যা বললেন তাতে মনে হল, ছ'সাত বছর আগে।"

"তোমার স্টুডিয়োতে নয়!"

"না, পাঁজাবাবুর বাড়িতে গিয়ে। তাঁর বিধবা মায়ের ছবি। বৃদ্ধা মহিলা। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস হবে। মাথায় কাপড়–মানে থান। গায়ে নামাবলি চাদর। হাতে মালা। আসনে বসে ছিলেন।"

কিকিরা বুঝতে পারলেন। এরকম ফোটো অনেক বাড়িতেই দেখা যায়, জীবনের শেষবেলায় তুলে রাখা ঠাকুমা-মা-দিদিমার ছবি। ঠাকুরদা বা বাবারও হতে পারে। সব ফোটোরই ধরন প্রায় এক। হেরফের বিশেষ থাকে না।

বগলা চা জলখাবার নিয়ে এল। রেখে দিল সামনে। জহর বলল, "এত?"

"আরে খাও।"

"এত আমি পারব না, কাকাবাবু?"

"খুব পারবে। ইয়াং ম্যান। সেই কোন দুপুরে বাড়ি গিয়ে ভাত খাবে। ওমলেট, রুটি আর দুটো মিষ্টি খেতে না পারলে হজমযন্ত্রটা শরীরে রেখেছ কেন! নাও, হাত লাগাও।"

কিকিরা নিজের চায়ের মগ তুলে নিলেন। সকালের দিকে তাঁর তিন মগ চা বাঁধা। খাদ্য যৎসামান্যই খান।

জহর যেন বাধ্য হয়েই খাবারের প্লেটটা তুলে নিল। তার আগে জল খেল গ্লাস তুলে নিয়ে।

"জহর, তোমার ওই পাঁজাবাবুর নাম কী? ...বিনয় পাঁজা?"

জহর অবাক! তাকিয়ে থাকল। "আপনি জানলেন কেমন করে! পতাকীদা বলেছে?"

"না। পতাকী কি নাম জানত?"

"কই! আমি তো নাম বলিনি। ঠিকানা বলেছিলাম আর একটা স্লিপ, টুকরো স্লিপ দিয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল, আমার লোক পাঠালাম, যা দেওয়ার দিয়ে দেবেন। খামের

ওপর পেনসিলে শুধু মিস্টার বি. পাঁজা লেখা ছিল। ওঁর পুরো নাম বিনয়ভূষণ না, বিনয়রঞ্জন– আমি মনে করতে পারিনি।”

“মিস্টার?”

“হ্যাঁ। শ্রী লিখিনি। ...আপনি কেমন করে নাম জানলেন। চেনেন নাকি?”

“আমি কেমন করে চিনব! তোমার ফোন পেয়ে কী মনে হল, পরে একজনকে ফোন করলাম। কাছাকাছি পাড়ায় থাকে। পুরনো লোক। ক্রিমিন্যাল কেসের প্র্যাকটিস করেন। পাকা উকিল।”

“ও! ...চেনেন তিনি বিনয়বাবুকে?”

“নামে চেনেন। আলাপ নেই,” বললেন কিকিরা। জহরের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলেন। জহর খাওয়া শুরু করেছে। চোখ সরিয়ে জানলার দিকে তাকালেন একবার। রোদ এখনও জানলার ওপারে। অনেকটা বেলায় ঘরে ঢুকবে। আবার চোখ ফেরালেন কিকিরা। বললেন, “অনেককালের পুরনো বাড়ি শুনলাম পাঁজাবাবুদের। এখন শুধু ইট ছাড়া চোখে পড়ে না কিছু।”

“ঠিকই শুনেছেন। বহু পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ি। বাইরে থেকে ইটই চোখে পড়ে। ভেতরে নীচের তলায় খুপরি খুপরি ঘর। হরেকরকম লোক। তারা কেউ দরজিগিরি করে, কেউ স্টিলের বাসন মাথায় নিয়ে ফেরি করে পাড়ায় পাড়ায়, কারও বা হাওয়াই চপ্পলের ব্যবসা- ফুটপাথে বসে কেনাবেচা...”

“পাঁজামশাই থাকেন কোথায়?”

“দোতলায়। আমি দোতলায় দেখেছি তাঁকে। সেকালের দোতলা, মানে যত ঘর তত প্যাসেজ! ফোটোও তুলেছিলাম দোতলার পিছন দিকের একটা ঘরের সামনে। বোধ হয় পাশেই ঠাকুরঘর।”

“তেতলায় কে থাকে?”

“বলতে পারব না। আমি তো তেতলায় উঠিনি। ওপরে কোনও শব্দও শুনিনি!”

“ফাঁকা পড়ে থাকত?”

“কী জানি!...আমি তো ফোটো তুলতে একবারই মাত্র গিয়েছি।”

“ছবি দিতে যাওনি?”

“না। উনি এসে দোকান থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।”

চা প্রায় শেষ। কিকিরা চুমুক দিলেন চায়ে। আলগাভাবে। বললেন, “ওঁকে একবারই দেখেছ?”

“না, না, আরও দু-তিনবার দেখেছি। পথেঘাটে।” জহর জল খেল আবার। চায়ের কাপ টেনে নিল। “ভদ্রলোক খুব ইন্টারেস্টিং। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, না হলে ফিনফিনে আদ্দির।

পরনে মিহি ধুতি- দুইই বেশ দামি। গলায় একটা সোনায় গাঁথা পাথরের মালা। কী পাথর জানি না। হালকা নীল দেখতে। দানাগুলো ছোট ছোট। কাঁধে রঙিন চাদর। মাথার চুল ঝাঁকড়া, ফোলানো। হাতের আঙুলে অদ্ভুত সব আংটি.... লোহা, সিসে, তামা, সোনা, রুপো। বাঁ হাতে পাথর বসানো একটা বড় আংটি। কী পাথর জানি না। কালো কুচকুচে দেখতে।"

কিকিরা কৌতূহল বোধ করছিলেন। "আচ্ছা! জ্যোতিষী ভক্ত। ভাগ্য বিশ্বাসী। কী করেন উনি? ভাল কথা, বয়েসটা বললে না?"

"বয়েস হয়েছে৷ ফোটো তুলতে যখন গিয়েছিলাম তখন ওনার বয়েস পঞ্চাশ-টঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। এখন ষাটের মতন হবে।"

"মানে ঠিক বুড়ো নয়, প্রৌঢ়! কলসির জল গড়িয়ে খান? না, কিছু করেন? ব্যবসাপত্র?"

জহর বলল, "তা আমি জানি না, কাকা! তবে চাকরিবাকরি করার লোক নয়। ওসব পুরনো বনেদি বাড়িতে চাকরি করার রেওয়াজ থাকে না। গোলামির ধাতই নয় ওঁদের। ব্যবসাপত্র কী করেন বা করতেন, বলতে পারব না। শুধু জানি বা শুনেছি, বীরভূমের কোথায় যেন বিস্তর জমিজমা, বাগান, পুকুর, চালকল, এটাসেটা ছিল। জমিদার বংশ।"

"আর কলকাতায়?"

"এখানেও ছিল। তবে এটা পৈতৃক। আর বীরভূমে ওঁর মাতুল বংশের বাড়ি। সেই বংশ একেবারে ফাঁকা। বিনয়বাবুই একমাত্র জীবিত স্বজন। তিনিই মাতুলবংশের যাবতীয় সম্পত্তি ভোগদখলের উত্তরাধিকার পেয়েছেন।"

কিকিরা কেমন ধাঁধায় পড়ে গেলেন। বীরভূমে মাতুলবংশের জমিদারি আর কলকাতায় পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র মালিক।

কী ভেবে কিকিরা বললেন, "ভদ্রলোককে তুমি চিনলে কেমন করে?"

মাথা নাড়ল জহর। "সেভাবে আমি চিনি না, কাকা। বাবার সঙ্গে আলাপ ছিল। বাবার কাছে মাঝেসাঝে আসতেন। তখন দেখেছি। যেটুকু শুনছি তাও বাবার মুখে। আপনি তো জানেন, বাবা আজ প্রায় আট বছর আগে চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে।"

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কিকিরা! চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে একটা চুরুট ধরালেন।

শেষে কিকিরা বললেন, "পতাকীর ব্যাগ তো খোয়া গিয়েছে। বিনয়বাবুর পাঠানো ফোটো তো তুমি হাতে পেলে না। এরপর–?"

জহর মাথা চুলকে হতাশ গলায় বলল, "আমি বুঝতে পারছি না কী করব?"

"ফোটোটা যে খোয়া গিয়েছে, জানিয়েছ পাঁজামশাইকে?"

"না।"

"কেন?" 'সাহস হচ্ছে না।"

“সাহস!”

জহর ইতস্তত করে বলল, “বিনয়বাবু বারবার বলে দিয়েছিলেন, ওটা খুব জরুরি। সাবধানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। কাজটাও পনেরো দিনের মধ্যে করে দিতে হবে।” বলে একটু থেমে জহর কেমন সন্দেহের গলায়, বা খুঁতখুঁতে গলায় বলল, “আশ্চর্য কী জানেন। ফোটোটার–মানে ওটা এনলার্জ করার পর কোথায় কী রিটাচ করতে হবে তাও বলে দিয়েছিলেন।”

“মানে?”

“মানে রিটাচের সময় বাঁ চোখটা ডান চোখের তুলনায় সামান্য ছোট করতে হবে, চোখের দৃষ্টি একটু টেরা, মাথার কাপড় কপাল পর্যন্ত নামিয়ে দিতে হবে, নাক অতটা খাড়া রাখা চলবে না, গাল বসা, ভাঙা গোছের... আরও ছোটখাট দু-চারটে ব্যাপার!”

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, “কেন?”

“সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। কতকাল আগে এক বৃদ্ধা মহিলার ফোটো তুলেছিলাম–মুখের ফোটো একেবারে নিখুঁত হয় না সাধারণত। তবু একটা মুখ নিয়ে কাজে বসলে আমরা–আমি অন্তত যেমন প্রয়োজন রিটাচ করে থাকি। বাবা অনেক ভাল পারতেন কাজটা। আমি অতটা পারি না। তবু খারাপ করি না। তা বলে, মুখের চেহারাটাই আমি দেখলাম না, মনেও নেই, উনি আমায় ফোনে কী কী করতে হবে বলে দিচ্ছেন, এটা কী ধরনের কথা!”

“তুমি কিছু বলেনি?”

“না। মুখে আসছিল, বলতে পারলাম না। বুড়োমানুষ; বাবার সঙ্গে আলাপ ছিল একসময়। ভাবলাম, আগে তো ফোটোটা দেখি, কী অবস্থা হয়েছে সেটার, তারপর বলা যাবে। ফোটো কম-বেশি নষ্টও হয়ে যেতে পারে।”

‘যত্ন করে না রাখলে হতেও পারে,” কিকিরা বললেন। চুপ করে গেলেন হঠাৎ। পায়ের দিকে একটুকরো কাগজ উড়ে এসেছিল হাওয়ায়। সরিয়ে দিলেন। বাইরে রোদ বাড়ছে। উজ্জ্বল রোদ আলোর সঙ্গে তাত। বাতাস সামান্য গরম।

কিকিরা বললেন, “তুমি একটা ফোন করো পাঁজামশাইকে, বা নিজে তাঁর বাড়ি যাও। ব্যাপারটা বলো। ওঁর কথামতন কাজ যখন নিয়েছ তখন তো তোমার জানানো উচিত, ফোটোটা তুমি পাওনি, সেটা খোয়া গিয়েছে।”

“তা তো বলতেই হবে। ভাবছি, আজ ফোন করব। নম্বরটা উনি বলেছিলেন।”

“দেখো কী বলেন! ...আচ্ছা জহর, তোমার কি মনে হয়, কেউ জেনেশুনে পতাকীর কাছ থেকে ব্যাগটা হাতিয়েছে? তা যদি হয় তবে মামুলি পকেটমারের কাজ এটা নয়। টাকা-পয়সার জন্যেও ব্যাগ হাতায়নি। তার উদ্দেশ্য ছিল ওই ফোটোটা হাতিয়ে নেওয়া!”

জহর গলা ঘাড় মুছে নিল রুমালে। কিকিরাকে দেখছিল। বলল, “আমি বুঝতে পারছি না কাকা। আপনি যা বলছেন, সেরকম সন্দেহ আমারও হয়েছে। কিন্তু ভাবছি, সামান্য একটা ফোটো হাতাবার জন্যে এত কাণ্ড কে করবে? কেনই বা করতে পারে? ...আমি পতাকীদাকে

বারবার জিজ্ঞেস করেছি, কেউ তাকে কিছু বলেছে কি না! কিংবা তার পিছু নিয়েছিল বলে মনে হয়েছে কি না! পতাকীদা বলছে, একটা লোক তার পিছু নিয়েছিল। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, আবার কথাটা উড়িয়ে দিতেও পারছি না। হয়তো একটা গোলমাল, আছে। হয়তো...?"

"পরে সেটা ভাবা যাবে। আগে তুমি একটা ফোন করো পাঁজামশাইকে। তাঁর রি-অ্যাকশানটা দেখো। তারপর যা করার করতে হবে।"

"আপনি যদি দেখেন তার চেয়ে ভাল আর কী হবে!" জহর অনুরোধের গলায় বলল।

কিকিরা হাসলেন। সস্নেহ হাসি। "দেখা যাক..!"

৪.

তারাপদদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর জহরকে বললেন কিকিরা, "এরা অ্যামেচার। আমারই মতন। যেমন গুরু, তেমনই চেলা। তবে কাজের বেলায় অপদার্থ নয় একেবারে।" বলে হাসলেন।

জহরকে আগে কোনওদিন দেখেনি তারাপদরা। দেখার কথাও নয়। দুজনেই দেখছিল জহরকে। একেবারে সমবয়েসি না হলেও প্রায় কাছাকাছি বয়েস। চোখমুখের চেহারাতেই বোঝা যায়, ভদ্র সাদাসিধে মানুষ। ঘোরপ্যাঁচে থাকার লোক নয়। বরং. খানিকটা বেশি সরল।

পতাকী আজও দোকানে আসেনি। তবে অনেকটাই ভাল। পাশের দোকানের একটি আধবুড়ো লোককে মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে জহর তার দোকান সামলে যাচ্ছে। আগামীকাল হয়তো পতাকী আসতে পারে।

কিকিরাদের দোকানে বসিয়ে জহর বলল, "কাকা, আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি। পাঁচ-সাত মিনিট..."

সন্ধে হয়ে গিয়েছে। এখন সাত, সোয়া সাত। দোকান বন্ধ হবে আরও ঘণ্টাখানেক পরে। আটটায়। বাইরের বড় রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড় এখনও কম নয়। তবে কমে আসছে ক্রমশ। একটা বাসের হর্ন কানের পরদা কাঁপিয়ে চলে গেল এই মুহূর্তে।

তারাপদরা দোকানের ভেতরটা দেখতে দেখতে বলল, "এ একেবারে ভেরি ওল্ড দোকান, সার। চেয়ার টেবিলগুলো পর্যন্ত সে আমলের। কাঠের বাজারে দাম আছে।"

কিকিরা নিস্পৃহ গলায় বললেন, "ওল্ড ইজ গোল্ড।"

তারাপদ মজা করে বলল, "পিওর, না খাদ মেশানো?"

চন্দন দোকানের দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটা ফোটো দেখছিল। ফ্রেমে বাঁধানো বড় আর মাঝারি ছবি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধি, একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, মড়ক বা দুর্ভিক্ষের অসাধারণ এক ফোটোগ্রাফ। আরও আছে। পুরনো হাওড়া ব্রিজ, ময়দানে দাঁড়ানো একটা ফিটন.... মায় একটা ভাঙা কলসি আর কাক, কলকাতার গঙ্গার ঘাট– বাবুঘাট বোধ হয়।

চন্দনের কৌতূহল হচ্ছিল। কিছু ফোটোগ্রাফ এত পুরনো যে, ওসব দৃশ্য যখন তোলা হয়েছে জহর তখন জন্মায়নি, বা শিশু।

কিকিরা চন্দনকে দেখছিলেন। অনুমান করতে পারলেন সে কী ভাবছে। বললেন, "ভেরি সিল ব্যাপার, চাঁদুবাবু! জহরের বাবার হাতে ভোলা ফোটো অনেক, দু-একটা আবার বাবার গুরুর, মানে যিনি হাত ধরে জহরের বাবাকে বিদ্যেটা রপ্ত করাতেন। বাকি যা দেখছ..."

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে চন্দন বলল, "আপনি দেখছি নাড়ি নক্ষত্র জানেন?"

"জানি মানে, শুনেছি। আড্ডা মারা স্বভাব, দোকানে এলে গল্প-গুজব হত–তখন শুনতাম।

বিখ্যাত বিপ্লবী হেম কানুনগো একজন মাস্টার ফোটোগ্রাফার ছিলেন, জানো?”

চন্দন মাথা নাড়ল, জানে না।

স্টুডিয়োর এটা অফিসঘর। হাতকয়েক জায়গা। টেবিল চেয়ার। একটা পুরনো আলমারি। কাঁচের পাল্লা। ভেতরে বিক্রিবাটার জন্যে শস্তা দু-তিনটে বক্স ক্যামেরা, ফিল্ম রোল, বাঁধানো অ্যালবাম। ডানপাশে বোধ হয় স্টুডিয়ো ঘর। কাঠের খুপরি ঘরের দরজা।

তারাপদ হঠাৎ হেসে বলল, “কিকিরা, আপনি কি কোনও সময়ে ক্যামেরা কাঁধে ঘুরতেন নাকি?”

“আমি! ...না তারাবাবু, নেভার। আমার দুটো জিনিস নেই, ধৈর্য আর তৃতীয় নয়ন।”

“সে কী, সার! আপনার তো দুটোই প্রবল।”

“ঠাট্টা করছ! ...তা হলে তো তোমাদের ভজুদার বাণী শোনাতে হয়!”

“কে ভজুদা?”

“ফিশ ক্যাচার। ছেলেবেলার, আমার ছেলেবেলার কথা বলছি, ভজুদা আমাদের পাড়ার পয়লা নম্বর ওস্তাদ ছিল মাছ ধরার। এগারোটা নানা টাইপের ছিপ, এক কৌটো বঁড়শি, সাত কিসিমের চার বানাতে পারত। ভজুদার কাছে তালিম নিতে গিয়েছিলাম। একটা পুঁটিমাছও ধরতে পারিনি। ভজুদা তখন মাথায় চাঁটি মেরে বলেছিল, তোর দ্বারা হবে না! ওরে গাধা, তোর না আছে ধৈর্য, না চোখ। না ধৈর্য, না দৃষ্টি.... ওরে ভূত, অর্জুন কি সাধে অর্জুন! চোখের দৃষ্টি একেবারে নিবাত নিষ্কম্প.... তুই গর্দভ– গো ব্যাক। ভাতের পাতে যে মাছভাজা পাবি, তুলে নিয়ে মুখে পুরগে যা। পুকুরের মাছে তোর নো চান্স।”

তারাপদ হাসতে হাসতে বলল, “সংস্কৃত বাণীটাও ভজুদার?”

“ও ইয়েস। ভজুদার ইংলিশও ছিল আমার মতন। হোম মেইড ইংলিশ।”

ওরা হেসে উঠল।

এমন সময় ফোন বাজল দোকানের। টেবিলের ওপর ফোন। কিকিরারা ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। জহর ফেরেনি এখনও। তিনি ইতস্তত করে উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন।

সাড়া দিলেন না কিকিরা। সরাসরি নয়। তবে শব্দ করলেন। কাশলেন যেন।

ওপাশ থেকে গম্ভীর গলা, “জহর...!”

কিকিরা টেলিফোনের মুখের কাছটায় হাত চাপা দিলেন। তারাপদদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। চুপ করতে বললেন।

“উনি একটু বাইরে গেলেন; আসবেন এখনই,” কিকিরা ফোনের মুখ থেকে হাত সরিয়ে সাধারণ ভাবে বললেন।

“তুমি কে?” ওপার থেকে প্রশ্ন।

“আমি ওঁর চেনা কাস্টমার। ...আমাকে বসিয়ে একটু বাইরে গেছেন দরকারি কাজে এসে পড়বেন।”

“ঠিক আছে। আমি পরে ফোন করছি।”

“কী নাম বলব?

“বিনয়বাবু?” ওপাশে ফোন নামিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক।

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। “পাঁজাবাবুর ফোন।” গলায় ঈষৎ উত্তেজনা। সরে এলেন টেবিলের সামনে থেকে।

তারাপদ বোধ হয় আগেই আন্দাজ করেছিল। চন্দনের দিকে তাকাল।

“কড়া গলা নাকি, সার?” তারাপদ বলল।

“গম্ভীর।”

“হিজ মাস্টার্স ভয়েস?” চন্দন ঠাট্টা করে বলল।

“মেজাজ আছে।”

“তা থাক। কড়া হলে অন্যরকম মনে হত।”

ততক্ষণে জহর ফিরে এল। এসেই বলল, “আমার একটু দেরি হয়ে গেল কাকা। আসলে আমি বুলুবাবুর দোকানে গিয়েছিলাম। ওঁর বাবাকে বিকেলে নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়েছে। হার্ট অ্যাটাক। খবর নিয়ে এলাম। পাশাপাশি সব দোকান, একসঙ্গে আছি..”

“তোমার বিনয়বাবু ফোন করেছিলেন।”

জহর যেন ঘাবড়ে গেল। “কিছু বললেন?”

“আবার ফোন করবেন।”

মাথা নাড়তে নাড়তে জহর টেবিলের সামনে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। “কাল থেকে এই নিয়ে বারচারেক হয়ে গেল। এক

একবার ফোন আসে আর আমার বুক ধড়ফড় করে।”

“তুমি কাল পাঁজামশাইকে ফোন করে খবরটা জানিয়েছ তা হলে!”

“জানিয়েছি। তবে একটু ঘুরিয়ে।”

“মানে?”

“বললাম, যে-লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম, আমার দোকানের পাতকীদা, সে ফেরার পথে অ্যাকসিডেন্ট করেছে। তার ব্যাগটা পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় হারাল...”

“অশ্বত্থামা হত ইতি গজ...”

“হ্যাঁ, এইরকম আর কী! শুনে তো উনি একেবারে আগুন। রাগে ফেটে পড়লেন। যা মুখে এল বললেন আমাকে। ....আমি তখনকার মতন ওঁকে ঠাণ্ডা করার জন্যে বললাম, আমি খোঁজখবর করছি। ব্যাগটার। পতাকীদা বাড়িতে পড়ে আছে বিছানায়, নয়তো...”

“ওতে কি আর ভবি ভোলে?”

“ভুলছে না। কাল দু’বার ফোন এসেছে। আজ ও-বেলা একবার। আবার এখন একবার। আরও তো আসবে বলছেন।”

চন্দন বলল, “একটা পুরনো ফোটোর জন্যে এমন পাগলামি! ভদ্রলোকের এত হইচই করার মানেটা কী?”

দোকানের ভেতরের দরজাটা হালকা কাঠের ঠেলা-দরজা। বাইরের দিকেও একটা দরজা আছে, কাঠের। দরজা ঠেলে যে ঢুকল তার হাতে চায়ের কেটলি আর কাপ। জহরকে বলতে হল না, আগেই বলে এসেছে। কিকিরাদের চা দিল লোকটি। জহরও চা নিল।

লোকটি চলে যাওয়ার পর জহর বলল, “পতাকীদা আমায় ডুবিয়ে দিল। এখন আমি কী করব! বিনয়বাবুকে সামলাই কেমন করে!”

তারাপদ তামাশা করে বলল, “এক কাজ করুন। বাড়ির কেউ হারিয়ে গেলে লোকে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, অমুক চন্দ্র অমুক নিরুদ্দেশ। বয়েস এত, চেহারার একটা বর্ণনা...। আপনি ভদ্রলোককে বলুন-ফোটো নিরুদ্দেশের একটা বিজ্ঞাপন দিতে কাগজে।” বলে হাসল।

চন্দন বলল, “কেন! শুধু মানুষ কেন, দরকারি কাগজপত্র, চাবি, লাইসেন্স হারানোর বিজ্ঞাপনও তো কাগজে থাকে।”

জহর কোনও জবাব দেবে না ভেবেছিল। যার জ্বালা সে বোঝে, অন্যে কী বুঝবে! ওরা রসিকতা করছে করুক।

কিছু বলব না ভেবেও জহর হঠাৎ বলল, “যাঁর ফোটোর কথা হচ্ছে–তিনি অবশ্য সত্যিই নিরুদ্দেশ।”

কিকিরা একবার তারাপদদের দেখলেন, তারপর জহরের দিকে তাকালেন। “নিরুদ্দেশ। মানে মিসিং।”

“হ্যাঁ। নিখোঁজ।”

“কবে? কই, তুমি তো আগে আমায় বলোনি।”

“আমি কেমন করে বলব! জানতাম আগে?”

“জানতে না!... কবে জানলে?”

“গতকাল,” জহর বলল। চুপ করে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর কেমন হতাশ গলায় বলল, “কাল যখন উনি আবার ফোন করলেন, দ্বিতীয়বার, তখন আমি কিছু না ভেবেই বলেছিলাম,

“আপনি রাগ করছেন কেন? একটা ফোটো তো! আপনি বলুন, যেদিন বলবেন, আমি আপনার বাড়ি গিয়ে তুলে আনব।... উনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, কার ফোটো তুলবে! যে-মানুষ নেই তার ফোটো তুলবে। ননসেন্স। কাজটা অত সহজ হলে আমি তোমায় পুরনো ফোটোটা পাঠাতাম না, বলতাম না–তুমি ওই পুরনো থেকে আমায় একটা এনলার্জ কপি করে দাও।”

“নেই মানে?” কিকিরা বললেন।

“মানে আমি জানি না। তবু বোকার মতন বলেছিলাম, সে কী! মারা গিয়েছেন। আমার কথা শুনে কী ভাবলেন কী জানি, শুধু বললেন, মিসিং, খোঁজ পাওয়া যায়নি।”

“মিসিং! তারপর।”

“আর কিছু বলেননি। আমিও সাহস করে অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি।”

কিকিরা বেশ অবাক। চন্দনদের দিকে তাকালেন। তারাও বোকার মতন বসে আছে। বুঝতে পারছে না ঠিক কী হয়েছে, হতে পারে।

এমন সময় ফোন বাজল।

ফোন তুলল জহর।

“হ্যাঁ, জহর বলছি।” ওপাশ থেকে বিনয়বাবুই কথা বলছেন। কী বলছেন কিকিরা শুনতে পাচ্ছিলেন না; শোনার কথাও নয়। জহর শুধু সাড়া দিয়ে যাচ্ছিল।

সামান্য পরেই ফোন রেখে দিল জহর। “পাঁজামশাই?”

“হ্যাঁ।”

“কী বললেন?”

“বললেন,কাল বিকেলে উনি নিজেই আসবেন দোকানে। অনেক খুঁজে একটা নেগেটিভ তিনি পেয়েছেন। অন্য নেগেটিভ। পড়ে থেকে থেকে ফেড হয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে যাওয়াই সম্ভব। তবু সেটা নিয়ে তিনি আসবেন, যদি কাজে লাগে।”

তারাপদ হঠাৎ বলল, “তা আগে এলেই তো পারতেন।”

জহর বলল, “উনি অসুস্থ মানুষ। বয়েস হয়েছে। কী করে বুঝবেন যে-ফোটোটা পাঠাচ্ছিলেন সেটা হারিয়ে যাবে ওভাবে।”

“উনি অসুস্থ। কী অসুখ?” কিকিরা জানতে চাইলেন।

“আমি তো শুনলাম, সবসময় মাথা ঘোরে। বললেন, ভারটিগো।”

“ভারটিগো!” চন্দন বলল, “ভারটিগো সাধারণত ঘোরানো সিঁড়ি-টিড়ি উঠতে গেলে হয়, খুব উঁচু জায়গায় গিয়ে নীচে তাকালেও হয়। আরও নানা কারণে হতে পারে। উনি কি হাইপার টেনশান–মানে হাই ব্লাড প্রেশারে ভোগেন?”

অসহায় মুখ করে জহর বলল, "আমি জানি না। হতে পারে..."

কিকিরা কী যেন ভাবছিলেন। চোখ বুজে ডান হাতটা কপালে রেখে বসে থাকলেন। খানিকটা পরে চোখ খুললেন। বললেন, "শোনো উনি কাল আসছেন আসুন। ভালই হল। আমিও আসব। তবে দোকানে নয়। উনি যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ নয়। তার বদলে একটা জিনিস আমি রেখে যাব।" বলে কিকিরা হাত বাড়িয়ে টেবিলের একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখালেন। "শোনো জহর, কাল একসময় এই বেলার দিকে এসে আমি তোমার টেবিলেই ওই জায়গায় একটা ডেস্ক পে-হোল্ডার রেখে যাব। ছ' সাত ইঞ্চি লম্বা। হোল্ডারের মাঝখানে একটা ছোট ঘড়ি। টেল ঘড়ি৷ দেখতে কালো, ছোট, হালকা, স্মল পিস। ঘড়িটার দু পাশে দুটো খোপ আছে। একটাতে পেন-হোল্ডার-মানে কলম রাখার ব্যবস্থা, অন্যটায় পেপারকাটার, ক্লিপ এ-সব। আসলে টেব্ল ঘড়ি হলেও এটা কিন্তু টেপ রেকর্ডার। পেন হোল্ডারের মুখটা আসলে মাইক। তলায় টেপ আর ব্যাটারি রাখার ব্যবস্থা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। জাপানি মাল তো, পাক্কা অ্যারেঞ্জমেন্ট। ফ্যান্সি মার্কেট থেকে কিনেছিলুম। ... আমার কাছে এরকম দু-একটা জিনিস আরও আছে, অন্য কায়দার। তবে সেগুলোয় এখানে সুবিধে হবে না। ঘড়িটাই একদম মানিয়ে যাবে।"

তারাপদরা কিকিরার বাড়িতে হরেকরকম পুরনো নতুন, নানান ধরনের জিনিসপত্র দেখেছে। এসব তাঁর জমিয়ে রাখার শখ। ওরা অবাক হল না।

জহর বলল, অবাক হয়েই, "ঘড়ি নিয়ে আমি কী করব, কাকা?"

"তুমি কী করবে আর! সময়মতন চালু করে দেবে। কেমন করে দেবে আমি দেখিয়ে দেব। ভেরি ইজি ব্যাপার।"

"তারপর?"

"পাঁজাবাবুকে যা বলার বলতে দেবে। তুমি চেষ্টা করবে তাঁকে দিয়ে বেশি কথা বলাবার।"

"মানে?"

"মানে যতটা পারো নিরুদ্দেশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে। কোথায় কবে কেমন করে নিরুদ্দেশ হলেন মহিলা? এতকাল পরে ফোটোটা এনলার্জ করার দরকার পড়ল কেন? কী হবে এনলার্জ করিয়ে? অত রিটাচ করারই বা দরকার কেন?"

"ফোটোই হল না, তো রিটা।"

"যদি ওঁর নেগেটিভ থেকে হয়?"

"কিন্তু কাকা, এসব ওঁর ফ্যামিলির ব্যক্তিগত ব্যাপার। বলবেন কেন?"

"না বলতেও পারেন! আই অ্যাডমিট।"

"তবে?"

"জহর! আমি পাঁজামশাইকে দেখিনি। তাঁর সম্পর্কে জানি না কিছু। তবু তোমায় বলছি, ভেতরে কোনও বড় রহস্য আছে। সাম্ মিস্ট্রি। নয়তো এতকাল পরে ভদ্রলোক ফোটো নিয়ে এত ব্যস্ত, উতলা হতেন না।"

জহর চুপ করে থাকল।

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। তারাপদরাও যেন গন্ধ পাচ্ছিল রহস্যের।

"আমরা এখন উঠি," কিকিরা বললেন জহরকে। "ঘাবড়ে যেয়ো, না। কাল আমি যথাসময়ে তোমার স্টুডিয়োর কাছাকাছি হাজির থাকব। দেখাও হবে। নার্ভাস হবে না একেবারে। চলি।" কিকিরা উঠে পড়লেন।

৫.

হালদার স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা এগিয়ে কিকিরা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কলকাতা শহরে কদাচিৎ বসন্তকালের মোলায়েম ফুরফুরে স্নিগ্ধ হাওয়া অনুভব করা যায়। এখন যে হাওয়া দিচ্ছিল তা মনোরম, খানিক এলোমেলো। ফুটপাথের পাশেই পুরনো এক গির্জা, সামান্য ফাঁকা মাঠ, কয়েকটা সাবু গাছ।

"কটা বাজল, চাঁদু?"

চন্দন ঘড়ি দেখল হাতের। "সাড়ে সাত বেজে গিয়েছে।"

কিকিরা একবার আকাশের দিকে তাকালেন। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনও তিথি। দ্বাদশী ত্রয়োদশী হবে।

"ভাবছি একবার পানু মল্লিকের কাছে যাবা"

"ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার?" তারাপদ বলল।

"ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার আবার কী হে! ক্রিমিন্যাল কেসের প্র্যাকটিস করেন।"

"ওই হল!... তা তাঁর কাছে কেন?"

"পানুদাকে বলেছিলাম, আপনার পাড়ার কাছাকাছি পাঁজামশাই থাকেন, একটু খবরাখবর নেবেন।"

"ও! কোথায় থাকেন আপনার পানু মল্লিক?"

"কেশব সেন স্ট্রিট।" বলেই হাত বাড়ালেন কিকিরা, "দেখি একটা ফুঁ দাও তো!" ফুঁ মানে সিগারেট। কিকিরা নিজের মনেই বললেন, "পানুদার ঠিকানা কেশব সেন স্ট্রিট হলেও ওঁর বন্ধুবান্ধব আড্ডা থিয়েটার ক্লাব বরাবরই বউবাজারের দিকে ছিল।"

সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে তারাপদ বলল, "এখন যাবেন। বেটাইম হয়ে যাবে না। গিয়ে হয়তো দেখবেন, ভদ্রলোক মক্কেল নিয়ে বসে আছেন। উকিল আর ডাক্তার– সন্ধেবেলায় কামাই দেয় না শুনেছি। টাকা কামাবার টাইম ওটা।" বলে চোখ টেরা করে চন্দনকে দেখল।

চন্দন পাত্তাই দিল না তারাপদকে, কথাটা যেন তার কানেই যায়নি। "আপনি একা যাবেন তো চলে যান, আমরা কেটে পড়ি।"

"তা হয় না। তোমরাও চলো। ...আরে আমি বুড়োমানুষ, অর্ধেক কথা মাথায় আসে না, যা শুনি ভুলেও যাই। চলো।"

"আমাদেরও টেনে নিয়ে যাবেন!"

"বা, তোমরাই তো আমার কমান্ডো।"

তারাপদরা হেসে উঠল। কিকিরা নজর করে ফাঁকা ট্যাক্সি দেখছিলেন। পেয়েও গেলেন একটা।

ট্যাক্সিতে বসে কিকিরা হঠাৎ বললেন, "চাঁদু, তোমাদের ডাক্তারিতে কী বলে! এমন তো অনেক সময় দেখো, আপাতত, গোড়ায় গোড়ায় যে রোগটাকে সিম্পল বলে মনে করছ, পরে দেখলে সেটা ভীষণ জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক কি না?"

চন্দন মাথা হেলিয়ে বলল, হয়।

"আমার সন্দেহ হচ্ছে, পাঁজাবাবুর কেসটা জলবৎ নয়।"

তারাপদ বলল, "সার, জলবৎ না জটিলবৎ সেকথা বাদ দিন। এই কেসটা তো আপনাকে কেউ নিতে বলেনি। ক্লায়েন্ট নেই। তবু নিজেই আপনি নাক গলাচ্ছেন।"

কিকিরা বললেন, "আমার যে স্বভাব ওইরকম। নেই কাজ তো। খই ভাজ।" বলে হেসে উঠলেন।

.

পানু মল্লিক নীচেই ছিলেন। তাঁর বাড়ির চেম্বারে। এক মক্কেলকে সবেই ঘর থেকে সরিয়েছেন, কিকিরা মুখ বাড়ালেন।

"আরে কিঙ্কর!"

"আসব?"

"ন্যাকামি কোরো না! এসো।"

"আপনার আরেক মক্কেল বাইরে বসে আছে।"

"কালী!" পানু মল্লিক ডাকলেন।

ঘরের একপাশে আধবুড়ো একটি লোক টাইপ মেশিন আর কাগজপত্র নিয়ে বসে ছিল। কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

পানু মল্লিক বললেন, "বাইরে বলরাম শীল বসে আছে। তাকে বলে দাও, কাল কোর্টে গিয়ে যেন দেখা করে। জজসাহেবকে কাল পাব না। এ হপ্তায় কাজের কাজ কিছুই হবে না। সবুর করতে হবে ক'টা দিন।"

কালী চলে গেল।

পানু মল্লিক কিকিরাদের বসতে বললেন। "ও দুটি তোমার নন্দীভৃঙ্গী নয়!"

কিকিরা হাসলেন। তারাপদদের চেনেন পানু। চোখের চেনা।

দু-চারটে সাধারণ কথা। তারপর কিকিরা বললেন, "আমার সেই পাঁজামশাই, বিনয় পাঁজার খোঁজ নিয়েছেন?"

“নিয়েছি কিছু কিছু। ...আরে ওই ভদ্রলোক তো এখন লাটে উঠে বসে আছেন। টোটালি ডুবে গিয়েছেন।”

“মানে?”

“আমি শুনলাম, ভদ্রলোক দেনায় দেনায় মাথা ডুবিয়ে বসে আছেন। সবচেয়ে বড় দেনা হল, তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে বারো কাঠা জমি ওইরকম হবে, একটা লোককে মর্টগেজ দেন। জমির মালিকানা ছিল বিধবা মায়ের নামে। সত্তর আশি হাজার টাকায় মর্টগেজ ছিল। সুদ ধরা ছিল টাকার ওপর। এখন সুদ সমেত তার পাওনা ছ’সাত লাখ টাকা।

তারাপদ আঁতকে উঠে বলল, “ছ’-সাত লাখ?”

“কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হলে হতেই পারে। তার ওপর ওই জমিতে একটা ছোট সিনেমা হল তৈরি করেছিলেন ওই ভদ্রলোক– যিনি টাকা ধার দেন। বছর কয়েক হল– সিনেমা বন্ধ। চলছে না।”

“কেন?”

“জানি না। ...ওসব থার্ডক্লাস হল আর চলে না বলেই বোধ হয়।”

“এ ছাড়া!”

“বরানগরের দিকে একটা বাজার ছিল। লিজ দিয়েছিলেন। সেটাও হাতছাড়া হয়েছে।

“আর?”

“আরও ছিল। চিৎপুরের দিকে একটা বাড়ি ছিল। বারো ভাড়াটের বাস। তারা ভাড়া তো দেয়ই না, বাড়ির মালিকানাও মানতে চায় না। কোর্ট দেখিয়ে দেয়।”

“আশ্চর্য!”

“ধুস, এতে আবার আশ্চর্য হওয়ার কী আছে! কলকাতা শহরের কত পুরনো বাড়ির এই হাল- তোমরা তার খোঁজ পাবে কেমন করে!”

কিকিরা চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন, “শুনেছি, বীরভূমের দিকে পাঁজামশাইয়ের মাতুল বংশ। ওদিকেও ফাঁকা। সেখানে জমি জায়গা বাগান পুকুর..”

“জানি না কিঙ্কর। আমার কাছে তেমন খবর নেই। বীরভূমের দিকে মায়ের বাপের বাড়ি ছিল শুনেছি। তবে জমিজমা বাগান সত্যি কতটা ছিল– আর থাকলেও শেষ পর্যন্ত মায়ের বাপের বাড়ির সম্পত্তি ওঁর হাতে এসেছিল কি না, বলতে পারব না। খোঁজ করার উপায় আমার নেই।” বলতে বলতে পানু মল্লিক আয়াস করে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। “কালী, এদের চা কী হল? বাড়ির মধ্যে বলেছ?”

কালী বলল, বলে এসেছে।

“কিঙ্কর?”

“বলুন পানুদা?”

“ব্যাপারটা কী হে? তুমি হঠাৎ পাঁজা নিয়ে পড়লে কেন?.. ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নেই, তবে দেখেছি। লোকটিকে। প্রায় বুড়ো, ষাট-বাষট্টি তো হবেই। বনেদি চেহারা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেন। মাথার চুল বারো আনাই সাদা। পথেঘাটে বড় একটা চোখেই পড়ে না। শুনেছি নিজের ওই বাড়ি ছেড়ে বেরোন না একরকম। ওঁর আপাতত কোনও সংসারও নেই। মেয়ে-জামাই বিদেশে।”

কিকিরা মন দিয়ে পানুবাবুর কথা শুনছিলেন। যত শুনছিলেন ততই যেন ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছিলেন।

কাঠের ট্রে করে চা নিয়ে এল একটি ছোকরা।

“নাও চা খাও,” পানুবাবু বললেন। “ব্যাপারটা কী আমায় একটু বলবে?”

কিকিরা মাথা হেলালেন। চায়ের কাপ তুলে নিলেন টেবিল থেকে, তারপর সংক্ষেপে বললেন ঘটনাটা।

পানু শুনলেন। ভাল উকিলের চোখ কান যেন অনেক বেশি সতর্ক ও তীক্ষ্ণ হয়। বিশেষ করে ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিস নিয়ে যাদের দিন কাটে মাসের পর মাস।

কিকিরা চুপ করলেন। চন্দন আর তারাপদ কোনও কথাই বলেনি। তারা নেহাতই যেন সঙ্গী। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল, ওদের উদাসীন ভাব দেখে, বিষয়টা নিয়ে কিকিরার যত উৎসাহই থাক তাদের বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই।

পানু মল্লিক একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন। তারপর বললেন, “কিঙ্কর, যত চোর গুণ্ডা বাটপাড় খুনে নিয়ে আমার দিন কাটে। এক্সপিরিয়ান্স কী কম হল! দেখলাম অনেক। হাই লেভেল লো লেভেন— কোথায় ক্রিমিন্যাল নেই! এভরি হোয়ার। পেশাদারি ভাবে কথার প্যাঁচে, অনেককে বাঁচিয়েছি, অনেকের জন্যে সরকারি খানাদানার ব্যবস্থা করেছি দু’-চার বছরের জন্যে। ...তা সে কথা থাক। আসল কথাটা কী জানো ভায়া, ক্রিমিন্যালরা দু’-ক্লাসের হয়। মেইনলি। একটার কাজকর্ম হয় অনেকটা সরল গতির। এরা মুখ, টেম্পারামেন্টাল, গবেট। আর-এক ক্লাসের ক্রিমিন্যাল দেখেছি, তারা যত চতুর ততই জটিল। এদের হল বক্রগতি। ধরাই যায় না, বেটারা সত্যিই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, না, এক-একটা ভয়ঙ্কর শয়তান।...আমি পাঁজামশাই সম্পর্কে আগে থেকে কোনও কমেন্ট করব না। কিন্তু তুমি যদি ওঁকে নজরে রাখো হয়তো সত্যি-মিথ্যে অনেক কিছু জানতে পারবে।...আর শোনো, আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করব। জানাব তোমায়।”

কিকিরা উঠে পড়লেন। “চলি পানুদা। আপনি যা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত।”

চন্দনরাও উঠে পড়ল।

রাস্তায় এসে চন্দন হঠাৎ বলল, “কিকিরা আমাদের হাসপাতালে বীরভূমের একটি ছেলে আছে। আমার কলিগ। বীরভূমের খোঁজ আমি নেব।”

৬.

দুটো দিন কেটে গেল। কিকিরা আশা করেছিলেন, জহরের টেবিলে যে যন্ত্রটি রেখে এসেছিলেন–সেই গোপনে রাখা টেপ রেকর্ডার থেকে বিনয় পাঁজার মুখে তাঁর নিজের তরফের কথা অনেকটাই জানা যেতে পারে।

পাঁজামশাই কম কথার মানুষ। জহরও ততটা চতুর নয়, তার সেই বুদ্ধি আর তৎপরতাও নেই যে খুঁচিয়ে ভদ্রলোকের মুখ থেকে, বলা ভাল পেট থেকে, দশটা কাজের কথা বার করে নেবে। জহর পারেনি।

ওরই মধ্যে কাজের কথা যা জানা গিয়েছে, তা হল–বিনয়বাবু তাঁর মা আর বাড়ির কাজকর্মের দু-তিনজনকে নিয়ে সে বছর হরিদ্বার হৃষীকেশ যান। ওই পথে যতটা পারেন যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। তখনও ঠিক বর্ষা পড়েনি। গরম শেষ হয়ে আসছে। বিনয়বাবু আগে থেকেই কোথায় কোথায় উঠবেন সে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সবই প্রায় কোনওনা-কোনও আশ্রম। বিনয়বাবুদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত, দু'পুরুষ তো হবেই। তীর্থযাত্রীদের জন্যে ধর্মশালা বা ওইরকম কিছু তো আছেই। তা তীর্থযাত্রার মধ্যে একদিন হঠাৎ দুর্যোগ দেখা দিল। আচমকা। দুপুর থেকে বৃষ্টি। বিকেল-শেষে সেই বৃষ্টি প্রবল হল; তার সঙ্গে ঝড়। অন্ধকারে ডুবে গেল পাহাড়পর্বত গাছপালা। কিছুই আর ঠাওর করা যায় না।

তখন ঘন রাতও নয়, বৃষ্টি পড়েই চলেছে, হঠাৎ সব কেমন দুলে উঠল। ভীষণ এক শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে রটে গেল ভূমিকম্প। তখন মাথা ঠাণ্ডা রাখার মতন মানুষই বা ক'জন। প্রাণের ভয়ে কে যে কীভাবে মাথার আশ্রয় সাধারণ ধর্মশালা ফেলে বাইরে বেরিয়ে পাগলের মতন ছোটাছুটি শুরু করল বোঝানো মুশকিল।

পাঁজাবাবুর পরিবারের একজন সেই দুর্যোগে চিরকালের মতন হারিয়ে গেলেন। পাঁজাবাবুর বৃদ্ধা মা। বৃদ্ধা হলেও একেবারে অক্ষম বা পঙ্গু নন।

কোথায় হারালেন?

সম্ভবত দিকদিশা পথ ঠিক করতে না পেরে ওই বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ি সরু পথের কিনারা থেকে গড়িয়ে পড়েছিলেন নীচে। গভীর কোনও খাদে। সেখান থেকে কাউকে উদ্ধার করা অসম্ভব। ঘন গাছপালায় পাথরে মাটিতে অন্ধকার একেবারে। কোন অতলে নেমে গিয়েছে সেই খাদ কে জানে। তার ওপর ধস নেমেছিল কোথাও কোথাও। বৃষ্টি তো ছিলই।

যাই হোক, পরের দিন বিকেলে আবহাওয়া খানিকটা ভাল হলেও ওঁর খোঁজ করা সম্ভব হয়নি। তার পরের দিন উন্নতি হল আবহাওয়ার। বৃদ্ধার খোঁজ করা হল। পাওয়া যায়নি। সকলেরই ধারণা হল, উনি মারা গিয়েছেন, দেহটা কোথায় চাপা পড়ে আছে জানা সম্ভব নয়।

ঘটনাটা ঠিক পাঁচ বছর আগেকার।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সময়ের প্রায় বছরখানেক আগে বিনয় পাঁজা জহরকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে বৃদ্ধার ফোটোটি তুলিয়েছিলেন। উনি কী করে জানবেন, জানা সম্ভব যে, বছরখানেকের মধ্যে এই পরিণতি হবে মায়ের।

.

কিকিরা যেন একটা বিদঘুঁটে অঙ্ক নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন; কোন পথে যাবেন বুঝতে পারছেন না, নিজের ওপরেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিলেন, এমন সময় ছকু এসে হাজির। গুরুজির তলব, না এসে সে থাকতে পারে!

ছকু এসে যথারীতি গড় হয়ে কিকিরার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, তারপর হাতকয়েক তফাতে মাটিতে বসল। গুরুজির সামনে কোনওদিনই সে উঁচু জায়গায় বসে না।

"তোমায় আরও আগে খবর দিলে হত।" কিকিরা বললেন, "মাথায় এসেছিল একবার, কিন্তু ভাবলাম আগে থেকে খবর না দিয়ে এদিকের ব্যাপারটা বুঝে নিই আগে।"

"খবর ভেজলেই চলে আসতাম,"ছকু বলল। "কোই কাম আছে, গুরুজি?"

"আছে। আগে বলল তোমার বাড়ির সব ভাল?"

"বালবাচ্চা ভাল। বহুকে ঘোড়া ম্যালারু ধরেছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।"

কিকিরা হাসলেন। পরে বললেন, "ছকু, তুমি তো বড় ওস্তাদ ছিলে৷ এদিকেই আগে তোমার কারবার ছিল। এখন পাড়া পালটেছ, পেশাও পালটে ফেলেছ অনেকদিন।"

ছকু যেন লজ্জার মুখ করে হাসল।

"আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারো? ধর্মতলার লাইনে তোমার পুরনো চেলা কে কে আছে এখনও?"

ছকু একসময়ে পকেটমারদের মাস্টার ছিল। ভাল ট্রেনার। হাতে কলমে কাজ শিখিয়েছে। তখন সে মাস্টার ওস্তাদ। এখন সে অন্য পাড়ায় লন্ড্রির দোকান দিয়েছে। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প টেলারিং। এখনও তার চেলা আছে। তারা মাস্টার বলে ডাকে ছকুকে। ছকু নিজে পকেটমারের মতন ইতর কর্ম নিজে করে না। তবে চেলাদের ছোটখাটো টিপস দিতে আপত্তি কীসের!

ছকু বলল, "আছে। কেন গুরুজি?"

"আমার একটা কাজ করতে হবে।"

"হুকুম করুন।"

"একটা লোকের খোঁজ দিতে পারবে?"

"ক্যায়সা লোক?"

কিকিরা সেদিনের ঘটনার কথা বললেন। যে-লোকটা পতাকীর ব্যাগ উঠিয়ে নিয়ে গলির মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল তার একটা বর্ণনাও দিলেন যতটা পারেন। আচমকা ঘটনা; মন দিয়ে নিখুঁতভাবে সব দেখার মতন অবস্থা তখন নয়, তবু, যতটা পেরেছেন দেখেছেন কিকিরা। ছোকরার গায়ে ছিল চাকার মতন গোল গোল লাল-সাদা, ছাপ তোলা গেঞ্জি, ঘোড়ার মাঠের জকিদের মতন অনেকটা। মাথার চুলের সামনেটা সাপের মতন ফণা তোলা। লম্বা জুলফি।

ছকু সব শুনল। ভাবল কিছুক্ষণ। পরে বলল, "লাইনে নয়া নয়া ছোকরা চলে আসছে গুরুজি। আপনি যার কথা বললেন, আমি ওকে চিনি না। নয়া ছোকরা হবে। তো আমার পুরানা দোস্তরা আছে এখানে, পাত্তা নিয়ে নেব।"

কিকিরা বললেন, "ছকু, আমি জানতে চাই, যে-লোকটা রাস্তা থেকে ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে পালাল, সে সত্যিই ওই এলাকার পকেটমার, না, অন্য মতলব ছিল তার।"

ছকু বুঝতে পারল। আসলে লোকটা মামুলি পকেটমার, না, তাকে কেউ ওই কাজের জন্যে ভাড়া খাটাচ্ছিল–জেনে নিতে চান গুরুজি।

কাজটা সহজ। ছকু জেনে নেবে। কলকাতা শহরের প্রত্যেকটি এলাকায় সেখানকার পকেটমারদের ঘাঁটি থাকে। ঘাঁটির বাদশাও থাকে–মানে লিডার, কর্তা। তার হুকুম না মানার মতন বুকের পাটা কারও হয় না।

"তুমি তাড়াতাড়ি খবর নিয়ে আমায় জানাবে।"

ছকু মাথা নাড়ল। হয়ে যাবে কাজ।

আরও খানিকটা বসে চা খেয়ে ছকু চলে গেল।

·

বিকেলে চন্দন এল।

"তারা আসেনি?"

"এখনও নয়। আসবে।" চন্দন রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "কী গরম পড়ে গেল, সার! চৈত্র মাস কি শুরু হয়ে গিয়েছে। দেখতে দেখতে টেম্পারেচার..."

"জল খাও।" বলেই হাঁক দিলেন কিকিরা, বগলাকেই।

চন্দন একবার পাখাটার দিকে তাকাল। জোরেই চলছে। নিজের জায়গাটিতে বসতে বসতে চন্দন বলল, "আপনাকে বলেছিলাম না, হাসপাতালে আমার এক কলিগ রয়েছে বীরভূমে বাড়ি। সজল নাগ।"

"নাগ...! হ্যাঁ, বলেছিলে।"

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিনয় পাঁজাকে চেনো কি?"

"নাগ কি পাঁজামশাইয়ের দেশের লোক! বীরভূম তো একটা জেলা। পাজামশাইদের জমিদারির চৌহদ্দি ছিল কোন দিকটায়?"

"দিকটিক জানি না, সার। বীরভুম আমার ডিস্ট্রিক্ট নয়," চন্দন বলল। "সজল বীরভূম জেলার ছেলে। নলহাটির দিকে তার বাড়ি। সে বলল, পাঁজাদের সে চেনে না। তবে নাম শুনেছে। ডুমুরগ্রাম বলে একটা জায়গা আছে ওদিকে। পাঁজারা সেখানকার লোক। মানে পাঁজার মামার বাড়ি ওখানে। চৌধুরীবাড়ি।"

বগলা জল নিয়ে এল।

জল খেয়ে চন্দন বলল, “ইন ফ্যাক্ট, ডুমুরগ্রাম-পাঁজাবাবুর মামার বাড়ি বেশ বিখ্যাত। মামাদের একসময় জমিদারি-টমিদারি ছিল। তবে জমিদারদের এখন আর দাপট কোথায়! ওই লুকিয়েচুরিয়ে বেনামা করে যা রাখতে পেরেছে তাতেই পেট চলে। অবশ্য পাঁজাবাবুর মামার বাড়ির অতটা দীনদশা হয়নি। দু মহলা ভাঙা বাড়িটা আছে। দু’ মহলা হলেও বাড়ি বিশাল। কাছারি, দেউড়ি, ঠাকুর দালান সবই আছে। আছে মদনমোহনের মন্দির। দেবোত্তরের আয় থেকে বছরের দুর্গাপুজোটাও হয় এখনও...”

“কে থাকে ওখানে?”

“কেউ নয়। জনাদুই কর্মচারী আর একজোড়া বাস্তু সাপ। চন্দন হাসল। “বারোয়ারি লোকজনও ঢুকে পড়ে।”

কিকিরা যেন চোখ বুজে অনুমান করার চেষ্টা করলেন ডুমুরগ্রামের জমিদার বাড়িটা।

“চাঁদু, আমাদের বুঝতে একটু গোলমাল হচ্ছিল। একেবারে সঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয়, বিনয়বাবুর পৈতৃক বাড়ি কলকাতায়, ঠনঠনিয়ার দিকে যেখানে এখন তিনি আছেন। এটা তাঁর নিজস্ব। আর ওই বীরভূমের বাড়ি এটা-ওটা যা রয়েছে সব তার মামার বাড়ির। ভদ্রলোকের কপালে ছিল তাই মামার বাড়ির প্রপার্টি–যাই হোক না কেন–ইনহেরিট করেছেন। ঠিক তো!”

“পুরোপুরি ঠিক।”

“প্রশ্ন হচ্ছে, বিনয়বাবুর মামার বংশে এমন কেউ কি ছিল না যে-লোক সম্পত্তির ভাগীদার হতে পারে? অন্তত পার্টলি? ..কী বলে তোমার কলিগ?”

চন্দন বলল, “সার, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা। সজল বলল, আর-একজন ছিল। তবে তার থাকা না-থাকা সমান।”

কিকিরা কৌতূহল বোধ করলেন। বললেন, “কে?”

“ও-বাড়ির একটি ছেলে। বিনয়বাবুর মাসতুতো ভাই! ঘটনা হল, বিনয়বাবুর মায়েরা দু’বোন। ভাই নেই। বিনয়বাবুর মা-বোনদের মধ্যে বড়। ছোট বোন বয়েসে খানিকটা ছোট তো বটেই, কপালটাও খারাপ। কম বয়েসে বিধবা হন। মায়ের কাছেই অবশ্য থাকতেন। একটি ছেলে ছিল। তা একদিন ছেলেটির দিদিমা আর মা দুই-ইচলে গেলেন। ছেলেটা খেপাটে গোছের। ঘরবাড়ির সঙ্গে আলগা। সম্পর্ক। সাধুসন্ন্যাসী শ্মশান-মশান করে বেড়াত। শেষে বিশ-বাইশ বছর বয়েসেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। পরে শোনা গেল সে কোনও তান্ত্রিকের দলে গিয়ে ভিড়েছে।”

অবাক হয়ে কিকিরা বললেন, “সে কী! জমিদার বাড়ির ছেলে তান্ত্রিক।”

“চমকে যাচ্ছেন সার! চমকাবার কিছু নেই। সজল বলে, বীরভূমের রক্তে নাকি দুটো জিনিসেরই টান আছে। একদিকে বৈষ্ণব, অন্যদিকে তন্ত্র। একদল বাজায় একতারা,অন্যদল শ্মশানের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।”

কিকিরার কৌতূহল ততক্ষণে তীব্র হয়েছে। বললেন, “একদিকে জয়দেব, অন্যদিকে বামাক্ষ্যাপা! তা পাঁজাবাবুর মাতুলবংশ কি...”

“ঘোরতর বৈষ্ণব।”

“বৈষ্ণববংশের ছেলে হয়ে গেল তান্ত্রিক।”

“সজল তো তাই বলে।”

“চাঁদু, এ তো দেখছি সেই ভক্তকুলে দৈত্য।”

তারাপদর গলা পাওয়া গেল। বগলার সঙ্গে কথা বলছে। কিকিরা বললেন, “চাঁদু, সেই তান্ত্রিকের আর খবর পাওয়া যায়নি। পরে কখনও বাড়িঘর ভিটেতে দেখা যায়নি তাকে?”

“না,” চন্দন বলল। বলে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। বলল, “সার, একটা কথা মনে রাখবেন। সজল ওই পাঁজাবাবুর মামার বাড়ির গ্রামের মানুষ নয়, তাদের বাড়ি নলহাটির দিকে। সে যা শুনেছে এ-মুখ সে-মুখে– তাই বলেছে। কোনটা কতদূর সত্যি, কোনটা লোকমুখে বানানো– তা সে জানে না।”

কিকিরা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “চাঁদু, আমার বুদ্ধিতে বলে, সামান্য ধোঁয়া দেখলেও অনুমান করতে হবে আগুন অল্পস্বল্প আছে কাছাকাছি; এখানে একটু ধোঁয়া দেখছি, কিন্তু আগুন...?”

তারাপদ ঘরে এল। শেষ কথাটা তাঁর কানে গিয়েছে। বলল, “কীসের ধোঁয়া সার?”

“ধুনির,” কিকিরা হালকা স্বরে বললেন।

“ধুনি! কার ধুনি? কোথায়?” বলে তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। তাকিয়ে নিজের মাথা দেখাল। “অফিস থেকে বেরিয়ে ও-পাড়ার মডার্ন হেয়ার কাটিংয়ে একটা হেয়ার কাট দিলুম। শ্যাম্পুও করিয়ে নিলুম। কেমন হয়েছে রে?”

চন্দন গম্ভীর মুখে বলল, “কুমারটুলির কার্তিক!”

“যাঃ!” তারাপদ যেন খুশি হল না, মুখের ভাবে হতাশ হওয়ার ভান করে বলল, “তোর চোখ বলে কিছু নেই। দারুণ হেঁটেছে।”

“তো হেঁটেছে। বোস।”

বসল তারাপদ। মাথার চুলে শ্যাম্পুর গন্ধ। সাবধানে একবার মাথায় হাত বুলিয়ে গন্ধটা শুকল। কীসের ধুনি, সার? কার কথা বলছিলেন?” কিকিরার দিকে তাকাল তারাপদ।

কিকিরা বললেন, “চাঁদুকে জিজ্ঞেস করো।...তুমি শোনো, আমি একটা ফোন সেরে নিচ্ছি।”

চন্দন ডুমুরগ্রামের বৃত্তান্ত শোনাতে লাগল তারাপদকে।

কিকিরা হালদার স্টুডিয়োতে ফোন করলেন। বার দুই বৃথা চেষ্টা। কথা চলছিল ওপাশে। তিনবারের বার পেলেন।

“জহর! রায়কাকা বলছি। পতাকী আসছে?”

ওপার থেকে সাড়া এল। “এসেছে। ভালই আছে।”

“গুড। ...ইয়ে তোমার সেই নেগেটিভের কী হল? পাঁজামশাই পরে যেটা দিয়েছিলেন?”

“ও কিছু হবে না। নষ্ট হয়ে গিয়েছে।”

“চেষ্টা করেছিলে?”

“চেষ্টা করেও হল না। একটা কালচে দাগ আর বাদবাকি একেবারে ধোঁয়া। দেখলে মনে হবে ভুতুড়ে...”

“ও! বিনয়বাবুকে জানিয়েছ?”

“হ্যাঁ।”

“কী বললেন?”

“কী আর বলবেন! বললেন, জানতাম।”

“অল্পক্ষণ চুপচাপ। তারপর কিকিরা বললেন, “কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি যাব।”

ফোন রেখে দিয়ে কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। চন্দন আর তারাপদদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল না আর। যা বলার বলা হয়ে গিয়েছে চন্দনের।

বগলা এসে চা দিয়ে গেল। কিকিরা নিয়ম করেছেন, এখন থেকে যেহেতু গরম পড়ে যাচ্ছে, গরমের বদলে ঠাণ্ডা চা খাওয়া হবে। মানে হালকা চা, দুধ থাকবে না, চিনি সামান্য, আর চায়ের মধ্যে এক টুকরো বরফ। অবশ্য বাজারের বরফ নয়, ফ্রিজের বরফ।

চা খেতে খেতে কিকিরা বললেন, “জহর বলল, কাজ হয়নি,” বলে না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন।

তারাপদ বলল, “আপনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন।”

“মানে?”

“পরের চরকায় তেল দিচ্ছেন। পাঁজামশাইয়ের ঠিকুজি কোষ্ঠী জানতে আপনাকে কেউ লাগায়নি। জহরও বলেনি। আপনি নিজে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। তাও যদি দু পয়সা আসত! কী লাভ, সার?”

কিকিরা বিরক্ত হলেন বোধ হয়। রাগ না করেই বললেন, “ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ...আসলে কী জানো, এ হল অভ্যেস। এক রকম খেলাও বলতে পারো–চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। ...তা সে যাই হোক, ওই পতাকীকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। বেচারি মানুষ। ভাল মানুষ। নিজের চোখে আমি দেখলাম লোকটা ট্রাম লাইনে কাটা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। পরে শুনলাম, ওটা নিছক অ্যাকসিডেন্ট নয়। তাই একটু খোঁজখবর করে দেখছি। টাকা কামানো আমার উদ্দেশ্য নয়, তারা।”

৭.

জহর কিকিরাকে দেখছিল।

কিকিরা শেষপর্যন্ত মাথা নাড়লেন। হতাশ গলায় বললেন, “না, এই প্রিন্ট থেকে কিছুই বোঝা যায় না। সত্যিই ভুতুড়ে।” বলে প্রিন্টটা তারাপদর হাতে দিলেন।

জহর তার সাধ্যমতো যতটা করা যায় করেছে। বিনয়বাবুর দেওয়া পুরনো নেগেটিভ থেকে, নয় নয় করেও তিনটে প্রিন্ট। সবই সমান। একপাশে কালো একটা ছোপ, যেন ঘন ছায়ার পরদা, বাকিটা সাদাটে বা ঈষৎ বাদামি ধোঁয়া ধোঁয়ার আকারটাও কেমন যেন কুণ্ডলী পাকানো।

তারাপদ আর চন্দনও দেখেছে প্রিন্টগুলো। কিছুই ধরতে পারেনি।

চন্দন বলল, “আনাড়ি কেউ শাটার টিপেছিল ক্যামেরার। না হয় কোনও সোর্স থেকে আলো ঢুকে ফিল্ম নষ্ট করে দিয়েছে।” চন্দন ফোটো তুলতে পারে। শখের ফোটোগ্রাফার।

তারাপদ বলল, কিকিরাকেই, ঠাট্টার গলায়, “যাই বলুন সার, ওই প্রিন্টটাকে, মৃতজনের আত্মা বলে চালানো যায়। স্পিরিট আর কী!”

কিকিরা কথাটা শুনলেন। কিছু বললেন না ওকে। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে কিকিরা বললেন, “জহর, আমাদের একবার পাঁজাবাবুর বাড়িতে যাওয়া দরকার। মানে, যেতে পারলে ভাল হত। ওঁর দর্শন পাওয়ার একটা ব্যবস্থা...”

কথার মাঝখানে জহর বলল, “ব্যবস্থা মানে আপনি আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা বলছেন?”

“হ্যাঁ। আমরা সবাই যেতে চাই।”

কী যেন ভাবল জহর, বলল, “কীভাবে যাব? হঠাৎ একটা দল করে এত অচেনা লোক ওঁর কাছে গেলে...”

“অসন্তুষ্ট হবেন? কিছু মনে করবেন?” কিকিরা বললেন, “সেটা স্বাভাবিক। তবে তুমি ভেবো না। আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি কাঁচা কাজ করব না।”

জহর সামান্য চুপ করে থেকে বলল, “কবে যাবেন?”

“ক-বে! ...কাল হবে না। কাল যদি ছকু আসে, ওর দ্বারা কতটা কী হল জেনে নিই। পরশু বা তার পরের দিন হতে পারে।”

জহর আপত্তি করল না।

কিকিরা হঠাৎ পতাকীকে ডাকলেন। পতাকী দোকানেই ছিল।

“পতাকী, তোমার হাতে সে ব্যাগটা ছিল–ঠিক ওইরকম, অন্তত ওর মতন একটা ব্যাগ কাল কিনে রাখবে। চাঁদনিতেই পাবে। নিউ সিনেমার উলটো দিকে ফুটপাথে। মনে রেখো ব্যাগটা যেন তোমার ব্যাগের মতন হয়। রং একই রকম।” বলে কিকিরা পকেট থেকে টাকা বার

করে পতাকীর হাতে দিলেন।

জহর প্রথমটায় বোঝেনি, পরে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, “আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন, কাকা! আমি দিচ্ছি।”

“আরে রাখো! কটাই বা টাকা!”

“আমার বড় খারাপ লাগছে কাকা। আমার জন্যে—”

“তোমার খারাপ লাগার কোনও কারণ নেই জহর। আমি নিজেই যখন নাক গলাচ্ছি, তখন তোমার খারাপ লাগবে কেন! ...ও কথা থাক, তুমি ওই ভুতুড়ে প্রিন্টগুলোর একটা আমাকে দেবে। পাঁজাবাবুকে অন্য দুটো। কিন্তু তাঁকে বলবে না যে, আমায় দিয়েছ! বুঝলে!”

জহর মাথা নাড়ল। কিকিরার কথামতনই কাজ হবে।

চেয়ার সরিয়ে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “আমরা চলি আজ। চলো তারাপদ। কলকাতা ঠনঠনিয়া বীরভূম হরিদ্বার মায়ের অন্তর্ধান ভূমিকম্প ধস নামা–ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। দেখি কত জট পাকিয়েছে, কেনই বা।”

বাইরে এসে তারাপদ বলল, “সার, আপনার পাগলামির মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারি না। হুট করে আপনি পাঁজাবাবুর বাড়ি যাবেন কেন? উনি আপনাকে ডাকেননি। কী করবেন আপনি ভুতুড়ে ওই প্রিন্ট নিয়ে! লাইফ আফটার ডেথ বইটইয়ে এরকম ছবি দেখা যায়। মৃতজনের আত্মা টাইপ। এদিকে আবার একটা ব্যাগ কিনতে বললেন পতাকীকে! সবই আপনার অদ্ভুত!”

কিকিরা হাসলেন, “শোনো তারাবাবু, ভাগ্য প্রসন্ন করার জন্যে জ্যোতিষীরা নানান রত্ন ধারণ করতে বলে। তাতে কী হয় জানি না। আমি বলি, বেস্ট রত্ন হল ধৈর্য। ওটাই ধারণ করা। মহাভারত পড়েছ? পাণ্ডবরা কতদিন ধৈর্য ধারণ করে বসে ছিল বলো তো?”

তারাপদ তামাশার গলা করে বলল, “সার কি আজকাল নতুন করে মহাভারত পড়ছেন?”

“তা মাঝে-মাঝে পড়ি। কেন, পড়লে আপত্তি কীসের!”

তারাপদ আর কিছু বলল না।

.

বাড়ি ফিরে কিকিরা দেখলেন, ছকু আর চন্দন দিব্যি গল্প করছে। বসার ঘরে বসে। হাসাহাসি হচ্ছিল। চন্দনের গলার জোরই বেশি। বোঝা যায়, ছকুই বক্তা, চন্দন শ্রোতা।

তারাপদ সঙ্গেই ছিল কিকিরার। এখনও রাত হয়নি। আটটাও নয়।

কিকিরাকে দেখে ছকু লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল।

“বোসো, বোসো।” ছকুকে বসতে বলে কিকিরা চন্দনের দিকে তাকালেন। “তুমি কতক্ষণ?”

“ঘণ্টাখানেক হবে। খানিক পরে ছকু এল। ওর কাছে গল্প শুনছিলাম। গল্পগুলো যদি সত্যি

হয়, সার–তবে ওকে একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত। ছকু জিনিয়াস।”

ছকু যথারীতি কিকিরার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসে পড়ল। তার আগেই কিকিরারা বসেছেন।

“খবর বলো?” কিকিরা বললেন, “আমি ভাবছিলাম তুমি কাল সকালে আসবে।”

ছকু বলল, “না গুরুজি, আজই চলে এলাম। খবর ভাল নয়।”

“ভাল নয়!”

“দশ নম্বর ঘাঁটিয়া দেখে কানহাইয়া। সে বলল, ওই মাফিক ছোকরা–আপনি যেমন বললেন–কেউ তাদের খাতায় নেই। মালও কিছু জমা পড়েনি ওদের কাছে। এলিট সিনেমার পিছে ফিরিঙ্গি ওস্তাদ থাকে। সেও বলল, ওই ছোকরাকে কেউ দেখেনি।”

কিকিরা বুঝতে পারলেন। যে লোকটা, ছোকরাই বলা যাঃ সেদিন ট্রাম লাইনের পাশ থেকে ব্যাগ নিয়ে পালিয়েছিল সে ওই চাঁদনি এলাকার পকেটমার ছিনতাইবাজদের দলে নেই, তাদের ‘পকেটে থাকে না। তাকে ওরা চেনে না।

ছকু বাজে কথা বলার মানুষ নয়। তার খোঁজখবরে ত্রুটি থাকার কথা নয়। তবে ওই ছোকরা যদি বেপাড়ার হয়, অন্য কথা। তবে বে-পাড়ার লোক এ-পাড়ায় নাক গলায় না। ওটা ওদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ব্যাপার। হয়তো কখনও-কখনও এই নিয়ম ভাঙা হয়। তরে সেটা ব্যতিক্রম।

তারাপদ নিচু গলায় চন্দনকে দোকানের ঘটনা শোনাচ্ছিল।

একসময় চন্দন বলল, “বীরভূমের মামার বাড়ির কথা বলেছিস তো?”

“বলা হয়েছে।”

“কী বলল জহর?”

“কী বলবে আর! শুনে বোবা হয়ে বসে থাকল। ও এত কথার কিছুই জানে না।”

কিকিরা কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে বসে থাকলেন। ছকুকে দেখলেন আবারখুব যে হতাশ হয়েছেন, মনে হল না। হয়তো তিনি পুরোপুরি আশাও করেননি, পতাকীর ব্যাগ আর উদ্ধার করা যাবে। তবে পকেটমার ছোকরা সম্পর্কে একটা খোঁজ পাওয়া যেতে পারে–এমন আশা ছিল। পাওয়া গেল না। অবশ্য না-পাওয়া একপক্ষে ভাল। ছোকরা তবে বাইরের আমদানি। হাজির হল কোথা থেকে? কীসের লোভে?

কিকিরা যা ভেবে রেখেছেন, সেভাবেই একটা চেষ্টা করা ছাড়া আপাতত অন্য উপায় নেই।

“ছকু?”

“গুরুজি?”

“কাল হবে না, পরশু আমরা ও-বাড়ি যাব। পাঁজামশাইয়ের ঠনঠনিয়ার বাড়িতে। যাব সন্ধেবেলায়। আমরা সকলেই যাব। তারা, চাঁদু, তুমি আর আমি। জহরও যাবে।”

চন্দন ঠাট্টা করে বলল, “একটা পুলিশভ্যান ভাড়া করবেন নাকি?”

কথাটা কানেই তুললেন না কিকিরা, ছকুকেই বললেন, “তুমি কাল ওই বাড়ির আশপাশ যতটা পারো, নজর করে নেওয়ার চেষ্টা, করবে। পারলে দু-একজনের সঙ্গে আলাপ, গল্পগাছা। আমি যা শুনেছি–তাতে ও বাড়ির নীচের তলা শিয়ালদার কোলে বাজারের মতন। যার যেমন খুশি থাকে, বারো ভাড়াটের হাট। তোমায় বাড়ির ভেতর যাওয়ার দরকার নেই। বাইরে থেকে যা নজরে আসে দেখে নেবে। হাওয়ার ঝাঁপটাতেও গাছের আম মাটিতে পড়ে হে! ভাল করে নজর করবে। আর পরশু দিন আমাদের আসল কাজ।”

চন্দন হেসে বলল, “ইটের দুর্গে প্রবেশ!”

“হ্যাঁ। সম্মুখ সমর। তুমি থাকবে ছকুর সঙ্গে, নীচে একতলায়। তারাপদ থাকবে, দোতলার সিঁড়ির মুখে, আর জহর আর আমি দোতলায় পাঁজাবাবুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব। দেখা যাক..”

তারাপদ মাথা নেড়ে বলল, “অসম্ভব, সার। আপনি বরং চাঁদুকে দোতলায় রাখুন। ওর সাহস বেশি। আমি আপনার চেলা হয়ে সঙ্গে থাকব। প্লিজ।”

কিকিরা বললেন, “পরে সেসব দেখা যাবে। এখন আর কথা নয়।”

৮.

পাঁজাবাবুর বাড়ির একতলা সম্পর্কে যা শোনা গিয়েছিল তার কোনওটাই বাড়িয়ে বলা নয়। কোন আমলের পুরনো বাড়ি, অনুমান করা যায় না। বাড়ির মাঝখানে বিশাল চাতাল। চাতালের একপাশে এক বারোয়ারি চৌবাচ্চা। বোধ হয় সারাদিনই সুতোর মতন জল পড়ে। গোটাতিনেক কলও আছে বারান্দার গায়ে। চাতালের চারদিক ঘিরে সরু বারান্দা। গাঁ ঘেঁষে ছোট ছোট ঘর। খুপরিই বলা যায়।

নীচের তলার বাসিন্দাদের বিশেষ কোনও পরিচয় নেই। কোথাও মিস্ত্রি ক্লাসের কোনও লোক রয়েছে পরিবার নিয়ে, কোথাও পাঁচ ছ'জন বিহারি মজুর থাকে একসঙ্গে, রান্না খাওয়া মিলেমিশে। ওপাশে দুই ছোকরা হাওয়াই চটির কারবারি, ফুটপাথে বসে হকারি করে চটির। ট্রাম কোম্পানির এক কন্ডাক্টর থাকে পাশেই, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। মামুলি দরজি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, মায় এক স্টিলের বাসনওয়ালা! আরও কত কী!

টিমটিমে আলো, পাঁচ সংসারের কলরব কালচে শ্যাওলার রং ধরা উঠোন। অদ্ভুত এক গন্ধ এই নীচের তলায়।

কোনও সন্দেহ নেই, এরা যে যার খুশিমতন ভাড়া দেয় ঘরের, বা দেয় না। কারও কিছু বলার নেই। ওই বিচিত্র কলরব আর দুর্গন্ধের মধ্যে কোথাও রেডিয়ো বাজে, কোথাও বা টিভি চলে একটা।

কিকিরা জহরকে নিয়ে দোতলার সিঁড়ি ধরলেন। পিছনে তারাপদ।

যাওয়ার আগে ছকুর ইশারা থেকে বুঝে নিয়েছেন। তাঁর অনুমান অন্তত এক জায়গায় সঠিক।

ছকু আর চন্দন নীচের তলার সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে! ভেতরে ঢুকে দাঁড়াবার মতন মেজাজ নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কিকিরা বললেন, "জহর, যা শুনেছিলাম এ যে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সত্যিই কোলে বাজার।..ধরো বাড়ির যা অবস্থা। হঠাৎ যদি ভেঙে পড়ে–"

"জনাপঞ্চাশ খতম," তারাপদ পিছন থেকে বলল।

দোতলার মাঝামাঝি সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে কিকিরার মনে হল, এ বাড়িতে আলো জ্বালানো যেন নিষিদ্ধ। হলুদমতন যৎসামান্য আলো যা আছে-তা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। সিঁড়িতে বোধ হয় মানুষের পা পড়ে না, শুধু ধেড়ে টাইপের কয়েকটা ইঁদুর ছোটাছুটি করে। পাঁজামশাইয়ের কি এমনই অর্থাভাব যে, প্রয়োজন বুঝে আলো জ্বালাতেও দেন না, ওই যা টিমটিম করে জ্বলে তাই যথেষ্ট।

দোতলায় পা দিয়ে দেখা গেল, সামনে টানা বারান্দা। ঢাকা বারান্দা অবশ্য। বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাতি জ্বলছে। তার আলো এত কম যে, অত বড় বারান্দা প্রায় অন্ধকার। বাড়ির কাউকেই দেখা গেল না।

কিকিরা জহরকে বললেন, "ডাকো কাউকে।"

জহর ডাকল। “কে আছে?”

বারতিনেক গলা চড়িয়ে ডাকার পর বারান্দা-ঘেঁষা ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। মাঝবয়েসি। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া। দাড়ি গোঁফ কামানো নয়।

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল। দেখছিল কিকিরাদের। কিকিরা জহরকে ইশারা করলেন। জহর বলল, “বাবুকে গিয়ে বলো জহরবাবু এসেছেন। জহর।”

লোকটি জহরদের অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল।

কিকিরা চারপাশ দেখছিলেন। কলকাতা শহরে পুরনো বাড়ি অনেক দেখেছেন কিকিরা। এ বাড়ি যেন হার মানায় অন্যগুলোকে। এত জীর্ণ, হতশ্রী, অদ্ভুত এক গন্ধ-খসে পড়া বালি, সুরকির চুন আছে কি না বোঝা যায় না। অথচ ইমারতের গড়ন দেখলে মনে হয়, যে আমলেই হোক বাড়ি তৈরির সময় অন্তত রীতিমতন বাড়ির মালমশলা খরচ করা হয়েছিল।

নীচের ফাঁকা চাতাল থেকে সেই একই কলরব ভেসে আসছে। তবে অত জোরালো নয়।

কিকিরা আর জহর নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। তারাপদ সামান্য পেছনে। তাকে বলা হয়েছে, সিঁড়ির দিকে চোখ রাখতে।

লোকটি ফিরে এল। “আসুন আপনারা। বাবু আসছেন।”

বারান্দা বরাবর দু’তিনটে বন্ধ ঘর পেরিয়ে একটা ঘরে এনে কিকিরাদের বসতে বলল লোকটি।

ঘর খুলে আলো সে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার সে পাখা খুলে দিল। আলো জ্বেলে দিল অন্য একটা দেওয়ালেরও।

বিশাল ঘর, মানে সাধারণ বড় ঘরের চেয়েও আকারে বড়। ঘর জুড়ে পুরনো আমলের সোফা, চেয়ার, আর্মচেয়ার, ডিভান। কোনওটাই আজ আর উজ্জ্বল নয়। ময়লা। ধুলো জমেছে। কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে এখানে ওখানে। ঘরের একপাশে একটা নকল বাজপাখি, বাঘের মাথা, দেওয়ালে হরিণের শিং। আর কিছু ছবি দেওয়ালে। তার মধ্যে একটা ছবি পাজামশাইয়ের কোনও পূর্ব পুরুষের অয়েল পেন্টিং, মাথায় পাগড়ি, গায়ে রাজকীয় পোশাক।

কিকিরা আবাক হচ্ছিলেন, আবার কেমন যেন শঙ্কিত হচ্ছিলেন, যে চালাকির খেলাটা তিনি খেলতে এসেছেন, সে-খেলায় কি জিততে পারবেন।

হঠাৎ কিকিরার চোখ পড়ে গেল বাজপাখির ওপর। আশ্চর্য, বনেদি বাড়ির কেউ কেউ বসার ঘরে কুকুর, পাখি, এমনকী হায়েনার নকল মাথা সাজিয়ে রাখে। বাজপাখি কিকিরা আগে কোথাও দেখেননি। পাখিটা দেখলে মনে হয় জীবন্ত।

পায়ের শব্দ হল।

পাঁজামশাই ঘরে এলেন। বিনয়ভূষণ পাঁজা।

জহররা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বিনয়ভূষণ কিকিরাদের দেখছিলেন। তাঁর কৌতূহল হচ্ছিল।

জহর বলল, "আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আপনি বসুন।"

বিনয়ভূষণ বসলেন। হাতের ইশারায় কিকিরাদের বসতে বললেন, "বসুন। আপনারা..."

নমস্কারের সৌজন্যপর্ব চুকিয়ে কিকিরাও বসে পড়েছেন ততক্ষণে।

"ইনি আমার বাবার বন্ধুর মতন ছিলেন," কিকিরাকে দেখিয়ে জহর বলল, "আমি কাকা বলে ডাকি। নাম কিঙ্করকিশোর রায়। আর উনি কাকার সঙ্গে এসেছেন...!" বলে তারাপদকে দেখাল।

কিকিরা বিনয়ভূষণকে দেখছিলেন। বৃদ্ধই ধরা যেতে পারে, তবে অক্ষম নন শারীরিক ভাবে। এখনও পিঠ সোজা, গাল-মুখ শুকিয়ে কুঁচকে যায়নি। ওঁর পরনে ধুতি, গায়ে হাফ হাতা গেঞ্জি। গলার কাছে বোম দেওয়া। পায়ে তালতলার চটি। বাঁ হাতে চশমার খাপ। চোখে চশমা নেই। বোঝা যায় দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধে হয় না, চশমাটা কাছের বস্তু দেখা বা পড়ার জন্যে। ধবধবে ফরসা রং গায়ের। মাথার চুল সাদা এবং স্বল্প। গলায় একটি ছোট মাপের সোনার হার।

জহর বলল, "সেদিন যা ঘটেছিল রায়কাকা স্বচক্ষে দেখেছেন। ওইজন্যে ওঁকে নিয়ে এলাম। পতাকীদার কোনও দোষ নেই।... তা ছাড়া কাকারও কিছু বলার আছে।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ," কিকিরা বললেন, "একটা কাজে আমি ওদিকে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা চোখে পড়ে যায়। পতাকীকে আমি চিনি। অনেকদিন। স্টুডিয়োয় কাজ করে জানি।"

"বুঝতে পারছি। তা আপনি কি এই কথাটাই বলতে এসেছেন?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। বললেন, "না, আমি একটা ব্যাগ আপনাকে দেখাতে এসেছি।"

"ব্যাগ! কীসের ব্যাগ!"

কিকিরার কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা ছিল। তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগ বার করলেন। দেখতে প্রায় কালো। লম্বায় ফুটখানেক। পতাকীকে দিয়ে ব্যাগ কিনিয়ে সেটার চেহারা পুরনোর মতন করা হয়েছে। যদিও তা হয়নি।

"এই ব্যাগ," কিকিরা বললেন "আগে আপনি দেখেছেন?"

বিনয়ভূষণ ব্যাগ দেখতে দেখতে অবাক হয়ে বললেন, "তা আমি কেমন করে বলব! তবে হ্যাঁ, জহরের সেই লোকের হাতে এইরকম ব্যাগ ছিল! ...আপনি কি ব্যাগটা উদ্ধার করেছেন?"

জহর তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ। উনি..."

"উনি কুড়িয়ে পেয়েছেন? কেউ দিয়েছে?"

জহর বলল, “আজ্ঞে, মানে ঠিক কুড়িয়ে পাওয়া নয়। দেয়নি কেউ?”

“তবে?”

কিকিরা এবার নিজেই কথা বললেন। “আমি অনেকদিন ধরেই ওদিকে ঘোরাফেরা করি। চেনা লোকজন আছে। চুরিচামারি, পকেটমার, ছিনতাই হলে খোঁজখবর পাই।”

“আপনি পুলিশের লোক?”

“আজ্ঞে না। পুলিশের লোক নয়। তবে ওই যে গুমঘর লেনের কাছে বাচ্চাদের একটা ক্লিনিক আছে। পোলিও পেশেন্টদের দেখাটেখা হয়, তার পাশে একটা ছোট বাড়ি আছে। সেখানে কাঁচা চোরছ্যাঁচড় পকেটমারদের শুধরানোর চেষ্টা করা হয়। থানা পুলিশ থেকেই পাঠায় অনেককে। আমি ওখানে যাই। ধরাপড়া ছোকরাগুলোকে বাবা বাছা করে ধর্মকথা শোনাই, বারণ করি কুকর্ম করতে।” কিকিরা আগেই মনে মনে এসব কথা বানিয়ে রেখেছিলেন।

বিনয়ভূষণ অবাক হয়ে বললেন, “কই, এরকম তো আগে শুনিনি। জুভেনাইল কোর্ট বলে একটা কী আছে শুনেছি। তা সে তো অন্য ব্যাপার।”

“কত কী আছে পাঁজামশাই, আমরা কি সব জানি? না, খোঁজ রাখি!”

মাথা নাড়লেন বিনয়ভূষণ। “আপনি বলতে চাইছেন ব্যাগটা সেখান থেকে পেয়েছেন?”

“আজ্ঞে, যথার্থ।”

“আমার জিনিসটা কই? সেই খাম–?”

“ফোটোর কথা বলছেন!” কিকিরা বললেন, “কী বলি আপনাকে বলুন তো! যে-বেটা ব্যাগ মেরে পালিয়েছিল সেই রাস্কেলটা ব্যাগের মধ্যে টাকা-পয়সা যা ছিল-পকেটে পুরে বাকি যা কাগজপত্র ছিল ছিঁড়ে দলা করে পাকিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে।” কিকিরার বলার ধরনে ইতস্তত ভাব, একটু যেন কুণ্ঠা, সেভাবে গোছানো নয় কথাগুলো। এ-সবই তাঁর ইচ্ছাকৃত।

বিনয়ভূষণ কেমন বিহ্বল, হতবাক। মুখে কথা নেই। শেষে বললেন, “ফেলে দিয়েছে, আঁস্তাকুড়ে?”

“আজ্ঞে, চোরের আর কাগজপত্র কী কাজে লাগবে! টাকা যা পেয়েছে–নিয়েছে। কাগজ তো সোনাদানা ঘড়ি আংটি নয় যে, বাজারে বেচা যাবে! ফেলে দিয়েছে।”

সেই লোকটি আবার ঘরে এল। হাতে শ্বেতপাথরের বড় থালা। তিনটি গ্লাস, গ্লাসে শরবত। কাঁচের গ্লাস নয়, জার্মান সিলভারের গ্লাস। অল্প কারুকার্য গ্লাসের গায়ে।

শরবত এগিয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটি।

বিনয়ভূষণকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছিল। তবু সৌজন্য দেখিয়ে কিকিরাদের শরবত খেতে বললেন।

তারাপদ অস্বস্তি বোধ করছিল। কিকিরা হয়তো ভুল করেছেন। এভাবে জড়িয়ে পড়া উচিত হয়নি তাঁর।

জহরও চুপ।

বিনয়ভূষণ হঠাৎ বললেন, কিকিরাকেই, “আপনি কি আমাকে একটা ঘেঁড়া পুরনো ব্যাগ দেখাতে এসেছেন! এর কোনও দরকার ছিল না।” বলে জহরের দিকে তাকালেন। মনে হল জহরের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

কিকিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বিনীতভাবে বললেন, “আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হওয়ারই কথা। কিন্তু আমি ঠিক ব্যাগ দেখাতে আসিনি। ...একটা কথা আপনাকে বলে নিই। কিছু মনে করবেন না। অন্যের ব্যাপারে আমার অকারণ মাথা গলাবার অভ্যেস নেই। এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। পতাকীকে আমি অনেককাল ধরে চিনি। সে ভাল মানুষ, নিরীহ, গরিব। জহর সবই জানে।” শরবত খেলেন সামান্য কিকিরা। ঘরের চারপাশ তাকালেন একবার, তারপর বিনয়ভূষণকে বললেন, “সেদিন আমি নিজের চোখে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে, মামুলি পকেটমারের কাজ ওটা নয়। পতাকীকে ট্রাম থেকে ফেলে দেওয়া, আর ওই ব্যাগ নিয়ে পালানোর একটা মতলব আগেই করা হয়েছিল। আমি যা করছি পতাকীর জন্যে করছি। অবশ্য জহরের জন্যেও খানিকটা।”

বিনয়ভূষণ আরও বিরক্ত হলেন। “কী বলছেন আপনি! ওই পতাকীকে কে ট্রাম থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চাইবে! কেন? কাউকে চলন্ত গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া বিরাট অফেন্স। ও তো মারা যেতেও পারত।”

“আপনি ঠিকই বলেছেন। একাজ কে করল?”

“কে করল? মানে?”

“আপনি অনুমান করতে পারেন না?”

বিনয়ভূষণ থতমত খেয়ে গেলেন। “আমি! কী বলছেন মশাই, আমি কেমন করে অনুমান করব।”

কিকিরা বললেন, “কাউকে সন্দেহ হয় না!”

“কাজের কথা বলুন। না হয় আমায় ছেড়ে দিন। আমি বুড়ো লোক– এখন আমার বিশ্রামের সময়!”

কিকিরা সামান্য হাসলেন। “আপনার মায়ের ফোটো আমার কাছে আছে। যদিও সেটা ছেঁড়াফাটা, চটকানো। চিনে নিতে অসুবিধে হয়।”

“আপনার কাছে আমার মায়ের ফোটো আছে!” বিনয়ভূষণ যেন উঠে বসার মতন পিঠ সোজা করলেন। উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

“আপনার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, যা পাওয়ার আপনি পাবেন। তার আগে আপনি বলুন, আপনার মায়ের, বৃদ্ধা বিধবা মায়ের যে ফোটো আপনি প্রায় বছরদুয়েক আগে তুলিয়েছিলেন জহরকে দিয়ে, এতদিন পরে হঠাৎ সেটার জন্যে এত উতলা হয়ে উঠলেন কেন? কেন ওই

ফোটো থেকে আরও বড় সাইজের একটা ছবি তৈরি করে দিতে বললেন?”

বিনয়ভূষণ কিকিরাকে দেখছিলেন একদৃষ্টে। প্রথমে তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হল, অজানা অচেনা বাইরের একটা লোকের এই ধৃষ্টতায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও বিস্মিত। কী যেন বলতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করলেন।

কিকিরা শান্তভাবে বললেন, “আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।”

বিনয়ভূষণ কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, “এসব আমার ব্যক্তিগত কথা। আমার মা…”

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কিকিরা বললেন, “আপনার মায়ের কথা আমরা কিছু কিছু জানি।”

“জানেন? কেমন করে?” বিনয়ভূষণ যেন বিশ্বাস করছিলেন না।

“খোঁজ নিয়েছি। উনি বীরভূমের ডুমুরগ্রামের জমিদার পরিবারের মেয়ে। কলকাতায় তাঁর বিবাহ হয়। এই বাড়ি তাঁর শ্বশুর বংশের, মানে এখন আপনার পৈতৃক বাড়ি।”

বিনয়ভূষণ মাথা নাড়লেন। “হ্যাঁ। ..সঠিক খবরই জোগাড় করেছেন।”

“আরও দু-একটা খবর বলতে পারি। এই বাড়ি ছাড়া কলকাতায় ও আশেপাশে যেসব সম্পত্তি আপনাদের এককালে ছিল এখন তা দেনার দায়ে হাতছাড়া। অবস্থা আপনাদের…”

“কী হবে শুনে! আমি নিজেই বলছি, এখন আমি ভিখিরি। অপচয় আর অহংকার আমার বাবার মাথায় ভুতের মতন চেপে বসেছিল। সেইসঙ্গে দুর্ভাগ্য। যাতে হাত দিয়েছেন ব্যর্থ হয়েছেন, টাকা-পয়সা জলে পড়েছে। …তা এসবই আমি আমার মন্দভাগ্য বলে মেনে নিয়েছি। …শুধু শেষ বয়েসে একটা জিনিস পারিনি।…শুনবেন সেকথা?”

কিকিরা মাথা হেলালেন। শুনবেন।

৯.

বিনয়ভূষণ প্রথমটায় চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেন।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুললেন, দেখলেন না কিকিরাদের, যেন নিজের মনে-মনেই বললেন, "পাপ আর পাঁক-এর মধ্যে পা ডুবলে মানুষ তলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। জন্তুও যায়। তবে পাপে নয়, কেন না তারা মানুষ নয়, পাপপুণ্য জানে না। আমরা দাদামশাই তাঁর আমলে করেছিলেন বিস্তর, তবে নষ্টও করেছেন। তিনি গত হলে, আমার দিদিমা জমিদারির রাশ টেনে নেন। না, নেন বলব না, 'নেয়' বলব। দিদিমাকে আমি দেখেছি ছেলেবেলায়। আপনি-টাপনি করে কথা বলতাম না। আপনি খোঁজ করলে জানতে পারবেন, আমার দিদিমাকে ওদিককার লোক বলত আর-এক দেবী চৌধুরাণী। দেখতে সুন্দর, তবে স্বভাবে হিংস্র। লাঠিয়াল, ডাকাত, বল্লমবাজ সবই পুষত দিদিমা। মামলা আর খুনোখুনি দাঙ্গা লেগেই থাকত।"

তারাপদ বলল হঠাৎ, "উনি নিজে খুনোখুনি করতেন?"

"দিদিমার পোষা লোকরা করত। হুকুম থাকত দিদিমার। ...তা ওই দিদিমা যখন নানা ঝাটে জড়িয়ে পড়েছে তখন আমার মা, আমি, বাবা-কলকাতায়। খবর এল দিদিমাকে কেউ চালাকি করে বিষ খাইয়েছে। আমরা ডুমুরগ্রাম পৌঁছোবার আগেই দিদিমা মারা গেল।"

"কী বিষ?"

"জানি না। গাঁ গ্রামে কতরকম বিষের চল আছে কে জানে! সেঁকো বিষ হতে পারে।...কেউ আবার বলল, দিদিমা নিজেই বিষ খেয়েছে।"

"কেন?"

"আমার এক ছোট মাসি ছিল। মাসি বেশিরভাগ সময়েই বাপের বাড়িতে থাকত। মাসি হঠাৎ বিধবা হয়ে গেল। শোকের ধাক্কাটা নাকি সহ্য করতে পারেনি দিদিমা। আমার মা আর মাসি ছাড়া দিদিমার অন্য কোনও সন্তানাদি নেই।"

"মাসির একটি ছেলে ছিল না?"

"জানেন? হ্যাঁ ছিল। খেপাটে, নির্বোধ, জেদি। সে কার পাল্লায় পড়েছিল কে জানে! বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াত। শেষে শ্মশানে গিয়ে কী করত জানি না। কোনও তান্ত্রিকের সঙ্গ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।"

"কম বয়েসেই?"

"হ্যাঁ পনেরো ষোলো বছর বয়েস থেকেই খেপামি শুরু হয়েছিল। কুড়ি একুশে ঘরছাড়া। আমার চেয়ে বয়েসে ছোট ছিল। আমরা তার খবর পেতাম না। মাসিও একদিন মারা গেল।"

বিনয়ভূষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ঘরের আলোও কেমন অনুজ্জ্বল হয়ে আসছিল। তারাপদ চোখ সরিয়ে ভেতর দরজার দিকে

তাকাতেই সেই নকল বাজপাখির ওপর দৃষ্টি পড়ল। দেখলে বাস্তবিক ভয় হয়।

কিকিরা বললেন বিনয়ভূষণকে, "আপনার মায়ের কথা একটু বলুন। উনি যে হরিদ্বারে তীর্থ করতে গিয়ে..."

"আপনি শুনেছেন? কে বলল?"

"জহর।" কিকিরা টেপ রেকর্ডার লুকিয়ে রাখার কথা আর বললেন না।

বিনয়ভূষণ বিষঃ গলায় বললেন, "মানুষ বোধ হয় তার দিন ফুরিয়ে আসার আগে ভেতরে ভেতরে কিছু বুঝতে পারে। কেউ কেউ নিশ্চয় পারে। আমার মা বোধ হয় পেরেছিল। একদিন নিজেই বলল, আমার একটা ছবি ঝুঁলিয়ে রাখ। পুজোর আসনে বসে জপ করছি। যখন থাকব না ওটাই দেখবি।' ...আমি কোনওদিন মায়ের কথা অমান্য করিনি। জহরকে বাড়িতে ডেকে এনে ফোটো তোলালাম। এরকম ফোটো আপনি হয়তো ঘরে ঘরে দেখবেন। ভেরি কমন। মায়ের মনে কী ছিল জানি না, শেষ ছবিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে মা বায়না ধরল, শেষ বয়েসে তীর্থে যাবে। তীর্থ তো আগেই সারা হয়েছিল, বাকি ছিল হরিদ্বার হৃষীকেশ কেদার– ওই দিকটা। মায়ের বয়েস হয়েছে তবে পঙ্গু হয়ে পড়েনি।...সবরকম ব্যবস্থা করে মাকে নিয়ে গেলাম হরিদ্বার। তারপর, ঘোরাফেরার পথে কী ঘটে গেল জানেন বোধ হয়। জহর বলেনি?"

"বলেছে। জানি। শুনেছি।"

"তা হলে আর তো আমার বলার কিছু নেই।"

"একটু আছে। এতকাল পরে ওই বিশেষ ফোটোটা নিয়ে...

বাধা দিয়ে বিনয়ভূষণ বললেন, "আপনি মশাই একটা কথা জানেন না। আপনি কি জানেন আমার মায়ের শ্রাদ্ধকর্ম হয়নি। হয়নি, কারণ, আমাদের যিনি কুলপুরোহিত, তিনি অবশ্য নেই, তাঁর ছেলে আছেন, তিনিই এখন আমাদের পুরোহিত। আমি ইদানীং প্রায়ই মাকে স্বপ্ন দেখতাম। খারাপ লাগত। পুরোহিতমশাইকে বললাম। তিনি বললেন, অপঘাতে মৃতজনের প্রেতকর্ম হয় না। আর শাস্ত্রমতে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির শ্রাদ্ধকর্ম করার কতক নিয়ম মানেন প্রাচীনরা। যেমন নিরুদ্দিষ্ট হলে বারো বছরের আগে স্ত্রী তার স্বামীর শ্রাদ্ধকর্ম করতে পারে না। নিয়ম নেই। সেইরকম পুত্রসন্তানকেও কিছু নিয়ম মানতে হয়। এক্ষেত্রে আমি সন্তান হিসেবে মায়ের নিরুদ্দেশ হওয়ার পাঁচ বছর আগে কোনও শ্রাদ্ধকর্ম করতে পারি না। তবে এসব প্রাচীন লোকমত। যে মানে সে মানে, নয়তো মানে না।"

"বুঝেছি। আপনার মা নিরুদ্দেশ হওঁন্নার পর পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ।"

"আপনি মায়ের শ্রাদ্ধকর্মে তাঁর ওই শেষ ফোটোটি বড় করে তুলিয়ে...।"

"ঠিকই বলেছেন।"

"ওটা যদি নাই পেতেন, মায়ের অন্য ফোটো?"

"না। আপনি কোথাকার মানুষ আমি জানি না। এখন তো সবই হয়। কিন্তু আপনার জানা

নেই, তখনকার দিনে বনেদি সম্ভ্রান্ত বাড়িতে বিধবা বয়স্কা মহিলাদের ফোটো যখন-তখন তোলা যেত না। পরিবারের আচার বিচারে বাধত। ...আরে তেমন হলে তো আমি আমার বাবা-মায়ের একসঙ্গে তোলা পুরনো ছবিও নিতে পারতাম। তা তো হয় না। তা ছাড়া ওটি আমার মায়ের শেষ ফোটো। তাঁর কথাতেই তোলা।”

কিকিরা তারাপদকে বললেন, “দেখো চাঁদুরা কী করছে। ডাকো ওদের। ছকুকে বলবে ছোকরাকেও ধরে আনতে।” কিকির জানতেন, ছকু আজও ছোকরাকে এই গলির মধ্যে দেখেছে। চায়ের দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে বসে ছিল। ছকু বলেছে তাঁকে।

তারাপদ চলে গেল। বিনয়ভূষণ অবাক হয়ে বললেন, “ওরা আবার কে? কাকে ডাকতে পাঠালেন?”

“আমার লোক।”

“আপনার লোক! তারা এখানে কেন?”

কিকিরা বললেন, “ওরা আসুক, দেখতেই পাবেন।”

“আপনার কথাবার্তা বড় ধোঁয়াটে। যাকগে, আমার মায়ের ফোটোটা দিন। আপনি বলেছেন, ফোটো দেবেন। কই, দিন।”

কিকিরা মাথা নাড়লেন। “দেব। একটু অপেক্ষা করুন। আচ্ছা পাঁজামশাই, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনার মায়ের শ্রাদ্ধশান্তির কাজ কবে করবেন ঠিক করেছিলেন?”

“এই পূর্ণিমার পর। তৃতীয়া তিথিতে।”

“এ বাড়িতে? না, মামার ভিটে ডুমুরগ্রামে?”

“আপনি কি পাগল! এই বাড়ি মায়ের স্বামীর ভিটে। মায়ের শ্রাদ্ধকর্ম তার বাপের বাড়িতে হবে কেন? এ বাড়িতেই হবে।”

“আমার ভুল হয়েছিল। যাক, বাদ দিন। এই বাড়ি আগলে আপনি কতদিন বসে থাকবেন। বাড়ির যা হল..”

কিকিরার কথা শেষ হওয়ার আগেই ছকু আর চন্দন একটা ছোকরাকে ধরে আনল। সঙ্গে তারাপদ। ছকু ছোকরার গলা জড়িয়ে তার কোমরের কাছে ছকুর বিখ্যাত অস্ত্রটি ধরে আছে। সাইকেলের চাকার স্পোকের মতন সরু দেখতে। অথচ বড় ভয়ঙ্কর এই অস্ত্র। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও শক্ত। ছকু এর নাম দিয়েছে, সূচা’! মানে, দ্য নিডল।

কিকিরা চিনতে পারলেন। সেই ছোকরা। ট্রাম লাইনের গায়ে ফুটপাথ থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে পালিয়েছিল। এখন অবশ্য গায়ে লাল-সাদা গেঞ্জি নেই। অন্য জামা।

বিনয়ভূষণ হতবাক। এসব কী করছে এরা বাড়ির মধ্যে!

কিকিরা বললেন, “চেনেন একে?”

“দেখেছি। কাছেই থাকে। কী নাম যেন, কী নাম! চু-চুনি।”

চুনির অবস্থা দেখে মনে হল ভীত, আতঙ্কিত, হতবুদ্ধি। সে যেন এমন এক জালে জড়িয়ে পড়েছে, যেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার কোনও উপায় নেই। ছকুর হাতের অস্ত্রটা তার কোমরে ফুটছিল। একটু জোর দিলেই পেটে ঢুকে যাবে।

কিকিরা বললেন, "এই ছোকরাই সেদিন পতাকীকে ট্রাম থেকে ফেলে দিয়েছিল কায়দা করে। আর ওকেই আমি দেখেছি, ব্যাগ তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। ওর কাছেই আপনি ফোটোর হদিস পাবেন।"

বিনয়ভূষণ বিহ্বল, বিমূঢ়। কথা আসছিল না। শেষে বললেন, "কোথায় ফোটো?"

চুনি বলতে চাইছিল না। কিন্তু ছকুর অস্ত্রটার খোঁচা লাগল। কী যেন গালমন্দ করল ছকু।

"কোথায় ফোটো?"

চুনির গলা জড়িয়ে গেল। ভয় পেয়েছে। সাধুবাবার কাছে।"

"কী?" বিনয়ভূষণ যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। "সাধু–এ বাড়ির সাধু।"

"আমি ঠিক বলেছি বড়বাবু। মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি। বিশ্বাস করুন। আমাকে টাকা দিয়েছিল সাধু।"

বিনয়ভূষণ আর সংযত থাকতে পারলেন না। চেঁচিয়ে ডাকলেন কাউকে।

সেই লোকটি এসে দাঁড়াল।

"ওপর থেকে সাধুবাবুকে ডেকে দাও। আর শিবুকে।"

লোকটি চলে গেল।

কিকিরা বললেন, "ওপরে–মানে তেতলায়। সেখানে লোকজন থাকে?"

"না। লোক নয়, শয়তান। আজ আমি তাকে দেখে নেব।" উত্তেজিত হয়ে বিনয়ভূষণ উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে ডাকলেন শিবুকে। বসে পড়লেন আবার।

শিবু এল।

বিনয়ভূষণের বোধবুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছে। বললেন, "ছোট দেরাজের মাথায় চাবি আছে। বড় আলমারি খুলে বন্দুক আনবে আমার। টোটাও পাবে আলমারির তলায়। যাও।"

১০.

যে-লোকটি এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখলে মন বিরূপ হয়ে ওঠে। ভদ্র সাংসারিক পরিবেশের সঙ্গে একেবারে বেমানান, গাঢ় গেরুয়া রঙের বসন পরনে। গায়ে জামা নেই, গেরুয়া চাদর মাত্র। গলায় দু'-তিন ধরনের মালা, রুদ্রাক্ষ আর রঙিন পাথরের। মাথার চুল ঝাঁকড়া, রুক্ষ, জট পড়ে আছে। মুখে দাড়ি গোঁফ। পেকে গিয়েছে অর্ধেক। বাঁ চোখটি ছোট, পাতা যেন বুজে রয়েছে। পিঠে সম্ভবত কুঁজ আছে; বেঁকে হেলে দাঁড়িয়ে থাকলেন ভদ্রলোক।

কিকিরা কিছু বলার আগেই বিনয়ভূষণ বললেন, রাগে ঘৃণায় গলা কাঁপছিল, "গত বছরখানেকের বেশি এই বাড়ির তেতলায় ও রয়েছে। ওই সাধুবাবু।"

এই বাড়ির তেতলা! কিকিরারা তো শুনেছেন তেতলার দরজা জানলা খোলা থাকে না বাড়ির। খড়খড়িকরা দরজা বন্ধই থাকে বরাবর। রাজ্যের পায়রা, তাদের ময়লা, খসে পড়া পালক পড়ে থাকে জঞ্জাল হয়ে। আর থাকে ইঁদুর, বাদুড়, চামচিকে। সাধুবাবুকে দেখে মনে হল, অন্ধকার আর দুর্গন্ধময় ওই নরক থেকে সত্যিই ওই মানুষটি বেরিয়ে এসেছেন।

বিনয়ভূষণ বললেন সাধুবাবুকে, উত্তেজনায় গলা কাঁপছে, "মুখে রক্ত-তুলে মরতে বসেছিলে রাস্তায়। আঁস্তাকুড়ে তোমায় মরতে হত। এখানে এসে আশ্রয় চাইলে, দয়া করে থাকতে দিয়েছিলাম। আর তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করে ওই গুণ্ডা ক্লাসের ছেলেটিকে পেছনে লাগিয়েছিলে আমার। শয়তান, অকৃতজ্ঞ।"

সাধুবাবুর যেন রাগ উত্তেজনা নেই। নির্বিকার গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "না; আমার কৃতজ্ঞতা নেই। তুমি তোমার মায়ের ছবি সাজিয়ে ঘটা করে শ্রাদ্ধ করবে আর আমি দেখব!"

"কেন দেখবে না? তুমি কে?"

"আমি. কে তুমি জানো, আমিও জানি। তোমার মায়ের বলা ছিল, তার মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে তুমি ডুমুরগ্রামের বাড়ি সম্পত্তি, কোনও কিছুতেই হাত দিতে পারবে না। তোমার সে-অধিকার নেই। কী তুমি অস্বীকার করবে? করলে আমি প্রমাণ দেখাতে পারি..."

"না। আমি ঠগ জোচ্চর নই। মায়ের আদেশ, ইচ্ছে কাগজপত্রে লেখা আছে।"

"কিন্তু এটা লেখা নেই যে, তোমার মায়ের যে শেষ ফোটো তুমি তুলিয়েছিলে, সেই ফোটোর চারপাশে বাহারি ডিজাইন করা লাইন টেনে ওটা বাঁধাবার পর ফোটোর চার কোণে চারটি অক্ষর তোমার মা পরে বসিয়ে দিয়েছিল।" সাধুবাবুর দাঁতগুলো দেখা গেল এক পলক। হয়তো ঘৃণাভরে হাসলেন। "চারটি অক্ষর কী, তুমি জানো। শুনবে?"

"ভয় দেখাচ্ছ আমাকে। আমি তোমার মতন একটা নোংরা জন্তুকে গুলি করে মারতে পারি। তুমি আমাদের মাতুল বংশের মান ইজ্জত সম্ভ্রম-সব নষ্ট করেছ। মাসিকে তিলে তিলে মেরেছ।"

"যা করেছি তা করা হয়ে গিয়েছে। সেটা পুরনো কথা। আমি যা ভেবেছিলাম, চেয়েছিলাম–তা পাইনি। সবই মিথ্যে হয়ে গেল। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ছাই হয়ে গিয়েছিল কে না জানে! ...ও কথা থাক, আসল কথা বলি। ওই চারটে অক্ষর হল 'ম' 'তি' হা' 'সি'... তুমি জানতে না ওই অক্ষরগুলোর মানে কী? পরে জেনেছ।"

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, “ম-তি-হা-সি। মানে কী?”

সাধুবাবু বললেন, “ওকে জিজ্ঞেস করুন।” বলে বিনয়ভূষণের দিকে তাকালেন, “তুমি যুধিষ্ঠির নাকি! তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আর আমি চোর! শোনো, আমাদের ডুমুরগ্রামের মদনমোহন মন্দিরে যে বিগ্রহ আছে মদনমোহনের, তার তিন হাত তলায় এক সিংহাসন লুকনো আছে সোনার হীরে। চুনি বসানো। দিদিমার কীর্তি। তুমি ওই সিংহাসন তুলে নেওয়ার পর তার বিক্রির অর্ধেক টাকা আমায় দেবে। বাদবাকি যা সম্পত্তি, যত কমই হোক-তারও আধা ভাগ। মদনমোহন আর তোমার মা–মানে মাসির নামে প্রতিজ্ঞা করো, ফোটো আমি তোমায় দেব।”

কেউ কিছু বোঝার আগেই, বিনয়ভূষণ বন্দুকটা তুলে নিলেন। শিবু যে কখন এসে মনিবের হাতে বন্দুক দিয়েছে, কেউ খেয়াল করেনি। পুরনো আমলের একনলা বন্দুক। টোটা পোরা ছিল কি না কে জানে!

বিনয়ভূষণ উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মাথা ঘুরছিল। টলে যাচ্ছিলেন।

সাধুবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। জড়ানো গলায় বললেন, “তোমার মা–আমার মাসি ধাঁধা করে পদ্য লিখত। ফোটোর পিছনে কী লিখেছিল তুমি আগে ধরতে পারতে না। শুনবে ধাঁধাটা? মনে হয় মোহন অতি/ তাঁহারে করিবে নতি/ তিন সূতা নীচে যাবে/ চাও যাহা তাহা পাবে ॥” ... মানেটা তোমার মাথায় ঢুকত না। নির্বোধ তুমি। ‘মোহন’ হল ‘মদনমোহন’; তিন সূতা হল ‘তিন হাত’, ওটা হল গেঁয়ো মাপের হিসেব। আর মদনমোহনের মূর্তির হাততিনেক নীচে গেলে তুমি যা চাও তাই পাবে...।”

বিনয়ভূষণ উন্মাদের মতন চেঁচিয়ে উঠলেন, “রাস্কেল! নেমকহারাম।”

“আমাকে তোমার যা খুশি বলল। আমি এখানে বসে বসে তোমার সমস্ত কিছু নজর করেছি। তোমার টেলিফোন লাইনের সঙ্গে তার টেনে আড়িও পেতেছি। হাঁ করেছি। অন্যায় করিনি।”

বিনয়ভূষণ নিশানা ঠিক করতে পারছেন না মাথা ঘুরছে। চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা।

“শয়তান, আজ আমি তোমায়...”

তারাপদ আর চন্দন আতঙ্কে কেমন এক শব্দ করে উঠল। কিকিরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ছকু লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিনয়ভূষণের ওপর।

একটা শব্দ হল। গুলির শব্দ। ঘর কেঁপে উঠল যেন। নকল বাজপাখিটা ছিটকে উঠে মাটিতে পড়ে গেল।

সাধুবাবু নির্বিকারভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বিনয়ভূষণ টলতে টলতে চেয়ারে বসে পড়েছেন। চোখের পাতা খুলছেন না। ঘামছেন। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল বুঝি!

চন্দন এগিয়ে গেল বিনয়ভূষণের দিকে।

আশ্চর্য, চুনি কিন্তু পালিয়ে গেল না, দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে।

কাপালিকরা এখনও আছে

এক

কত বিচিত্র ঘটনাই না জগতে ঘটে যায়। তারাপদর জীবনে যেমন ঘটল আজ।

সকালে খুব বিরস মুখে তারাপদ ঘুম থেকে উঠেছিল। ঘুম ভাঙার মুখে মুখে যদি মনে পড়ে যায়, মেসের বটুকবাবুকে গোটা তিরিশেক টাকা অন্তত দিতেই হবে আজ, নিচের জগন্নাথ চা-অলাকেও পাঁচ-সাত টাকা, তা হলে কারই বা ভাল লাগে! লোকের কাছে ধার-দেনার কথা, নিজের অভাবের কথা মনে হলে ভাবনা-চিন্তা বেড়েই যায়, আরও কত রকম ধারটারের কথা মনে পড়ে, কত রকম অভাব এসে দেখা দেয়। তারাপদরও সেই রকম হল মনে পড়ল–আজ লন্ড্রি থেকে জামাটামা আনতে হবে, তা তাতেও দেড় দু টাকা; নীলুর মনিহারী দোকান থেকে একটা সাবান, নিদেন পক্ষে একটা কি দুটো ব্লেড আনতে গেলে সেও বাকি সতেরো টাকার জন্যে হাত পেতে বসবে। এই রকম আরও কত টুকটাক। না, এ আর ভাল লাগে না! এইভাবে কি বাঁচা যায়, দিনের পর দিন! মাঝে মাঝে তারাপদর মনে হয়, এ জীবন রেখে লাভ নেই; তার চেয়ে একদিন ‘জয় মা বলে ডবল ডেকারের তলায় ঝাঁপ দেওয়াই ভাল।

বিরক্ত বিরস মুখ করে তারাপদ উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। তার ঘরের জানলা বন্ধ, দরজা খোলা। শীতের দিন বলেই যে জানলা বন্ধ তা নয়, এখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, রোদ উঠেছে, জানলা খুলে দেওয়া যেত। কিন্তু তার রুমমেট বঙ্কিমদা কখনো সকালে জানলা খুলবেন না। কেননা, জানলাটা খোলা এবং বন্ধ করার মধ্যে কলা-কৌশল আছে। জানলার দুটো পাটই আলগা, প্রায় কর্জাবিহীন, হিসেব করে না খুললেই একটা পাট সোজা নিচে বটুকবাবুর মাথায় গিয়ে পড়তে পারে, আর-একটা হয়ত মাঝপথে কোথাও ঝুলতে থাকবে। নারকোল দড়ি, লোহার ছোট শিক–এইসব মালমশলা দিয়ে তারাপদ কোনো রকমে ঘরের জানলা দুটোকে ধরে রেখেছে, যদি না রাখত–এই ঘরে জানলা বলে কিছু থাকত না। তারাপদ খুব বিবেচক। বাড়ির দোষ সে দেয় না। একশো সোওয়াশো বছরের পুরনো বাড়ির হাল এর চেয়ে আর কি ভাল হতে পারে! গলির গলি তার মধ্যে বাড়িটা নড়বড়ে চেহারা নিয়ে, কপোরেশনের ময়লাফেলা গাড়ির মতন ইটকাঠের আবর্জনা হয়ে যে এখনো দাঁড়িয়ে আছে তাই যথেষ্ট। যদি গঙ্গাচরণ মিত্তির লেনের ওই বাড়ি না থাকত-কোথায় যেত তারাপদ? আজকের দিনে মাথা গোঁজার জন্যে তার মাত্র ন’ টাকা খরচ হয় মাসে মাসে। বটুকবাবু এবাড়ির জন্যে সিট রেন্ট বাবদ মাথা পিছু ন টাকা নেন। তাতেও তাঁর লাভ থাকে। আটান্ন টাকা মাসিক ভাড়ার বাড়ি। অবশ্য পুরনো ভাড়াই চলছে। জনা দশেক মেম্বারের মেসের।

তারাপদ ঘরের এক কোণ থেকে তার টুথব্রাশ তুলে নিয়ে আবার বিরক্ত হল। পেস্ট নেই। পরশুই ফুরিয়ে গিয়েছিল। গতকাল কোনো রকমে পেস্টের মুণ্ডু টিপে একটু পাওয়া গিয়েছিল, দাঁত মাজার কাজটা তাতেই সেরেছে। কাল। সারাদিন আর টুথপেস্টের কথা মনে হয়নি।

এক চিলতে সাবানের ওপর ব্রাশ ঘষে নিয়ে মুখ ধুতে যাবার সময় তারাপদর মনে পড়ল, আজ শনিবার। একুশ তারিখ। শনিবার দিনটা এমনিতেই ভাল যায় না তারাপদর, তার ওপর

একুশ তারিখ। একুশ তারিখটা তার পক্ষে ভাল নয়। তিন সংখ্যাটাই তার ভাগ্যে সয় না। একুশ, মানে দুই আর এক–সংখ্যা দুটো পাশাপশি রাখলে তাই হয়। দুই আর এক যোগ করো, তিন। খারাপ। ওদিকে আবার একুশকে শুধু তিন আর সাত দিয়ে ভাগ করা যায়, করলে মিলে যায়। তিন দিয়ে মেলানো অশুভ। আবার সাত দিয়ে ভাগ করলে সেই তিন। মানে, যোগ আর ভাগ দু দিকেই একুশ সংখ্যাটা এত খারাপ তারাপদর পক্ষে যে তাকে ডবল খারাপ বলা যায়।

দিনটা যে আজ খুবই খারাপ যাবে সকাল থেকে তারাপদ তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে । ঘুম থেকে উঠেই টাকার চিন্তা, কোথায় বটুকবাবু, কোথায় নীলু, কোথায় লন্ড্রি। মুখ ধোবার গেস্ট পর্যন্ত জুটল না।

.

মাত্র ক'ঘণ্টা পরেই কিন্তু সব কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেল ।

বেলা সাড়ে বারোটা বাজেনি। তারাপদ হন্তদন্ত হয়ে চন্দনের মেডিক্যাল হোস্টেলে গিয়ে হাজির। চন্দন ঘরেই ছিল। দাবা খেলছিল বন্ধুর সঙ্গে। সবে এম-বি পাশ করেছে চন্দন, পাশ করে পি আর সি-তে আছে।

তারাপদকে এমন অসময়ে আসতে দেখে চন্দন, "কী রে? হঠাৎ?" বলতে বলতে সে তারাপদর খানিকটা উত্তেজিত, খানিকটা বা বিমূ মুখ দেখতে লাগল ।

তারাপদ হাঁপাচ্ছিল। শীতের দিন হলেও তার মুখে যেন সামান্য ঘাম ফুটেছে। চুলটুল রুক্ষ শুকনো শুকনো চেহারা।

তারাপদ দম টেনে বলল, "চাঁদু, তোর সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে।"

"বল", বলে চন্দন তার দাবার বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল।

তারাপদ বলব কি বলব না মুখ করে বসে থাকল। তৃতীয়জনের সামনে তার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

চন্দন তার দাবা খেলার বন্ধুকে চোখের ইশারায় আপাতত উঠে যেতে বলল। বন্ধুটি স্নান করতে যাচ্ছিল, তার কাঁধে তোয়ালে ঝোলানো, সে চলে গেল।

বিছানার মাথার দিক থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই উঠিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরাল চন্দন; বলল, "কী তোর সিরিআস কথা, বল?"

তারাপদ নিজের উত্তেজনা সামান্য সামলে নিয়ে বলল, "চাঁদু, সাঙঘাতিক একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আমি একটা চিঠি পেয়েছি, আজ, খানিকটা আগে; রেজিস্ট্রি করে এসেছে।"

"কিসের চিঠি? চাকরির?"

"আরে না না–চাকরির নয়," বলতে বলতে তারাপদ পকেট থেকে খামে মোড়া একটা চিঠি বের করল। "চিঠিটা পড়ে আমার মাথা ঘুরে গেছে। কিছু বুঝতে পারছি না…।" বলে তারাপদ খামসমেত চিঠিটা চন্দনের হাতে দিল।

চিঠি নিল চন্দন। রেজিস্ট্রি করা চিঠি, উইথ এ ডি। খামের মুখ ছেঁড়া। চন্দন চিঠিটা বের করে নিল। ছাপানো প্যাডে ইংরেজিতে লেখা চিঠি। যেন খানিকটা পোশকি ব্যাপার।

প্রথমটায় চন্দন তেমন মন দিতে পারেনি। চিঠির মাঝামাঝি এসে তার কেমন চমক লাগল। তারাপদর দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার মন। দিয়ে প্রথম থেকে চিঠিটা পড়তে লাগল।

চিঠি পড়া শেষ করে চন্দন অবাক হয়ে বলল, "এ তো কোনো সলিসিটারের চিঠি বলে মনে হচ্ছে রে।"

তারাপদ মাথা নেড়ে বলল, "মনে হবার কী আছে, লেটার প্যাডের মাথায় তো লেখাই আছে, ভদ্রলোক সলিসিটার।"

"কিন্তু সলিসিটাররা অফিস থেকে চিঠি দেয় বলে শুনেছি। এটাতে বাড়ির ঠিকানা দেওয়া আছে। "

"চিঠিটা খানিকটা পাসসান্যাল বলে বোধ হয়।"

চন্দন আরও একবার চিঠিটা পড়তে পড়তে সিগারেট খেতে লাগল।

তারাপদ বলল, "কিচ্ছু বুঝলি?"

চন্দন বলল, "খানিকটা বুঝলাম। ভদ্রলোক তোকে পত্রপাঠ দেখা করতে বলেছেন। বিষয়সম্পত্তির একটা বড় ব্যাপার জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই সলিসিটার ভদ্রলোক যাঁর কথা লিখেছেন, ওই ভুজঙ্গভূষণ হাজরা; উনি কে?"

তারাপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি ভাই এরকম নাম কখনো শুনিনি। অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারছি না। তবে মা বেঁচে থাকতে শুনেছিলুম–সাঁওতাল পরগনার দিকে আমার এক পিসিমা থাকতেন, তাঁরা হাজরা ছিলেন। পিসিমার নাম বোধ হয় ছিল সুবর্ণলতা। পিসেমশাই নাকি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। আমার মনে হচ্ছে, ভুজঙ্গভূষণ আমার সেই পিসেমশাই। চিঠিতে তো আর কিছু লেখা নেই তেমন।"

চন্দন চিঠিটা মুড়ে খামের মধ্যে ঢোকাল। অন্যমনস্ক। পরে বলল, "বোধ হয় ভুজঙ্গভূষণ তোকে বিরাট কোনো সম্পত্তিটম্পত্তি দিয়ে গেছেন..." বলে হাসল চন্দন, "দেখ, রাজত্বটাজত্ব পেয়ে যেতে পারিস।"

তারাপদ বলল, "আমার তিন কুলে কেউ নেই। টিউশানি করে আর বটুকবাবুর মেসে ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে আছি। একটা চাকরি পর্যন্ত জোটাতে পারলাম না। যাও বা একটা জুটেছিল হাতাহাতি করে ছেড়ে এলাম। আমার কপালে ভাই রাজত্ব বর্তাবে ।"

চন্দন হেসে বলল, "বর্তে যাবে রে, তার হিন্টস্ রয়েছে চিঠিতে। তুই বড়লোক হয়ে যাবি। নে লেগে পড়।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে এর মধ্যে, তুই লক্ষ করেছিস?"

"কী?"

“প্রথমত ধর, আমার ঠিকানা এরা পেল কেমন করে? যদি ধরেই নি ভুজঙ্গভূষণের বিষয়সম্পত্তি আমার জন্যে বসে বসে কাঁদছে, তবু ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতন নয় কি? আমার ঠিকানা সলিসিটার মশাই জানলেন কী করে? কেমন করে বুঝলেন আমি ভুজঙ্গভূষণের আত্মীয়? যদি আমার ঠিকানা জানাই থাকবে তবে সেই ভুজঙ্গভূষণ কেন আমায় নিজে চিঠি লিখলেন না?

চন্দন আচমকা বলল, “ভুজঙ্গভূষণ হয়ত মারা গিয়েছেন।”

“মারা গিয়েছেন?”

“মারা গেলেই এ-সব বিষয়সম্পত্তির ওয়ারিশানের কথা ওঠে।“

“তা আমায় কেন?”

“তুই-ই বোধ হয় একমাত্র মানুষ যে কিনা ভুজঙ্গভূষণের জীবিত আত্মীয়।”

তারাপদ চুপ করে থাকল, অন্যমনস্কভাবে লক্ষ করতে লাগল, ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটা দমকা বাতাসে নড়ে নড়ে যাচ্ছে ।

চন্দন বলল, “তুই এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন?”

“ব্যাপারটা আমার কাছে খুব গোলমেলে লাগছে।”

“গোলমালের কী আছে, তুই আজ সোজা ওই সলিসিটার ভদ্রলোক কী যেন নাম– মৃণালকান্তি দত্ত, তাই না–, তাঁর কাছে চলে যা। গিয়ে দেখা কর।”

“তারপর?”

“দেখা করে দেখ, কী বলেন ভদ্রলোক। কেন তোকে যেতে বলেছেন।”

“কিন্তু আমি যে ভুজঙ্গভূষণের আত্মীয়, তার প্রমাণ কী? নামে মিললেই মানুষ এক হয় না। আমি তো জাল হতে পারি।”

মাথা নেড়ে চন্দন বলল, “জাল ভেজাল প্রমাণ হয়ে যাবে । ভদ্রলোকের। কাছে নিশ্চয়ই কোনো প্রমাণ আছে। তা ছাড়া যদি তোর সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর ও-পক্ষ না রাখত তবে তোর ঠিকানায় চিঠি আসত না।”

তারাপদ চুপ করে থাকল। চন্দন যা বলছে এসব চিন্তা যে তার মাথায়। আসেনি এমন নয়। চিঠি পাবার পর থেকে সে অনবরত ভেবেই যাচ্ছে, ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না। সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য। তারাপদ ভাবতেই পারছে না, যে ভুজঙ্গভূষণকে সে জীবনে চোখে দেখেনি, যার নাম শোনেনি, সেই লোক সত্যি সত্যি তারাপদর জন্যে বড়সড় কোনো বিষয়সম্পত্তি রেখে যেতে পারে! বরং এ-সব ব্যাপারে এমন একটা রহস্য রয়েছে যে, না জেনে না বুঝে এগুতে পেলে বিপদে পড়ে যাবে । গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে গেলেই বিপদ।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে তারাপদ বলল, “তুই যেতে বলছিস?”

“আলবত্ যাবি।”

“আমার কেমন নার্ভাস লাগছে।”

“কিসের নার্ভাস! তোকে কি সলিসিটার খেয়ে ফেলবে? তুই কি নিজে যাচ্ছিস? তোকে দয়া করে যেতে বলেছে বলে তুই যাচ্ছিস।”

“তুই আমার সঙ্গে যাবি?”

“আমি?”

“উকিল অ্যাটর্নি শুনলেই আমার ভয় করে। তা ছাড়া ওই যে কী ঠিকানা–কত নম্বর ওল্ড আলিপুর–ও সব ভাই আমি চিনি না। চল তুই…।”

‘বিকেলে আমার যে অন্য দরকার ছিল রে!”

“ক্যানসেল করে দে।…তোর এমন কোনো কাজ নেই। হাসপাতালের চাকরিরও যা বাহার।”

একটু কি ভাবল চন্দন, তারপর বলল, “বেশ, তা হলে বিকেল বিকেল চল । শীতের দিন। পাঁচটা বাজতেই সন্ধে হয়ে যাবে।”

তারাপদ যেন আশ্বস্ত হল খানিকটা। হঠাৎ আবার চোখে পড়ে গেল ক্যালেন্ডারটা। তারাপদ বলল, “চাঁদু, আজ কিন্তু আমার দিনটা ভাল নয়।”

“মানে?”

“একে শনিবার তায় একুশ তারিখ। তিন হল আমার আনলাকি নাম্বার। চন্দন হেসে উঠল। গালাগাল দিয়ে বলল, “তোর যত কুসংস্কার। এসব মাথায় কে ঢোকায় রে? আমি তো দেখছি আজ তোর সাঙ্ঘাতিকু দিন, এ ডে। অফ ফরচুন।”

তারাপদ তখনো খুঁতখুঁত করতে লাগল।

শেষে চন্দন বলল, “আমার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয়নি। তুই মেসে যা। ঠিক চারটের সময় ওয়েলিংটনের মোড়ে থাকবে। আমি আসব ।”

তারাপদ উঠল । অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে।

.

আলিপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। ডিসেম্বর মাসের এই সময়টা এই রকমই, বিকেল ফুরোবার আগেই সব ঝাপসা, ঝপ করে যেন অন্ধকার নেমে আসে আকাশ থেকে। জায়গাটাও কেমন নিরিবিলি। পুরনো আলিপুরের সেই প্রাচীন, বনেদি বাড়ি-ঘর এদিকে রাজারাজড়ার এলাকা যেন, উঁচু উঁচু দেওয়াল ঘেরা বাড়ি, মস্ত মস্ত গাছ, ফটকে দরোয়ান, ভেতরে অ্যালসেশিয়ান কুকুরের গর্জন, ঝকঝকে গাড়ি বেরুচ্ছে, ঢুকছে, রাস্তাটাস্তা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। তারাপদর কেমন গা ছমছম করছিল। সে বেচারি বউবাজারের দিকে থাকে, গঙ্গাচরণ মিত্তির লেনে, যেখানে আলো-বাতাসও ঢুকতে ভয় পায়, গাছটাছ তো দূরের কথা, কোথাও একটা সবুজ পাতা পর্যন্ত দেখা যায় না–সেই তারাপদ এরকম একটা জায়গায় এসে

ঘাবড়ে যাবে না তো কী হবে!

তারাপদ বলল, "চাঁদু, এ-দিকে এলে মনেই হয় না এটা কলকাতা, কী বল?"

চন্দন দু পাশের বাড়ি, বাগান, গাছপালা দেখতে দেখতে হাঁটছিল ধীরে ধীরে সলিসিটার দত্ত-র বাড়ির নম্বর খুঁজছিল। ততক্ষণে রাস্তার বাতি জ্বলে উঠেছে, মাথার ওপর আকাশে তারা দেখা যাচ্ছিল।

বাড়িটা পাওয়া গেল। আশেপাশের বাড়ির তুলনায় ছোট। পুরনো আমলের বাড়ি। সামনে বাগান ছোটমতন।

ফটকের সামনে কেউ ছিল না। তারাপদ ঢুকতে চাইছিল না, যদি অ্যালসেশিয়ান তেড়ে আসে।

চন্দন বলল, "কুকুর নেই, থাকলে বাঁধা আছে; চলে আয়–।"

ফটক খুলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। তারাপদর ভয় করছিল। তার ওপর শীতটাও যেন বেচারিকে জাপটে ধরেছে, কাঁপতে লাগল তারাপদ।

অল্প এগিয়ে গাড়ি বারান্দা।

গাড়ি বারান্দার সিঁড়িতে উঠে একজনকে দেখতে পাওয়া গেল। বুড়ো মতন একটি লোক। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে মোটা চাদর।

তারাপদদের দেখতে পেয়ে লোকটি কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর কাছে এল। তার চোখে দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে জিজ্ঞেস করছে, কাকে চাই আপনাদের?

চন্দন বলল, "আমরা বউবাজার থেকে আসছি। মিস্টার দত্ত আমাদের দেখা করতে বলেছেন।" বলে চন্দন তারাপদকে দেখিয়ে দিল। "বাবু এঁকে চিঠি লিখেছেন দেখা করার জন্যে। এঁর নামটা বলে গিয়ে বাবুকে।" চন্দন তারাপদর নাম ঠিকানা বলল।

তারাপদদের অপেক্ষা করতে বলে লোকটি চলে গেল। দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকল চুপ করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। এক সময় নিশ্চয় বিস্তর পয়সা ছিল বাড়ির মালিকের, সাজিয়ে গুছিয়ে বাড়ি করেছিল, এখনো তার প্রমাণ চোখে পড়ে। মাথার ওপর শেকল দিয়ে ঝোলানো সাদা শেড় পরানো বড় বাতি জ্বলছে, আলোর রঙ বাদামী; এই ঢাকা জায়গা–অনেকটা যেন লবির মতন, দু পাশেই বড় বড় সেটি পাতা রয়েছে বসার জন্যে, এক কোণে হ্যাট স্ট্যান্ড, আয়না, দেওয়ালে গোটা দুয়েক বিশাল বিশাল ছবি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের, একটা চমৎকার হরিণের মাথা।

সমস্ত বাড়ি কিন্তু কী চুপচাপ। দোতলা থেকে পাতলা স্বর ভেসে আসছিল সামান্য।

লোকটি ফিরে এল। এসে বলল, "আসুন আপনারা।"

খুবই আশ্চর্য, ডান বা বাঁ দিকের মুখোমুখি দুটো বাইরের ঘরের কোনোটাতেই ওদের নিয়ে গিয়ে বসাল না লোকটি। একটু ভেতর দিকের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারাপদদের আর-একবার ভাল করে দেখে চলে গেল। .

সেকেলে কাঠের গদি-আঁটা চেয়ারে বসল তারাপদরা। এই ঘরটা সামান্য ছোট। ঘরের বারোআনা শুধু বইয়ে ভরতি। মোটা মোটা বই। বোধ হয় আইনের বই। একদিকে দেওয়ালে-গাঁথা সিন্দুক। লোহার একটা আলমারি অন্যদিকে। জানলা বরাবর বোধহয় দত্ত-মশাইয়ের বসার জায়গা, সিংহাসনের মতন চেয়ার, সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিল।

এই ঘরের গন্ধই যেন কেমন আলাদা। বইপত্রের জন্যেই বোধ হয় ধুলোধুলো গন্ধ লাগে নাকে। পায়ের তলায় জুট কার্পেট। দেওয়ালের দু-এক জায়গায় ছোপ লেগেছে। ঘরে মস্ত বড় একটা পোর্ট্রেট ঝোলানো, কোনো বৃদ্ধের, দত্ত-মশাইয়ের বাবা কিংবা ঠাকুরদার। এক দিকে নিচু টেবিলের ওপর একটা বেড়াল। জ্যান্ত নয়, মরা। কেমন করে তৈরি করেছে কে জানে! একেবারে জ্যান্ত বলে মনে হয়। গায়ের লোম, চোখের মণি, কান, পায়ের থাবা সব যেন জীবন্ত। বেড়ালের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। চোখে খুব যে ভাল লাগে তা কিন্তু নয়।

তারাপদ আর চন্দন নিচু গলায় কথা বলছিল, পায়ের শব্দ শুনে চুপ করে গেল।

ছিপছিপে চেহারার এক ভদ্রলোক ঘরে এলেন। টকটকে গায়ের রঙ, মাথায় বেশ লম্বা, পরিষ্কার করে কামানো মুখ, মাথার চুল একেবারে সাদা ধবধবে, পরনে ধুতি, গায়ে পুরো হাতা পশমী গেঞ্জির ওপর দামি শাল। চোখে চশমা।

তারাপদরা উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে জড়সড়ভাবে নমস্কার করত হাত তুলে।

ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করলেন। চশমার আড়াল থেকে দুজনকে লক্ষ করতে করতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন শেষে ।

চন্দন ইশারায় তারাপদকে চিঠিটা বের করতে বলল।

তারাপদ চিঠি বের করল।

চিঠি বের করে তারাপদ দু পা এগিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "আজ সকালে আমি এই চিঠিটা পেয়েছি । আপনিই কি আমায় দেখা করতে বলেছিলেন?"

ভদ্রলোক চিঠির জন্যে হাত বাড়ালেন। দেখলেন। বললেন, "হ্যাঁ, আমারই নাম মৃণালকান্তি দত্ত। বসুন আপনি।"

তারাপদ আবার দু পা পিছিয়ে এসে চন্দনের পাশে বসল।

মৃণাল দত্ত কিছুক্ষণ সরাসরি তারাপদদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "আপনার নামই তারাপদ?"

তারাপদ একটু কেমন ধাঁধায় পড়ে গেল। এ আবার কেমন প্রশ্ন? সামান্য যেন রাগই হল। ভাবল, বলে–আজ্ঞে আমি তো তাই জানি।...

কিন্তু মৃণাল দত্তের সামনে দাঁড়িয়ে সে-কথা বলতে তার সাহস হল না। ভদ্রলোকের চেহারায় শুধু ব্যক্তিত্বই নেই, দেখলেই বোঝা যায়, অসম্ভব সাবধানী, চালাক এবং বুদ্ধিমান উনি।

তারাপদ নিজের নাম বলল, আবার, পদবী সমেত। বটুকবাবুর মেসের ঠিকানাও।

“আপনার পিতার নাম?”

তারাপদ তার বাবার নাম বলল। তাতেও রেহাই নেই, মার নামও বলতে হল। বাবার নাম, মার নামের পর তাদের পৈতৃক দেশবাড়ি ভিটেমাটির কথাও।

তারাপদ বলল, “আমি এ-সব চোখে দেখিনি। ছেলেবেলায় একবার দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন আমার চার-পাঁচ বছর বয়েস, আমার কিচ্ছু মনে নেই। শুধু একটা তেঁতুল গাছের কথা মনে আছে, খুব বড় তেঁতুল গাছ, গাছটায় নাকি ভূত থাকত.....” তারাপদ একটু হাসল।

এমন সময় বাহারি ট্রের ওপর সুন্দর কাপে করে চা আনল সেই বুড়ো লোকটি। তারাপদদের দিল।

মৃণাল দত্ত বললেন, “চা খাও–”, বলেই তাঁর কী খেয়াল হল, সামান্য হালকা গলায় বললেন, “তোমাদের তুমি বলছি, কিছু মনে করো না, বয়েস তোমাদের অনেক কম।”

চা পেয়ে তারাপদরা বেঁচে গেল । একে এই বিশ্রী অবস্থা, তার ওপর শীত, হাত-পা রীতিমত ঠাণ্ডা হয়ে আসার জোগাড়।

“ওই ছেলেটি তোমার বন্ধু?” মৃণাল দত্ত চন্দনকে দেখিয়ে তারাপদকে জিজ্ঞেস করলেন।

“আমার পুরনো বন্ধু । ওর নাম চন্দন। ডাক্তারি পাশ করেছে সবে।”

মৃণাল দত্ত চন্দনকে দু চারটে কথা জিজ্ঞেস করলেন, পুরো নাম কী চন্দনের, কোথায় থাকে, বাড়ি কোথায়, বাবা কী করেন, কোথায় থাকেন–এই সব ।

শেষে মৃণাল দত্ত তারাপদর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমায় এবার কটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিকঠিক জবাব দিও। তোমার বন্ধু এখন এখানে থাকতে পারে–পরে তাকে একটু উঠে যেতে হবে।”

তারাপদ একবার চন্দনের মুখের দিকে তাকাল। তারপর মৃণালবাবুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, “চাঁদু আমার পুরনো বন্ধু। ওর কাছে আমার কিছু গোপন করার নেই। ও আমার সবই জানে।”

“আচ্ছা, সে আমি পরে ভেবে দেখব। এখন তোমার বন্ধু থাকুক।” বলে মৃণাল দত্ত যেন সামান্য কি ভেবে নিলেন।

খুবই আচমকা মৃণাল দত্ত বললেন, “তুমি ভুজঙ্গবাবুকে কখনো দেখেছ?”

“আজ্ঞে, না।”

“তাঁর নাম শুনেছ?”

“আমার মনে পড়ছে না।“ মার কাছে আমার এক পিসিমার কথা শুনেছি। পিসিমার শ্বশুরবাড়ির পদবী ছিল হাজরা। সাঁওতাল পরগনার কোথায় যেন থাকতেন জায়গাটার নাম আমি জানি না । মা যদি বলেও থাকে–আমি ভুলে গিয়েছি।”

মৃণাল দত্ত খুব শান্তভাবে বসে, তারাপদর দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তোমার বাবা কবে মারা যান?"

"বাবা–! বাবা মারা গেছেন অনেক দিন। আমি তখন স্কুলে পড়ি। ক্লাস এইট-এ।"

"অসুখ করেছিল? কী অসুখ?"

"কী অসুখ আমি বলতে পারব না।...বাবা কলকাতার বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিলেন। অসুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। কয়েক দিনের মধ্যে মারা যান।"

"কোথায় গিয়েছিলেন জানো না?"

"না।"

"মা-র কাছে কিছু শুনেছ?"

"না।...বাবা যখন ফিরে আসেন তিনি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন, অনেকটা পাগলের মতন। অথচ একটা কথাও বলতেন না। বলতে পারতেন না। একেবারে বোবা। মাথায়ও কিছু হয়েছিল, মনে হত আমাদের চিনতেও পারছেন না।" বলতে বলতে তারাপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এতকাল পূরে বাবার কথা মনে হওয়ায় হঠাৎ যেন সেই পুরনো স্মৃতি তাকে কেমন বিষণ্ণ করে তুলল।

মৃণাল দত্ত নীরব। চন্দন আড় চোখে একবার কালো বেড়ালটার দিকে তাকাল। তার চোখের মণিতে আলো পড়েছে যেন।

"তোমার মা কবে মারা যান?" মৃণাল শুধোলেন।

"আমি কলেজ থেকে বেরুবার পর মা মারা যায়। বাবা মারা যাবার পর মা অনেক কষ্টে স্কুলে একটা চাকরি জুটিয়ে নেয়। আমরা বরাবরই খুব গরিবভাবে থেকেছি। কোনো রকমে চলত দুজনের। মার বুকের অসুখ করেছিল। তাতেই মারা যায়।"

মৃণাল দত্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর রাখা চুরুটের বাক্স থেকে একটা চুরুট বেছে নিলেন। "তোমরা আগে কোথায় থাকতে, ঠিকানা কী?"

তারাপদ মদন দত্ত লেনের ঠিকানা বলল।

"তারপর?"

তারাপদ বটুকবাবুর মেসে এসে ওঠার আগে যেখানে যেখানে ছিল তার কথা বলল ।

চুরুট ধরিয়ে নিয়ে মৃণাল দত্ত এবার বললেন, "তোমার পিসেমশাই ভুজঙ্গভূষণ তোমায় তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর-সবই দিয়ে যেতে চান। ভূজঙ্গবাবুর প্রপার্টি যা যা আছে তার সঠিক ভ্যালুয়েশান আমি এখনই দিতে পারব না। ধরো মোটামুটি দেড় থেকে পৌনে দুই লাখ টাকার। এ-সমস্তই তোমার হবে। কিন্তু..."

তারাপদর মাথা প্রায় ঘুরে উঠল। দেড় লাখ টাকার সম্পত্তি! আজ সকালে দাঁত মাজার স্টে পর্যন্ত যার ছিল না, বটুকবাবুর তিরিশটা টাকার জন্যে যারা আত্মহত্যা করার ইচ্ছে করছিল,

সেই লোক সন্ধেবেলায় দেড় লাখ টাকার সম্পত্তি পাচ্ছে। তারাপদর ইচ্ছে করছিল থিয়েটারের লোকদের মতন হাহা করে হেসে ওঠে।

মৃণাল দত্ত বললেন, "কিন্তু এই সম্পত্তি পাবার আগে তোমায় দুটো শর্ত পালন করতে হবে।"

তারাপদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

মৃণাল দত্ত বললেন, "তুমিই যে ভুজঙ্গবাবুর আত্মীয় তারাপদ তা প্রমাণ করতে হবে।"

"কী করে করব?"।

"তোমার যা করার করেছ, বাকিটা আমি করব। আমার কাছে প্রমাণ আছে। আমি মিলিয়ে দেখব। তার আগে তোমার বন্ধুকে এ-ঘর থেকে কিছুক্ষণের জন্যে উঠে যেতে হবে।"

তারাপদ কিছু বলার আগেই চন্দন উঠে দাঁড়াল। সেও রীতিমত উত্তেজনা বোধ করছিল।

তারাপদ বলল, "আর-একটা শর্ত কী?"

মৃণাল দত্ত শান্ত গলায়, "প্রথমটা যদি মেলে তবে না দ্বিতীয়টা!"

চন্দন আর-একবার বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দুই

চন্দন চলে যাবার পর তারাপদর বড় ভয় করতে লাগল। ঘরে সে এখন একলা; মৃণাল দত্ত মুখোমুখি বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন তো দেখেই যাচ্ছেন, চুরুটটা তাঁর দাঁতের সঙ্গে ছোঁয়ানো, কেমন একটা কড়া তামাকের গন্ধ নাকে লাগছে। তারাপদ বুঝতে পারছিল না, অন্ধকারের আলো ফেলার মতন চোখ করে মৃণাল দত্ত এত কী দেখছেন তাকে! তার মাথায় ঢুকছিল না, ওই ভদ্রলোকের কাছে এমন কী প্রমাণ রয়েছে যাতে তিনি আসল আর জাল তারাপদ ধরে ফেলবেন? খানিকটা যেন রাগও হচ্ছিল তারাপদর, তার, পরিচয় এই নিয়ে সন্দেহ করার কী আছে? সে কি মুদির দোকানের বনস্পতি ঘি যে খাঁটি আর ভেজাল পরীক্ষা করে দেখতে হবে? বাস্তবিক পক্ষে এটা কিন্তু অপমান;. তারাপদ যেচে এখানে আসেনি, সে ভুজঙ্গভূষণের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি পাবার আশায় কাঙাল নয়, তবু তাকে নিয়ে এটা কি বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে? এভাবে তাকে বসিয়ে রাখার কোনো অধিকার মৃণাল দত্তর নেই।

তারাপদ মনে মনে যাই ভাবুক সে কিছু বলতে পারল না; বোবার মতন বসে থাকল।

শেষে মৃণাল দত্ত উঠলেন। ওঠার আগে টেবিলের ড্রয়ার খুললেন চাবি দিয়ে, ড্রয়ারের মধ্যে থেকে আরও একটা বড় মতন চাবির গোছা বার করলেন, দুটো কি তিনটে চাবি একসঙ্গে বাঁধা।

তারাপদর সামনে দিয়ে মৃণাল দত্ত আস্তে আস্তে দেওয়াল-সিন্দুকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, “তোমার চেহারার সঙ্গে কার মিল বেশি বলে মনে হয়, তোমার বাবার না মা-র?”

তারাপদ খানিকটা অবাক হল। বাবা এতকাল হল মারা গিয়েছেন যে, তাঁর মুখ আর ভাল করে মনেই পড়ে না। তা ছাড়া বাবা মারা যাবার সময় সে ছেলেমানুষ ছিল, এখন কত বড় হয়ে গিয়েছে, চব্বিশ পঁচিশ বয়েস হতে চলল–কেমন করে সে বলবে তার চেহারা বাবার মতন’ হয়ে আসছে কি না! মা অবশ্য বলত, তারাপদর চেহারার আড় তার বাবার মতন হয়েছে, মুখের খানিকটা বাবার ছাঁদে, বাকিটা মার।

শুকনো শুকনো গলায় তারাপদ বলল, “আমি বলতে পারব না। মা বলত, মেশানো মুখ ।”

মৃণাল দত্ত বড়সড় দেওয়াল-সিন্দুকটা খুলে ফেলে কী যেন বের করতে লাগলেন। তারপর বাঁধানো অ্যালবামের মতন একটা মোটা খাতা বের করলেন যত্ন করে রাখা কিছু কাগজপত্রও নিলেন; নিয়ে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করলেন।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলেন মৃণাল দত্ত। বললেন, “তুমি আমার সামনে এগিয়ে এসে বসো।” বলে আঙুল দিয়ে টেবিলের অন্য প্রান্তটা দেখালেন।

তারাপদ চেয়ারটা টেনে এনে টেবিল ঘেঁষে বসল, মুখোমুখি ।

মৃণাল দত্ত বাঁধানো খাতার মতন জিনিসটা এগিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, ওটা অ্যালবামই, তবে বাজারে যেমন কিনতে পাওয়া যায় সেই রকম নয়। মোটা মোটা কাগজ, বেশিরভাগ পাতায় একটা করে মাত্র ছবি, কখনো কখনো দুটো; প্রতিটি পাতা নিখুঁত করে রাখা, গোটা খাতাটাই চামড়ায় বাঁধানো, ছবির পাশে লাল পেনসিলে পুরু করে শুধু নম্বর লেখা আছে বাংলায় ।

তারাপদ অ্যালবাম হাতে করে বসে থাকল।

মৃণাল দত্ত কাগজপত্রের মধ্যে থেকে একটা পাতলা চামড়ার খাপ–চুরুট রাখার খাপ যেমন হয় অনেকটা সেই রকম খাপ-খুঁজে নিয়ে তার ভেতর থেকে একটা মোটা কাগজ বের করে নিলেন।

মৃণাল দত্ত বললেন, "তুমি ওই ছবিগুলো দেখে যাও একটা একটা করে; যে ছবিটা তোমার চেনাচেনা লাগবে সেই ছবিটা কার আমায় বলবে। বুঝলে?"

তারাপদ মাথা হেলিয়ে বলল, সে বুঝেছে।

"নাও বলো", বলে মৃণাল দত্ত চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে বসে মুখের সামনে মোটা কাগজটা মেলে রাখলেন। তারাপদ বুঝতে পারল, উনি খুব সাবধানী, কাগজের কোনো আঁচড়ও যাতে তারাপদর চোখে না পড়ে সেজন্য দূরত্ব সৃষ্টি করলেন। এর কোনো প্রকার ছিল না, কেন না তারাপদ কাগজের সাদা পিঠ ছাড়া অন্য কিছু এমনিতেই দেখতে পাচ্ছিল না।

তারাপদ অ্যালবামের দিকে চোখ দিল। প্রথম ছবিটা যে কার কে জানে! অনেক পুরনো ছবি, কেমন হলদেটে হয়ে গেছে, ছোপ ছোপ ধরেছে, কোথাও কোথাও একেবারেই ধূসর। বিশাল দাড়িঅলা এই বৃদ্ধ মানুষটিকে সেকেলে কোনো গুরুদেব-টুরুদেবের মতন দেখতে লাগে, পরনের খুট গায়ে জড়ানো, পদ্মাসন না কী বলে যেন সেই ভাবে বসা, হাত দুটি হাঁটুর ওপর।

তারাপদ মাথা নাড়ল বলল, "এই এক নম্বরের ফটো যে কার আমি জানি না। জীবনেও দেখিনি।"

মৃণাল দত্ত বললেন, "তোমার দেখার কথাও নয়। তারপর বলে যাও... ।"

তারাপদ দুই তিন চার পাঁচ নম্বর ছবি পর্যন্ত কাউকে চিনতে পারল না। বুঝতে পারল, ছবিগুলো সবই পারিবারিক, বৃদ্ধবৃদ্ধাদের, প্রবীণের । এই পরিবারের সঙ্গে তারাপদর সম্পর্ক কী? সে তো কাউকে চেনে না দেখেনি। তবে? তবে কি তারাপদ এই পরিবারেরই কেউ, এদেরই বংশধর, এদেরই রক্ত গায়ে নিয়ে বেঁচে আছে? এইসব স্বর্গত পুরুষরা কি আজ অদৃশ্য হয়ে তাকে দেখছে? তারাপদর ঘাড় এবং মাথার কাছে যেন কারা দাঁড়িয়ে রয়েছে এরকম একটা অস্বস্তি বোধ করল সে।'

সাত নম্বর ছবির দিকে চোখ রেখে তারাপদ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল । কী যেন মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। ওই ছবির সঙ্গে একটা কিছুর যোগ রয়েছে কোথাও। অথচ ছবিটা কোনো মানুষের নয়। সেকেলে একটা বাড়ির ছবি। পাকা বাড়ি, তার চেহারাই কেমন আলাদা–একালের শহুরে বাড়ির সঙ্গে মেলে না। বাড়ির ঢঙে, আশপাশের চেহারায়, গ্রাম-গাম লাগে। দোতলা বাড়ি, একটানা ঘর, বাঁ দিকে একটা চালার মতন, ডান দিকে ক'টা গাছপালা, তার পাশে মস্ত একটা গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, গাছটার মাথা দেখা যাচ্ছে না।

তারাপদ গভীর মনোযোগে গাছটার অস্পষ্ট ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, "এই বাড়িটা বোধ হয় আমাদের দেশের বাড়ি। আমার ঠিক মনে নেই, তবে সেই তেঁতুলগাছটা, যার মাথায় ভূত থাকত, সেই গাছটা যেন এইটে–" বলে তারাপদ আঙুল দিয়ে গাছটা দেখাল।

মৃণাল দত্ত বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের দেশের বাড়ি। তোমার কি মনে আছে ওই বাড়ির

পেছনে কী ছিল?”

তারাপদ মনে করার বৃথা চেষ্টা করল, তারপর হঠাৎ কেমন একটু হেসে বলল, “আমার মনে নেই। তবে মার মুখে শুনেছি পুকুর ছিল।”

মৃণাল দত্ত শান্ত গলায় বললেন, “তেঁতুলগাছটার কথাও মা-বাবার মুখে শুনতে পার।...যাক, অন্য ছবি দেখো।”

তারাপদ বেশ ক্ষুব্ধ হল। তার বাল্যস্মৃতির মধ্যে তেঁতুলগাছটা কেমন করে যেন থেকে গেছে অথচ মৃণাল দত্ত তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। আশ্চর্য! এত সন্দেহ কেন?

পর পর তিনটে ছবি উলটে গিয়ে তারাপদ হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখ উজ্জ্বল দেখাল । সামান্য গলায় বলল, “আমার বাবার ছবি ।” বলে তারাপদ ঝুঁকে পড়ে তার বাবার ছবি দেখতে লাগল । কতকাল পরে বাবাকে দেখছে। যেন। এই মুখ চোখ মাথার চুল সব বুঝি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ফিরে পেল।

মৃণাল দত্ত বললেন, “তোমার কাছে তোমার বাবার ছবি নেই?”

“না”, মাথা নাড়ল তারাপদ।

“তোমার মার কাছে নিশ্চয়ই ছিল।”

তারাপদ এবার রেগে গিয়ে বলল, “আপনি আগাগোড়া আমায় অবিশ্বাস করছেন কেন? আপনি ভাবছেন, মা বাবা বেঁচে থাকার সময় আমি যা শুনেছি দেখেছি সেগুলো চালাবার চেষ্টা করছি।”

মৃণাল দত্ত বললেন, “আমি আমার কাজ করছি। তোমার কথার জবাব পরে দেব। এখন তুমি ছবিগুলো দেখে যাও।”

বিরক্ত অসন্তুষ্ট মনে তারাপদ অন্য ছবিগুলো দেখতে লাগল। মার ছবি দেখল, বলল। একটা মন্দিরের পাশে মা বাবা এবং আরও যেন দুজনকে দেখল। বলল, “মা বাবাকে চিনতে পারছি, আর কাউকে পারছি না।”

“তোমাকে পারছ না?”

“আমাকে? আমিও আছি নাকি? কোথায়?” তারাপদ বেশ কৌতূহল বোধ করে নিজেকে খুঁজতে লাগল। দুটো বাচ্চার একটা নিশ্চয় সে। কিন্তু কোটা? ছেলেবেলার তারাপদ কি তালপাতার সেপাই ছিল? কাঠির মতন হাত পা, ঢলঢলে হাফ প্যান্ট, একটা শার্ট গায়ে, খোঁচা খোঁচা চুল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই ছেলেটাই কি তারাপদ নিজে? অন্যটা কে তা হলে?

তারাপদ ছবির ওপর আঙুল দিয়ে বলল, “আমি বোধ হয় এইটে...।”

মৃণাল দত্ত একটু যেন হাসলেন। বললেন, “ঠিক আছে, পরের ছবিগুলো দেখো।”

তারাপদ পরের ছবিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ছবি দেখে কেমন থমকে গিয়ে বলল, “এ আমার বোন পরী...।”

"ওটা কত নম্বরের ছবি?"

"উনিশ।"

"তোমার বোনের কথা মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ । দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ঝাঁকড়া চুল, ফরসা রঙ, একটু একটু কথা বলতে শিখেছিল, দা—দ–দা, মা—ম–মা বলতে পারত জলকে বলত দল…। বছর দুই বয়সও হয়নি, পরী মারা যায়।"

"কেমন করে?"

"সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে মাথায় লেগেছিল। তাতেই মারা গেল।"

মৃণাল দত্ত কিছু বললেন না। নিবন্ত চুরুটটা ছাইদান থেকে আবার উঠিয়ে নিলেন।

তারাপদ অন্যমনস্ক বিষণ্ণ মুখে বসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর আবার পাতা ওলটাতে লাগল। ওলটাতে ওলটাতে দেখল কী আশ্চর্য, তার স্কুলে পড়ার সময়কার ছবি, মা-র সঙ্গে আরও একটা ছবি, তার কৈশোর ও যৌবনকালের ছবিও এই অ্যালবামে রয়েছে। কেমন করে থাকল? বি এ পাশ করার পর সে কনভোকেশনে গিয়েছিল–একটা ছবিও তুলিয়েছিল অন্যদের মতন জোব্বা পরে, সেই ছবিও রয়েছে। অদ্ভুত তো!…একেবারে শেষের দিকে তারাপদ সাধুমামার ছবি দেখতে পেল। দেখে অবাক হয়ে গেল। সাধুমামা তাদের একেবারে নিজের কেউ নয়, মার কোন দুর সম্পর্কের আত্মীয়, আবার বাবারও যেন কেমন একটা ভাইটাই হত । তবু মার সম্পর্কেই তাঁকে মামা বলা হত। একটু খেপাগোছের লোক। হঠাৎ কলকাতায় তাদের বাড়িতে আসত, আবার চলে যেত, কোথায় যে থাকত সাধুমামা, কেউ জোর করে বলতে পারবে না। কখনো বর্ধমানে কখনো রানীগঞ্জে, কখনো দেওঘরে। সাধুসন্ন্যাসী আশ্রম-টাশ্রম করে বেড়াত খুব। মা মারা যাবর পরও সাধুমামা দু-এক বছর তারাপদর খোঁজখবর করেছে, থেকেছে এক-আধ রাত। বটুকবাবুর মেসে তারাপদ আস্তানা গাড়ার পরও সাধুমামা দেখা দিয়ে গিয়েছে। আজ বছর দেড় দুই অবশ্য আর আসেনি। তারাপদ ভাবত, সাধুমামা মারা গেছে।

সাধুমামার কথা ভাবতে গিয়েই তারাপদর আচমকা খেয়াল হল, আরেসাধুমামাই তো তার কনভোকেশনের একটা ছবি জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। ওই ছবি কি সেইটে? নিশ্চয়ই তাই।

তারাপদ চোখ তুলে বলল, "আমি এখন বুঝতে পারছি।"

"কী বুঝছ?"

"সাধুমামা আমাদের অনেক ছবি জোগাড় করে এই অ্যালবামে রেখেছে।"

"না", মৃণাল দত্ত মাথা নাড়লেন। "সাধুমামার অ্যালবাম এটা নয়। এটা ভুজঙ্গবাবুর। তোমাদের সাধুমামা অনেক ছবি ভুজঙ্গবাবুকে দিয়েছে, তঅমাদের ছবি–বিশেষ করে তোমার বাবা মারা যাবার পর তোমাদের সমস্ত ছবিই সাধুমামা ভুজঙ্গবাবুকে জোগাড় করে দিয়েছে।"

"শুধু ছবি কেন, আমাদের সমস্ত খবরই বোধ হয় সাধুমামা দিত?"

"হ্যাঁ।"

"আমার ঠিকানাও সাধুমামা দিয়েছিল!"

"না দিলে ভুজঙ্গবাবু কোথায় পাবেন?"

"আমি যদি বটুকবাবুর মেসে না থাকতাম–তা হলে কী হত?"

"তোমার খোঁজ করার চেষ্টা করতাম, কাগজে নোটিশ দিতাম। তাতেও যদি তোমার খোঁজ না পাওয়া যেত–আমায় এই বোঝা মাথায় নিয়ে বসে থাকতে। হত তোমার অপেক্ষায়।"

তারাপদ অ্যালবামটা বন্ধ করে দিল। এতক্ষণে তার যেন স্বস্তি লাগছে। বড় করে নিশ্বাস ফেলল।

মৃণাল দত্ত বললেন, "এবার আমায় দু-একটা ছোটখাট কথা বলো! তোমার শরীরে কোনো আইডেন্টিফিকেশান মার্ক আছে? কোনো কাটাকুটি, জড়ল, তিল–?"

তারাপদ নিজের হাত দেখতে দেখতে বলল, "তিল তো অনেক আছে, বাঁ পায়ে হাঁটুর তলায় কাটা আছে।"

"আর কিছু?"

"জানি না, লক্ষ করিনি।"

মৃণাল দত্ত হাতের কাগজ টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন, "তোমার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের কাছটা জোড়া নয়? আরও আঙুলের মতন আছে। পাঁচের জায়গায় ছয় বলতে পারো। ঠিক কি না? দেখি?"

তারাপদ স্বীকার করল, হ্যাঁ, তার বাঁ পায়ের আঙুল ওই রকমই। মৃণাল দত্তকে দেখাল।

মৃণাল দত্ত এবার যেন নিশ্চিন্ত। চুরুট নিবে গিয়েছিল। আবার ধরালেন। বললেন, "আর একটু চা খাবে?"

তারাপদ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মাথা নেড়ে বলল, "খাব।"

মৃণাল দত্ত টেবিলের পাশে লাগানো কলিং বেলের বোতামে হাত দিলেন। একটু পরেই সেই বুড়োমতন লোকটি ঘরে এল।

মৃণাল দত্ত বললেন, "দু কাপ চাপ নিয়ে এসো, আর বাবুর বন্ধুকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও।"

লোকটি চলে গেল।

মৃণাল দত্ত এবার মোলায়েম গলায় বললেন, "প্রথম শর্তটা মিটল। তুমি যে আসল তারাপদ সবার আগে আমার সেটা দেখা দরকার ছিল। তোমার শরীরের চিহ্ন ছাড়াও–ওই ছবিগুলো যা তুমি চিনতে পেরেছ–তাতেও প্রমাণ হয় তুমি তারাপদই। আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।"

“তোমার এই বন্ধুটি কি সত্যিই পুরনো বন্ধু?” মৃণাল দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

“আজ্ঞে হ্যাঁ।“

“বিশ্বাস করার মতন?”

“আজ্ঞে, ও আমার সবচেয়ে ইনটিমেট ।”

“ভাল। খুবই ভাল।” মৃণাল দত্ত আস্তে আস্তে চুরুটে টান দিলেন। খানিকটা যেন চিন্তিত।

চন্দন ঘরে এল। তারাপদর পাশে বসতে পারল না, নিজের পুরনো জায়গায় বসল। এখানে বসলে চোখ যেন নিজের থেকেই বেড়ালটার দিকে চলে যায়। চন্দন তাকাল। তাকিয়েই তার কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল। সামান্য যেন চমকেও উঠল। চন্দন যখন এ-ঘর ছেড়ে চলে যায় তখন ওই বেড়ালটার মুখ যে অবস্থায় ছিল-এখন যেন তার চেয়ে খানিকটা ঘুরে গিয়েছে। তখন, মানে তারাপদ আর সে যখন এই ঘরে এসে প্রথমে বসে, তখন বেড়ালটার মুখ তাদের দিকে ফেরানো ছিল, এখন ঘড়ির কাঁটার মতন ডানদিকে সরে গিয়েছে, বেড়ালটার মুখ বা চোখের সঙ্গে চন্দনের চোখাচুখি হচ্ছে না। আশ্চর্য ব্যাপার তো! চন্দন কি চোখে ভুল দেখছে? নাকি তারাপদ বেড়ালটা হাতে করে তুলে দেখেছিল, আবার নামিয়ে রাখার সময় ওই ভাবে বসিয়েছে? চন্দন কিছু বুঝতে পারল না। সে বেড়ালটার দিকে নজর রেখে বসে থাকল।

ততক্ষণে তারাপদ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুকে দেখে নিয়েছে।

মৃণাল দত্ত তারাপদকে বললেন, “আমি তোমায় গোড়ার কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। তোমার শুনে রাখা ভাল। তোমার পিসেমশাই ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে। আমি একবার পুজোর ছুটিতে ফ্যামিলি নিয়ে মধুপুরে চেঞ্জে গিয়েছিলাম। ভুজঙ্গবাবুও গিয়েছিলেন কয়েক দিনের জন্যে। পাশাপাশি বাড়ি। আলাপ হয়েছিল সে-সময়। তারপর আমি কলকাতায় ফিরে আসি। ভুজঙ্গবাবু মাঝে মাঝে আমায় চিঠি লিখতেন। আমিও জবাব দিতাম। তারপর তিনি আমায় তাঁর সলিসিটার হবার অনুরোধ জানান। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হব না। পরে তাঁর চিঠির তাগাদায় রাজি হয়ে যাই। এবার পুজোর সময়, লক্ষ্মী পূর্ণিমার পর ভুজঙ্গবাবু একদিনের জন্যে কলকাতায় আসেন, আর এই সমস্ত কাগজপত্র ছবি দিয়ে যান। কিছু সই-সাবুদের ব্যাপার ছিল–ছুটির আগেই আমি তা সেরে রেখেছিলাম, তিনি সেগুলো সইটই করে দেন। তখন আমায় বলেছিলেন, তাঁর চিঠি পাবার পর আমি যেন তোমার খোঁজখবরের চেষ্টা করি। আজ দিন সাতেক হল আমি তাঁর দুটো চিঠি পেয়েছি। দুটো চিঠিতেই তিনি তোমার কথা লিখেছেন; লিখেছেন তোমায় তাড়াতাড়ি একবার তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে।”

তারাপদ মন দিয়ে কথা শুনছিল। বলল, “তিনি কোথায় থাকেন আমি তো । জানি না!”

“তোমার জানবার কথাও নয়, মৃণালবাবু বললেন। “তুমি কোনোদিন মধুপুর দেওঘরের দিকে গিয়েছ?”

“আজ্ঞে না ।”

“মধুপুর আর যশিডির মধ্যে একটা স্টেশন আছে, স্টেশনটার নাম শংকরপুর। সেখানে নেমে মাইল তিন-চার ভেতরে গেলে ভুজঙ্গবাবুর বাড়ি পাবে। জায়গাটাকে মাঠমোকাম

বলে।”

বুড়োমতন লোকটি আবার চা নিয়ে এল ট্রে-তে করে। তারাপদ আর । চন্দনকে দিল। চন্দন যত না মৃণাল দত্তর কথা শুনছে তার চেয়ে বেশি। মনোযোগ দিয়ে কালো বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে আছে। আপাতত কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

এত রকম ঝঞ্ঝাটের পর গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তারাপদর আরাম লাগছিল।

মৃণাল দত্ত সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, “তুমি তো ভুজঙ্গবাবুকে কখনো দেখোনি, তাঁর বিষয়ে কিছু জানো না।”

“না,” তারাপদ মাথা নাড়ল।

মৃণাল দত্ত কী যেন ভাবছিলেন, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেন, “আমি দেখেছি—ওঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখলেও তোমার ভয় করত। আর এখন, কী অবস্থায় তুমি তাঁকে দেখবে আমি বলতে পারছি না।”

তারাপদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। “ভয় করবে? কেন?”

“এক একজন মানুষের চেহারা দেখলে কেমন একটা লাগে না? তেমার কখনো লাগেনি?”

তারাপদ মনে করবার চেষ্টা করল। প্রথমেই তার মনে পড়ল, মদন দত্ত লেনের সেই মুদিঅলাকে; বীভৎস চেহারা, পাড়ার ছেলেরা তাকে ফ্র্যাংকেস্টাইন বলত; মনে পড়ল ছেলেবেলায় একবার সে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে একটা বাবরি চুলঅলা, কালো কুচকুচে চেহারার ষণ্ডা লোক দেখেছিল, তার চোখ দুটো লাল টকটকে। কে যেন বলেছিল, লোকটা জল্লাদ, জেলে জেলে ফাঁসি দিয়ে বেড়ায়। সেই লোকটাকে দেখে তারাপদর ভীষণ ভয় হয়েছিল। তারপর আরও কাউকে কাউকে দেখেছে যাদের চেহারার কোনো না কোনো অস্বাভাবিকতা, কোনো অঙ্গহানির জন্যে সত্যিই বড় বিশ্রী দেখতে লাগে ।

তারাপদ বলল, “হ্যাঁ, তা লাগে।”

“ভুজঙ্গবাবুকেও দেখতে তোমার ভাল লাগবে না–” মৃণাল দত্ত বললেন, “অনেকটা যেন কাপালিকের মতন দেখতে। আমি নিজে অবশ্য কোনো কাপালিক কখনো দেখিনি– বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা’ সিনেমায় একবার কাপালিক দেখেছি, সে তো সিনেমার কাপালিক। ভুজঙ্গবাবুকে আরও ভয়ঙ্কর দেখতে। তাঁর একটা ছবি আমার কাছে আছে তিনিই দিয়েছেন, তোমায় দেখাচ্ছি।” বলে মৃণালবাবু টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাগজপত্র থেকে একটা খাম বের করলেন। ফটো রাখার হলুদ খাম। ভুজঙ্গবাবুর ছবি বের করে তারাপদর দিকে এগিয়ে দিলেন।

চন্দনের কান তখন মৃণাল দত্তর কথায়। সে কালো বেড়ালটার দিকে তাকাতে ভুলে গেল। তারাপদ ছবিটা হাতে নিল। মাঝারি ছবি। ভুজঙ্গবাবুর বুক পর্যন্ত দেখা যায়। ছবি দেখে তারাপদ স্তম্ভিত। বিশাল মুখ, খড়ের মতন লম্বা নাক, বড় বড় চোখ, চওড়া কান। চোখ দুটো এত তীব্র, এমন অস্বাভাবিক রুক্ষ যে তাকালেই মনে হয়, মানুষটা তোমার সব কিছু দেখে নিচ্ছে। চোখের মধ্যে কেমন এক নিষ্ঠুরতা। মানুষের ভুরু যে কত চওড়া হতে পারে ভুজঙ্গভূষণের মুখ না দেখলে বোঝা মুশকিল। পুরু ঠোঁট, সামান্য দাঁত দেখা যাচ্ছে, ধারালো শক্ত ঝকঝকে দাঁত। ভুজঙ্গবাবুর উঁচু চওড়া কপাল, নাক, চোখ আর ঠোঁটের সামান্য অংশ

ছাড়া বাস্তবিক মুখের আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। মুখে ঘন দাড়ি, সন্ন্যাসীদের মতন, মাথার চুল পিঠ পর্যন্ত বাবরি করা। দাড়ি আর চুল কোনোটাই পরিপাটি নয়, উস্কোখুস্কো, ঝড়ে-ওড়া চুলের মতন এলোমেলো।

তারাপদ ভাবতে পারছিল না, এই লোকটা কী করে তার পিসেমশাই হয়? এ তো কোনো ভয়ংকর তান্ত্রিক হতে পারে। কাপালিক হওয়াও সম্ভব। ১

মৃণাল দত্ত বললেন, "ভুজঙ্গবাবুর কাছে তোমায় যেতে হবে। তিনি তোমায় নিজের চোখে দেখতে চান।"

"কেন?"

"তিনি লিখেছেন, আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। কীভাবে আগুন লেগে তাঁর মুখ পুড়ে গেছে। ওষুধপত্র লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে কোনোরকমে বেঁচে আছেন। মারা যাবার আগে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। এ হয়ত তাঁর দুর্বলতা। তা ছাড়া, তুমি ছাড়া তাঁর আর কোনো জীবিত আত্মীয় নেই, হয়ত সেই জন্যেই নিজের ওয়ারিসানকে একবার স্বচক্ষে দেখতে চান।"

তারাপদ চুপ করে থাকল। ভুজঙ্গভূষণের কাছে যেতে তার ইচ্ছে করছিল না, আবার যখনই দেড় দু'লাখ টাকার সম্পত্তির মনে আসছিল–তখন সেটা হারাবার কথাও ভাবতে পারছিল না।

মৃণাল দত্ত যেন তারাপদর মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, "ভুজঙ্গবাবুর সঙ্গে যদি তোমার দেখা না হয় তা হলে দ্বিতীয় শর্ত মতন তুমি তাঁর সম্পত্তির কানাকড়িও পাবে না।"

তারাপদর মনে হল, সে যেন মনে মনে কিসের স্বপ্ন দেখছিল, হঠাৎ তা ভেঙে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃণালবাবু আবার বললেন, "তোমায় আমার আপাতত আর কিছু বলার নেই। যদি ভুজঙ্গবাবুর কাছে যেতে চাও, আমি তোমায় দু-একটা জিনিস দেব। সেটা তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি জিনিসগুলো পেয়ে আমায় জানাবেন–তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে।"

"কিন্তু আমি গিয়ে যদি দেখি তিনি মারা গেছেন?"

"মারা যাবেন বলে মনে হয় না। দু-চার দিনের মধ্যে বোধ হয় নয়। নিজের মৃত্যুর দিন নাকি তাঁর জানা। সামনের অমাবস্যা পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন লিখেছেন। মানে আরও দিন আষ্টেক । আজ সপ্তমী-টপ্তমী হবে।"

তারাপদ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকল।

"যদি যেতে চাও কাল সকালে একবার তোমায় এখানে আসতে হবে। আমি সব তৈরি করে রাখব।"

তারাপদর মুখে কথা ফুটল না।

ঘর ছেড়ে চলে আসার মুখে চন্দন আবার কালো বেড়ালটার দিকে তাকাল। তাকিয়ে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। বেড়ালের মুখ মৃণাল দত্তর দিকে ঘুরে গিয়েছে প্রায়। চন্দন তারাপদর

হাতের কাছটা জোরে চেপে ধরল।
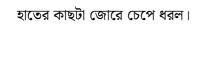
তিন

টাইম টেল-এ গাড়ি ছাড়ার সময় রাত প্রায় দশটা; ন'টার আগেই তারাপদরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেল। হাতে খানিকটা সময় থাকা ভাল, টিকিট কাটা, আগেভাগে বসবার জায়গা দখল করা । সারা রাত এই শীতে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া যাবে না, ঘুমোতে না পারুক—অন্তত ভাল করে বসার জায়গা দরকার।

তারাপদ নিজে টিকিট কাটতে গেল না। চন্দনকে পাঠিয়ে দিল। সারাটা দিন আজ তারাপদর বড় ছুটোছুটি গিয়েছে। কাল সারা রাত তেমন একটা ঘুমোতেই পারল না, মাথার মধ্যে মৃণাল দত্ত আর ভুজঙ্গভূষণ। ওরই মধ্যে সাধুমামার মুখ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে, মা বাবার কথা মনে পড়েছে, পরীর কথাও মনে পড়ল। পরীর মুখ তো মনেই ছিল না তারাপদর, ছবি দেখে মনে পড়ল। ওই একটিমাত্র বোন, আর তো কেউ ছিল না তার, আহা সে বেচারিও থাকল না। হাজার চিন্তায় ঘুম হল না। তার ওপর ওই ব্যাপারটাও তাকে বেশ অবাক করে তুলেছিল। মৃণালবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়েই চন্দন সেই কালো বেড়ালটার কথা বলল। বেড়ালটা নাকি ঘড়ির কাঁটার মতন ঘুরে যায়। চন্দন স্বচক্ষে দেখেছে, তারাপদরা যখন মৃণালবাবুর ঘরে গিয়ে বসে তখন তার মুখ ছিল তাদের দিকে, আর যখন চলে আসে তখন বেড়ালটার মুখ মৃণাল দত্তর দিকে। এ কি করে সম্ভব? একটা ভুয়ো, নির্জীব, পুতুল ধরনের বেড়াল কেমন করে মুখ ঘোরাবে? চন্দন নিশ্চয় ভুল দেখেছে।

চন্দন জোর দিয়ে বলল, না, সে ভুল দেখেনি। ঠিকই দেখেছে।

কেমন করে এটা হয় তারাপদ বুঝতে পারল না। ভূতের ব্যাপার নাকি? ম্যাজিক?

ভুজঙ্গভূষণের পুরো ব্যাপাটাই ভূতুড়ে মনে হচ্ছে, ভাবতে গেলে সেরকমই মনে হয় নাকি? কোথায় তারাপদ আর কোথায় ভুজঙ্গভূষণ—চেনা না জানা না—কস্মিনকালেও যারা পরস্পরের মুখ পর্যন্ত দেখল না, তারা কেমন করে। আজ একজন অন্যজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! ভুজঙ্গভূষণ খুঁজছে তারাপদকে, আর তারাপদ খুঁজে বেড়াচ্ছে ভুজঙ্গভূষণের দেড় দুলাখ টাকার সম্পত্তি! সত্যিই ব্যাপারটা ভুতুড়ে।

ব্যাপার ভুতুড়ে হোক আর যাই হোক, সকালে ঘুম ভেকে উঠে তারাপদকে মৃণালবাবুর কাছে ছুটতেই হল। দেড় দু'লাখ টাকার লোভে কি? হতে পারে। আবার টাকার লোভ ছাড়াও কেমন একটা রহস্যের টানও রয়েছে। সত্যি সত্যি ওই ভুজঙ্গভূষণ কে? কেনই বা তাঁর ওই রকম কাপালিক-মাকা চেহারা? কী করতেন তিনি এতকাল? কেন কোনদিন তারাপদদের খোঁজখবর নেনি, অথচ সাধুমামাকে দিয়ে তাদের পরিবারের—মানে তারাপদর মা, বাবা, পরী সকলের ছবি জোগাড় করে নিয়েছেন! কী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল?

হাজার রকম 'কেন'র কোনো জবাব যেমন পাওয়া যাচ্ছে না—সেইরকম। বোঝা যাচ্ছে না ভুজঙ্গভূষণ কী করে জানতে পারলেন যে সামনের অমাবস্যা পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন? ভদ্রলোকের কি ইচ্ছামৃত্যু? কে জানে বাবা! এত রকম অবাক হবার ব্যাপার যখন রয়েছে তখন বেড়ালটার মুখ ঘোরানোও আর এমন কি আশ্চর্যের! তবে, ওই কালো বেড়ালটা তো ছিল, মৃণাল দত্তর ঘরে। তা হলে? মৃণাল দত্তও কি ভুজঙ্গভূষণের ছোঁয়া পেয়েছেন?

সকালে মৃণাল দত্তকে একবার কালো বেড়ালটার কথা জিজ্ঞেস করলে হত। এসব কথা

জিজ্ঞেস করতে লজ্জাও তত করে। কিন্তু সে সুযোগই হল না। পুরনো ঘরে মৃণাল দত্ত তারাপদকে আর বসাননি। বাইরের বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে তাঁর দরকারি কাগজপত্র এনে দিলেন। যেন তিনি জানতেন তারাপদ ঠিকই আসবে, রাত পোহালেই এসে হাজির হবে। সমস্ত তৈরি করে রেখেছিলেন। সিলমোহর করা একটা চিঠি, সামান্য ভারী মতন একটা প্যাকেট, রেজিস্ট্রি করা পার্শেলের মতন চেহারা সেটার চারপাশে গালা দিয়ে করা, মোহরের ছাপ।

সেইসব জিনিস নিয়ে তারাপদ এল চন্দনের মেডিক্যাল হোস্টেলে। চন্দনকে বলল, "চাঁদু তোকে সঙ্গে যেতে হবে ।"

চন্দন প্রথমটায় রাজি হচ্ছিল না; তার হাসপাতাল। আবার পুরো ব্যাপারটাই এমন গোলমেলে যে একলা তারাপদকে ছেড়ে দিতে তার ভাল লাগছিল না। তারাপদ কোনো কালেই সাহসী নয়, বরং ভিতু ধরনের; তার শরীর স্বাস্থ্য ততটা মজবুত নয়; নিরীহ ভালোমানুষ গোছের ছেলে ও, ভিড়ের ভয়ে কোনোদিন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের লিগ বা শিল্ডের খেলা পর্যন্ত দেখতে গেল না। চন্দন কতবার বলেছে, চল্ না-আমি তো রয়েছি। তারাপদ মাথা নেড়েছে আর বলেছে, থাক ভাই, আমার মাঠে গিয়ে দরকার নেই, রিলে শুনলেই আমার খেলা দেখা হয়ে যাবে।

সেই তারাপদকে একলা একলা কী করে ছেড়ে দেয় চন্দন! তারাপদর মা যখন মারা যায় চন্দন শ্মশানে গিয়েছিল, তার মনে আছে সেদিন বারবার তারাপদ শুধু চন্দনকেই আঁকড়ে ধরেছিল আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ।

অনেক রকম গবেষণার পর ঠিক হল, চন্দন হাসপাতাল থেকে কয়েক দিনের ছুটি নেবে, বললবাবার অসুখ। কথাটা মিথ্যে হলেও করার কিছু নেই, ছুটির যখন দরকার তখন বড় কিছু একটা না বললে ছুটি দেবে কেন?

চন্দন রাজি হয়ে যাবার পর তারাপদ বটুকবাবুর মেসে ফিরল। স্নান খাওয়া সেরে বেরুলো কিছু টাকা পয়সা জোগাড়ের ধান্ধায়। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে যা পায় জুটিয়ে অন্তত একশো সোয়া শো টাকা তো হাতে রাখতেই হবে।

দুপুরের পর তারাপদ মেসে ফিরল। বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারপর গোছগাছ শুরু করল।

সন্ধের গোড়ায় গেল চন্দনের হোস্টেলে। চন্দন প্রায় তৈরি। তারপর দুই বন্ধু মিলে জয় মা বলে বেরিয়ে পড়েছে। দেখা যাক কপালে কী আছে!

চন্দন টিকিট কেটে ফিরে এসে বলল, "নে, চল... । ননম্বরে গাড়ি দেবে।

জিনিসপত্র তেমন কিছু নেই তাদের, দুজনের দুটো কিট ব্যাগ, চন্দন একটা কম্বল নিয়েছে হাতে ঝুলিয়ে, রাত্রে শীতের হাত থেকে বাঁচতে হবে। তারাপদর কম্বল নেই, সে একটা তুষের পুরনো চাদর আর বঙ্কিমদার হনুমান টুপিটা নিয়ে নিয়েছে সঙ্গে করে। মেসে কেউ জানে না–তারাপদ কোথায় যাচ্ছে।

তারাপদ শুধু বলেছে, একটু বাইরে যাচ্ছি এক বন্ধুর সঙ্গে, দরকার আছে।

প্লাটফর্মে ঢুকে তারাপদরা দেখল, ভিড় ভীষণ একটা কিছু নয়, মোটামুটি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন; তায় আবার শীতকাল, হয়ত তাই ভিড়টা কমই।

একটু পরেই প্লাটফর্মে গাড়ি দিয়ে দিল। চন্দন বাহাদুর ছেলে। গাড়ি প্লাটফর্মে ঢুকতে না ঢুকতেই কী-এক বিচিত্র কায়দায় সে চলন্ত ট্রেনের হ্যাঁন্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল ।

গাড়ি দাঁড়াবার পর তারাপদ খুঁজে খুঁজে চন্দনকে বের করে নিল। চমৎকার জায়গা জুটিয়ে কম্বল বিছিয়ে ফেলেছে।

গাড়িতে উঠে তারাপদ বলল, "তোর দৌড়বার কী ছিল? ভিড় তেমন নেই।"

চন্দন বলল, "দেখতেই পাবি। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে আসুক। নে বসে পড়। এদিকে আয়-জায়গা নিয়ে বস্–চাদরটা বিছিয়ে দে; শোবার জায়গা ছাড়বি না।"

কি ব্যাগ মাথার কাছে রেখে একেবারে কোণের দিকে মুখোমুখি দুই বন্ধু কম্বল আর চাদর পেতে ফেলল। কামরায় লোক উঠছে, কুলি উঠছে, আবার নেমেও যাচ্ছে, মালপত্র রাখার হইচই।

চন্দন নিজের জায়গায় বসে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। "তোর এই মালগাড়ি কাল নটা দশটার সময় শংকরপুর পৌঁছবে।"

গাড়িটা অবশ্য প্যাসেঞ্জার ট্রেন, মালগাড়িরই যমজ-ভাই। টিকির টিকির করে যাবে, হাজারবার দাঁড়াবে। অন্য কোনো গাড়িতে যাওয়া চলত, কিন্তু সারাদিন এত ছুটোছুটি করতে হয়েছে তারাপদকে যে সে-সুযোগ তার হয়নি। একটা এক্সপ্রেস গাড়ি ছিল, সেটা শংকরপুরে দাঁড়াত না।

ততক্ষণে দু বন্ধু মিলে সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছে। কামরায় তোক বাড়ছে, দেখতে দেখতে বেশ ভিড় হয়ে গেল। প্লাটফর্মে আরও যাত্রী এসে পৌঁছচ্ছে। তারাপদদের কামরায় এক দঙ্গল বেহারি উঠেছে, দু পাঁচজন বাঙালিও।

এমন সময় এক অদ্ভুত ধরনের ভদ্রলোক এসে কামরায় উঠলেন। টিয়াপখির মতন নাক, তোবড়ানো গাল, গর্তে বসা চোখ। চেহারাটি রোগাসোগা, গায়ে সেই আদ্যিকালের অলেস্টার, মাথায় কাশ্মীরি টুপি ডান হাতে একটা সুটকেস ঝুলছে, বাঁ হাতে খয়েরি বালাপোশ । ভদ্রলোক এতই রোগা যে গায়ে অলেস্টার চাপিয়েও তাঁকে মোটা দেখাচ্ছে না। গলায় মোটা মাফলার জড়ানো।

চন্দন ভদ্রলোককে দেখে নিচু গলায় বলল, "ডিসপেপসিয়ার কেস রে তারা, টিপিক্যাল ডিসপেপটিক পেশেন্ট।"

ভদ্রলোক তারাপদদের দিকেই এগিয়ে এলেন। কাছে এসে এমন মুখ করে হাসলেন যেন কতই না চেনা তারাপদর, গঙ্গাচরণ মিত্তির লেনে রোজই দেখা হয়।

"কত দূর?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন হাসিমুখে। হাসবার সময় তাঁর। দাঁত দেখা গেল। এবড়োখেবড়ো কালচে দাঁত, পান-খাওয়া দাঁত যেন।

তারাপদ ভদ্রলোককে কোনোদিন দেখেনি। জবাবও দিল না কথার।

ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকার, সুটকেসটা বেঞ্চির তলায় রেখে বালাপোশটা বিছিয়ে নিলেন, তারাপদর চাদর সামান্য গুটিয়ে গেল। তাঁর চেনাচেনা হসি আর কথা : "এই ট্রেনটায় যত

ছিঁচকে চোরের উপদ্রব, বুঝলেন মশাই, চোখে পাতা দু দণ্ড বুজেছেন কি পুঁটলি-পাটলা সুটকেস ব্যাগ হাওয়া। ওই দরজার দিকটায় তাই গেলাম না।...ওদিকটায় একটু পরেই দেখবেন কী হয়-ছিলিম চলবে। সে কী দৃর্গন্ধ।! গোয়ালাগুলো ব্যোম ভেলার জাত। গাঁজাই ওদের সর্বনাশ করল। দেখি স্যার, আপনার পা-টা একটু সরান–সুটকেসটাকে প্লেস করে দি আরও একটু সেফ সাইডে।“

চন্দন হেসে ফেলেছিল। সামলে নিল। ভদ্রলোক এবার গোছগাছ সেরে তারাপদর পাশে বসলেন।

গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে আসছিল। প্লাটফরমের কলরব কমে আসছে যেন। তারাপদদের কামরা থেকে কিছু বেহারি লোকজন নেমে গেল।

ভদ্রলোক ততক্ষণে পান-জরদা মুখে পুরেছেন। “আপনারা কদুর যাবেন স্যার?” ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন। তারাপদ কিছু বলার আগেই চন্দন বলল, “মধুপুর-টধুপুরের দিকে।”

“মধুপুর? কোথায়? কোন দিকটায়?”

“আপনি মধুপুরে থাকেন?”

“না স্যার, আমি অরিজিন্যালি ভাগলপুরের, তারপর থেকেছি জামসেদপুরে, শেষে ইছাপুরেও কিছুদিন ছিলাম, এখন আর কোনো পুরে থাকি না, টুরে টুরে দিন কেটে যায়।”

তারাপদ হেসে ফেলল। চন্দনও।

“আমার স্যার কতকগুলো বদ দোষ আছে,” পান চিবোতে চিবোতে ভদ্রলোক বললেন, “আমি হাসিঠাট্টা করতে ভালবাসি। আমার আপন-পর নেই। ভেরি ফ্র্যাংক...। একটা কথা স্যার আগেই বলে নি, আমার মুখ থেকে হরদম ইংলিশ বেরোয়, নো গ্রামার, কিছু মনে করবেন না। আমার বাবাকে একজন অ্যাংলো ঘুষি মেরে নাক ভেঙে দিয়েছিল, তখন থেকেই আমার ওই ভাষাটার ওপর রাগ। অ্যাংলোরা হাফ ইংলিশ বলে, তাতেই আমার বাবার নাক চলে গেল, ফুল ইংলিশ যারা বলে তাদের ঘুষি খেলে তো আমার বাবার ফেসই পালটে যেত। বলুন ঠিক কি না! আমি তখন থেকে রিভেজ নিতে শুরু করেছি ভাষাটার ওপর, যা মুখে আসে বলব–তুই আমার কাঁচকলা করবি। তোর ভাষা কি আমার মার না বাবার ভাষা!”

তারাপদরা এবার জোরে হেসে উঠল।

গাড়ি ছাড়ল। গাড়ি ছাড়ার সময় যেমন হয়, দু-একজন নেমে পড়ল, ছুটতে ছুটতে কে এজন পা-দানিতে উঠে পড়ল, প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে কেউ কেউ হাত নাড়ছে, একদল দেহাতী গোছের মানুষ ‘গঙ্গা মাই কি জয়’ বলে চেঁচিয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে গাড়িটা প্লাটফর্মের বাইরে আসতেই শীতের হাওয়া এসে ঢুকল জানলা দিয়ে।

চন্দন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল, এবার ভেতরে মুখ ফেরাল।

চন্দন বলল, “আপনার নামটা কী স্যার?”

“কিঙ্করকিশোর রায়, দেড়গজী নাম স্যার, ছোট করে লোকে বলে কিকিরা দি গ্রেট।“

জোরে হেসে উঠে চন্দন বলল, “আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর পর আর কোনো গ্রেট দেখিনি স্যার, আপনাকে দেখলাম।”

কিকিরা খকখক শব্দ করে হেসে উঠলেন। অদ্ভুত সে শব্দ। তারাপদও হেসে উঠল। ঠাট্টা করে চন্দনকে বলল, “তুই তা হলে আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে দেখেছিস।”

“ছবি দেখেছি”, চন্দন রসিকতা করে বলল।

কিকিরা হাসতে হাসতে বললেন, “এবার জ্যান্ত দেখুন, লিভিং গ্রেট।”

তারাপদ জিজ্ঞেস করলে, “আপনি কী করেন?”

কিকিরা অলেস্টারের গলার দিকে বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, “আমার করার কিছু ঠিক নেই, স্যার। কখনো ছুরি-কাঁচির এজেন্ট, কখনো খোস পাঁচড়ার মলমের, কখনো অম্লশূলের ওষুধ বেচে আসি, কখনো আবার অন্য কিছু–যা হাতের কাছে জুটে যায়। আমার নেচারটা অস্থির গোছের। মেজাজে না বলে আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলি না। লাস্ট মাস্থে আমি একটা নতুন কোম্পানির স্নো ক্রিম পাউডারের রিপ্রেজেনটেটিভ ছিলাম । মালিক বেটা ছ্যাচড়া, আমার সঙ্গে বনলো না, ছেড়ে দিলাম। দিয়ে এখন একটা কোম্পানির কাঁচি, খুর, ক্লিপের এজেন্ট হয়ে গিয়েছি। হাওড়ায় কারখানা খুলেছেন ভদ্রলোক বেশ ভাল খুর তৈরি করছে স্যার । আমার সুটকেসে স্যাম্পল আছে। কাল সকালে দেখাব।”

চন্দন হাত নেড়ে বলল, “থাক্ স্যার, খুব আর দেখাবেন না, খুর দেখলেই আমার ভয় করে।”

“ভয়ের কিছু নেই, স্যার। ঠিক মতন টানতে পারলে মাখনের মতন গাল নরম থাকবে। বেকায়দায় টানলে অবশ্য গলা যাবে…” বলে কিকিরা তারাপদর দিকে তাকিয়ে খখক্ শব্দ করে হাসলেন। তারপর নিজেই বললেন, “সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আমি আসলে ম্যাজিশিয়ান ছিলাম। গণপতিবাবু আমার গুরুর গুরু। আমার সাক্ষাৎ গুরু বড় একটা কলকাতায় আসতেন না। তাঁর ফিল্ড ছিল পাটনা, মজঃফরপুর, জামালপুর; ওদিকে বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা–এইসব। আমার গুরু অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা জানতেন। ইন্ডিয়ান ট্রিক বলে তাঁর একটা খেলা ছিল–তাতে তিনি স্টেজের ওপর একটা মেয়ের হাত-পা, মুখ সব আস্তে আস্তে অদৃশ্য করে দিতেন। তারপর আবার একে একে সব জোড়া লাগিয়ে দিতেন।”

চন্দন কৌতূহল বোধ করছিল, “বলেন কী!”

“মিথ্যে বলব না স্যার, গুরুর নামে কেউ মিথ্যে বলে না।” বলে কিকিরা হাত জোড় করে গুরুর উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। উঁচুদূরের লোক ছিলেন তিনি। একবার নাইট্রিক অ্যাসিড খাবার খেলা দেখাতে গিয়ে কী একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। তিনি মারা গেলেন। আমি পনেরো বছর বয়েস থেকে তাঁর চেলাগিরি করেছি। সাত আট বছর লেগে ছিলাম। আরও পাঁচ সাতটা বছর সঙ্গে থাকতে পারলে দেখতেন–কিকিরা কী না করত! জাপান, আমেরিকা, লন্ডন করে বেড়াতাম । কপাল স্যার, কপাল, ব্যাড লাক… ।”

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, “আপনি নিজেও কি ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন?”

“আমরা ম্যাজিকের বংশ স্যার। আমার ফাদারের অলটারনেট ফাদার বিরাট ম্যাজিশিয়ান ছিলেন।”

চন্দন অবাক হয়ে বলল, “ফাদারের অলটারনেট ফাদার কী জিনিস মশাই?”

কিকিরা মজার মুখ করে হেসে বললেন, “বাবার বাবাকে ছেড়ে তাঁর বাবা—-মানে প্রপিতামহ।”

তারাপদ আর চন্দন হেসে গড়িয়ে গেল।

কিকিরা বললেন, “ওটাই তো আমার অরিজিন্যাল ব্যবসা ছিল স্যার, বছর আট দশ কিকিরা ম্যাজিক মাস্টার হয়েছিল; তারপর আমার বাঁ হাতটায় কী যে হল–প্রথমে ব্যথা-ব্যথা করত, দেখতে দেখতে হাত শুকোতে লাগল, জোর একেবারে কমে গেল, সব সময় কাঁপত। হাত না থাকলে ম্যাজিশিয়ান হওয়া। যায় না। ম্যাজিশিয়ানের হাত, চোখ আর মুখ এই তিনটেই হল আসল। “

চন্দন কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কিকিরা তার বাঁ হাতটা দেখালেন। সত্যিই শুকনো মতন দেখতে। আঙুলগুলো বেঁকা বেঁকা, চামড়া কেমন পোড়া পোড়া রঙের। হাতটা কাঁপছিল। কোট থাকার জন্যে কব্জির ওপর দেখা গেল না ।

চন্দন বলল, “আপনি ডাক্তার-টাক্তার দেখাননি?”

“দেখিয়েছি, কত ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধ খেয়েছি, ইনজেকশান নিয়েছি, কিছু হয়নি। ডাক্তাররা ধরতে পারছে না। কেউ বলছে, নার্ভের রোগ;কেউ বলছে কোনো বিষাক্ত জিনিস থেকে হয়েছে, কেউ আবার অন্য কিছু বলছে–।”

তারাপদ চন্দনকে দেখিয়ে কিকিরাকে বলল, “ও হল ডাক্তার।“

চন্দন যেন সামান্য লজ্জা পেল। বলল, “না না, এখনো পুরো ডাক্তার হইনি, সবে পাশ করেছি।”

তারাপদ রগড় করে বলল, “চন্দন এখনও দশ বিশটা কেন, একটাও মানুষ মারেনি। কাঁচা হাত। দু-চার বছর আরও যাক তারপর ডাক্তার হবে।”

তিনজনেই হেসে উঠল।

হাসি-ঠাট্টার কথা বলতে বলতে রাত বাড়তে লাগল। গাড়ি মাঝে মাঝে থামছে, আবার চলছে। শীতের জন্যে জানলা সব বন্ধ। কামরার লোকজন কথাবার্তা বলতে বলতে ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসছে। দু-একজন ঘুমিয়েও পড়েছে। কিকিরা ততক্ষণে তারাপদদের নামধাম জেনে গিয়েছেন। শুধু জানতে পারেননি তারাপদরা ঠিক কোথায় যাচ্ছে। ওরা সেই যে বলেছিল মধুপুর-ধুপুর, তার বেশি আর কিছু বলেনি।

বর্ধমানের পর গোটা কামরাটাই যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

তারাপদর ঘুম পাচ্ছিল। হাই উঠছিল তার।

হাই তুলতে তুলতে চন্দন হঠাৎ কিকিরাকে বলল, “আপনি তো একজন এক্স-ম্যাজিশিয়ান আচ্ছা এই যে লোকে মন্ত্রটন্ত্রর কথা বলে, আপনি ওসব বিশ্বাস করেন?

মাথা নাড়লেন কিকিরা, “না, ম্যাজিক হল খেলা, তার সঙ্গে মন্ত্রটন্ত্রর কোনো সম্পর্ক নেই।

তবে আমি হিপ্নোটিজম, মেসম্যারিজম্ এ-সব বিশ্বাস করি । নিজে করেছি একসময়। আমাদের দেশে অনেকে যোগ অভ্যাস করে অনেকে কিছু করতে পারেন। আমার গুরু মাটির তলায় চাপা দেওয়া অবস্থায় দু-তিন ঘণ্টা থাকতে পারতেন।”

তারাপদ আর বসে থাকতে পারছিল না, বড় ঘুম পাচ্ছে। শুয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হতে হতে বলল, “আপনার দু-চারটে ম্যাজিক কাল সকালে উঠে দেখব।”

কিকিরা তারাপদকে দেখতে দেখতে হেসে বললেন, “কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, না এখনই দেখবেন?”

“এখন?”

কিকিরা যেন মজা করছেন এমন চোখমুখ করে বললেন, “একটা স্যাম্পল দেখিয়ে দিই, কী বলেন?” বলে কয়েক পলকের জন্যে চোখ বুজলেন, তারপর বললেন, “আপনি আপনারা মধুপুর যাচ্ছেন না। কোথায় যাচ্ছেন জানি না–তবে মধুপুর নয়, এমন কোনো জায়গায় যাচ্ছেন যার নামের প্রথমে ‘এস্’ অক্ষর আছে। রাইট? যার কাছে যাচ্ছেন তার নামের প্রথমে ‘বি’ অক্ষর থাকবে। রাইট?”

তারাপদ যেন চমকে উঠল। চন্দনও। দুজনেই হতভম্ব; অপলকে কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল, নিশ্বাস নিতেই যেন ভুলে গেছে ।

শেষে তারাপদ বলল, “আপনি–আপনি কে?”

কিকিরা খক খক্ করে বিচিত্র হাসি হেসে বললেন, “আমি কিকিরা দি গ্রেট, কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান।”

তারাপদ মাথায় পাশে তার কিট ব্যাগের দিকে তাকাল। ওই ব্যাগের মধ্যে ভুজঙ্গভূষণকে দেবার জন্যে সিলমোহর করা চিঠি আর প্যাকেট আছে একটা। খুব দরকারি জিনিস। মৃণাল দত্ত বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। ও দুটো যদি খোয়া যায় সর্বনাশ হবে। তারাপদ যেজন্য শংকরপুর যাচ্ছে তা ব্যর্থ হবে। এই কিকিরা লোকটা কি সেটা জানে? সে কি সমস্ত জেনেশুনে তারাপদদের পিছু ধরেছে? লোকটার উদ্দেশ্য কী? কোন মতলব নিয়ে সে তাদের সঙ্গী হয়েছে?

তারাপদ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। চন্দনও বিচলিত, বিমূঢ়।

চার

অনেকক্ষণ আর কেউ কোনো কথা বলল না। তারাপদ ভাল করে আর কিকিরার দিকে তাকাচ্ছিল না, তার সাহস নেই তাকাবার। ভীষণ সন্দেহ হচ্ছে। লোকটাকে। মুখে যতই হাসি থাক, মজার মজার কথা বলুক–তবু কিকিরা যে বড় রকমের ঘুঘু তাতে সন্দেহ কী।

আড়চোখে তাকিয়ে তারাপদ চন্দনকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। তার মুখের ভাব, চোখের সাবধানী দৃষ্টি বলছিল : চাঁদু, বি কেয়ারফুল; লোকটা ঘুঘু ।

চন্দন নিজেও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিকিরা যত বড় ম্যাজিশিয়ানই হোক, ওরা কোথায় যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে–এটা মুখ দেখে ঠাহর করতে কিছুতেই পারে না। অসম্ভব। থট রিডিং না কী যেন বলে একটা–কিকিরা কি সেই মনের কথা জানতে পারার খেলা দেখাল? বোগা। চন্দন ওসব বিশ্বাস করে না। তবে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, কিকিরা প্রচণ্ড ধূর্ত। সে কেমন কায়দা করে পুরো শংকরপুর, কিংবা সোজাসুজি ভুজঙ্গভূষণ না বলে রহস্যময় ভাবে বলল, প্রথমটা অক্ষর ‘এস’ আর ‘বি’। ও যে সবই জানে তাতে চন্দনের সন্দেহ হচ্ছিল না। অন্তত, কিকিরা নিশ্চয় জানে চন্দনরা শংকরপুরে যাচ্ছে, ভুজঙ্গভূষণের কাছে।

চন্দন চোখে চোখে তারাপদকে বোঝাবার চেষ্টা করল : সবই বুঝতে পারছি। সাবধান হতে হবে।

কিকিরা কিন্তু একই রকম হাসিমুখে তারাপদদের দেখছিলেন। বরং তাঁর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, কিকিরা এরকম একটা খেলা দেখাবার পর যেন তারাপদদের হাততালি আশা করেছিলেন, না পেয়ে একটু দুঃখবোধ করছেন।

চন্দন মনে মনে ভেবে দেখল, আর বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকা উচিত নয়। ওরা ভয় পেয়েছে কিকিরা সেটা বুঝে ফেলবে। বার দুই শুকনো কাশি কেশে তারাপদকে বলল, “অনেক রাত হয়ে গেল: তুই শুয়ে পড়। আমি জেগে আছি। ট্রেনে আমার ঘুম হয় না। “

তারাপদ ঘুমোবে কি, ঘুম তার মাথায় উঠে গেছে।

কিকিরাই যেন কী মনে করে বললেন, “বাস্তবিক স্যার, রাত হয়ে গেছে অনেক, বারোটায় বর্ধমান পেরিয়ে পেরিয়ে এসেছি। তা ধরুন এখন সাড়ে বাররা। শীতটাও জব্বর। এবার শোবার ব্যবস্থা করতে হয়। তবে একজনের জেগে থাকা উচিত, নয়ত এ-গাড়িতে যা চোরের উৎপাত, গা থেকে জামাকাপড়ও খুলে নিয়ে যায়।”

চন্দন একটু ঠাট্টার ছলেই বলল, “আপনার নিশ্চয় অম্বলের রোগ আছে, বয়েসও হয়েছে, আপনি শুয়ে পড়ন–আমি জেগে আছি।”

কিকিরা বললেন, “ঠিক ধরেছেন স্যার, আমার জুস বেশি হয়, রাত জাগলে বোতলের সোডার মতন হয়ে যায় পেট বুক। সে কী কষ্ট! যাকগে, আমি একবার বাথরুম ঘুরে এসে শুয়ে পড়ি, কী বলেন?”

বালাপোশটা হাত দিয়ে আবার একটু ঝেড়েঝুড়ে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন, বাথরুমে যাবেন।

তারাপদ যেন এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

কিকিরা ওপাশে বাথরুমের দিকে যেতেই নিচু গলায় তারাপদ বলল, “চাঁদু, লোকটা ঘোড়েল। ওর কোনো মতলব আছে।”

চন্দন বলল, “আমিও তাই ভাবছি। ম্যাজিক-ফ্যাজিক বাজে কথা।”

“কিকিরা কি আমাদের ফলো করছে?” তারাপদ জিজ্ঞেস করল।”

“তাই তো মনে হয়। কিন্তু কেন?”

তারাপদ দূরে বাথরুমের দিকে তাকাল। কিকিরা দরজা খুলে ঢুকে গেলেন।

তারাপদ বলল, “আমার ভুজঙ্গভূষণের নামে একটা সিল করা প্যাকেট, চিঠিঠি আছে, মৃণাল দত্ত দিয়েছেন। ওগুলো যতক্ষণ না ভুজঙ্গভূষণের হাতে দিতে পারছি ততক্ষণ আমার কোনো ক্লেম হচ্ছে না সম্পত্তির ওপর। “

“তা জানি,” চন্দন মাথা নাড়ল।” কিকিরা কি ওটা হাতাবার জন্যে এসেছে? তাতে ওর লাভ কী হবে? কিকিরা তো তারাপদ নয় যে, ওগুলো হাতিয়ে ভুজঙ্গভূষণের কাছে হাজির হলেই দেড় দুই লাখ টাকার সম্পত্তি পেয়ে যাবে। তা ছাড়া ওর মধ্যে কী আছে তাও তো আমরা জানি না।”

তারাপদ চিন্তায় পড়ে কেমন বিমর্ষ হয়ে আসছিল। বলল, “আমিও তো তাই ভাবছি।..আচ্ছা, তোর কি মনে হয়, কিকিরা মৃণাল দত্তর লোকর?”

“মানে?”

“মৃণাল দত্ত ওকে পাঠাননি তো? উনি ছাড়া আর তো কেউ জানে না আমরা শংকরপুরে ভুজঙ্গভূষণের কাছে যাচ্ছি।”

চন্দন বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবল। বলল, “তা ঠিক। তুই যখন সকালে মৃণাল দত্তর বাড়ি গিয়েছিলি তখন কাউকে দেখেছিস?”

“না”, মাথা নাড়ল তারাপদ।

“ঘরে কেউ ছিল না?”

“কালকের সেই বুড়োমতন লোকটি দু একবার এসেছিল।”

“তার চোখের সামনেই মৃণাল দত্ত তোকে এই এই সব দিয়েছেন?”

“হ্যাঁ।”

“গাড়ির কথা কিছু বলেছেন?”

“বলেছেন, রাত্রে দুটো গাড়ি আছে, একত্সপ্রেস শংকরপুরে থামে না।”

চন্দন কিছুই বুঝতে পারল না। মৃণাল দত্ত নিজেই তাঁর মক্কেলের জন্যে তারাপদর খোঁজ করছিলেন, তিনি যেচে তারাপদকে ভুজঙ্গভূষণের কাছে। পাঠাচ্ছেন, এটা তাঁর কর্তব্য। তবে কেন তিনি পেছনে লোক লাগাবেন? তা হলে কি ওই বুড়ো লোকটা, মৃণাল দত্তর বাড়ির কাজের লোকটা, আসলে অন্য কারও হাতের পুতুল। তাই যদি হয়, তবে ধরে নিতে হবে, ভুজঙ্গভূষণের সম্পত্তি যাতে তারাপদর হাতে না যায় সেজন্যে ফন্দি আঁটার লোক আছে। তারাই কিকিরাকে লাগিয়েছে। কিন্তু এ-সব ভাবনা কি বাড়াবাড়ি নয়। কার গরজ তারাপদকে বঞ্চিত করার। তেমন কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না ।

চন্দন বলল, “আমি ভাই কিছু বুঝতে পারছি না। এভরিথিং ইজ মিস্টিরিয়াস। ভুজঙ্গভূষণ, মৃণাল দত্ত, কালো বেড়াল, কিকিরা—সবই কেমন গোলমেলে।”

তারাপদ ম্লান মুখ করে বলল, “আমারও মাথায় কিছু ঢুকছে না। লাভের মধ্যে ভাবতে ভাবতে মাথা ধরে গেল। টাকা-পয়সা, সম্পত্তি ব্যাপারটাই ঝাটের। বেশ ছিলুম, এখন কী প্যাঁচেই পড়লাম।”

কিকিরাকে আবার দেখা গেল।

চন্দন নিচু গলায় বলল, “যাই হোক—তুই ঘাবড়াবি না, তারা। ওই লোকটার কাছে একেবারেই নার্ভাসনেস দেখাবি না। ওর সামনে তুইও শুয়ে পড়।”

“আমার ঘুম হবে না।”

“না হোক, তবু তুই শুয়ে পড়বি। ঘুমোবার ভান করবি। আমি জেগে থাকব। হাসপাতালের ডিউটিতে আমার রাত জাগা অভ্যেস আছে।”

“তুই একলা কতক্ষণ জাগবি?”.

“সারা রাত। কিকিরাকে আমি নজর রাখব।”

তারাপদর হঠাৎ মনে পড়ল, কিকিরা বলেছে, তার সুটকেসে নাকি খুরটুর আছে। স্যাম্পল দেখাবে বলেছিল। লোকটা কত বড় শয়তান। সুটকেসে করে খুর এনেছে। গলা কাটবে নাকি? খুন?

তারাপদ ভয়ে ভয়ে বেঞ্চির তলার দিকে তাকাল, কিকিরার সুটকেস দেখবার চেষ্টা করল। তারপর অস্ফুটভাবে চন্দনকে বলল, “কিকিরার কাছে খুর আছে—।”

কিকিরা ততক্ষণে একেবারে কাছে এসে পড়েছেন।

চন্দন আবার একটা সিগারেট ধরাল। যেন কিছুই হয়নি।

তারাপদ তখনও বসে।

কিকিরা বললেন, “জমজম করে শীত পড়ছে। পানাগড় দুর্গাপুর কাছেই বোধ হয়। আরও জব্বর ঠাণ্ডা পড়বে স্যার, একেবারে আর্লি মর্নিংয়ে আসানসোল, তারপর শীতের বহরটা দেখবেন, লাইক্ ক্যাটস অ্যান্ড ডগস্।”

চন্দন ব্যঙ্গ করে বলল, “ওটা বৃষ্টির বেলায় স্যার, শীতের বেলায় নয়।”

কিকিরা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খখকে হাসি হেসে বললেন, “একই হল স্যার, বৃষ্টির বেলায় যদি বেড়াল কুকুর পড়তে পারে শীতের বেলায় কেন পড়বে না। ইংরিজি ভাষার কোনো নিয়ম নেই, যা পড়াবেন তাই পড়বে।”

কথা বলতে বলতে কিকিরা তাঁর সেই বেখাপ্পা অলেস্টার খুলে পাট করে বালিশের মতন করে নিলেন। টুপি আগেই খুলেছিলেন, মাফলারটা পাগড়ির মতন করে কানে বাঁধলেন, জুতো খুললেন।

চন্দন ইশারায় তারাপদকেও শুয়ে পড়তে বলল।

কিকিরা পাট করা অলেস্টারের ওপর মাথা রেখে বালাপোশ গায়ে টেনে শুয়ে পড়তে পড়তে বললেন, “স্যার, একটু সাবধানে থাকবেন। চোখের পাতাটি বুজেছেন কি সর্বনাশ হয়ে যাবে।...আচ্ছা, শুয়ে পড়ি। আসানসোলে আমায় ডেকে দেবেন। চা খাব।”

কিকিরা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন। তারাপদও যেন বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ল।

কামরার মধ্যেটা একেবারেই চুপচাপ। কেউ কেউ বেঞ্চের ওপর কুণ্ডুলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, কেউ কেউ বাংকের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে, পুঁটলি পাকানো চেহারা করে বসে বসেই ঘুমোচ্ছে দু-চার জন। মাঝে মাঝে কাশির শব্দ, এক-আধটা ঘুম-জড়ানো কথা, ট্রেনের একঘেয়ে শব্দ—সব মিলিয়ে কেমন একটা নিঝুম আবহাওয়া।

একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থেমে আবার চলতে শুরু করল চন্দন বড় বড় হাই তুলছিল।

কিকিরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারাপদ অনেকক্ষণ মটকা মেরে পড়েছিল। সারাদিনের ক্লান্তি যেন কখন তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

চন্দন নানারকম কথা ভাবছিল। কিকিরা লোকটা কি সত্যিই চালাক? তার ভাঁড়ামির খানিকটা হয়ত অভিনয়, কিন্তু চালাকির ব্যাপারটা অভিনয় করে দেখানো যায় না। কিকিরা যদি চালাকই হবে তাহলে সে কেন অযথা প্রথমেই চন্দনদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে গেল? যে-লোক জানে চন্দনরা শংকরপুরে ভুজঙ্গভূষণের কাছে যাচ্ছে সেই লোক কেন আগেভাগে তা প্রকাশ করে দেবে? বরং সে চুপচাপ থাকবে, ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবে না তারাপদদের ব্যাপারটা সে ছিটেফোঁটাও জানে। তারপর সবাই যখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বে, কিকিরা তারাপদর কিট ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়বে যে কোনো স্টেশনে। এই গাড়িটা এমনই যে, যখন তখন নেমে পড়া যায়, অনরবত থামছে, চলছে, আবার থামছে।

কিকিরা বোকামি করেছে। হয় বোকামি করেছে, না হয় জেনেশুনে ইচ্ছে করেই সতর্ক করে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে, তারাপদদের ব্যাপার সে জানে । কিন্তু কেন কিকিরা সতর্ক করে দেবে? চোর কি বাড়ির লোককে সাবধান করে দিয়ে চুরি করে? তবে?

চন্দন যতই ভাবছিল ততই তার মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল । শুরু থেকেই যার মধ্যে এত রহস্য আর ঝামেলা—শেষে গিয়ে তার মধ্যে যে আরও কত গভীর রহস্য দেখা যাবে কে জানে।

.

গায়ে হাত পড়তেই চন্দন ধড়মড় করে উঠে বসল ।

মুখের সামনে কিকিরা। চন্দন তারাপদকে দেখে নিল। ঘুমোচ্ছে। তারাপদ।

"আপনি স্যার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন", কিকিরা বললেন, এমনভাবে বললেন। যেন কতই না সহানুভূতি দেখাচ্ছেন।"

চন্দন বলল, "হ্যাঁ, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে তার লজ্জা এবং রাগ হচ্ছিল।

"অনেকক্ষণ থেকেই ঘুমোচ্ছেন," কিকিরা হাসি হাসি মুখ করলেন। চন্দন তাড়াতাড়ি হাতের ঘড়ি দেখল। সর্বনাশ, সাড়ে তিনটে বাজে। সে যখন শেষবার ঘড়ি দেখে তখন দুটো বাজছিল। টানা দেড় ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে থাকল। আশ্চর্য। হাসপাতালে কখনও এ-রকম হয় না। রাত্রের গাড়িটাড়ির এই দোষ, যাত্রীদের ঘুম, ঢুলুনি, গাড়ির দোলানি, একঘেয়ে শব্দ, ট্রেন থামা আর যাওয়া, হলুদ হলুদ আলো, সব মিলেমিশে কেমন ঘুম এনে দেয়। ছোঁয়াচে রোগের মতন ব্যাপারটা।

চন্দন কিকিরাকে সন্দেহের চোখে দেখল। "আপনি কি জেগেছিলেন?"

"আমার ঘুম স্যার খুব পাতলা, একটু খুসখস শব্দ হলেই জেগে উঠি। রাতের গাড়িতে চলাফেরা করতে করতে এই অভ্যেস হয়ে গেছে ।"

চন্দন হাই তুলল। চোখ যেন এখনও জুড়ে রয়েছে।

"আপনি অনেকক্ষণ থেকে জেগে বসে আছেন?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"অনেকক্ষণ। বসে নয়, শুয়ে ছিলাম।"

হঠাৎ চন্দনের কেমন যেন মনে হল, মনে হতেই চমকে উঠল। আরে–কিকিরা এর মধ্যে কোনো হাত সাফাই করেনি তো? তারাপদর কিটু ব্যাগে মৃণাল দত্তর দেওয়া সেই কাগজপত্তর ঠিকঠাক আছে? না কিকিরা চুরি করে নিয়েছে?

কথাটা মনে হতেই চন্দনের বুক ধকধক করে উঠল, ভয় যেন লাফ মেরে। গলার কাছে এসে বসল। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে সে তারাপদকে ঠেলা দিল।"তারা, এই তারা–"

বলিহারি ঘুম তারাপদর। মরার মতন ঘুমোচ্ছে ।

"ওঁকে আবার কেন অযথা জাগাচ্ছেন, স্যার?" কিকিরা বলল।

"দরকার আছে," চন্দন রুক্ষভাবে জবাব দিল।

বার কয়েক ঠেলা খেয়ে তারাপদ উঠে বসল। উঠে বসে চোখ রগড়াতে লাগল। যেন তার খেয়ালই নেই সে বাড়িতে বিছানায়, না রেলগাড়িতে। কয়েক মুহূর্ত পরে তারাপদ হুঁশ ফিরে পেল।

চন্দন রেগে গিয়ে বলল, "আশ্চর্য ঘুম তোর!"

তারাপদ লজ্জিত হয়ে বলল, "কাল সারাদিন যা ধকল গেছে–পারছিলাম না।"

“এদিকে যে—” বলতে গিয়ে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল চন্দন, আড়চোখে কিকিরাকে দেখে নিল। তারপর ইঙ্গিতে বলল, ‘আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বলে কিকিরাকে দেখাল, “উনি জেগে ছিলেন।”

তারাপদ হয় ইঙ্গিতটা বুঝল না, না হয় তার মাথা মোটা। সে তখনো হাই তুলছে।

বিরক্ত হয়ে চন্দন আবার বলল, “এই ট্রেনে ছিঁচকে চোরের যা উপদ্রব । দেখে নে আমাদের জিনিসপত্র ঠিক আছে কিনা?”

তারাপদ এবার বুঝতে পারল। তার মুখের অদ্ভুত এক চেহারা হল ।

কিকিরা বললেন, “না না, এদিকে কেউ আসেনি। আমার ঘুম ভেরি ভেরি ভেরি থিন, গায়ের পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেলেই ঘুম ভেঙে যায়।”

চন্দন তারাপদকে হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, “তা হলেও একবার দেখে নে।“

তারাপদ কিব্যাগ-টিটব্যাগ দেখল।

“তোর ব্যাগের মধ্যে আমার একটা সিগারেটের প্যাকেট রেখেছিলাম–দেখ তো আছে কি না?” একবারে ডাহা মিথ্যে কথা চন্দনের! সে চাইছিল, ব্যাগ খুলে তারাপদ একবার আসল জিনিসটা আছে কিনা দেখে নিক।

তারাপদ কোলের ওপর ব্যাগ তুলে চেন খুলল। দেখল। হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে ঘাঁটল। তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মৃণাল দত্তর দেওয়া জিনিসগুলো ঠিকই রয়েছে।

তারাপদ কায়দা করে বলল, “আছে।...তুই এখন আমার সিগারেট নে। নতুন প্যাকেট পড়ে ভাঙবি।”

চন্দন নিশ্চিন্ত হল। বাব্বা, যা ভয় ধরে গিয়েছিল তার।

কিকিরা সমস্ত ব্যাপারটাই স্বাভাবিকভাবে দেখছিলেন। এবার বললেন, “আমায় একটা সিগারেট খাওয়ান, স্যার; যা শীত... ।”

চন্দন তারাপদর প্যাকেট থেকে কিকিরাকে সিগারেট দিল। নিজেও ধরাল।

বালাপোশ গায়ে জড়িয়ে বসে সিগারেট খেতে খেতে কিকিরা খখক্ করে কাশছিলেন। বললেন, “সিগারেটের নেশা আমার নেই, একটা দুটো খাই কখনো।”

গাড়িটা যেন কোনো ইয়ার্ডে ঢুকল । লাইন বদলের শব্দ হচ্ছে। এক একবার বাঁয়ে টাল খাচ্ছে, আবার যেন ডাইনে টাল খেল।

কিকিরা বললেন, “অন্ডাল এসে গেল । আর খানিকটা পরে আসানসোল। সোয়া চারটে নাগাদ আসানসোল পৌঁছোয়।”

“আপনি এদিকে খুব যাতায়াত করেন?” চন্দন জিজ্ঞেস করল ।

“প্রায়ই।”

“সবই আপনার চেনা।”

“তা বলতে পারেন।”

তারাপদ হঠাৎ বলল, “যশিডিতে থাকবেন এখন?”

“যশিডিতে নয়, দেওঘরে যাচ্ছি...। ওখানে আমার ফিল্ড আছে।”

“কী?”

“ফিল্ড স্যার, মানে চেনাজানা আছে, কাস্টমার রয়েছে।”

চন্দন মনে মনে একটা প্যাঁচ ভাবছিল। দাবা খেলার চালের মতন একটা মোক্ষম চাল দিলে কেমন হয়? কিকিরা কি সামলাতে পারবে? হয়ত কিকিরা আরও পাকা খেলোয়াড়, চন্দনকে বসিয়ে দেবে। তবু একটা ঝুঁকি নিতে আপত্তি কী? এখনও যাত্রা শেষ হয়নি চন্দনদের, আরও পাঁচ ছ ঘণ্টার বেশি ট্রেনে থাকতে হবে। কিকিরার যদি কোনো মতলব থাকে, এর মধ্যে হাসিল করবে কি না কেউ বলতে পারে না। তবে এখন পর্যন্ত করেনি। সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। যদি তারাপদর ব্যাগ নিয়ে কিকিরা কোথাও নেমে যেত মাঝপথে, চন্দনরা জানতেও পারত না। লোকটাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করার চেয়ে একটু বিশ্বাস করা যাক না, ক্ষতি কী!

চন্দন আরও খানিকক্ষণ ভেবে শেষে বলল, “স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?”

“নিশ্চয় নিশ্চয়, একশোটা কথা জিজ্ঞেস করুন।”

“আপনি যে বললেন, আমরা মধুপুরে যাচ্ছি না—এটা কী করে বললেন?”

কিকিরা অদ্ভুত মুখ করে হাসলেন, “ম্যাজিক।”

“ম্যাজিক দেখতে আমাদের ভাল লাগে, কিন্তু তা বিশ্বাস করি না।”

“ভাল ম্যাজিক আপনারা দেখেননি স্যার, তাই বলছেন—” কিকিরা বললেন। একটু চুপ করে থেকে আবর বললেন, “আপনারা ছেলেমানুষ, অনেক কিছুই জানেন না, দেখেননি। যখন দেখবেন, জানবেন,—তখন বিশ্বাস করবেন।”

“তা বলে এই থট রিডিং না কী যেন বলে, তাও বিশ্বাস করতে হবে? আপনি নিজেই তখন বলছিলেন, ম্যাজিক হল খেলা, মন্ত্রট বাজে—।”

“বলেছি,” কিকিরা ঘাড় হেলালেন, “এখনও বলছি, মন্ত্রটন্ত্র বাজে। তবে যোগীদের আমি বিশ্বাস করি। তাঁরা আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে পারেন। মাটি চাপা হয়ে তিন ঘণ্টা কী করে মানুষ থাকতে পারে স্যার, আপনি তো ডাক্তার, বলুন না?”

চন্দন কোনো জবাব দিল না। কিকিরাকে এখন আর ভাঁড় মনে হচ্ছে না। তার গলার স্বরও যেন পালটে গিয়েছে।

তারাপদ লল, “আপনি কি যোগী?”

“না, না”, কিকিরা মাথা নেড়ে জিব কাটল, “যোগের য পর্যন্ত আমি জানি না। ওসব মহাপুরুষরা পারেন, আমরা কত তুচ্ছ।”

“তা হলে আপনি কী করে জানলেন আমরা কোথায় যাচ্ছি, কার কাছে যাচ্ছি?”

কিকিরা খুব বিনয় করেই যেন বললেন, “একথাটা ঠিক হল না স্যার, আমি শুধু বলেছি, আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেই জায়গাটার নামের প্রথমে ‘এস’ অক্ষর আছে। যার কাছে যাচ্ছেন তাঁর নামের প্রথমে ‘বি’ অক্ষর আছে তা আপনারা তো ‘এন’ অক্ষর দিয়ে নামের কত জায়গাতেই যেতে পারেন, সীতারামপুর, সালানপুর, শিমুলতলা আর যার কাছে যাচ্ছেন তাঁর নাম বিহারীপ্রসাদ, বিজনকুমার, বটুকচন্দ্রও হতে পারে…”

চন্দন বুঝতে পারল, কিকিরা পাকা লোক, সহজে মচকাবে না। বলল, “হতে সবই পারে, কিন্তু আপনি জানেন আমরা কোথায় যাচ্ছি। জানেন না?”

কিকিরা হাসি-হাসি মুখ করে চেয়ে থাকলেন।

চন্দন আর তারাপদ তাকিয়ে থাকল, অপেক্ষা করতে লাগল।

কিকিরা কোনো কথাই বলছিলেন না।

“কিছু বলছেন না?”

“কী বলব স্যার!”

“আপনি সত্যি সত্যিই কিছু জানেন না?”

কিকিরা এবার একবার তারাপদর দিকে তাকালেন। চোখ বন্ধ করলেন। আবার খুললেন। তাঁর হাসি-হাসি মুখ মুখ ধীরে ধীরে গম্ভীর, করুণ হয়ে উঠল, গলার স্বর ভারী শোনাল। বললেন, “একটা কথা আপনাদের আমি বলে দিই। আপনারা ছেলেমানুষ। যেখানে যাচ্ছেন সেই জায়গা কিন্তু ভয়ংকর। আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন, বিপদেও পড়তে পারেন। চোখ কান খোলা রাখবেন। কোনো ভেলকি বিশ্বাস করবেন না। ওই লোকটা যোগী নয়–শয়তান, পিশাচ। তার চেহারা দেখলে আপনাদের বুক কাঁপবে। অনেক মানুষের জীবন সে নষ্ট করেছে। ও একটা কাপালিক। কী নিষ্ঠুর জানেন না। এত বড় শয়তান কেমন করে বেঁচে আছে–আমি জানি না। ভগবান এত লোককে নেন, ওই পিশাচকে কেন নেন না?” বলতে বলতে কিকিরার মুখ কেমন রক্তজমার মতন নীলচে হয়ে এল। তিনি দু’হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন।

তারাপদ আর চন্দন যেন স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল। কোনো কথা বলতে পারল না।

কোনোরকমে কাঁপা কাঁপা গলায়, জড়ানো স্বরে তারাপদ বলল, “সামনের অমাবস্যায় নাকি তিনি মারা যাবেন?”

কিকিরা বললেন, “তাই যেন যায়।…এত পাপ করেও মানুষ যদি বেঁচে থাকে তবে ভগবান বলে কিছু নেই।”

চন্দনরা অবাক হয়ে দেখল, কিকিরার গলা ফুলে উঠেছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে।

পাঁচ

শংকরপুর গাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সামান্য বেলা হয়ে গেল। মধুপুরে মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে থাকল ট্রেন, কিসের একটা গণ্ডগোল হয়েছিল ইঞ্জিনে। শংকরপুরে পৌঁছতে হরেদরে আধ ঘণ্টা লেট।

কিটব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে তারাপদরা প্লাটফর্মে নেমে পড়ল। ছোটখাট স্টেশন, তেমন একটা লোকজন ওঠানামা করল না। যারা নামল বা গাড়িতে উঠল, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই দেহাতী মানুষজন।

প্লাটফর্মে নেমে তারাপদরা কিকিরার জানলার দিকে সরে এল । চন্দন বলল, "আপনিও নেমে গেলে পারতেন।"

কিকিরা মাথা নেড়ে বললেন, "না স্যার, এখন আমার নামা চলবে না। এখানে আমাকে দু-চারজন চেনে। আপনাদের সঙ্গে নামলে চোখে পড়ে যেতে পারি।"

তারাপদ বলল, "চোখে পড়লে কী হবে?"

"কী হবে তা কেমন করে বলব। সাবধানের মার নেই। আপনারা ভাববেন না; আমি যশিডির কাজকর্ম সেরে বিকেলের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এখানে ফিরে আসব। যা বলে দিয়েছি মনে রাখবেন, স্টেশনের পুব দিকে বালিয়াড়ির মতন জায়গাটার কাছে হরিরামের আস্তানা। ওখানে আমায় পাবেন। কাল দেখা করার চেষ্টা করবেন। যান স্যার, আর দাঁড়াবেন না। খুব সাবধানে থাকবেন, চোখ কান খোলা রেখে। ভয় পাবেন না। "

তারাপদরা দাঁড়িয়ে থাকার কোনো কারণ দেখল না আর। গাড়িও ছাড়ল ছাড়ব করছে। হুইল বেজে গেছে। ইঞ্জিনের দিকেও স্টিম ছাড়ার শব্দ উঠছে।

চন্দন হঠাৎ কিকিরাকে বলল, "আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন আমরা ভুল বুঝেছিলাম। বুঝতেই তো পারছেন–"

কিকিরা চন্দনের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "কিছু না, কিচ্ছু না স্যার, ক্ষমা-টমার দরকার নেই। আমি আপনাদের পেছনে আছি। আমার যতটা সাধ্য করব।"

ট্রেন ছেড়ে দিল। কিকিরা কেমন হাসি-হাসি অথচ মায়া-মাখানো মুখ করে তারাপদর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তারাপদ একটু হাত ওঠাল, যেন বিদায় জানাল কিকিরাকে ।

প্লাটফর্ম ততক্ষণে ফাঁকাই হয়ে এসেছে । দুই বন্ধু মিলে হাঁটতে লাগল।

টিকিট কালেক্টারকে টিকিট দিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা। পাঁচ-সাতটা ছোট ছোট দোকান, এক ফালি রেল কোয়াটার, মস্ত মস্ত ক'টা শিমুলগাছ ছাড়া আশেপাশে আর কিছু চোখে পড়ে না। পানের দোকান, দেহাতী মিঠাইয়ের দোকান। একপাশে কয়েকটা বুড়বুড়ি গোছের লোক ছোট-ছোট ঝুড়ি করে বেগুন, কাঁচা টমাটো, অল্প ক'টা ফুলকপি

বিক্রি করছে। খদ্দের বলতে রেলের বাবু আর খালাসি গোছের লোক। একদিকে ছোট এক হনুমান-মন্দির, বাঁশের আগায় পতাকা উড়ছে।

তারাপদ বলল, "চাঁদু, নো রিকশা? নাথিং?"

চন্দন বলল, "কিকিরা তো বলেই দিয়েছিলেন হাঁটতে হবে।"

"তা হলে নে, হাঁট।"

চারদিক তাকিয়ে চন্দন বলল, "ওদিকে একটা মারোয়াড়ি দোকান দেখছি। চল, আগে সিগারেট-ফিগারেট কিনে নিই। ভুজঙ্গভূষণের মাঠ-মোকামের কথাও জেনে নেব।"

জায়গাটা এই রকম যে, তারাপদ আর চন্দনের মতন দুটি বাঙালি ছেলে কাঁধে কিট ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমেছে, হাতে কম্বল ঝোলানো–এই দৃশ্যটাই যেন অনেকের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সকলেই তাদের নজর করছিল। কালো জোয়ান গোছের একটা লোক সাইকেল কোমরের কাছে হেলিয়ে দেহাতী মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ময়লা কাঁচের গ্লাসে চা খাচ্ছিল। লোকটার চেহারা ষণ্ডার মতন, মাথা নেড়া, পরনে নীল একটা প্যান্ট, গায়ে কালো রঙের সোয়েটার।

চন্দন এবং তারাপদ দুজনেই তাকে দেখল।

তারাপদ ইশারা করে চন্দনকে বলল, "ভুজঙ্গভূষণের লোক নাকি রে?"

চন্দন বলল, "ড্রেস থেকে রেলের লোক মনে হচ্ছে। মালগাড়ির ড্রাইভার হতে পারে।"

"বেটা আমাদের অমন করে দেখছে কেন?"

"দেখুক। তাকাস না। ইগনোর করে যা।"

সামান্য এগিয়ে চন্দনরা মারোয়াড়ির দোকানটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

দোকানটা দেখতে বড় নয়, কিন্তু হরেক রকম জিনিস রয়েছে। মুদির দোকান খানিকটা, খানিকটা মনিহারী। কবিরাজী তেল আর ভাস্কর লবণ ধরনের করলে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সস্তা সিগারেট পাওয়া গেল। কয়েক প্যাকেট কিনে নিল চন্দন।

তারাপদ মাঠ-মোকামের কথাটা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল । কিকিরা যদিও বলে দিয়েছিলেন রাস্তাটা, তবু তারাপদ জিজ্ঞেস করল । নতুন জায়গায় কিছু খুঁজে বের করতে হলে একজনের জায়গায় দুজন কি তিনজনকে জিজ্ঞেস করলে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

দোকানের ছোকরামতন লোকটি মাঠ-মোকামের যাবার রাস্তাটা বলে দিলেও দোকানের বাইরে যে বুড়োমতন লোকটি টিনের চেয়ারে বসে ছিল, সে কেমন কৌতূহলের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাঙলায় হিন্দিতেই জিজ্ঞেস করল, "কাঁহা যাবেন?

তারাপদ বলল, "ভুজঙ্গবাবুর বাড়ি।"

লোকটা অবাক হলেও নিজেকে যেন সামলে নিতে নিতে বলল, “ভুজঅংগ মহারাজজি? আচ্ছা আচ্ছা । যাইয়ে... ।”

দোকানের বাইরে এসে তারাপদরা একটা নিমগাছের পাশ দিয়ে পাথরফেলা রাস্তাটা ধরল। সামান্য এগিয়ে চড়াই। চড়াইয়ের কাছে পৌঁছতেই ডান দিকে গ্রাম চোখে পড়ল। ছোট গ্রাম। কয়েকটা মাত্র ঘর। হরিরামের আস্তানা দেখা গেল না, টিলাটা চোখে পড়ল গ্রামের কাছাকাছি। ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে আস্তানাটা বোধ হয় আড়াল পড়েছে। বাঁ দিকেও দু-একটা পাকা বাড়ি, বাঁধানো কুয়ো ।

চড়াই ফুরিয়ে গেলেই বাঁ দিকের কাঁচা রাস্তা ধরতে হল।

জায়গাটা যে সুন্দর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খটখটে শুকনো শক্ত মাটি, বিশাল বিশাল মাঠ, ঢেউ-খেলানো; মাঝে-মাঝে বড় বড় পাথর পড়ে আছে, জংলা গাছ নানা রকমের, মাথার ওপর দিয়ে দু-চারটে বক উড়ে যাচ্ছে, রোদ টকটক করছে, শীতের বাতাস দিচ্ছে শনশন করে।

হাঁটতে হাঁটতে চন্দন বলল, “জায়গাটা কিন্তু চমৎকার, কী বলিস?”

তারাপদ বলল, “খুব ভাল। কিন্তু জায়গার কথা এখন ভাবতে পারছি না চাঁদু।”

“কেন? জেনেশুনেও চন্দন বলল।

“ভুজঙ্গ যেরকম ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে–,” তারাপদ হাজার দুভাবনার মধ্যেও তামাশা করবার চেষ্টা করল।

চন্দন হেসে বলল, “যা বলেছিস। ভুজঙ্গ যে কোন্ ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। কিকিরা যা বললেন তাতে লোকটাকে একটা আস্ত শয়তান বলেই মনে হচ্ছে।”

তারাপদ বলল, “কিকিরা কিন্তু সত্যিই বড় ভাল লোক।”

“আমরা ভাই ওঁকেই অবিশ্বাস করছিলাম। সত্যি, মানুষ চেনা বড় কঠিন।”

“সবই কঠিন। এই সংসার চেনাই কি সহজ। ধর না ভুজঙ্গভূষণের কথা লোকটা এত শয়তান কিন্তু সেই লোক মরার আগে আমায় সম্পত্তি দেবার জন্যে ডেকে পাঠায়?”

চন্দন একটা কুলঝোঁপের পাশে বিশাল এক গিরগিটির মতন জীবন দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। “তারা, দেখ।“ চন্দন আঙুল দিয়ে জীবটাকে দেখাল।

তারাপদ বলল, “কী রে ওটা? তক্ষক নাকি?”

চন্দন পায়ের শব্দ করতেই জন্তুটা ঝোঁপের আড়ালে পালাল।

তারাপদ বলল, “ডেনজারাস্ জিনিস। বিষটিষ আছে বোধ হয়।

চন্দন বলল, “তুই এক আচ্ছা জায়গায় এলি, কী বল? চারপাশেই ডেনজার।”

“সত্যি! এখন ভাবছি, টাকার লোভে মানুষ কী না করে!”

“আমার কিন্তু ভালই লাগছে।”

“ভালই লাগছে?”

“অ্যাভেঞ্চার-অ্যাডভেঞ্চার মনে হচ্ছে। সেই যকের ধনের মতন ব্যাপার। তোর পিসেমশাই ভুজঙ্গভূষণের গুপ্তধন উদ্ধারের থ্রিলটা মন্দ কী রে?”

তারাপদ দুঃখের শব্দ করে বলল, “গুপ্তধন উদ্ধার! বলেছিস বেশ। ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার।”

“কেন কেন? নিধিরাম কেন?”

“কিকিরার মুখে শুনলি না ভুজঙ্গ কেমন ভয়ংকর। তার সঙ্গে লড়ব আমরা? আমাদের কী আছে রে? নাথিং। একটা লাঠি পর্যন্ত হাতে নেই।”

চন্দন এবার মুচকি হেসে বলল, “আছে, আছে।”

“কী আছে?”

“বলব?”

“বল।”

“প্রথমে আছে কিকিরার হেল্প। কিকিরা আমাদের সব রকম সাহায্য করবেন বলেছেন।”

“তুই বড় বাজে কথা বলিস, চাঁদু। কিকিরা একটা রুগ্ন লোক, তাঁর একটা হাত একরকম অসাড়। ওই মানুষ তোকে মুখের কথায় ছাড়া আর কিসে সাহায্য করতে পারেন?”

চন্দন একটা ছোট পাথর লাফ মেরে টপকে গেল। যেন তার হাত-পায়ের সাবলীল ভাবটা দেখাল। বলল, “শোন তারা, কিকিরা আমাদের কাছে চোদ্দ আনা কথাই ভাঙেননি। আমি তোকে বলছি, কিকিরা ভুজঙ্গভূষণের হাঁড়ির খবর রাখেন। কিকিরা ভুজঙ্গভূষণের শত্রু। কাজেই শত্রু যদি ভুজঙ্গভূষণের হাঁড়ির খবর দেন তা হলে আমরা সেটা জানতে পেরে যাচ্ছি। ওটা কম কাজে লাগবে না। দু নম্বর হল, কিকিরার অ্যাডভাইস। সেটা খুব কাজের হবে। আর তিন নম্বর হল, আমার দুটো অস্ত্র।”

“অস্ত্র?” তারাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চন্দন মিটমিট করে হেসে বলল, “ভাই, যখন থেকে আমি ভুজঙ্গভূষণের কথা শুনেছি তখন থেকেই আমি তাঁকে সাসপেক্ট করেছি। ভুজঙ্গভূষণের দুর্গে ঢুকব অথচ একেবারে খালি হাতে, তা কি হয়! আমি দুটো জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ইনজেকসানের সিরিঞ্জ, আর একটা পাতলা ছিপছিপে ছুরি।”

তারাপদ বন্ধুর এই ব্যাপারটাকে তামাশা মনে করে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, “এই তোর অস্ত্র? আমি ভেবেছিলাম রিভলবার-টিভলবার নিয়ে এসেছিস।

“ওটা আমি চালাতে জানি না। এ দুটো জানি।”

"তুই ভুজঙ্গকে ওই দিয়ে ভয় দেখাবি? সত্যি চাঁদু তোর যা বুদ্ধি!"

"ভয় দেখাব কেন? ভদ্রলোকের মতন সব যদি মিটমাট হয়ে যায়—তোর ভুজঙ্গভূষণকে ভগবানের হাতে দিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে যাব।"

তারাপদ যেন কি ভেবে বলল, "কিন্তু চাঁদু, যদি ভুজঙ্গ আগেই তোর চালাকি ধরতে পারে?"

চন্দন বলল, "ধরা পড়লেই বা কী হবে! আমরা কলকাতাতেই শুনেছি, ভুজঙ্গভূষণের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমি তোর ডাক্তারবন্ধু; ইমার্জেন্সিতে কাজে লাগতে পারে ভেবে জিনিস দুটো এনেছি।"

যুক্তিটা তারাপদর পছন্দ হল। তবু বলল, "তুই স্টেথোকোপটা এনেছিস?"

"না।"

"বাঃ, তা হলে? স্টেথোস্কোপ ছাড়া ডাক্তার হয়?

"ভুলে গিয়েছি। তাড়াহুড়োর মধ্যে জরুরি জিনিস নিতে লোকে ভুল করে না? সেই রকম ভুল।"

তারাপদ কী যেন ভাবল, বলল, "শুধু ইজেকসানের সিরিঞ্জ নিয়ে কী হবে? ওষুধপত্র?"

চন্দন বলল, "মাথা ধরা, পেট ব্যথার দু-চারটে খুচরো ওষুধ ছাড়া ইনজেকসানের জন্যে মরফিয়ার দুটো অ্যাম্পুল এনেছি, আর-একটা অ্যাম্পুল আছে হার্টের গোলমালের ওষুধ। সবই ইমার্জেন্সির জন্যে।"

তারাপদ এক ফোঁটাও ডাক্তারি বোঝে না। কিন্তু চন্দনের এই উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে ওকে বাহবা দিতে ইচ্ছে করছিল । সত্যিই তো, একজন ডাক্তার বন্ধু নিয়ে সে মুখ ঝলসানো ভুজঙ্গভূষণের কাছে আসছে, এরকম অবস্থায় একেবারে খালি হাতে কি আসা যায়?

চুপচাপ কয়েক পা এগিয়ে এসে তারাপদ বলল, "দেখ চাঁদু, ভুজঙ্গকে আমরা যতটা ভয় পাচ্ছি—এতটা ভয়ের কারণ আমাদের বেলায় নাও থাকতে পারে । কাল রাত্রেও ঠিক এতটা ভয় আমাদের ছিল না। আজ সকালে কিকিরাই আমাদের ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা যতটা ভাবছি তা হয়ত কিছুই হবে না। তা ছাড়া আমি কি যেচে এসেছি? ভুজঙ্গভূষণই আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।"

তারাপদ তার কথা শেষ করেনি, চন্দন অনেকটা দূরে গাছপালার আড়ালে একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "তারা, ওই তোর মাঠ-মোকাম, ভুজঙ্গভূষণের বাড়ি।"

চন্দন তাকাল। জায়গাটা দেখার মতন। মাঠের ঢল নেমে গেছে অনেকটা, চারদিকে জঙ্গলের ঝোঁপঝাড় গাছপালা, মনে হয় জঙ্গল বুঝি এখান থেকেই শুরু হয়েছে। ওরই এক পাশে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আড়ালের জন্যে বোঝা যাচ্ছে না বাড়িটা কেমন।

আরও আধ মাইলটাক হেঁটে তারাপদরা ভুজঙ্গভূষণকে বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এটা বাড়ি না দুর্গ বোঝা যায় না। জেলখানার মতন উঁচু পাঁচিল দিয়ে চারদিক ঘেরা। গাছপালার অভাব নেই, আম জাম নিম কাঁঠাল থেকে শুরু। করে শিমুল পর্যন্ত। জল বৃষ্টি রোদ সয়ে সয়ে পাঁচিলের গায়ে শ্যাওলার রঙ ধরেছে। কোথাও কোথাও কালো হয়ে গেছে। পাঁচিলের এ-

পাশ থেকে বাড়ির সামান্যই চোখে পড়ে। অনেকটা ভেতর দিকে বাড়িটা। দোতলাই হবে। দোতলরা রেলিং-দেওয়া বারান্দা চোখে পড়ছিল। কেমন একটা ফটফট শব্দ হচ্ছে, যেন একটা মেশিন গোছের কিছু চলছে।

তারাপদ বলল, "কিসের শব্দ রে?"

চন্দন বলল, "ডায়নামো বলে মনে হচ্ছে।"

"কী করে ডায়নামো দিয়ে?"

"বোধ হয় বাতিটাতি জ্বালায়।"

"অবাক হয়ে তারাপদ বলল, "বাব্বা! বিশাল কারবার তা হলে?"

একটা জিনিস চন্দন লক্ষ করল। তারা বাড়ির হয় পেছনে না হয় পাশে কোথাও এসে দাঁড়িয়েছে। সামনের দিকটা নজরে আসছে না।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চন্দন বলল, "আয়, সামনের দিকে যাই।"

শুকনো পাতা, গাছের সরু সরু ভাঙা ডালপালা, ছড়ানো পাথরের স্তূপ টপকে তারাপদরা বাড়ির সামনের দিকে এসে পড়ল। প্রথমেই চোখে পড়ল, লোহার ফটক। বিশাল ফটক। কারখানার গেটে যেমন দেখা যায়, অনেকটা সেই রকম। ফটকের একপাশে পাঁচিল জুড়ে ছোট একটা ঘর মতন। বোঝাই যায় পাহারা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। খুবই আশ্চর্য, ফটকের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা মাঠের দিকে চলে গেছে–সেটা কাঁচা হলেও গাড়ি চলার দাগ আছে। মরা ঘাস, কাঁকর-মেশানো মাটির ওপর চাকার দাগ। গরুর গাড়ি চললে যেমন দাগ ধরে যায় মাটিতে। কিন্তু দাগের গর্ত গভীর নয়।

তারাপদ ফটকের সামনে এসে বলল, "এবার?"

চন্দন আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। ফটক বন্ধ। পাহারা ঘরের গায়ে একটা ছোট ফটক রয়েছে, কিন্তু তালা দেওয়া। ফটকটা টপকানো যেত, যদি না মাথায় বশার ফলার মতন শিক থাকত।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকা ছাড়া চন্দন অন্য কোনো উপায় খুঁজে পেল না।

হঠাৎ তারাপদ বলল, "চাঁদু, এদিকে একবার দেখ।"

চন্দন তারাপদর কাছে গেল। বাঁ ফটকের পাশে থামের গায়ে একটা কী যেন লেখা আছে। লোকে সাদা পাথরের ওপরেই বরাবর কালো দিয়ে বাড়ির নামটাম লিখে এসেছে। এ একেবারে উলটো। কালো পাথরের ওপর সোনালি দিয়ে কিছু লেখা ছিল। সোনালি রঙ এখন প্রায় কালচে হয়ে এসেছে, অক্ষরগুলো বোঝা কষ্টকর, অর্ধেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, গিয়ে পাথরের খোদাইটুকু কোনো রকমে টিকে আছে। দেবনাগরী অক্ষরে কিছু লেখা। চন্দন দেবনাগরী বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে, তারাপদ হয়ত বুঝতে পারত, কিন্তু ভাঙা অস্পষ্ট অক্ষর সে পড়তে পারছিল না।

খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারাপদ বলল, "সংস্কৃত মনে হচ্ছে। ঠিক ধরতে পারছি না, তবে আত্মাটাত্মা কিছু লেখা আছে।"

“আত্মা?”

“তাই তো দেখছি।”

চন্দন কী যেন ভাবল, “আত্মা পরে হবে। জোর খিদে পেয়ে গিয়েছে। নিজেদের আত্মা আগে বাঁচাই। আয় আগে তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে মোলাকাত করি।“

তারাপদকে টেনে নিয়ে চন্দন পাহারা-ঘরটার কাছে এল। “টপকাতে পারবি?”।

“পাগল, বর্শায় গিঁথে যাব।”

“তা হলে?...আচ্ছা, দাঁড়া, আমার কম্বলটা পাট করা রয়েছে। এটা বশার মাথায় দিচ্ছি। তুই ওই সেন্ট্রি পোস্টের গা ধরে ওঠ, উঠে টপকে যা।”

চন্দন যাকে সেন্ট্রি পোস্টের গা বলল সেটা পাহারা-ঘরের দেওয়ালই বলা যায়।

তারাপদ ইতস্তত করল। এই ফটকটা ছোট, ফুট চারেকেরও কম উঁচু মাটি থেকে। হাই জাম্প করেও পেরিয়ে যাওয়া যেত যদি জায়গা থাকত দু পাশে । অবশ্য তারাপদ স্পোর্টসম্যান নয়, চন্দন খানিকটা লাফঝাঁপ করতে পারে।

চন্দনের তাড়া খেয়ে তারাপদ মনে-মনে ভগবানকে ডেকে গেটের ওপর চেপে পড়ল।

কপাল ভাল, কোনো অঘটন ঘটল না। দুজনেই গেট টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ভেতরে ঢুকে তারাপদরা দেখল, বাড়িটা ফটক থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে হবে। গড়নটা সেকেলে জমিদারবাড়ির মতন, অবশ্য সামনের দিকে গোলাকার ভাব আছে। মজবুত বাড়ি মস্ত মস্ত থাম, পাকাঁপোক্ত বারান্দা বাইরে। দূর থেকে মনে হয়, যেন বড় বড় পাথরে গাঁথা বাড়ি। বাইরে রঙরঙ কিছু নেই, কালচে হয়ে আছে, মানে ভুজঙ্গভূষণ বাইরের দিকে আর নজর দেন না। দেখতে বাড়িটা ছোট নয়। ভুজঙ্গভূষণ একলা মানুষ, এই বাড়ি নিয়ে কী করেন কে জানে!

ফটক থেকে যে রাস্তাটা সোজা বাড়ির সদর সিঁড়িতে গিয়ে পড়েছে, তার দু পাশে বাগান। এক সময় নিশ্চয় ফুলের বাগান ছিল, এখন ফুলটুল তেমন কিছু নেই, নানা ধরনের পাতাবাহার, জবা, গাঁদা আর এলোমেলো কিছু ফুলগাছ। চোখে পড়ে। বাগানে বেদী আছে বসার । ঘাসগুলো মরে যাচ্ছে শীতে। কিছু লতাপাতা নিজের মতন বেড়ে যাচ্ছে। পাঁচিলের গা ধরে অবশ্য বড় বড় গাছ–নিম, কাঁঠাল, আম, হরীতকী ।

তারাপদ আর চন্দন ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই ডায়নামোর শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছে না, কারও কোনো রকম টিকি দেখা যাচ্ছে না। ক’টা প্রজাপতি উড়ছে বাগানে। রোদ আরও গাঢ়, রীতিমত তাপ লাগছে গায়ে। শীত যেন এই রোদের কাছে। হার মেনে গেছে।

চন্দন বলল, “তারা, একটাও লোক নেই, কোনো সাড়াশব্দ নেই, তোর ভুজঙ্গভূষণ বেঁচে আছে তো?”

কথাটা শোনামাত্র তারাপদ যেন চমকে উঠল। সত্যিই তো, ভুজঙ্গভূষণ যদি মারা গিয়ে থাকে? ভুজঙ্গ নিজে অমাবস্যা পর্যন্ত বাঁচব বলেছে–কিন্তু মরা বাঁচা কি মানুষের নিজের

হাতে? ওটা ভগবানের হাত । যদি ভুজঙ্গভূষণ মারা গিয়ে থাকে তবে তো হয়েই গেল! তারাপদর এই ছুটে আশা বৃথা হল । বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার যে আশা দেখা গিয়েছিল তাও গেল।

তারাপদ বেশ বুঝতে পারল, সে ভুজঙ্গভূষণকে জীবিত দেখতে চায় টাকার লোভে, সম্পত্তির লোভে? অথচ এই ভুজঙ্গকে নিয়ে তাদের ভয় দুশ্চিন্তা কি কম!

পাথরকুচি-ছড়ানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির একেবারে সামনের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল তারাপদরা। তবু কোনো শব্দ নেই, কারও সাড়া নেই। একেবারে চুপচাপ সব।

চন্দন বন্ধুর দিকে তাকাল। “কী ব্যাপার রে?”

“কী জানি, বুঝতে পারছি না।”

“চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকব?”

“কাকে?”

“কেন, ভুজঙ্গভূষণকে?”

তারাপদ বুঝতে পারল না, কী বলবে।

পাঁচ-সাত ধাপ সিঁড়ি উঠে গেল ওরা। বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা বড়-মতন ঘর। দরজা খোলা। বারান্দার একদিকে গোটা দুই চেয়ার পাতা রয়েছে।

চন্দন ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে উঁকি মারতে যাচ্ছিল, এমন সময় পাশের ঘর থেকে কে বাইরে এসে দাঁড়াল। চন্দন তাকাল।

তারাপদ একদৃষ্টে লোকটিকে দেখছিল। তারপর অবাক হয়ে বলল, “সাধুমামা!”

সাধুমামা যেন তারপদকে চিনতে পারছিলেন না। তাকিয়ে থাকলেন।

তারাপদ আবার বলল, “সাধুমামা, আমি তারাপদ । তোমার এ কী চেহারা হয়েছে? তুমি ওভাবে আমায় দেখছ কেন? আমায় চিনতে পারছ না?”

সাধুমামার শরীর কঙ্কালের মতন, মাথার চুল একেবরে সাদা, ঘাড় পর্যন্ত ছড়ানো, মুখের মাংস কুঁচকে বিশ্রী হয়ে গেছে। বীভৎস দেখাচ্ছে। কিছু যেন হয়েছিল মুখে। কাটাকুটি, ঘা, নাকি সাধুমামারও মুখ পুড়ে গিয়েছিল ঝোঝা যাচ্ছে না। সাধুমামা এমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকলেন যেন সত্যিই তারাপদকে চিনতে পারছেন না।

তারাপদ বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সাধুমামা তাকে চিনতেও পারছেন না। বছর দেড় দুই আগেও সাধুমামা তার কাছে গিয়েছিলেন,

এমন সময় একেবারে আচমকা ভয়ংকর গম্ভীর গলায় কে যেন বলল, “ওদের হলঘরে বসাও। বসিয়ে তুমি ওপরে আমার কাছে এসো।”

তারাপদরা চমকে উঠল।

কে যে কথাটা বলল দেখবার জন্যে তারাপদরা তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না কোথাও। গলার স্বরটা কী গম্ভীর, কী কঠিন। গমগম করে উঠল যেন বারান্দাটা। কিন্তু কে কথা বলল? কে?

সাধুমামা ওই গলা শোনামাত্র বাড়ির চাকরবাকরের মতন হাত দেখিয়ে তারাপদদেরর মাঝের ঘরটার দিকে যেতে ইশারা করলেন। কথা বললেন না।

ছয়

হলঘরে বসে থাকার সময়েই তারাপদরা বুঝতে পারল, তারা এক অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়েছে। এই বিশাল বাড়ি এত ফাঁকায়–এমনিতেই নিঝুম থাকার কথা তার ওপর যদি এই বিরাট পুরীতে মানুষের সাড়াশব্দ, হাঁকডাক, চলাফেরা না থাকে–তবে কেমন লাগে? তারা কলকাতার মানুষ, মানে হইহই রইরইয়ের মধ্যে মানুষ। কোন্ ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সেখানে শুধু শব্দ আর শব্দ, মানুষজন থেকে গাড়ি-ঘোড়া, রাস্তার খেকি কুকুরগুলোও কানের পরদা ফাটিয়ে দেয় অনবরত। আর এখানে এই অদ্ভুত চুপচাপ। শুধু ডায়নামো চলার সেই ফটফট শব্দ; মাঝে মাঝে বাইরে দু-চারটে পাখির ডাক।

হলঘরটাও কেমন জাদুঘরের মতন দেখাচ্ছে। রীতিমত বড় ঘর, কবেকার কোন্ মান্ধাতা আমলের আসবাবপত্র, কারিকুরি করা লোহার ফ্রেমের সোফা সেট, বড় বড় আর্ম চেয়ার, মোগলাই নকশার একটা বড় সেন্টার টেবিল, মোটা মোটা বেটপ আলমারি গোটা দুই, দেওয়াল জুড়ে নানা ধরনের সামগ্রী ঝুলছে, বাঘের মাথা, বুনো মোষের সিং, বড় বড় তীর-ধনুক, এক জোড়া খঙ্গ, মা কালীর বিরাট পট, আর ওই সবের মধ্যে একটিমাত্র মানুষের ছবি। ফটো নয়, তেলরঙে আঁকা ছবি । ও ছবি যে ভুজঙ্গভূষণের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই মুখের দিকে তাকালে সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কাঁপে, গায়ের লোমকূপে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বেশ লম্বা, খাঁড়ার মতন নাক, ভীষণ চওড়া কপাল; চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, কী তীব্র, তীক্ষ্ণ। খুবই আশ্চর্য, ঘরের মাঝখানে যেখানেই তুমি বসো, মনে হবে ভুজঙ্গভূষণ তোমায় দেখছে। ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল, মুখভরতি দাড়ি। দাঁত যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় মানুষটি বড় ভয়ংকর।

তারাপদরা বসে থাকল তো বসেই থাকল। চুপচাপ। ঘরের মধ্যে একটা বড় দেওয়াল-ঘড়ি টিকটিক করে বেজে যাচ্ছিল। আর তারাপদর বুকের মধ্যে ধকধক করছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল।

এমন সময় একজন ঘরে এল। ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রঙ কালো, অন্তত বছর চল্লিশ বয়েস, লালচে রঙের গেরুয়া পরনে, মাথায় রুক্ষ একরাশ কোঁকড়ানো চুল, দাড়ি নেই। লোকটার মুখের দিকে তাকালেই প্রচণ্ড ধূর্ত মনে হয়।

লোকটা দু মুহূর্ত তারাপদদের দেখল। তারপর বলল, "তোমাদের জন্যে ঘর ঠিক করা হয়েছে, এসো।"

তারাপদ বলল, "আমরা ভুজঙ্গবাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

"এখন নয়। গুরুজির অসুখ। তিনি বিকেলের পর দেখা করবেন।"

তারাপদ কী ভেবে বলল, "একবার একটুর জন্যে দেখা করা যায় না?"

"না; এখন নয়। দেখা করার সময় তিনি নিজেই দেখা করবেন।"

তারাপদ ঢোক গিলল। চন্দন একটাও কথা বলছিল না। লোকটাকে দেখছিল। তার মনে হল, লোকটা মোটামুটি টেরা, গলার কাছে একটা জায়গা ফোলা, থায়রয়েড় গ্ল্যান্ডের গোলমাল আছে বোধ হয়, চোখ দুটোও যেন সামান্য ঠেলে বেরিয়ে আসার মতন লাগছে।

তারাপদরা ঝোলাঝুলি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আবার বারান্দায়। লোকটার পিছু পিছু হেঁটে বাড়ির একেবারে শেষ দিকে একটা ঘরে তারা এসে দাঁড়াল।

তারাপদ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লোকটা বলল, "আমার নাম মৃত্যুঞ্জয়। এখানে আমায় সকলে ছোট মহারাজ বলে।" বলেই তারাপদর দিকে তাকাল, "গুরুজি আদেশ দিয়েছেন, তোমার কাছে কাগজপত্র যা আছে, আমার হাতে দিতে। গুরুজি দেখবেন।"

তারাপদ ভাবল আপত্তি করে। কাগজপত্রগুলো নিজের হাতে ভুজঙ্গভূষণকে দেবার কথা। অবশ্য মৃণাল দত্ত বলে দেননি যে, হাতে-হাতেই দিতে হবে। পৌঁছে দেবার কথাই তিনি বলেছিলেন। এই মৃত্যুঞ্জয়কে কাগজপত্র দিলে কি কোনো ক্ষতি হবে? তারাপদ বুঝতে পারল না। লোকটা যখন এই বাড়িরই লোক, বোধ হয় ভুজঙ্গভূষণের ডান হাত–তখন একে দিতে আপত্তি কি? তা ছাড়া ভুজঙ্গভূষণ তো বিকেলের আগে দেখাই করবেন না। কাগজপত্রের কথা ভুজঙ্গভূষণ বলে না দিলে এই লোকটা জানবেই বা কোথা থেকে?

তারাপদ একবার চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দন চোখের ইশারায় দিয়ে দিতে বলল।

কিট ব্যাগ খুলে যা কিছু দেবার বের করে তারাপদ মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়ে দিল।

চন্দন এতক্ষণ পরে কথা বলল। বলল, "কিছু মনে করবেন না, আমরা সারারাত ট্রেন জার্নি করেছি। খিদে-তেষ্টা পেয়েছে। একটু চা পেলে অন্তত ভাল হয়।"

মৃত্যুঞ্জয় বলল, "ও হ্যাঁ, আমি দেখছি। ব্যবস্থা হয়ে গেছে।" বলে চলে যেতে গিয়ে আবার বলল, "এখানে কোনো অসুবিধে হবে না। কিছু দরকার হলে আমাদের জানিও। নাও, বিশ্রাম করো। কলঘরটা ডানদিকে।" বলে হাত দিয়ে বাথরুমের দিকটা দেখাল।

মৃত্যুঞ্জয় চলে যাবার পর তারাপদ নিচু গলায় বলল, "চাঁদু, এ কোথায় এলাম । আমার ভাল লাগছে না। সাধুমামা আমায় চিনতে পারল না। কেমন শরীর হয়ে গেছে! একটাও কথা বলল না। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না।"

চন্দন বলল, "তোর লোক চিনতে ভুল হয়নি তো?"

"কী বলিস! সাধুমামাকে চিনব না?"

চন্দন কোনো জবাব দিল না। ঘরটা দেখতে লাগল। বড়ঘর। দু পাশে দুই বিছানা। একটা দেরাজ একপাশে। গোটা দুয়েক চেয়ার। মাথার ওপর পাখা। ইলেকট্রিক বাতি ঝুলছে। শীতকাল বলে পাখা চালানোর প্রয়োজন নেই। আর দিনের বেলায় বাতি জ্বালানোর প্রশ্নই ওঠে না। পুবের মস্ত জানলা দিয়ে আলো আসছে, রোদ অবশ্য নেই, সরে গেছে।

চন্দন বলল, "দাঁড়া, আগে মুখ ধুই, চা খাই, তারপর ভাবব। এখন আর মাথা খুলছে না।"

চন্দন কিট ব্যাগ খুলে টুথব্রাশ, পেস্ট, তোয়ালে বার করল। এক টুকরো সাবানও।

তারাপদ তার কিট ব্যাগ খুলতে লাগল। তার মুখ দেখলেই মনে হয় সে বেশ উদ্বেগ এবং হতাশা বোধ করছে।

ঘরের ভেতর দিকের দরজা খুলে চন্দন একটা প্যাসেজ দেখল, তার গায়েই বাথরুম।

তারাপদ জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরটা একেবারে শেষের দিকের। জানলার গা ঘেঁষে বাগান, পেছনের দিকে আস্তাবল। একটা বাদামী রঙের ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে ফাঁকা জমিতে। তারাপদ বুঝতে পারল, ভুজঙ্গভূষণের বাড়িতে ঘোড়ার গাড়ি আছে।

সেই ফটফট শব্দটা হঠাৎ কখন থেমে গেছে তারাপদ বুঝতে পারেনি। আচমকা খেয়াল হল। কান পেতে থাকল সামান্য, না, কোনো শব্দ নেই। সাধুমামার মুখ আবার তার মনে পড়ল। মানুষ না কঙ্কাল? কী হয়েছিল সাধুমামার? সাধুমামা কেন তাকে চিনতে পারল না? কেন কথা বলল না? সাধুমামা কি অসুখবিসুখে বোবা হয়ে গেছে? আশ্চর্য!

চন্দন ফিরে এসে বলল, “যা তারা, মুখটুখ ধুয়ে আয়। ফাইন জল এখানকার রিফ্রেশিং...।”

তারাপদ নিশ্বাস ফেলে মুখ ধুতে চলে গেল।

চা জলখাবার এসেছিল। বাড়িতে তৈরি জলখাবার । মিষ্টিও। চা-টাও মন্দ নয়।

দুই বন্ধু চা খেতে খেতে নিচু গলায় কথা বলছিল।

চন্দন বলল, “শোন তারা, আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু এতদূর এসে আর ফিরে যাওয়া যায় না।”

“এমন জানলে আমি আসতাম না, চাঁদু।”

“না এলে সম্পত্তি ফসকে যেত।” চন্দন যেন ঠাট্টাই করল।

তারাপদ মুখ কালো করে বলল, “যেত তো যেত। আমি গরিব ছিলাম, গরিবই থাকতাম; বটুকবাবুর মেসে আমার জীবন কেটে যেত। কিন্তু এ-কোথায় এলাম? মৃণাল দত্ত আমায় এত কথা বলে দেননি।’

চন্দন বলল, “এসে যখন পড়েছিস, দুটো দিন দেখে যা না কী হয়? আমাদের কী করবে ভুজঙ্গভূষণ? খুনও করবে না, জেলেও পাঠাবে না। যদি অবস্থা খারাপ দেখি, পালাব।”

“কেমন করে পালাবি এই দুর্গ থেকে?”

“পালাব। সে-ভার আমার।...এই বাড়িতে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে, তারা; অ-নেক। এই রহস্যগুলো কী?”

তারাপদ বিরক্ত হয়ে বলল, “তুই শার্লক হোমস্ নাকি?”

চন্দন বলল, “শোন, তুই এ-বাড়িতে একটা মেয়েকে দেখেছিস?”

“মেয়ে? না।” তারাপদ অবাক।

“আমি দেখেছি,” চন্দন বলল, “দোতলার দিকে ভেতর বারান্দায় একটা মেয়েকে দেখলাম। একটুর জন্যে। মনে হল, খুব রোগা, ফরসা, বয়স কম।”

তারাপদ বলল, “ভুজঙ্গভূষণ বা তার চেলার কেউ হবে।“

“হতে পারে,” চন্দন একটা সিগারেট ধরাল, “কাপালিকের বাড়িতে অতটুকু মেয়ে কেন?”

তারাপদর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়ে গেল। বন্ধুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল তারাপদ।

ভুজঙ্গভূষণ যে অতিথিদের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল সেটা বোঝা গেল। শীতের বেলা গড়িয়ে যাচ্ছিল, স্নান খাওয়া শেষ করল তারাপদরা। দোতলায় গিয়ে তাদের খেতে হল আসনে বসে। খেতে বসে মনে হল, এতরকম সুখাদ্য তারাপদ জীবনে খায়নি। মৃত্যুঞ্জয় তাদের তদারক করছিল। ঠাকুরগোছের একটা লোক খেতে দিচ্ছিল ওদের। সমস্ত কিছু পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন।

নিজেদের ঘরে ফিরে এসে চন্দন বলল, “তারা, তোর পিসেমশাই যে দারুণ খাতির করছে রে? এই রেটে যদি সাত দিন খাই আর ঘুমোই–এই শীতে একটা ফার্স্ট ক্লাস চেঞ্জ হয়ে যাবে।”

তারাপদ ঢেকুর তুলে বলল, “খাতিরের শেষটায় কি হয়, দেখ।”

“কেন, তুই সম্পত্তি পাবি, আর আমরা বগল বাজাতে বাজাতে কলকাতা ফিরব। “

“সাধুমামাকে আর একবারও দেখছি না কেন বল তো?”

“কী জানি! হয়ত তাঁর অন্য কাজ।”

“মৃত্যুঞ্জয়কে তোর কেমন লাগছে?”

“একটা ক্যারেকটার।”

“লোকটা শয়তান বলে মনে হচ্ছে আমার।”

“পাকা শয়তান। ...নে এবার একচোট ঘুমিয়ে নে। ট্রেনে ভাই ভাল ঘুম হয়নি।” বলতে বলতে চন্দন বিছানায় শুয়ে পড়ল। হাতের সিগারেটটা টিল করে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল।

তারাপদও প্রচুর খাবার পর একটা সিগারেট খাচ্ছিল। বলল, “চাঁদু, আজ একবার কিকিরার সঙ্গে দেখা করা যায় না? উনি তো বলেছেন বিকেলেই যশিডি থেকে ফিরবেন।”

চন্দন বলল, “আজ আর কী করে হবে? সন্ধের দিকে ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে দেখা হবে তোর। তারপর আর সময় কোথায়? স্টেশন কম দূর নয়।”

তারাপদ চুপ করে থাকল। চন্দন বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

তারাপদরও আলস্য লাগছিল। শীতের দুপুরে চন্দন ঘুমোচ্ছে। বিছানায় গা গড়িয়ে নানারকম ভাবতে ভাবতে তারাপদও ঘুমিয়ে পড়ল।

.

তারাপদর ঘুম ভাঙল শেষ বেলায়। শীতের দিন। হুহু করে রোদ পালিয়ে আলো মরে আসছে। ঘরের মধ্যে ছায়াছায়া ভাব। কেমন যেন বিষণ্ণ রঙ ধরে গিয়েছে বাগানে।

চন্দন ঘুমোচ্ছিল। তারাপদ হাই তুলতে তুলতে উঠল। জানলার কাছে দাঁড়াল। হাওয়া দিয়েছে শীতের, গাছপালায় সেই হাওয়া লেগেছে। দূরে যেন কোথায় একটা কাক ডাকছে। শব্দটা কানে খারাপ লাগছে না। গাছের পাতা উড়ে গেল বাতাসে, বোধ হয় ওই ইউক্যালিপটাস গাছটার শুকনো পাতা।

তারাপদ চোখেমুখে জল দিয়ে আসতে কলঘরের দিকে চলে গেল।

ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখল জানলার কাছে সাধুমামার মুখ ।

তারাপদ প্রথমটায় কেমন বিশ্বাস করতে পারেনি। যখন তার বিশ্বাস হল, তখন আর সাধুমামা নেই। কী যেন একটা বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই সাধুমামা চলে গেছেন।

তারাপদ তাড়াতাড়ি এসে জানলার কাছে দাঁড়াল। জানলায় গরাদ, মুখ বাড়ানো যায় না। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল তারাপদ–সাধুমামাকে দেখতে পেল না। ডেলাটা তুলে নিল তারাপদ। ধীরে ধীরে খুলল। এক টুকরো কাগজে কী যেন লেখা সিস-পেনসিলে; পড়তে কষ্ট হয় ।

তারাপদ পড়ল : "তুমি শেষ পর্যন্ত যমপুরীতে পা দিয়েছ। এসে ভাল করেছ। খুব সাবধানে থাকবে। আমি আছি । তোমায় পরে সব বলব। আমি বোবা সেজে আছি। এই যন্ত্রণা থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করবে বাবা? একাগজ রেখো না। নষ্ট করে ফেলো।"

অরাপদর সর্বাঙ্গ পাথর হয়ে গেল। সাধুমামা বোবা সেজে রয়েছে। কেন? তারাপদ তাদের উদ্ধার করতে পারে, মানে? কাদের? কারা এখানে বন্দী? কেন?

তারাপদ ভয়ে কেমন যেন হয়ে গিয়ে চন্দনকে ঠেলা মেরে জাগিয়ে তুলতে লাগল ।

"চাঁদু, এই চাঁদু; ওঠ..।"

চন্দন ধড়মড় করে উঠে বসল। ভেবেছিল, না জানি কী ঘটেছে; উঠে বসে দেখল ঘরটা ছায়ায় ভরা, তারাপদ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

তারাপদ বলল, "আচ্ছা ঘুম ঘুমোচ্ছিস? সন্ধে হয়ে গেল। ওঠ। ...এইটে পড়ে দেখ।"

ঘুম জড়ানো ছলছলে চোখে চন্দন বলল, "কী ওটা?"

"সাধুমামার চিঠি।"

চন্দন চিঠিটা নিল। চোখ ঝাপসা, কোনো রকমে পড়ল। বার দুই তিন। তারপর বলল, "এখানকার সবই মিস্টিরিয়াস ।"

.

এবাড়ির আরও বড় রহস্য তারাপদরা সন্ধের দিকে জানতে পারল।

শীতের দিন; বিকেল ফুরোতেই সন্ধে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল । কলকাতার মানুষ তারাপদরা, অন্ধকার দেখার সুযোগ কমই জোটে; জুটলেও এমন চারপাশ জুড়ে থমথমে অন্ধকার দেখার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। তার ওপর শীত। কুয়াশা জমছে মাঠঘাটে। কোনো দিকেই তাকানো যায় না।

মৃত্যুঞ্জয় এসে জানিয়ে গিয়েছে, সামান্য পরে এসে তারাপদদের ভুজঙ্গভূষণের কাছে নিয়ে যাবে। তারাপদরা জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে বসে আছে। সেই ফটফট শব্দটা আবার বিকেলের পর থেকে শোনা যাচ্ছিল । ডায়নামো চলছে আর কি। ঘরে বাতি জ্বলছি।

তারপর বুকের মধ্যেও ধকধক করছিল। ভুজঙ্গভূষণের কাছে যেতে হবে। জীবনে যাকে কোনোদিন দেখেনি, যার নামও তিন দিন আগে পর্যন্ত তার জানা ছিল না, সেই লোকটার কাছে। অথচ এই লোকই তারাপদকে দেড় দুই লাখ টাকার সম্পত্তি দিয়ে যেতে ডেকে পাঠিয়েছে। এমন মানুষকে দেখার আগে এমনিতেই বুক কাঁপার কথা। তার ওপর সেই মানুষ যদি এত রহস্যময় ও ভয়ঙ্কর হয় তবে কেমন লাগে? তারাপদর মুখ গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, বলে যেন অনবরত কেউ হাতুড়ি পিটছে।

চন্দন তারাপদর চেয়ে সাহসী । তবু তারও ভয় হচ্ছিল।

তারাপদর কাঠের মতন শুকনো গলা করে বলল, “চাঁদু, কী হবে?”

চন্দন বলল, “কিছু ভাই বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমাদের নিশ্চয় মেরে ফেলবে না। কাপালিকই হোক আর শয়তানই হোক–আজকের দিনে মানুষকে বাড়িতে ডেকে এনে মেরে ফেলা মুশকিল। পুলিসে ধরবে। আমরা দুজন যে এবাড়িতে এসেছি তার প্রমাণ কলকাতার মৃণাল দত্ত থেকে শুরু করে এখানে সাধুমামা পর্যন্ত সবাই দিতে পারবেন।”

তারাপদ ভয় সামলাবার জন্যে ঘন ঘন সিগারেট খেতে লাগল।

শেষে মৃত্যুঞ্জয় এল। বলল, “এসো।”

তারাপদরা উঠল।

ফাঁকা ফাঁকা ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি দিয়ে তারাপদরা দোতলায় এল। দোতলার ভেতর বারান্দা দিয়ে হেঁটে একটা ছোট ঘরের কাছে এসে মৃত্যুঞ্জয় বলল, “ওই ঘরে যাও। ঘরে থোয়ানো ধুতি, ফতুয়া, গরম চাদর আছে। তোমাদের এই জামা-প্যান্ট পালটে নেবে, জুতো-মোজা খুলে রাখবে । জানলার দিকে জল আছে। হাত ধুয়ে নেবে। নোংরা, বাইরের জামা কাপড়ে গুরুজির কাছে যাওয়া যায় না।”

চন্দন প্রতিবাদ করে বলল, “আমরা লন্ড্রির প্যান্ট জামা পরেছি।”

“তা হোক; এখানের এই নিয়ম। বাইরের কোনো পোশাকেই কাউকেই গুরুজির কাজে যেতে দেওয়া হয় না।”

“আমি ধুতি পরতে পারি না,” চন্দন বলল।

“তা হলে তুমি থাকো।”

তারাপদ চন্দনের হাত ধরে টানল। “ঠিক আছে–আমি তোকে ধুতি পরিয়ে দেব।”

ওরা দুজনে পোশাক পালটাতে পাশের ঘরে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে চন্দন রাগের গলায় বলল, "যত্ত বাজে নিয়ম। কোনো মানে। হয়? কোন মহারাজ তোর পিসেমশাই যে তাকে দেখতে হলে ধুতি পরতে হবে। কেমন শীত দেখছিস। ধুতির ভেতর দিয়ে ঢুকে হাড় কাঁপাবে।"

তারাপদ বলল, "কপাল ভাই। কিছু করার উপায় নেই।"

চন্দন একেবারেই ধুতি পরতে পারে না তা নয়, বছরে এক-আধ দিন পরে, রীতিমত যুদ্ধ করে।

ওরা জামা-প্যান্ট ছেড়ে ধুতি ফতুয়া পরতে লাগল।

পোশাক পালটে তারাপদরা বাইরে এল। মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে। বলল, "এসো ।"

বারান্দার গা-লাগানো একটা প্যাসেজ ঘুরে সামনের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল মৃত্যুঞ্জয়। বলল, "ভেতরে যাও, বসবার জায়গা আছে, গিয়ে বসে থাকো। কথাবার্তা বলো না।"

দরজা ভেজানো ছিল, মৃত্যুঞ্জয় খুলে দিল।

তারাপদরা ঘরে পা বাড়াল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সামনেই মোটা ভারী পরদা। পরদা সরিয়ে ঘরের মধ্যে তাকাতেই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল। কিছু দেখা যায় না। মনে হল, সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাবার পর হলে ঢুকলে চোখে কিছু দেখা যায় না, অনেকটা সেই রকম। কিন্তু সিনেমার হলে তবু এদিকে ওদিকে চোরা আলোর ব্যবস্থা থাকে, ছবি দেখানোর আলোও এক এক সময় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানে ওসব কিছু না। মিটমিট করে দুপাশে দুই চোরা দেওয়াল-আলো জ্বলছে যদিও, তবু সেই আলোয় কিছু দেখা যায় না।

দুই বন্ধু পাশাপাশি থমকে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে চোখ সয়ে এলে খুব অস্পষ্টভাবে ঘরটা চোখে পড়ল। ঘরের মাঝখানে দুটো চেয়ার। দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বসে থাকা ভাল ভেবে দুজনে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলল। পায়ের তলায় যে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। মনেই হয় না মাটিতে পা; যেন কোনো তুলোর মধ্যে পা ডুবে যাচ্ছে, এত নরম! কোনো সন্দেহ নেই, খুব দামি কার্পেট পাতা রয়েছে ঘর জুড়ে, কার্পেটের রঙটাও। হয় কালো, না হয় ঘন লাল–কালচে দেখাচ্ছে, অবশ্য এই অন্ধকারে সবই কালচে দেখাচ্ছে।

তারাপদরা কোনো রকমে চেয়ারে এসে বসল। বসামাত্র মনে হল, যেন নরম গদির মধ্যে সমস্ত শরীরটা ডুবে গেছে।

ভয় দু'জনেরই বুকের ওপর চেপে বসেছে। তবু চোখ আরও খানিকটা সয়ে আসায় তারা ঘরের চারপাশ দেখছিল। ঘর নিশ্চয় ছোট নয়। দেওয়ালগুলো দেখা যায় না। সারা ঘরে কেমন এক সুন্দর গন্ধ। দামি ধূপের, নাকি কোনো আতর ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বোঝা যায় না। গন্ধটা বাতাসে ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছিল। তাদের চেয়ারের সামনে–খানিকটা তফাতে আরও একটা চেয়ার চোখে পড়ল। তারাপদদের দিকে মুখ করা। সিংহাসনের মতনই যেন। উঁচু, বড়। মনে হল–বেশ যেন বাহারি। চেয়ারের দু'পাশে পরদা। ভেলভেটের পরদা বুঝি। কোঁচানো হয়ে ঝুলছে। ঠিক একেবারে ছোট স্টেজের দুটো উইং। মাথার ওপর দিকটা এত

অন্ধকার যে, কোথায় ছাদ বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ চন্দন তারাপদর হাত আঁকড়ে ধরল। ধরে ফিসফিস করে বলল, "তারা, সেই বেড়াল।

তারাপদ তাকায়। ভেলভেটের পরদার একপাশে, ছোট্ট একটা গোল টেবিলের ওপর সেই কালো বেড়াল, মৃণাল দত্তের বাড়িতে যেমন দেখেছিল তারা। অন্ধকারে তার গা দেখা যাচ্ছে না, চোখের মণিদুটো শুধু জ্বল। করছে। নিশ্চয় কালো বেড়াল। মৃণাল দত্তের বাড়ির বেড়ালের মতনই মরা, সাজানো বেড়াল। নয়ত একই জায়গায় বসে থাকবে কেন?

চন্দনের হাত ঘামছিল। সে বেড়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। নিশ্চয় ঘুরবে, মুখ ফেরাবে।

এমন সময় ভেলভেটের পরদার পরদার দিকে আর-একটা চোরা আলো জ্বলে উঠল। লাল আলো। মৃদু তার আভা।

আর তারাপদরা দেখল এক ভৌতিক আকৃতি ডানদিকের পরদা সরিয়ে এসে দু মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর সেই সিংহাসনের মতন চেয়ারে বসল ধীরে ধীরে।

ভয় দুজনেরই গলায় এসে জমা হয়েছে। জিব শুকনো। বুক যেন আর সইতে পারছে না এত জোরে ধকধক করছে হৃদপিণ্ড । শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। অসাড় লাগছে। কাঁপছে হাত-পা ।

মানুষটি যে কী পরেছে বোঝা যাচ্ছিল না। হয়ত আলখাল্লা। রক্ত-গৈরিক রঙের। তার মাথা থেকে গলা পর্যন্ত একটা ঢাকা পরানো, শুধু নাক মুখ আর চোখের জায়গাটা ভোলা। তারাপদরা প্রচুর ইংরেজি ছবি দেখেছে। তাদের মনে হল, এককালে এই রকম মুখোশ পরে রাজারাজড়ারা গোপন জায়গায়। যেত, এইরকম মুখোশ পরেই কেউ কেউ অনাচার অত্যাচার করতে বেরিয়ে পড়ত; দুশমন দমন করতেও যেত।

এই কি ভুজঙ্গভূষণ?

হঠাৎ সেই মানুষটি গম্ভীর চাপা গলায় বলল, "তারাপদ, আমি তোমার পিসেমশাই ভুজঙ্গভূষণ।"

উঠে গিয়ে প্রণাম করার কথা তারাপদ ভুলে গেল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "আমার মুখ পুড়ে গিয়েছে। ব্যান্ডেজ বাঁধা। তোমাদের দেখতে ভাল লাগবে না। তাই এটা পরেছি। তুমি আমার মুখ দেখতে পাচ্ছ না বলে আমারই কষ্ট হচ্ছে। আমার শরীর ভাল নয়। তোমায় শুধু দেখতে এসেছি। তুমি এসেছ, আমি খুশি হয়েছি।"

তারাপদ সাহস করে বলল, "মৃণালবাবু আমার হাত দিয়ে কিছু কাগজপত্র আর চিঠি দিয়েছিলেন আপনাকে দেবার জন্যে। আপনি পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। ..ওই ছেলেটি তোমার বন্ধু, ডাক্তার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মৃণালবাবুর মুখে শুনলাম, আপনার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে–তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। কী হয়েছিল আপনার?"

"কী হয়েছিল তুমি ঠিক বুঝবে না। অগ্নিচক্রের মধ্যে মুখ ছিল, মনটা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে

যায়। একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গেলে পাপ হয় সেই পাপের ফল।”

“অগ্নিচক্র কী?”

“তোমরা বুঝবে না। না দেখলে বুঝতে পারবে না। এই যে ঘরে তোমরা বসে আছ, এই ঘরে পরলোক থেকে আত্মারা আসেন। আমি তাঁদের ডেকে আনি। তাঁরা আসেন, দেখা দিয়ে যান, কত লোক তাদের হারানো প্রিয়জনকে এখানে একটু দেখতে আসে। আত্মা অদৃশ্য। তাকে দেখা যায় না। তবে সদয় হলে তাঁরা আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। অনেক সময় স্পর্শও করে যান। চিহ্নও রেখে যান কোনো কোনো সময়ে।...ওই দেখো, একজন এসেছেন...এই মুহূর্তে এসে গেছেন।” বলতে বলতে যেন ভুজঙ্গভূষণ কেমন হয়ে গেলেন, মাটি থেকে একটা বড় পুজোর ঘণ্টা উঠিয়ে নিয়ে বাজালেন সামান্য। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর ঘুটঘুঁটে অন্ধকার।

সেই নিকষ কালো অন্ধকারে মাথার ওপর ক্ষীণ একটু আলো জ্বলে উঠল । আর কোথা থেকে একটা লাল বল, সোনালি ডোরা দেওয়া, ঘরের মাঝখানে এসে হাজির হল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “আপনি কে আমি জানি না। যদি আমার পরিচিত হন আপনার আসার প্রমাণ দিন।”

বলার পর বলটা কাঁপতে লাগল, নড়তে লাগল, তারপর ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে লাগল, ভাসতে ভাসতে ওপরে ছাদের দিকে উঠে গেল, ওপরের আলোয় সেই লাল আর সোনালি রঙের বলটা ঝকঝক করে উঠল। বলটা আবার সামান্য নেমে এল। নেমে এসে লাফাতে লাফাতে ঘরের ডান দিক থেকে বাঁ দিক পর্যন্ত চলে গেল। আবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আসতে লাগল।

তারাপদ ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবার মতন।

চন্দন দু চোখ বন্ধ করে ফেলল।

সাত

পরের দিন সকালেও তারাপদ নিজেকে সামলে নিতে পারল না। চোখমুখ বসে গিয়েছে, শুকনো চেহারা। পর পর দু' রাত্রিই ঘুম হল না বেচারির; আগের দিন কেটেছে ট্রেনে; আর কাল সারা রাত বিছানায় শুয়ে ভয়ে আতঙ্কে মরেছে । চন্দন ডাক্তার-মানুষ, তার অনেক সাহস, মড়া কাটা থেকে শুরু করে সে কত কী করেছে, সহজে ঘাবড়ে যাবার ছেলে চন্দন নয়; তবু চন্দনও কেমন বোকা হয়ে গেছে। ভয়ও পেয়েছে খানিকটা। দুজনে আলোচনা করেও বুঝতে পারছে না–এরকম ঘটনা কেমন করে ঘটে? ছোট ফুটবল সাইজের, একটা বল কেমন করে হাওয়ার মধ্যে নেচে বেড়ায়? ভৌতিক ব্যাপার? না ম্যাজিক?

যদি বিশ্বাস করে নেওয়া যায় ম্যাজিক, তবে ভয়-ভাবনার কিছু থাকে না। কিন্তু ম্যাজিক বলে ঠিক বিশ্বাস করতেও মন চাইছে না।

সকাল বেলায় মুখটুক ধুয়ে কোনো রকমে চা খেয়ে দুজনে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। বাগানে।

তারাপদ বলল, "চাঁদু, কিকিরার কাছে যেতেই হবে।"

চন্দন বলল, "আমিও তাই ভাবছি। কখন যাবি।"

'বিকেলে যাওয়া যাবে না। ভুজঙ্গ আবার আজ বিকেলের পর আমাদের সঙ্গে দেখা করবে বলেছে। যেতে হলে এখনই যাওয়া দরকার।"

চন্দন বলল, "চল, আমরা ঘুরে আসি।"

"কাউকে কিছু বলতে হবে না?"

"কী দরকার । নতুন জায়গা, কেমন সুন্দর দেখতে, আমরা একটু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি–এইভাবে যেতে হবে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব, বেড়াচ্ছি। তারপরও যদি খোঁচায়, বলব–স্টেশনে যাচ্ছি ব্লেড কিনতে কিংবা সিগারেট কিনতে। "

তারাপদ বলল, "ঠিক আছে, চল।"

বাগানের মধ্যে সামান্য সময় দুজনে বেড়ানোর ভাব করে ঘুরে বেড়াল। বাড়ির চার পাশ না হলেও অন্তত তিনটে পাশ দেখে নিল । ভুজঙ্গভূষণের এই পুরী যতই দুর্গ হোক, কেউ যদি পালাতে চায় নিশ্চয় পালাতে পারে । সব দিক সর্বক্ষণ আটকে রাখা সম্ভব নয়। মানুষ জেলখানা থেকেও পালায়–এখান থেকে পালানো নিশ্চয়ই তার চেয়ে কঠিন নয়।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতেই মৃত্যুঞ্জয়কে দেখা গেল।

চন্দন বলল, "তারা, তোকে এবার একটু খেলতে হবে।"

তারাপদ অবাক চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল।

চন্দন বলল,"তুই ওই মৃত্যুঞ্জয়টাকে ডাক। ডেকে বল, ছোট ফটকের তালা খুলে দিতে।

বলবি, আমরা বেড়াতে যাব। শোন, মিনমিন করে কথা বলবি না ওর সঙ্গে, হুকুমের গলায় বলবি।”

“এখানকার ছোট মহারাজাকে হুকুম? তুই বলছিস কী?” তারাপদ ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

চন্দন বলল, “আমি ঠিকই বলছি। তুই ভুজঙ্গভূষণের সম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছিস। ও বেটার কোনো রাইট নেই এখানে; তোর আছে। তুই এখন থেকেই এটা দেখিয়ে যা।”

“তারপর যদি–”

“যদি-টদি বাদ দে; নো রিস্ক নো গেই।...তুই চালা না–তারপর আমি আছি।” বলে চন্দন মাতব্বরের মতন মৃত্যুঞ্জয়কে ডাকল।

মৃত্যুঞ্জয় কাছে এলে তারাপদ ছোট ফটকের তালা খুলে দিতে বলল। ঠিক হুকুমের গলায় অবশ্য বলতে পারল না।

“খুবই আশ্চর্য যে, মৃত্যুঞ্জয় সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করল, তারাপদরা কোথায় যাবে? তারপর চাকরকে ডেকে তালা খুলে দিতে বলল।

ফটকের বাইরে এসে তারাপদরা হাঁটতে লাগল। মাঠ ময়দান, গাছপালা, দূরের জঙ্গল–যেদিকে চোখ যায়–সব যেন রোদে ভেসে যাচ্ছে। শীতের রোদ, তবু কী গাঢ়, কত উষ্ণ। আকাশ নীল, রোদ যেন উপচে পড়ছে আকাশ থেকে; মাঠঘাটের ভেজা ভাব শুকিয়ে এসেছ, শিশির আর চোখে পড়ছে না। এখনো শীতের সেই শনশন হাওয়া দেয়নি, অল্পস্বল্প যা আছে তাতে ভালই লাগে।

কাল রাত্রের সেই অন্ধকার রহস্যময় ঘর, সেই আত্মার ব্যাপার-স্যাপার, বলের নাচ যেন অন্য একটা জগৎ। আর এখানকার এই রোদ, মাঠ, কুলঝোঁপ, আতাগাছের ডালে বসে পাখির ডাক–এ আর-এক জগৎ। এই জগৎ তারাপদরা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে, কিন্তু কালকের ওই রহস্যময় ঘটনার কিছুই বুঝতে পারে না। মনে হয় যেন দুঃস্বপ্ন।

হেঁটে আসতে আসতে দুজনেই গল্প করছিল।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, “চাঁদু, তুই তো ডাক্তার । আত্মা-টাত্মা কখনো দেখেছিস?”

“না ভাই, আমি মর্গও দেখেছি, বাট নো আত্মা।”

“আমি প্ল্যানচেট দেখেছি,” তারাপদ বলল, “পরলোক-টরলোক নিয়ে একবার একটা বইও পড়েছিলাম। কিছু বুঝিনি।”

“এ-সব গাঁজাখুরি... ।”

“কিন্তু কাল আমরা নিজের চোখে যা দেখলাম–?”

“তাই তো ভাবছি। পি সি সরকারের ম্যাজিক যেন!”

এমন সময় একটা দেহাতী গোছের লোককে সাইকেলে করে আসতে দেখা গেল দূরে। ভুজঙ্গভবনের দিক থেকে আসছে। চন্দনের চোখে পড়েছিল।

চন্দন বলল, “তারা, ওই লোকটা এদিকে কেন আসছে?”

তারাপদ দেখল। বলল, “আমরা কোথায় যাচ্ছি দেখতে আসছে বোধ হয়।”

“তার মানে ভুজঙ্গ আমাদের ওপর চোখ রাখতে চায়? না, মৃত্যুঞ্জয়?”

“বুঝতে পারছি না।”

দুজনেই হাঁটতে লাগল, দাঁড়াল না। চন্দন হঠাৎ বেয়াড়া গলায় গান গাইতে শুরু করল, যেন খুব খুশ মেজাজে রয়েছে।

লোকটা কাছাকাছি এল। পুরোনো সাইকেল, মাঝ বয়েসী লোক; বাঙালি বলে মনে হয় না। তারাপদদের কাছাকাছি এসেও দাঁড়াল না। একবার শুধু দেখল, খাতিরের ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো, তারপর চলে গেল।

সাইকেল খানিকটা এগিয়ে যেতে চন্দন বলল, “তারা, আমার মনে হচ্ছে লোকটা নজর রাখার জন্যে এসেছে। কিন্তু কেন? ভুজঙ্গ না মৃত্যুঞ্জয়, কার হুকুমে ও নজর রাখছে? আমরা পালিয়ে যাব ভাবছে নাকি?”

তারাপদ বলল, “চাঁদু, সম্পত্তির নিকুচি করেছে, চল, আমরা এই ভূতের বাড়ি থেকে পালাই।”

মাথা নেড়ে চন্দন বলল, “এত সহজে পালাব কেন রে? আরও দু-একটা দিন দেখি । অন্তত তোর পিসেমশাইয়ের অরিজিন্যাল মুখটা একটু দেখি। পালাবার জন্যে তুই ভাবিস না। ওটা আমার হাতে ছেড়ে দে। সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। পালাবার জায়গা দেখে রেখেছি ভাই।

আরও একটু এগিয়ে আসতেই আচমকা পাখির ডাকের মতন শোনা গেল । ডাকটার একটা আলাদা সুর ছিল, কানে লাগে। চন্দন দাঁড়িয়ে পড়ল, তার দেখাদেখি তারাপদও দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চন্দন আশেপাশে তাকাল । ডানদিকে খানিকটা উঁচু জমি, মস্ত মস্ত দুই পাথর, আশেপাশে ছোট ছোট পাথর-টুকরো পড়ে আছে। রুক্ষ জায়গা, কাঁকরভরা মাটি। কোনো গাছপালা চোখে পড়ছে না। কাঁটা গাছের ছোট্ট একটু ঝোঁপ পাথরের পাশে। কোথাও কোনো পাখির চিহ্ন নেই।

চন্দন কিছু বোঝবার আগেই একটা ছোট ঢিল এসে পায়ের কাছে পড়ল । তারপরেই পাথরের আড়াল থেকে কিকিরার মুখ উঁকি মারল।

“আরে, আপনি?” চন্দন অবাক । তারাপদকে বলল, “কিকিরা।”

হাতছানি দিয়ে কিকিরা ডাকলেন।

তারাপদরা এগিয়ে গেল ।

কিকিরা বললেন, “এখানে আসুন স্যার, গুঁড়ি মেরে চলে আসুন।”

তারাপদরা পাথরের আড়ালে গেল। কিকিরা বললেন, “একটু আগেই এক চেলা গেল, দেখেছি। দেখেই শেলটার নিয়েছি।”

“আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম।”

“আমিও আপনাদের খোঁজে আসছিলাম। মনে হচ্ছিল, দেখা হয়ে যেতেও পারে।”

“ওই লোকটাকে আপনি চেনেন?”

“না। তবে আন্দাজ করতে পারি।”

“ও কি আমাদের ওপর নজর রাখছে?”

“মনে তো হয়, স্যার। তবে ও বেটা অনেকটা চলে গেছে। দেখতে পাবে আর। যদি দেখি ফিরে আসছে, আপনাদের বলব। আপনারা সোজা ভুজঙ্গ ভয়ালের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করবেন।”

চন্দনরাও একবার দেখে নিল। লোকটা বেশ দূরে চলে গেছে। সেখান থেকে পাথরের আড়ালে তাদের দেখতে পাবে না। না গেলে কী ভাববে বলা মুশকিল। মাঠের মধ্যে দুটো লোক নিশ্চয় ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু অন্য সন্দেহই বা কী করবে? ভাববে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিকিরা বলল, “খবর বলুন, স্যার।”

তারাপদ বলল, “খবর অনেক। কিন্তু এখানে বলব?”

“এখানেই স্যার নিরাপদ। যদি লোকটা এখনি না ফিরে আসে,তা হলে এই হল বেস্ট জায়গা।”

“যদি আসে?”

“সামনে গিয়ে মনের সুখে নিজেরা গল্প করবেন, লাফাবেন, নাচানাচি করবেন, যেন ওর মনে হয় আপনারা কলকাতার লোক, ছেলেমানুষ, বাইরে বেড়াতে এসে বেজায় খুশি হয়েছেন। “

“আপনাকে যদি দেখতে পায়?”

“পাবে না স্যার, পাবে না। আমি মিলিটারির পজিসন নিয়েছি।”

চন্দন একটা সিগারেট ধরাল।

কিকিরা বললেন, “দিন স্যার, একটা ধোঁয়া দিন। টানি।”

কিকিরা সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

তারাপদ খুব সংক্ষেপে গতকালের ঘটনা বলল। বলে ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণটা দিল। তার গলার স্বর থেকে বোঝা যাচ্ছিল, তারাপদ উত্তেজনা, ভয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বিধার মধ্যে রয়েছে।

কিকিরা মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। আজ তাঁর বেশবাস খানিকটা অন্যরকম। পরনে

পাজামা, গায়ে কেমন এক আলখাল্লা ধরনের জামা। মাথায় গরম হনুমান-টুপি। টুপির তলার দিকটা গুটোনো। পায়ে খাকি কেডস্ জুতো।

চন্দন বলল, "মশাই, ভুজঙ্গ আত্মা নামায়; আপনি জানেন?"

কিকিরা ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। "জানি।"

"ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপারটা আপনারা এমনিতে বুঝবেন না। একে বিদেশিরা পেঁয়াস। বলে।"

"সেঁয়াস? সেটা আবার কী?"

"সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, আত্মাটাত্মা নামানো হয়, আত্মাদের দিয়ে নানারকম ভেলকি দেখানো হয়।"

"আপনি আত্মা মানেন?"

"আমার মানামানির কথা জিজ্ঞেস করবেন না। আত্মা মানি কিনা আমি জানি না। তবে ভুজঙ্গর আত্মাটাত্মা মানি না।"

তারাপদ বলল, "তা হলে ও কেমন করে ওই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটাল?

কিকিরা চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন, "কেমন করে ঘটল তা আমি বলতে পারব না। নিজের চোখে দেখলে বলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু স্যার, আমি বলছি, এ হল ভেলকি। বড় রকমের ম্যাজিক। বিশ্বাস করবেন না। ভুজঙ্গ এই ভেলকি দেখিয়েই তার প্রতিপত্তি করেছে, বহু লোকের সর্বনাশও করেছে সেই সঙ্গে। কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত পাগলের মতন হয়ে গেছে, কারও কারও যথাসর্বস্ব গিয়েছে। আপনারা ওই পিশাচের ধোঁকায় ভুলবেন না।"

চন্দন বলল, "আপনি আমাদের কী করতে বলছেন তা হলে?"

"আমি বলছি, আপনারা রয়ে সয়ে থাকুন। ভয় পাবেন না। চোখ খুলে ভুজঙ্গর বাড়ির সবকিছু লক্ষ করার চেষ্টা করুন। আপনাদের ও প্রাণে মারার সাহস করবে না।...শুনুন স্যার, এই মানুষটা–কিকিরা দি গ্রেট–একেবারে অপদার্থ নয়, যশিডিতে আমার অনেক মক্কেল আছে,তার মধ্যে একজন রয়েছে পুলিসের লোক–তেওয়ারিসাহেব। আমি তাঁকে বলে এসেছি। ভুজঙ্গ যদি বেশি চালাকি করার চেষ্টা করে, এবার আমি ওকে ছাড়ব না।"

তারাপদ কিকিরার মুখ দেখতে লাগল। মানুষটির চোখ দেখলে বোঝা যায়–কিসের যেন এক জ্বালা তার চোখে ঝকঝক করে উঠেছে।

মাথার টুপিটা খুলে নিলেন কিকিরা, রোদে মাথা তেতে উঠেছে। বললেন, "ভুজঙ্গ এখনো তার আসল চাল চালেনি, স্যার। কাল সে আপনাদের ভেলকি দেখিয়ে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ধরুন আজ কিংবা আগামী কাল সে আসল চাল চালবে।"

"কী চাল?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল ।

কিকিরা বললেন, “আমার মনে হচ্ছে–চালটা আপনাকে নিয়ে। ভুজঙ্গ হয়ত আপনাকেই সব দিয়ে যেতে চায়, কিন্তু দিয়ে যাবার আগে সে আপনার সঙ্গে শর্ত করতে চাইবে। কিসের শর্ত আমি বুঝতে পারছি না! ভুজঙ্গ এত শঠ আর শয়তান যে তার চাল আগে থেকে বোঝা যায় না। তাই বলছি–আপনারা ধৈর্য ধরে থাকুন। দেখুন। ভয় পাবেন না। আমি এখানেই থাকব। আপনাদের খোঁজখবর করব। যদি কোনো বিপদে পড়েন ভুজঙ্গর আস্তাবলে রামবিলাস বলে যে কোচোয়ান আছে তাকে বলবেন। রামবিলাস আমার লোক। বুঝলেন? আমি কোথায় থাকব সে জানে?”

তারাপদরা অবাক হয়ে কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল। চন্দন বলল, “ভুজঙ্গের বাড়িতে আপনার লোক কে কে আছে?”

কিকিরা যেন কতই লজ্জা পেয়েছেন, এমনভাবে হাসলেন। বললেন, “স্যার, আমার ধাতটাই হল ম্যাজিশিয়ানের, সব খেলাই ধীরেসুস্থে দেখাতে হয়, ঝট করে দেখাতে নেই। যথাসময়ে সবইদেখতে পাবেন।”

তারাপদ বলল, “কিকিরাবাবু, আপনি সাধুমামাকে চেনেন?

কিকিরা কেমন একটু হেসে বললেন, “চিনি।”

“কেমন চেনেন?”

“ভাল করেই চিনি। দয়া করে আমায় এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আপনারাও আর দেরি করবেন না। এবার ফিরতে শুরু করুন। ওই লোকটার ফেরার সময় হয়ে গেছে।... শুনুন, আর-একটা কথা বলে দিই। বাড়িতে এমনভাবে থাকবেন যেন ভুজঙ্গর ভেলকি দেখে আপনারা একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছেন। কাউকে বুঝতে দেবেন না, আপনারা ব্যাপারটা সন্দেহ করেছেন।...আর হ্যাঁ, কাল আমি আপনাদের জন্যে একটা জিনিস নিয়ে আসব। আজকের রাত্রের খেলাটা আগে দেখে নিন, দেখুন ভুজঙ্গ কী করে।”

তারাপদরা উঠতে লাগল। “কাল কোথায় দেখা হবে?”

“কাল আপনারা ওই জঙ্গলের দিকে বেড়াতে যাবেন। আমি থাকব । একটা ভাঙা সাঁকো আছে, নালার মতো নদী, শুকনো; ওখানে থাকব।”

উঠে দাঁড়িয়ে চন্দন হেসে বলল, “স্যার, আজ আপনার একটা ইংলিশ শুনলাম না।”

কিকিরা হেসে বললেন, “শুনবেন, ঠিক সময়ে শুনবেন। এখন ভুজঙ্গ আমার ইংলিশ স্টিম করে দিচ্ছে। পেটে কিছু থাকছে না, স্যার। পেটে না থাকলে কি করে ইংলিশ হবে? ইংলিশ হল পেট্যারন্যাল ব্যাপার, পেট প্লাস ইন্টারন্যাল সন্ধি করুন...”

চন্দন হো হো করে হেসে উঠল।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে দুজনেই রাস্তায় নেমে এল। হাত নাড়ল। কিকিরাও হাত তুললেন।

ফিরতে লাগল দুজনেই।

তারাপদ বলল, “চাঁদু, আমার মনে হচ্ছে–ভুজঙ্গর বেশ কিছু শত্রু আছে। তারা একটা দল

করেছে। সেই দলে সাধুমামা, কিকিরা, রামবিলাস না কি নাম বললেন কিকিরা–ওরা আছে। আর ভুজঙ্গর দলে আছে তার চেলারা।”

চন্দন বলল, “তাই মনে হয়।”

আরও খানিকটা এগিয়ে চন্দন ঘাড় ঘোরাল পিছনে। সাইকেলে-চড়া লোকটিকে দেখতে পেল না; কিকিরাকেও চোখে পড়ল না।

দুপুরটা ভালই কাটল। ভুজঙ্গভূষণের লোকজন আতিথ্যের ব্যাপারে কোনো কৃপণতা করল না। খাওয়া, শোওয়া, বাগানে ঘুরে বেড়ানো–কোনো দিকেই কারও কোনো বাধা নেই। কিন্তু তারাপদদের কেমন মনে হচ্ছিল, তারা যেন কাদের নজরে নজরে রয়েছে। সাধুমামার সঙ্গে বার দুই চোখাচুখি হয়েছে, হওয়া মাত্র সাধুমামা সরে গেছেন।

বিকেল পড়তে না পড়তে ফুরিয়ে গেল। তারপর সন্ধে। ৪ ।

তারাপদর তৈরি । আজ আবার সেই রহস্যময় ঘরেগিয়ে বসতে হবে। ভুজঙ্গ গতকালই জানিয়ে দিয়েছিলেন। আজ আবার কী দেখতে হবে কে জানে?

তারাপদ বরাবরই ভিতু ধরনের। বড় বেশি নিরীহ। কিকিরা যতই সাহস দিন, ভূত, প্রেত, আত্মা বিশ্বাস করুক আর না করুক তারাপদ, তবু বিকেল থেকেই বেশ বিচলিত বোধ করতে লাগল। সন্ধের মুখে তার মুখ কেমন শুকিয়ে এল। তারাপদ চন্দনকে বলল, “চাঁদু, আমার এ-সব ভাল লাগে না। মিস্ট্রিই বল আর অলৌকিক ব্যাপারই বল–কোনোটাই আমি সহ্য করতে পারি না। “ চন্দন বলল, “উপায় নেই ভাই, ভুজঙ্গর সব রকম খেলা দেখতেই হবে। লোকটার মনে কী আছে এখনো বোঝা যায়নি।”

তারাপদ বলল, “আজ আমি স্পষ্টই বলব, ভুজঙ্গকে বলে দেব–আত্মাটাত্মা। আমি দেখতে চাই না। আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাই। আপনার মুখ দেখতে চাই। হয় সাফসুফ কথা বলুন মশাই, না হয় ছেড়ে দিন, বাড়ি চলে যাই–আপনার সম্পত্তি আমি চাই না।”

দুই বন্ধুর কথাবার্তার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় এসে তাদের ডাকল। “এসো।”

.

সেই একই ঘর । কালকের মতনই অন্ধকার । বাতি যেটুকু জ্বলছে তাতে পাশের মানুষকেও আবছা দেখায়। ধূপধুনো গুগগুলের সেই রকম গন্ধ । তফাতের মধ্যে আজ একটা ছোট টেবিল রয়েছে গোল ধরনের, তার তিন দিকে চেয়ার।

তারাপদরা বসল।

ওরা বসার পর আচমকা কোথা থেকে ভারী গলায় স্তোত্র পাঠের মতন গানের সুর ভেসে এল । তারপর সেটা স্পষ্ট হল, যাকে বলে। জলদগম্ভীর–সেই স্বরে কে যেন স্তোত্র পাঠ করতে লাগল। সংস্কৃত স্তোত্র । কে কোথায় গান করছে বোঝবার আগেই সেই গম্ভীর স্বর যেন কেমন অন্যমনস্ক করে ফেলল তারাপদকে ।

স্তোত্রের মধ্যেই ভুজঙ্গভূষণ এলেন। কখন এলেন বোঝা গেল না। তাঁর বসার আসনেই বসলেন। মাথার ওপর সেই লাল আলো জ্বলে উঠল। ভুজঙ্গভূষণের পরনে রক্ত-গৈরিক

বসন। একটা বড় রুদ্রাক্ষ ঝুলছে গলায় । মুখের ওপর সেই আবরণ।

স্তোত্র পাঠ বন্ধ হয়ে গেল।

ভুজঙ্গভূষণই কথা বললেন প্রথমে। বললেন, "তারাপদ, কাল তুমি ভয়, পেয়ে গিয়েছিলে। তোমার বন্ধুও ভয় পেয়েছিল। আজ ভয় পেয়ো না যাঁরা তোমার আত্মীয়–মা, বাবা, বোন–"

"মা, বাবা, বোন-" তারাপদ চমকে উঠে বলল, গলার স্বর যেন বুজে আসছে।

"হ্যাঁ, তোমারই নিজের লোক। এঁদের আত্মা যখন আসেন তখন তোমার ভয় কী? এঁরা কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করবেন না। অনেক দূর থেকে তারা আসেন, আসতে তাঁদের কষ্টও হয়। এই মর্ত্যলোকে তাঁরা আসতে চান না, তবুও আমরা যখন ডাকি, না এসে পারেন না। আজ আমি তোমার মাকে প্রথমে তাকব।"

"মা?"

"তোমার মা আমার আত্মীয়া। আমরা তাকে ছেলেবেলায় বেণু বলে ডাকতাম। বলতে গেলে আমার বোনেরই মতো। আমি বেণুকে ডাকব।"

তারাপদর গায়ে কাঁটা দিল। মা! মা আসবে? কোন্ ছেলেবেলায় বাবাকে সে হারিয়েছে, স্কুলে পড়ার সময়, তারপর মা-ই ছিল তার সব । কত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছে, সেই মা আজ আসবে? তার কাছে? মা তা হলে আজও আছে, এ-জগতে নয়, অন্য জগতে, হয়ত স্বর্গে। মা কি তাকে দেখতে পায়?

তারাপদর বুকের মধ্যে কত দুঃখ যেন টনটন করে উঠল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তোমার মা আসবে। এই ঘরেই আসবে। কিন্তু তুমি তাকে দেখতে পাবে না। আত্মা অদৃশ্য। ছায়ারূপে তাঁরা আসেন, চলে যান। মানুষের চোখ তাঁদের দেখতে পায় না। কোনো কোনো চিহ্ন তাঁরা রেখে যান, স্পর্শও দিয়ে যান–কিন্তু সব সময় নয়, কখনো কখনো, এসব কাজ করতে তাঁদের কষ্ট হয়।"

কথা শেষ করে ভুজঙ্গভূষণ পায়ের কাছে পড়ে থাকা ঘণ্টা তুলে নিয়ে বাজালেন।

ঘণ্টা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুজঙ্গভূষণের পিঠের দিক থেকে ভেলভেটের পরদা সরিয়ে একটি মেয়ে এল। ভাল করে দেখা যায় না মেয়েটিকে। তবু যেটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল, কিশোরী মেয়ে, বছর পনেরো হয়ত হবে বয়স, রোগা দেখতে, ধবধবে ফরসা রঙ, লম্বাটে মুখ, মাথার চুল এলো করা, পুনে ঘন কালো শাড়ি জামা। মেয়েটি এল। কিন্তু কিছুই দেখল না । কোনো দিকেই তাকাচ্ছিল না। ভুজঙ্গভূষণের পায়ের দিকে রাখা ঘণ্টাটা তুলে লি। নিয়ে তারাপদদের কাছে এসে বসল। ঘণ্টাটা নিচে টেবিলের তলায় নামিয়ে রাখল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তারাপদ, এই মেয়েটির মধ্যে দিয়ে তোমার মা হনবেন। ও হল আধার, ওর মধ্যে দিয়ে তোমার মাকে আসতে হবে। তোমরা দুজনে ওর হাতে হাত ছুঁয়ে বসো। পায়ে পা ছুঁইয়ে রাখবে। ও তোমাদের দেখিয়ে দেবে।"

তারাপদ কিছু ভাবতে পারছিল না। বিহ্বল বোধ করছিল।

চন্দনের মনে হল, এই হয়ত সেই মেয়ে–গতকাল যাকে সে এক লহমার জন্যে দোতলায়

দেখেছিল।

ছোট গোল টেবিলের তিন দিকে চেয়ার। মেয়েটি একটি চেয়ারে বসল। ইশারায় তারাপদদের চেয়ার সামান্য সরিয়ে নিতে বলল। চেয়ার সাজিয়ে নেবার পর দেখা গেল, টেবিলের ওপর হাত ছড়ালে তারাপদর একটা হাত মেয়েটির হাত ছোঁয়, অন্য হাত চন্দনের হাত ছোঁয়। চন্দনেরও সেই একই অবস্থা, তার বাঁ হাত তারাপদর হাত ছুঁয়ে রয়েছে, ডান হাত মেয়েটির হাত ছুঁয়েছে। এ যেন বাচ্চা বয়েসে সেই গোল হয়ে হাতে হাত ধরে খেলার মতন।

মেয়েটি তার পা দু পাশে বাড়িয়ে দিল। ইশারায় তারাপদদের বলল, ওদের এক একটা পা দিয়ে তার পা ছুঁয়ে থাকতে।

সামান্য বিব্রত বোধ করলেও তারাপদরা পা বাড়াল ।

মেয়েটির পা বড় শক্ত শক্ত লাগল তারাপদর। অবশ্য বুড়ো আঙুলের কাছটায় আলগা করে ছুঁয়ে থাকল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তুমি এবার মনে মনে তোমার মাকে ডাকো, তারাপদ। চোখ বন্ধ করে। একমনে। আমিও তাকে ডাকছি।" বলে ভুজঙ্গভূষণ তাঁর গম্ভীর গলায় কিসের যেন একটা মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন।

ঘরের সমস্ত আলো নিবে গেল। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

তারাপদ চোখ বন্ধ করে মার কথা ভাবতে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল; তবু সে মা-র কথা না ভেবে থাকতে পারল না। চন্দন প্রথমটায় চোখের পাতা খুলে রেখেছিল। কিন্তু চোখ খুলে রাখা না রাখা সমান; দু চোখই যেন অন্ধ । কিছু দেখা যায় না; শুধু কালো আর কালো। চন্দনও চোখের পাতা বুজে ফেলল। তারাপদর মাকে সে দেখেছে, ভালো করেই জানত তাঁকে। চন্দনও তারাপদর মার কথা ভাবতে লাগল। আর মাঝে মাঝে অনুভব করছিল, তার একটা হাতের আঙুল মেয়েটির হাতের ওপর রাখা, অন্য হাতটি তারাপদর হাতের ওপর রয়েছে।

কতক্ষণ সময় যেন চলে গেল। কোনো শব্দ নেই। শেষে ভুজঙ্গভূষণ চাপা গলায় বললেন, "বেণু, তুমি এসেছ? তুমি কি এসেছ?"

কোনো সাড়াশব্দ নেই। আবার চুপচাপ। আরও কিছু সময় গেল।

ভুজঙ্গভূষণ এবার আবার বললেন, "বেণু, তুমি এসেছ? আমরা তোমায় ডাকছি, তুমি এসেছ?"

হঠাৎ টেবিলের তলার দিকে মৃদু করে ঘণ্টা বেজে উঠল ।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "বেণু, তুমি যদি সত্যি সত্যি নিজে এসে থাকো—ঘণ্টাটা একবার বাজাও, বাজিয়ে থামিয়ে দাও, আবার বাজাও।"

ঘণ্টা সেইভাবেই বাজল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তোমার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছ? যদি পাও অন্যভাবে ঘণ্টা বাজাও। একটানা।"

এবারও সেই রকম বাজল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “তোমার ছেলেকে আমি এখানে এনেছি। তুমি তাকে বলল আমার ইচ্ছা মতন সে যেন চলে। আমি তার ভাল চাই।”

ঘন্টাটা আস্তে আস্তে বাজল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “তোমার সঙ্গে আর কেউ এসেছে বেণু? কে এসেছে?”

ঘণ্টা বাজল না।

ভুজঙ্গভূষণ কেমন আকুল স্বরে বললেন, “কে এসেছে বেণু? তোমার স্বামী?”

ঘণ্টা এবার জোরে বেজে উঠল। তারাপদ সমস্ত কিছু ভুলে চিৎকার করে উঠল, বাবা!”

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হাত টেনে নিয়েছিল। মেয়েটি কেমন শব্দ করে উঠল । যেন ঘুমের ঘোর থেকে চমকে উঠে শব্দ করেছে।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “কী হল? কী হল?”

বাতি জ্বলে উঠল। সেই মৃদু আলো। মেয়েটি টেবিলের ওপর মুখ রেখে। পড়ে আছে। হাত ছড়ানো। থরথর করে কাঁপছে।

ভুজঙ্গভূষণ তারাপদকে বললেন, “কী করেছিলে তোমরা? বেণু চলে গেছে।”

তারাপদ ভয়ে ভয়ে বলল, “কিছু করিনি । হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম।”

কঠিন গলায় ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “মূর্খ!…সমস্ত বৃথা গেল।..যাও, তোমরা চলে যাও। ওকে ছুঁয়ো না। ধীরে ধীরে ও সুস্থ হয়ে উঠবে।”

তারাপদরা অপরাধীর মতন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

আট

সকালে তারাপদর চেহারা দেখে চন্দন বেশ ঘাবড়ে গেল। মুখ কেমন থমথম করছে তারাপদর, উদাস চোখ, বার বার নিশ্বাস ফেলছে শব্দ করে, কিসের এক দুঃখ যেন তার সমস্ত মুখ ম্লান করে রেখেছে। কথাবার্তা বলতেও তার তেমন ইচ্ছে করছি না। আপন মনে কত কী যে ভাবছে তারাপদ, কে জানে!

চন্দন বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলল, "তুই এত মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? কী হয়েছে তোর?"

তারাপদ চুপচাপ, কথার জবাবই দেয় না, শেষে বলল, "কাল আমার মা এসেছিল। একবার যদি দেখতে পেতাম...।"

চন্দন বলল, "তুই সত্যিই বিশ্বাস করিস মাসিমা এসেছিলেন?"

"তুই করিস না?"

চন্দন বুঝতে পারছিল না, বিশ্বাস করা উচিত কি উচিত নয়। সে বিশ্বাস করতেও চাইছে না, আবার অবিশ্বাস করারও জোর পাচ্ছে না।

তারাপদ ধরা-ধরা গলায় বলল, "মার সঙ্গে বাবাও এসেছিল, চাঁদু। আমার বাবা। স্কুলে যখন ক্লাস এইটে পড়ি, সেই সময় বাবা মারা গেছে; এত বছর পরে বাবা এসেছিল...; ইস্ আমি যে কী করলাম!"

তারাপদর চোখ ছলছল করে উঠল; ঠোঁট কাঁপতে লাগল । চন্দন বুঝতে পারল না কী বলবে। তার খারাপ লাগছিল। মাবাবার জন্যে বন্ধুর এই দুঃখ সে বুঝতে পারে, কিন্তু কেমন করে সান্ত্বনা দেবে জানে না। মাথা চুলকে চন্দন বলল, "তারা, এমন তো হতে পারে এ সবই মিথ্যে।"

তারাপদর ভাল লাগল না কথাটা। বন্ধুর দিকে ক্ষোভের চোখে তাকাল। বলল, "মিথ্যে?"

"কিকিরা তো তাই বলেছেন।"

"কিকিরা যা বলবেন তাই সত্যি হবে? বেশ, তুই বল–এটা কেমন করে সম্ভব হল? আমি ওই মেয়েটার একটা হাত আর একটা পা ছুঁয়ে রেখেছিলাম। একবারও ছাড়িনি। তুইও ছুঁয়ে ছিলি। ঠিক কি না?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ঘন্টাটা কেমন করে বাজল? কে বাজাল?"

চন্দন জবাব দিতে পারল না। সে এই ব্যাপারটা নিয়ে কাল রাত থেকেই। ভেবেছে, ভেবে কোনো কূল-কিনারা পায়নি। এক যদি এমন হয় যে, ওই ঘুটঘুঁটে অন্ধকার ঘরে কেউ লুকিয়ে এসে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিয়ে যায়! কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? লোকটা আসবে, বাজাবে, চলে যাবে–আর তারা দুজনে কিছুই বুঝতে পারবে না?

চন্দন বলল, “আমিও বুঝতে পারছি না। আচ্ছা তারা, ঘণ্টা যেটা বেজেছিল সেটা আমাদের টেবিলের তলায় ছিল সেটা ঠিক তো?”

“নিশ্চয়। কেন, তোর সন্দেহ হচ্ছে?”

“না, আমারও হচ্ছে না। তবু তোকে কাল যা বলছিলাম রাত্রে, কেউ যদি লুকিয়ে এসে বাজিয়ে দিয়ে যায়?”

“বাজে কথা বলিস না। অত অন্ধকারে এসে ঘণ্টা খুঁজে বাজিয়ে দিয়ে যাবে—আর আমাদের গায়ে পায়ে কোথাও তার ছোঁয়া লাগবে না—তা কি হয়? তুই একটা জিনিস ঠিক জানবি, যতই অন্ধকার থাকুক, তোর গায়ের পাশে কেউ যদি এসে দাঁড়ায় তুই নিশ্চয় বুঝতে পারবি। বাই ইনটিংক্ট।”

চন্দন অস্বীকার করতে পারল না।

তারাপদ বলল, “তারপর আমরা হাত ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বাতি জ্বলে উঠেছিল। যদি কেউ এসে থাকে—অত তাড়াতাড়ি পালাবে কোথায়?”

স্বীকার করে নিল চন্দন। এমন সব রহস্যময় কাণ্ড পর পর দু’ দিন তারা দেখল যে, কোনো রকমেই তা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। তা হলে কি সত্যিই আত্মা আছে? মানুষ মারা যাবার পর এই জীবলোকে না-থাকলেও অন্য কোনো জায়গায় থাকে? মানে তাদের আত্মা থেকে যায়? হাজার হাজার বছর ধরে কত। মানুষ এই জগতে এসেছে, চলে গেছে। সবাই কি তা হলে অন্য কোনো জগতে—অন্য কোনো লোকে আছে? কোটি কোটি আত্মা সেখানে কেমন করে আছে?

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না চন্দনের। সে ডাক্তার । মানুষ একটা বিচিত্র যন্ত্রের মতন, কে জানে ভগবান কেমন করে এই যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, কিন্তু এই যে যন্ত্র, এর কোনো তুলনা নেই, চাঁদে যাওয়ার চেয়েও এ অনেক রহস্যময়। সেই যন্ত্র যখন অচল হয়ে যায় কোনো কারণে, তখনই মৃত্যু। তারপর আর কিছু থাকতে পারে না।

থাকতে পারে না; কিন্তু এ-সব কেমন করে হচ্ছে? চন্দন অতশত আর ভাবতে পারল না। বলল, “নে ওঠ, কিকিরার সঙ্গে দেখা করার সময় হয়ে গেছে।”

তারাপদ এতই মুষড়ে পড়েছিল যে, কিকিরার কাছে যাবার জন্যে গা করল না। বলল, “আমার আর ভাল লাগছে না। তুই যা।”

চন্দন অবাক বন্ধুকে দেখতে লাগল। “তুই যাবি না মানে?”

“আমার ইচ্ছে করছে না।”

“কিন্তু কিকিরা এই ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন।”

“মুখে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যায়, চাঁদু-” তারাপদ বলল, “মন তা মানতে চায় না।”

চন্দন বন্ধুর এই ভেঙে পড়া ভাব পছন্দ করল না। বলল, “তুই এখানে বসে থেকে কী করবি একলা একলা। তার চেয়ে কিকিরার কাছে চল । কিকিরাকে সব বলি। আমার তো মনে হয় কিকিরার পরামর্শ খুব দরকার এখন।”

তারাপদ বলল, “তুই যা। আমি একবার সাধুমামাকে ধরবার চেষ্টা করি । সাধুমামা আমার মা-বাবার কথা সবই জানে। দেখি, সাধুমামাকে দিয়ে যদি কোনো কথা বলাতে পারি ।”

চন্দন কী ভেবে তারাপদর কথায় রাজি হয়ে গেল। তারাপদ যদি সাধুমামাকে দিয়ে দু-চারটে কথা বলাতে পারে, ভালই হবে। চন্দন বলল, “ঠিক আছে তুই এই বাড়ির দিকটায় নজর রাখ, সাধুমামাকে যদি ধরতে পারিস ধর; আমি কিকিরার সঙ্গে দেখা করে আসি। এবাড়িতে সাইকেল আছে। একটা সাইকেল বাগিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসতে আসতে পারলে ভাল হয়। চল, দেখি কী করা যায়।”

দুই বন্ধু বাগানের রোদে পায়চারি করতে করতে মৃত্যুঞ্জয়কে খুঁজতে লাগল।

চন্দন একটা সাইকেল জুটিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ। তারাপদ সে বাগানেই ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শেষ পর্যন্ত পেয়ারা গাছের ছায়ায় এসে বসে। ছিল। মৃত্যুঞ্জয় আজ তারাপদর সঙ্গ ছাড়তে চাইছিল না। গায়ে যেন লেপটে ছিল অনেকক্ষণ। বোধ হয় চন্দনকে একটা সাইকেল তাড়াতাড়ি জুটিয়ে দিয়ে সে তারাপদকে একলাই পেতে চাইছিল ।

তারাপদ নিরীহ, সরল মানুষ। হয়ত অনেক সময় বোকামি করে ফেলে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় লোকটাকে দেখা পর্যন্ত তার মন যেরকম বিগড়ে আছে, তাতে লোকটার সঙ্গে মেলামেশা করতে চাইছিল না। তা ছাড়া মানুষ যাকে সন্দেহ করে, তার কাছে মনখোলা হয় না, হতে পারে না। তারাপদ একেবারে বোক নয়, সে মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য জানে না যদিও, তবু খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতে লাগল। কথাবার্তা বলতে বলতে বুঝল, লোকটা যতই ধূর্ত শয়তান হোক, তার মনের ইচ্ছেটা একেবারে গোপন রাখতে শেখেনি। মৃত্যুঞ্জয় চায় না, তারাপদ এবাড়িতে বেশিদিন থাকে। হ্যাঁ, কথাবার্তা থেকে সেই রকমই আঁচ করল তারাপদ।

বেলা আরও বেড়ে উঠল। শীতের রোদ মাথা-গা তাতিয়ে যখন কপালে ঘাম ফোঁটাতে লাগল, তারাপদ তখন পেয়ারাতলায় একা-একা বসে একটা সিগারেট শেষ করল। এদিক ওদিক তাকিয়েও সে সাধুমামাকে কোথাও দেখতে পেল না। বাগান ফাঁকা। একটা দেহাতী মালী কিছু কাজকর্ম করছিল বাগানের একপাশে সবজি বাগানে; সেও চলে গেছে। ডায়নামোটা আর চলছে না। শব্দ নেই। আকাশ একেবারে নীল। চিলটিল উড়ছে অনেক উঁচুতে।

তারাপদ বারবার তার মা বাবার কথা ভাবছে। বেচারি বাবা, দুঃখী মা। মা যে কত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছিল, তারাপদই জানে। মা বাবা বেঁচে থাকলে আজ কি তারাপদর এমন অবস্থা হত?

পেয়ারাতলা ছেড়ে তারাপদ উঠে পড়ল। ভাল লাগছে না। কেন সে এখানে এল? না এলে এমন করে তাকে দুঃখ পেতে হত না। মা বাবাকে তো। সে ভুলেই গিয়েছিল, ভুজঙ্গ নতুন করে সেই দুঃখ জাগিয়ে তুলল। শুধু জাগিয়ে তুলল না, তারাপদর এখন থেকে বারবার মনে পড়বে–তার বাবা, মা বোন–সকলেই যেন আকাশে বাতাসে কোথাও আছে, কোনো ছায়ালোকে, অদৃশ্য আত্মা হয়ে।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারাপদ আস্তাবলের কাছে আসতেই হঠাৎ তার নজরে পড়ল, খানিকটা তফাতে টালির একটা ভাঙাচোরা ঘরের একপাশে আতা-ঝোঁপের দিকে সাধুমামা দাঁড়িয়ে। কী যেন করছিল সাধুমামা।

তারাপদ একবার চারপাশে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। আস্তাবলে ঘোড়া নেই। সহিস

বোধ হয় ঘোড়া নিয়ে মাঠে গিয়েছে।

প্রায় চোরের মতন তারাপদ সাধুমামার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে সাধুমামা তারাপদকে দেখতে পেয়ে গেছেন।

সাধুমামা তারাপদকে দেখে ভয়ের চোখে চারপাশে তাকালেন, যেন কেউ তাঁকে দেখে ফেলবে।

তারাপদ বলল, "সাধুমামা!"

আতা-ঝোঁপের আড়ালে মাটিতে বসে পড়লেন সাধুমামা, চোখে ভয়, সারা মুখে উদ্বেগ । ইশারায় তারাপদকে বসে পড়তে বললেন।

তারাপদ বসল। বসে একদৃষ্টে সাধুমামার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "সাধুমামা, তুমি বোবা সেজে বসে রয়েছ কেন?"

সাধুমামা জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর গলার শিরা ফুলে উঠল, মুখ কেমন কালচে হয়ে এল, জল এসে পড়ল চোখে । তারপর চাপা গলায়, ভাঙা ভাঙা স্বরে, জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "প্রাণের ভয়ে।" বলতে বলতে সাধুমামা তাঁর রোগা হাত কপালে তুললেন। তাঁর হাত কাঁপছিল থরথর করে । শিরাগুলোই চোখে পড়ে, বিন্দুমাত্র মেদ-মাংস যেন হাতে নেই, হাড় ফুটে আছে। সাধুমামার গলার স্বর থেকেই বোঝা যায়, তাঁর গলা কি বিশ্রী খসখসে হয়ে গেছে, জিবের কোনো দোষ হয়েছে তাঁর, কথা জড়িয়ে যায়।

তারাপদর কান্না পাচ্ছিল। বেচারি সাধুমামা। যেভাবে সাধুমামা বেঁচে আছেন, তা প্রায় মরে যাবারই সামিল। তারাপদ বলল, "ভুজঙ্গ তোমায় মেরে ফেলবে?"

"মারতে চেয়েছিল। পারেনি।" টেনে-টেনে জড়িয়ে-জড়িয়ে সাধুমামা বললেন।

"কেন?"

"আমি ওর বাধা হয়ে পড়েছিলাম।"

"কিন্তু তুমি আমাদের সব খবরাখবর ওকে দিয়েছ। আমাদের ছবি দিয়েছ।"

"দিয়েছি, বাবা। তখন ওকে বুঝিনি। ও আমায় বশ করে রেখেছিল। আমি তোমাদের ভালই চেয়েছিলাম। পরে বুঝলাম, ও একটা পাপী, নরকেও ওর জায়গা নেই। পশু... পশু..একেবারে পশু।" সাধুমামা অনেক কষ্ট করে কথাগুলো বললেন। বলতে তাঁর কী পরিশ্রম যে হচ্ছিল, তারাপদ বুঝতে পারল।

"কথা বলতে তোমার বড় কষ্ট হয়, না?"

"হ্যাঁ। বড় কষ্ট।"

তুমি আমায় একটা কথা বলো সাধুমামা। ভুজঙ্গ কি আত্মা নামাতে পারে?"

সাধুমামা কিছু বলার আগেই মৃত্যুঞ্জয়কে তারাপদ দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার বুক ধক করে লাফিয়ে উঠল যেন। সর্বনাশ! মৃত্যুঞ্জয় যদি তাদের দেখতে পায়, সাধুমামার ভীষণ

অবস্থা হবে। তারাপদ ভয়ে কাঠ হয়ে বলল, “সাধুমামা, মৃত্যুঞ্জয়।”

মৃত্যুঞ্জয়ের নাম শোনামাত্র সাধুমামা আতা-ঝোঁপের আড়ালে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়ে হাত-পা গুটিয়ে কুণ্ডলী হয়ে গড়াতে গড়াতে আরও হাত কয়েক দূরে সরে গেলেন। জায়গাটা আরও ঝোপেঝাড়ে ভরা, বুনো তুলসীর ঝোঁপ, কাঁটা-ঝোঁপ, তারই মধ্যে এক ধরনের বুনো লতা গাছপালার গা জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে। সাধুমামা ইশারায় তারাপদকে চলে যেতে বললেন।

তারাপদ আড়াল থেকে মৃত্যুঞ্জয়কে লক্ষ করতে লাগল। সামান্য সময় লক্ষ করার পর দেখল, মৃত্যুঞ্জয় অন্যদিকে চলে যাচ্ছে । বাড়ির ভেতরেই যাচ্ছে।

তারাপদ বসে বসেই বলল, “সাধুমামা, কাল ভুজঙ্গ আমার মা-র আত্মাকে এনেছিল। বাবাও এসেছিল। আমি গোলমাল করে ফেলায় সব নষ্ট হয়ে গেল ভুজঙ্গ কেন আমার মা-বাবাকে এনেছিল? সত্যিই কি তারা এসেছিল?”

সাধুমামা হাত বেড়ে তারাপদকে চলে যেতে ইশারা করছিলেন। বললেন, “ভুজঙ্গ তোমায় এইখানে এবাড়িতে আটকে রাখতে চায়। সারা জীবনের মতন। তোমাকেও সে ভুজঙ্গ করতে চাইছে। খবরদার, তুমি থেকো না। এই সম্পত্তির জন্যে নিজের সর্বনাশ তুমি করো না, বাবা। তুমি পাপী হয়ো না। এ বড় পাপের জিনিস।..যাও, আর এখানে থেকো না। উঠে যাও। পরে কথা বলব।”

তারাপদ কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে সাধুমামাকে দেখল। অবশ্য সাধুমামাকে দেখা যাচ্ছে না আর, আড়ালে মাটিতে শুয়ে আছেন, এমনভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছেন যে, মুমূর্ষ জন্তুর মতন দেখাচ্ছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারাপদ উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

.

আরও খানিকটা বেলায় চন্দন ফিরল।

তারাপদ তার বিছানায় শুয়ে ছিল ছাদের দিকে তাকিয়ে। খোলা জানলা দিয়ে রোদ আসছে না, কিন্তু আলো আসছিল। উজ্জ্বল আলো। এক জোড়া ভোমরা ঘরের মধ্যে উড়ছে, জানলা দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, আবার কখন এসে ঘরে ঢুকে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত তারা উড়ে গেল বাইরে। তারাপদও নিশ্চিন্ত বোধ করল ।

চন্দন এসে বলল, “তারা, তুই না-যাওয়ায় কিকিরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছেন।”

“কেন?”

“কিকিরা ভয় পাচ্ছেন, তুই না শেষ পর্যন্ত ভুজঙ্গর খপ্পরে পড়ে যাস।”

তারাপদ তেমন খুশি হল না; বলল, “খপ্পরে পড়ে যাবার কী দেখলেন উনি?”

চন্দন বলল, “তুই আত্মা-নামানোর ব্যাপারে বিশ্বাস করে ফেলেছিস। ভুজঙ্গ এই চাল দিয়ে তোকে বাগিয়ে ফেলবে।”

“মানে?”

“মানে এর পর ভুজঙ্গ যা বলবে–তুই তাই করবি।”

তারাপদ হঠাৎ যেন কেমন রেগে উঠল। বলল, “কিকিরা যা বলবেন তাই মেনে নিতে হবে? উনি মুখেই বলছেন, কাজে কিছু দেখাতে পারছেন? বোঝাতে পারছেন? কালকের ব্যাপারটা কেমন করে হল–কিকিরা আমায় বোঝান, তারপর অন্য কথা।”

চন্দন বলল, “কিকিরা বললেন, ঘরে কোনো আত্মাটাত্মা নামেনি। এটা ওই মেয়েটিরই কাজ।”

তারাপদ এত অবাক হয়ে গেল যে, কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর বলল, “কী বাজে কথা বলছিস তুই? মেয়েটা কেমন করে ঘণ্টা বাজাবে! আমরা তার হাতে হাত রেখে বসে ছিলাম, আমাদের পা তার পা ছুঁয়ে ছিল। তুই কি বলতে চাস মেয়েটার আরও একটা লুকোনো হাত ছিল? বাজে বকিস না চাঁদু।”

চন্দন বলল, “কিকিরাকে আমি সে-কথা বলেছিলাম। উনি বললেন, হাতে হাত রাখা, পায়ে পা ছোঁয়ানো সবই ঠিক কিন্তু ওরই মধ্যে একটা ভেলকি আছে।”

“ভেলকি আছে বললেই তো চলবে না, তার প্রমাণ কী?”

“কোনো প্রমাণ নেই, মানে আমরা কাল ধরতে পারিনি। ওইভাবে ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে বসিয়ে আত্মা নামালে লোকে সমস্ত ব্যাপারটায় এত অবাক হয়ে যায় যে, ভেতরে ভেতরে কী হচ্ছে খেয়াল করে না। মেয়েটা যদি কোনো চালাকি করে থাকে আমরা ধরতে পারিনি।”

“কোনো চালাকি করেনি,” তারাপদ বলল।

চন্দন একটু চুপ করে থেকে বলল, “ঠিক আছে। আজ যদি আবার ওই মেয়েটা আসে আমিও তক্কে তক্কে থাকব।”

“থাকিস।”

চন্দন বেশ বুঝতে পারল, তারাপদ তার মা-বাবার আত্মা আসার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে নিয়েছে প্রায়। না, বন্ধুর সে দোষ ধরছে না। মানুষের এই দুর্বলতায় দোষ ধরা যায় না। কিকিরাও বলেছেন, ভুজঙ্গ তারাপদর দুর্বল জায়গায় ঘা মারছে, এই ঘা দিয়েই সে তারাপদকে বশ করবে, তাকে নিজের মুঠোয় এনে ফেলবে। চন্দন যে কেমন করে বন্ধুকে ভুজঙ্গর হাত থেকে বাঁচাবে বুঝতে পারছে না। কিকিরা বলেছেন, আপনি স্যার এখন থেকে আরও সজাগ থাকবেন, আরও নজর রাখবেন সব ব্যাপারে।

.

চন্দন আজ খুব সতর্ক থাকবে। আজ সে দেখবার চেষ্টা করবে কেমন করে আত্মা আসে, কেমন করে ঘন্টা বাজে। কিকিরা তাকে একটা জিনিস দিয়েছেন। ছোট্ট জিনিস, লুকিয়ে রাখা যায়। চন্দন আজ যখন ওপরের ওই ভুতুড়ে ঘরে যাবে–তখন জিনিসটা লুকিয়ে নিয়ে যাবে কাপড়ের মধ্যে। চন্দনের ইচ্ছে ছিল, ইনজেকশনের উঁচটা লুকিয়ে নিয়ে যাবার। যদি সে দেখত, বা তার সন্দেহ হত, আত্মার নাম করে আশেপাশে কেউ ঘোরাঘুরি করছে, তবে

একবার উঁচটা ফুটিয়ে দিত গায়ে। আত্মা হলে নিশ্চয় ছুঁচ ফুটত না, বাতাসে কি আর ছুঁচ ফোটে? কিন্তু কোনো মানুষ হলে, সে যেমনই মানুষ হোক, আচমকা উঁচ ফুটলে উঃ করে উঠত। আর তখনই ব্যাপারটা জানা যেত। বোঝা যেত, ভুজঙ্গ আত্মা নামায় না মানুষ নামায়।

চন্দন বিছানায় শুয়ে এইসব ভাবতে লাগল, আর তারাপদ বসল দাড়ি কামাতে।

দাড়ি কামাতে কামাতে তারাপদ বলল, “চাঁদু, সাধুমামার সঙ্গে আজ আমার কথা হয়েছে।”

চন্দন তাকাল।

তারাপদ বলল, “সাধুমামাকে আমি দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করেছি–এমন সময় মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে পেলাম। বেশি কথা হল না। সাধুমামা কথা বলতে পারে–কিন্তু কেমন জড়িয়ে-জড়িয়ে। খুব কষ্ট হয়। সাধুমামা আমায় বলল, ভুজঙ্গ আমায় এইখানে আটকে রাখতে চায়। কেন বল তো?”

চন্দন বলল, “কিকিরাও তাই বললেন।”

“কিন্তু কেন?”

“ভুজঙ্গ মারা যাবার পর তুই আর-এক ভুজঙ্গ হয়ে থাকবি বলে।”

“আমি কেন ভুজঙ্গ হয়ে থাকব?”

“ভুজঙ্গই তোকে সে কথা বলবে। আমি কেমন করে জানব!”

.

সন্ধেবেলায় আবার সেই আত্মা-নামানোর ঘরে তারাপদরা এসে বসল। তেমনই অন্ধকার ঘর, মিটমিটে আলো জ্বলছে গুটি দুই, সেই একই ভাবে টেবিল-চেয়ার সাজানো, বাড়তির মধ্যে একটা নিচু ধরনের টেবিল ভুজঙ্গর কাছাকাছি রাখা, তার ওপর দু-একটা জিনিস; গোল বয়ামের মতন দেখতে।

তারাপদরা বসে থাকল তো বসেই থাকল। ঘরের সেই অন্ধকারে চোখ যেন নরম হয়ে আসছিল। গন্ধও আজ চমৎকার লাগছিল, কেমন একটা আবেশ আসছিল। হঠাৎ চন্দন উঠে পড়ে তারাপদকে তার চেয়ারে আসতে বলল । তারাপদ কিছু বুঝল না। কিন্তু চেয়ার বদল করল।

চন্দন ঘরের চারপাশ খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লগল । পর পর তিন দিন এই ঘরে এল তারা। এখন খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম দিনের মতন অতটা গা ছমছম করে না। চন্দন দেখল, এই ঘরের বাইরে মন একরকম থাকে কিন্তু ঘরটায় ঢুকলেই ধীরে ধীরে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যায় । সেই বেড়ালটাকেও চন্দন দেখল। চোখের মণি দুটো জ্বলছে।

আরও খানিকটা পরে ভুজঙ্গভূষণ এলেন। তাঁর মাথার ওপরকার চোরা লাল আলো জ্বলে উঠল। ঘরের অন্য বাতি দুটো নিবে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। ভুজঙ্গভূষণের একই বেশ : রক্তগৈরিক বসন, মুখের ওপর সেই মুখোশ, গলায় বিশাল রুদ্রাক্ষমালা। তিনি এসে বসার পর সেই কালকের মতন স্তোত্র পাঠ হল। গ্রামোফোন রেকর্ডে যে-ভাবে গান হয়, সেইভাবেই । এই ঘরের কোথাও এই গান-বাজাবার ব্যবস্থা আছে। ভেতর থেকে কেউ

বাজায়, বন্ধ করে। যে বাজায় সে-ই বোধ হয় ঘরের আলো জ্বালায় । চন্দন আজ সমস্ত কিছু লক্ষ করতে লাগল।

স্তোত্রপাঠ শেষ হবার পর একেবারে স্তব্ধ সব। সেই স্তব্ধতা ভেঙে ভুজঙ্গভূষণ গম্ভীর স্বরে সংস্কৃতে কী-যে মন্ত্রপাঠ করলেন। তারপর তারাপদকে বললেন, “তারাপদ, তুমি কি তোমার মা বাবাকে আজ আবার ডাকতে চাও?”

তারাপদ সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল, “হ্যাঁ।”

একটু থেমে ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “কাল তুমি–” তোমরা যা করেছ তাতে বড় ক্ষতি হয়েছে। ওই মেয়েটি–যার মধ্যে তোমার মা-বাবার আত্মা এসেছিলেন–আচমকা তোমরা তার হাত থেকে হাত উঠিয়ে নেবার পর সে এক রকম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে তার জ্ঞান আসে। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মিডিয়ামদের স্নায়ু হল সূক্ষ্ম তারের মতন–একটুতেই গোলমাল হয়ে যায়।”

তারাপদ লজ্জা পেল। বলল, “আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি।”

“তোমার মা বাবার আত্মাও কষ্ট পেয়েছেন। তোমরা এখনকার মানুষ, তোমাদের বোঝার সাধ্য নেই এইভাবে আত্মাদের আসতে-যেতে কত কষ্ট হয়। ডাকলেই কি তাঁরা আসেন? না–না। অনেক সময় হাজার বার ডাকলেও আসেন না। আবার যখন আসেন, তখন তাঁরা নিজেরা না চলে যাওয়া পর্যন্ত বিদায় দিতে নেই, এতে তাঁদের আরও কষ্ট হয়। কাল তোমরা তাঁদের কষ্ট দিয়েছ। আজ তাঁরা আবার আসবেন কিনা আমি বলতে পারছি না।”

“আসবেন না?” তারাপদ ব্যাকুল হয়ে বলল।

“কেমন করে বলব?”

“আপনি ডেকে দিতে পারেন না?”

“চেষ্টা করি। দেখি।”

ভুজঙ্গভূষণ ঘণ্টা বাজালেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই মেয়েটিকে দেখা গেল। ঘন কালো শাড়ি, কালকের মতনই, সিল্কের শাড়িই হবে; পায়ের দিকটা দেখা যাচ্ছে না, শাড়ি লুটোচ্ছে কার্পেটে। মাথায় এলো চুল, পিঠ পর্যন্ত ছড়ানো। মুখ বড় সাদা, অবশ্য লাল আলোয় কেমন লালচে দেখাল।

মেয়েটি ঘণ্টা উঠিয়ে নিয়ে টেবিলের কাছে চলে এল। একবার শুধু তারাপদ আর চন্দনকে দেখল। ওর দুই চোখ কেমন টানা টানা ছোট দেখাল, যেন ঘুম জড়িয়ে আছে।

কালকের মতন করেই বসল তিনজনে গোল টেবিল ঘিরে। মেয়েটির একটা ছড়ানো হাতের ওপর তারাপদর হাত, আঙুলে আঙুলে ছোঁয়ানো, অন্য হাতটি চন্দনের দিকে বাড়ানো। চন্দন তার হাত এমন করে মেয়েটির আঙুলে ছুঁইয়ে রাখল যেন একটু হাত কাঁপলেই সে বুঝতে পারে। পায়ে পা ছোঁয়ানো থাকল। চন্দন বুঝতে পারল না, মেয়েটির পায়ের আঙুল এত শক্ত কেন? হাড়-হাড় বলেই হয়ত।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার।

ভুজঙ্গ বললেন, “তারাপদ, একমনে নিবিষ্টচিত্তে ওঁদের ডাকো।”

তারাপদ চোখ বুজে মা-বাবাকে ডাকতে লাগল। চন্দন চোখের পাতা বন্ধ করল না । তাকিয়ে থাকল। এই অন্ধকার যেন পাহাড়ের কোনো গুহার মধ্যের অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, চোখের সাধ্য নেই এক বিঘত দূরের জিনিসও অনুমান করতে পারে।

ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই।

সময় কেটে যেতে লাগল। চন্দনও যেন আর না-পেরে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল ।

তারাপদ অধীর হয়ে উঠছিল। মা-বাবা আজ কি আর আসবে না? কাতর হয়ে তারাপদ তার মা বাবাকে ডাকতে লাগল।

সময় কেটে গেল আরও কতক্ষণ যেন। মনে হল, আজ আর কেউ আসবে না।

তারাপদ প্রায় যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন ঠিক তখন ঘণ্টার মৃদু শব্দ হল।

ভুজঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “কে, বেণু?”

ঘণ্টা বাজল না।

“বেণু, তুমি কি আসোনি?”

কোনো শব্দ হল না।

ভুজঙ্গ এবার বললেন, “কে তুমি? বিষ্ণু নাকি?”

বিষ্ণু তারাপদর বাবার নাম, বিষ্ণুপদ নাম থেকে বিষ্ণু।

এবারও কোনো শব্দ হল না। ঘণ্টা বাজল না।

ভুজঙ্গ নিজেই যেন বিচলিত হয়ে পড়েছেন, বললেন, “তুমি কে? তারাপদ যদি কেউ না হও, সাড়া দাও।”

ঘণ্টা বাজল না।

ভুজঙ্গ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, “তুমি কি তাহলে বেণুর মেয়ে?”

এবার খুব আস্তে করে ঘণ্টা বাজল।

তারাপদ কল্পনাই করেনি, তার সেই ছোট্ট বোন পরী আসবে। সেই পরী! কত ছোট্ট ছিল! কী সুন্দর ছিল! তার মাথার ঝাঁকড়া চুল আর ফুটফুটে গায়ের রঙ ছাড়া কিছুই আর মনে নেই তারাপদর। সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে মাথায় চোট লেগেছিল পরীর। মারা গেল। আহা রে!

তারাপদর সেই ছোট্ট বোন পরী আজ এসেছে। কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারল না তারাপদ, ছেলেমানুষের মতন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নয়

তারাপদ কান্নার আবেগে হাত ছেড়ে দিচ্ছিল প্রায়, আচমকা তার খেয়াল হল, হাত ছেড়ে দিলেই পরী চলে যাবে। কালকের মতন অবস্থা হবে তা হলে, পরীর আত্মা আর এই ঘরে থাকবে না। ওই মেয়েটি–যার মধ্যে দিয়ে পরীর আত্মা এসেছে-টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়বে, অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাতি জ্বলে উঠবে। ভুজঙ্গভূষণ আজ আর ক্ষমা করবে না। ভীষণ রেগে যাবে।

কথাটা খেয়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে তারাপদ মেয়েটির হাত আরও জোরে চেপে ধরল। চন্দনের হাতও ছাড়ল না।

ভুজঙ্গভূষণ সামান্য অপেক্ষা করলেন। তারাপদর কান্না শুনতে-শুনতে তাকে যেন সময় দিলেন সামলে নেবার।

তারাপদ নিজেকে খানিকটা সামলে নিল।

ভুজঙ্গভূষণ পরীকে উদ্দেশ করেই বললেন, "তোমার নামটা আমার মনে পড়ছে না। বেণুর মেয়ে বলেই তোমায় আমি জানি।"

তারাপদ জড়ানো গলায় বলল, যেন ভুজঙ্গভূষণের ওপর রাগ করেই, "ওর নাম পরী । পরী আমার বোন। একটি মাত্র বোন।"

ভূজঙ্গভূষণ কান দিলেন না তারাপদর কথায়। পরীকেই বললেন, "তুমি একলা এসেছ? যদি একা এসে থাকো, চুপ করে থেকো যদি সঙ্গে কেউ এসে থাকে–ঘণ্টা বাজিয়ে। একবার । ...তুমি একলা এসেছ?"

ক' মুহূর্ত কোনো শব্দ হল না। তারপর ঘণ্টা বাজল। একবার ।

ভূজঙ্গভূষণ বললেন, "তোমার সঙ্গে কে এসেছে? বেণু, না বিষ্ণু? শোনো, মন দিয়ে শোনো, আমার কথার জবাবে যদি হ্যাঁ হয়–তবেই একবার ঘণ্টা বাজাবে; যদি না হয় তবে চুপ করে থাকবে–ঘণ্টা বাজাবে না। বুঝলে? এখন বলল, তোমার সঙ্গে কে এসেছে? বেণু?"

একবার ঘণ্টা বাজল।

তারাপদ বুঝতে পারল, মা এসেছে।

চন্দন অন্ধকারে চোখের পাতা খুলল। তাকাল। কিছুই দেখতে পেল না। এত অন্ধকার চন্দন আর কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না, অন্ধ হয়ে গেলে কি মানুষ চোখে এই রকম অন্ধকার দেখে সর্বক্ষণ? চন্দনের মনে হচ্ছিল খুব ঘন কালো কোনো কালিতে ব্লটিং পেপার চুবিয়ে কেউ যেন তার চোখে চাপা দিয়ে কাপড়ে চোখ বেঁধে দিয়েছে। না, তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করা বৃথা তাতে চোখের মণি টনটন করে ওঠে। চোখ বন্ধ করল চন্দন। মেয়েটির হাত ঠিক আছে, নড়েনি। পায়ের আঙুলও ঠিক রয়েছে, আঙুলে-আঙুলে ছোঁয়ানো আছে। চন্দন ঠিক বুঝতে পারল না, মেয়েটির আঙুল এরকম শক্ত শক্ত লাগছে কেন? হাড় ছাড়া আঙুলে কিছু নেই নাকি?

ভুজঙ্গভূষণের গম্ভীর গলা শোনা গেল। স্পষ্ট করে টেনে টেনে কথা বললেন, "বেণু, তুমি আজ আবার এসেছ, আমরা খুশি হয়েছি। কাল তোমার ছেলে একটু ভুল করে ফেলেছিল। ও ছেলেমানুষ, অত বোঝেনি। তা ছাড়া তারাপদ ভয় পেয়েছিল। ওর কোনো দোষ নেই। ও কেমন করে জানলে তোমরা আত্মা হয়ে সূক্ষ্ম শরীরে অন্য লোকে বাস করছ? ওকে তুমি ক্ষমা করো।"

তারাপদও মনে মনে মা-র কাছে ক্ষমা চাইল । মা, আমায় ক্ষমা করো। "বেণু, তুমি জানো কেন আমি তোমার ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছি?" ভুজঙ্গভূষণ বললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে না হলেও ঘণ্টা বাজল।

"তুমি তা হলে জানো!...আমারই ভুল। তোমায় কেন বোকার মতন কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। তোমাদের কিছুই অজানা থাকে না । ভূত-ভবিষ্যৎ সবই তোমরা জানো। তবু, দু-একটা কথা বলি। তোমার ছেলেও শুনুক।" বলে ভুজঙ্গভূষণ একটু চুপ করে থাকলেন তারপর বললেন, "বেণু, তুমি জানো আমার তিনকুলে কেউ নেই। আমার এই ঘরবাড়ি ছাড়াও অনেক সম্পদ আছে। আমার যা কিছু আছে–স্থাবর অস্থাবর সব আমি তোমার ছেলেকে দিয়ে যাব স্থির করেই তাকে ডেকে আনিয়েছি। কিন্তু আমার দুটি শর্ত আছে। এই শর্ত তাকে পালন করতে হবে। যদি শর্ত মানে, এ-সবই তার যদি না মানে, সে একটা পাই পয়সাও পাবে না। যেমন এসেছে সেই ভাবে তাকে ফিরে যেতে হবে।"

আচমকা ঘণ্টাটা বেয়াড়া ভাবে বেজে উঠল, না থেমে, কোনো রকম ছন্দ না মেনে। শব্দটা এমনই যে কানে লাগে। মনে হয়, কেউ বুঝি প্রবল কোনো আপত্তি জানাচ্ছে।

ভুজঙ্গভূষণ ঘণ্টার শব্দটা শুনে কী বুঝলেন কে জানে, বললেন, "বেণু, তুমি অমন করছ কেন? কী হয়েছে?"

আবার সেই একইভাবে একটানা ঘণ্টা বেজে গেল। তারপর থামল।

ভুজঙ্গভূষণ সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "বেণু, তোমার সঙ্গে কি অন্য কেউ এসেছে? কে এসেছে? বিষ্ণু?"

এবার আর ঘণ্টা বেয়াড়াভাবে বাজল না। একবার মাত্র বাজল।

তারাপদ বুঝতে পারল, তার বাবাও এসেছে। বাবা, মা, পরী–সবাই এসে হাজির হয়েছে। চোখ বুজেই ছিল তারাপদ। তার মনে হল, যদি এমন হত–চোখ খুললেই তিনজনকে দেখতে পেত,তা হলে তার কী আনন্দই না হত, কিন্তু তা তো দেখতে পাবে না। তা ছাড়া সে-সাহসই বা তার কোথায়? তবু সকলে এসেছে জেনে তারাপদর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

"বিষ্ণু, তুমি এসে ভাল করেছ," ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তোমরা যে সবাই আসবে আজ–আমি ভাবতেও পারিনি। এসে ভাল করেছ। তোমাদের ছেলেকে আমি আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে যেতে চাই। আমার যাবার দিন হয়ে এসেছে। আগামী অমাবস্যার পর ইহজগতে আমি আর থাকব না। তোমাদের কাছে চলে যাব ।..যাক, কাজের কথাটা আগে বলে নিই। তারাপদকে আমি সব দিয়ে যাব–কিন্তু দুটো শর্ত রয়েছে। আমার প্রথম শর্ত হল তারাপদকে তার আগের জীবনের কথা ভুলতে হবে। আমি জানি, মানুষ তার অতীত ভুলতে পারে না। সে-ভাবে আমি তাকে কিছুই ভুলতে বলছি না। আমি বলছি–সে আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারবে না। পুরনো কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এই বাড়িতে

এখানে তাকে থাকতে হবে, বরাবরের মতন।”

তারাপদ চমকে উঠল তাই কি সম্ভব নাকি? কী বলছে ভুজঙ্গভূষণ? তারাপদ কলকাতায় ফিরে যাবে না? কলকাতার কথা, বন্ধুবান্ধবের কথা, চন্দনের কথা—সব ভুলে যাবে? অসম্ভব। তারাপদ বাঁচবে কী করে?

“আমার দ্বিতীয় শর্ত, ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “আমার মৃত্যুর পর তারাপদকে আমার জায়গায় বসতে হবে। আমি জানি তার কোনো সাধনা নেই, শিক্ষা নেই, আমাদের তন্ত্র-মন্ত্র সে জানে না। তবে সবই ধীরে ধীরে সে জেনে নেবে। তার মন যদি বশ করতে পারে, এই সাধনার কিছু কিছু সে জেনে নিতে পারবে। তারপর ধ্যান আর সাধনার মধ্যে দিয়ে একদিন সবই তার আয়ত্ত হবে।...এই আমার শর্ত।”

তারাপদ স্তব্ধ। তার বুকের অস্বস্তি হচ্ছিল। উত্তেজনা, ভয়, প্রতিবাদ, অসম্মতি সব যেন একসঙ্গে তার বুকের মধ্যে জমে যাচ্ছিল, গলায় এসে উঠছিল। তারাপদ বলতে যাচ্ছিল—না না,—সে এ-সব শর্ত মানতে রাজি নয়। তারাপদ ভুজঙ্গভূষণের মতন কাপালিক হতে চায় না। বটুকবাবুর মেস তার পক্ষে অনেক ভাল। সেখানে সে স্বাধীন। এই পরাধীনতা সে চায় না।

তারাপদ কিছু বলতে যাচ্ছি, তার আগেই ভুজঙ্গভূষণ কথা বললেন। “বিষ্ণু, তুমি কি চাও না, তোমার ছেলে আমার শর্তে রাজি হয়? যদি তোমার আপত্তি থাকে তুমি ঘণ্টাটা একবার বাজাও, যদি তুমি রাজি থাকো দু’বার বাজাবে। মনে রেখো, তুমি রাজি থাকলে দু’বার বাজাবে।”

তারাপদ উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বুক এত জোরে ধকধক করছে যে, নিজের কানেই সে শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল।

সেই অন্ধকার স্তব্ধ ঘরে দু’বার ঘণ্টা বেজে উঠল। তার মানে তারাপদর বাবা বিষ্ণুপদ রাজি।

তারাপদ কিছুই বুঝল না, চেঁচিয়ে উঠে বলল, “না, না।”

ভুজঙ্গভূষণ গম্ভীর গলায় বললেন, “চুপ করো, তুমি এখন কথা বলো না। তোমার মা বাবা কী বলছেন আগে সেটা শোনো। তারপর তোমার যা বলার বলো।” বলে ভুজঙ্গভূষণ গলার স্বর পালটে তারাপদর মাকে যেন জিজ্ঞেস করছেন, বললেন, “বেণু, তোমার কী ইচ্ছে বলো? তুমি কী চাও—তোমার ছেলে এই ঘরবাড়ি, সম্পত্তি, সুখ সমস্ত ফেলে দিয়ে কলকাতায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াক? কোনো মানুষ যা স্বপ্নেও ভাবে না-তোমার ছেলেকে আমি নিজের হাতে তা দিয়ে যেতে চাই। বলো, তুমি কী চাও? কী তোমার ইচ্ছে?”

ঘর একেবারে স্তব্ধ। তারাপদ ঘেমে উঠছিল। মা-ও কি সম্মতি জানাবে?

খুবই আশ্চর্য, সামান্য পরে ধীরে ধীরে ঘন্টাটা বেজে উঠল। একবার নয়, দু’বার ।

তারাপদ নির্বাক। তার সমস্ত কথা হারিয়ে গেছে। চন্দনের হাতটা জোরে চেপে রাখল তারাপদ। তার হাত ভিজে গিয়েছে।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “বিষ্ণু, বেণু—তোমরা বাবা-মা হিসেব তোমাদের ছেলেকে যা ভাল, যাতে তার ভাল হবে—তাই করতে বলেছ। তোমাদের ওপর আমি খুশি হয়েছি। তবু তোমরা আর-একটু কি থাকতে পারো না? আমি তোমাদের সামনে তোমাদের ছেলের সঙ্গে দুটো

কথা বলে নিতে চাই।”

ঘণ্টা বাজল না। তারাপদ বুঝতে পারল না, বাবা-মা আছে না চলে গেল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “তারাপদ তোমার মা বাবার ইচ্ছে তুমি শুনলে। এখন বলো, কী তুমি বলতে চাও।”

তারাপদ ভাবছিল কী জবাব দেবে। সে এখানে থাকবে না। কিছুতেই নয়। কিন্তু মা বাবা যদি চান তারাপদ এখানে থাকুক, তা হলে সে কী করবে? ঠিক এই মুহূর্তে তার মাথায় যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ঘণ্টাটা আস্তে আস্তে বেজে উঠল, বেজে বেজে যেন দুরে কোথাও মিলিয়ে গেল।

ভুজঙ্গভূষণ কথা বললেন, “তোমার মা বাবা-বোন চলে গেল তারাপদ। ওরা চলে গেল।” বলার পর গম্ভীর মৃদুস্বরে তিনি একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন, মনে হল, আত্মাদের বিদায় জানালেন।

ঘরের বাতি জ্বলল। মাথার ওপরকার ফিকে আলো ।

তারাপদ চোখ খুলল । চন্দনও তাকাল। চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঝাপসা। ধীরে ধীরে দৃষ্টি পরিষ্কার হল সামান্য।

মেয়েটি হাত টেনে নিল, পা সরিয়ে নিল। কোনো দিকে তাকাল না। মুখ মাথা নিচু করে থাকল। তবু তার ফরসা মুখ আরও সাদা ভিজে ভিজে দেখাচ্ছিল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারাপদ একবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। কেমন যেন ঘুম-জড়ানো চোখ, আচ্ছন্নের মতন লাগছে।

ঘুমের মধ্যে যেন হেঁটে যাচ্ছে এইভাবে চলে গেল মেয়েটি।

মেয়েটি চলে যাবার পর ভুজঙ্গভূষণ আবার কথা বললেন। তাঁর দিকের সেই লাল আলো এখন আর জ্বলছে না। ঝাপসা অন্ধকারে ভৌতিক চেহারা নিয়ে তিনি বসে আছেন। ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “তারাপদ, তোমার যা বলার আছে বলো।”

তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দনকে খানিকটা অন্যমনস্ক দেখাল। চোখাচোখি হওয়া সত্ত্বেও সে কোনো রকম ইশারা করল না।

তারাপদ অস্পষ্ট গলায় বলল, “আমি এখানে কেমন করে থাকব?”

“কেন?”

“কলকাতা ছেড়ে আমি কখনো থাকিনি। আমার বন্ধুবান্ধব, চেনা-জানা যারা, তারা সবাই কলকাতায় থাকে। তাদের ছেড়ে আমি এখানে একা একা কেমন করে থাকব?”

“একা একা কেন থাকবে, এই বাড়িতে লোকজন কম নেই, এরা থাকবে।” তারাপদ শুকনো গলায় ঢোক গিলল। “আমার মন টিকবে না।”

“প্রথম প্রথম টিকবে না, তারপর টিকে যাবে। আমার কেমন করে টেকে?”

"আপনি কতকাল ধরে এখানে আছেন। তা ছাড়া আরও একটা কথা রয়েছে–আপনি সাধনা করেন, কত বছর ধরে তন্ত্র-টন্ত্রর সাধনা করে আসছেন। আমি কিছু জানি না। আমার ওসব জিনিস পছন্দও হয় না। আমি কেমন করে আপনার মতন সাধক হব?"

ভুজঙ্গভূষণ শান্ত গলায় বললেন, "সে-চিন্তা আমার। তোমায় যে অনেক কিছু শেখাতে হবে–তা আমি জানি। তার ব্যবস্থাও আমি করেছি।"

তারাপদ আবার চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দনও তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলল না তারাপদ; পরে বলল, ধরুন যদি এমন হয়, আজ আমি আপনার শর্তে রাজি হলাম, তারপর আপনি যখন থাকবেন না–তখন শর্ত ভাঙলাম–তখন কী হবে?"

ভুজঙ্গভূষণ স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বললেন, "তুমি তোমার মা বাবার মনের ইচ্ছে জেনেছ। কাল আবার আমি ওদের ডাকব। ওই আত্মাদের কাছে তোমায় শপথ করতে হবে।... তারাপদ, মৃত পিতা-মাতার আত্মার সামনে শপথ করে সেই শপথ যদি তুমি ভাঙো, তার পরিণতি যে কী হবে–তুমি কল্পনাও করতে পারছ না। তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।..তা ছাড়া, আমার নির্দেশ আছে, অন্তত তিন বছর তুমি পুরনো সমস্ত সংসর্গ থেকে দূরে থাকবে। এই বাড়িতে তোমায় থাকতে হবে। কোথাও যাবে না। এখানে সাধনা করবে। যদি তিন বছর তুমি আমার নির্দেশ-মতন থাকতে পারো, তবেই তুমি আমার সমস্ত কিছুর একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে। নয়ত নয়। আর এই তিন বছর তোমার থাকা, খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট হবে না, দরকার পড়লে কিছু কিছু টাকা তুমি খরচ করতে পারবে। তিন বছর পরে তুমি বিষয়সম্পত্তি পেয়ে যা খুশি করতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, তোমার মাথার ওপর আত্মারা থাকবে–তোমার মা-র, বাবার, আমার ।...তিন বছর পরে আমার বিশ্বাস, তুমি আজ যা ভাবছ তা আর ভাবতে পারবে না।"

তারাপদ কোনো কালেই অঙ্ক জিনিসটা বোঝে না; তার মাথায় ফন্দি ফিকিরও খেলে না। তবু ভুজঙ্গভূষণের কথা থেকে বুঝতে পারল, লোকটি ভীষণ চতুর, সবদিক দিয়েই পথ আগলে রেখেছে।

তারাপদ চুপ। কী বলবে? সরাসরি না করে দেবে? কী দরকার তার এত সম্পত্তিতে? কোন দুঃখে সে তান্ত্রিক-টান্ত্রিক হতে যাবে? কেনই বা সে ভুজঙ্গভূষণের মতন আত্মা-টাত্মা নামাতে যাবে? সে যা আছে–এই কি যথেষ্ট নয়? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল সাধুমামার কথা, কিকিরার কথা। সবাই তাকে বলেছেন, ভুজঙ্গ শয়তান, ভুজঙ্গ পাপী। সাধুমামা মিনতি করে বলেছেন, বাবা

তুমি আমাদের এই নরক থেকে উদ্ধার করো। কেমন করে উদ্ধার করবে। তারাপদ? তিন বছর এই পুরীতে নিজে বন্দী থেকে সমস্ত কিছু নিজের আওতায় আনার পর? কিন্তু আত্মা? মা-বাবার মৃত আত্মার সামনে শপথ নেবার পর সে কি অমন কাজ করতে পারবে? .
তারাপদ কথা বলছে না দেখে ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তুমি মন স্থির করতে পারছ না?"

বিড়বিড় করে তারাপদ বলল, "আমায় ভাববার একটু সময় দিন।"

"বেশি সময় তোমায় কেমন করে দেব। আমার সামনেও যে সময় নেই। তুমি কি কোনো সন্দেহ করছ তারাপদ? তোমার মা-বাবার আত্মার ইচ্ছে কি পূরণ করতে মন চাইছে না?"

তারাপদ কিছু খেয়াল না করেই বলল, “আত্মা কি কথা বলে না?”

“না। কখনো-সখনো এক-আধটা কথা কেউ বলেছেন। আমি কাউকে কথা বলতে দিতে চাই না।”

“আমার মা-বাবা যদি একটা কথা বলতেন।”

‘তারাপদ, আত্মারা তোমারা আমার মতন স্কুল দেহ নিয়ে থাকেন না। সূক্ষ্ম আত্মা, সে প্রায় বাতাসের মতন। তাঁদের দিয়ে কথা বলাবার চেষ্টা না করাই উচিত। যিনি বাতাসের আকার নিয়ে থাকেন, তাঁকে সবাক করা উচিত নয়। তাতে তাঁদের বড় কষ্ট হয়।...তবে আমি একটা কাজ করতে পারি। আত্মারা

যে কখনো কখনো নিজেদের আসা-যাওয়ার চিহ্ন রেখে যান, সে-প্রমাণ আমি তোমায় দেখাতে পারি? দেখবে?”

তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দনের চোখে কৌতূহল।

তারাপদ বলল, “দেখব। “

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “বেশ। তুমি দেখতে চেয়েছ যখন আমি দেখাব। ওই ঘন্টাটা আমার কাছে দিয়ে যাও।”

তারাপদ উঠল। ঘন্টাটা চন্দনের পায়ের দিকে, যেদিকে চন্দন আর মেয়েটি পায়ে পা ছুঁইয়ে বসেছিল। চন্দন মাটিতে হাত নামিয়ে ঘণ্টাটা তুলে দিল। তারাপদ ঘন্টা হাতে করে ভুজঙ্গর সামনে গিয়ে হাত বাড়াল ।

ভুজঙ্গভূষণ ইশারা করে ঘন্টাটা নিচে নামিয়ে রাখতে বললেন।

তারাপদ ঘণ্টা নামিয়ে রাখল। রেখে নিজের জায়গায় ফিরে আসার সময় শুনল ভুজঙ্গ ঘণ্টা বাজালেন। তাঁর মাথার দিকে টকটকে লাল আলো জ্বলে উঠল আবার। তারাপদদের ওপরকার আলো নিবে গেল। আর কী আশ্চর্য, ভুজঙ্গভূষণের পেছন দিক থেকেই পরদার আড়াল সরিয়ে সাধুমামা এলেন। তারাপদদের দিকে তাকালেন না সাধুমামা, বাধ্য অনুগত চাকরের মতন ভুজঙ্গর সামনে মাথা নিচু করে আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ভুজঙ্গভূষণ হাতের ইশারায় তাঁর সামনের নিচু টেবিলটার দিকে দেখালেন। নিচু গলায় কী যেন বললেন, শুধু ‘মোম’ শব্দটা কানে গেল তারাপদর। সাধুমামা টেবিলের ওপর থেকে সামান্য লম্বা গোল মতন অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রটা নিয়ে চলে গেলেন। কাঁচের গোল বয়ামটা পড়ে থাকল। তার মধ্যে যেন জল, অর্ধেকের বেশি বয়ামটা ভরতি।

ভুজঙ্গভূষণ তারাপদর দিকে তাকালেন। “তুমি কতটা সাহসী?” কথার মধ্যে যেন একটু ঠাট্টার ভাব ছিল।

তারাপদ কথার জবাব দিল না। সে সাহসী নয়। ঘরের মধ্যে যা ঘটছে, তা সহ্য করার মতন মনের জোরও তার থাকার কথা নয়। তবু, দু দিনের পর–আজ তৃতীয় দিনে কেমন করে সে সাহস দেখাতে পারছে–সে নিজেই জানে না।

“তোমার বন্ধুর সাহস বোধ হয় বেশি।”–ভুজঙ্গ চন্দনকে লক্ষ করে বললেন। “ডাক্তার

লোক..আমার এখানে ভয় পাবার মতন কিছু নেই, তবু লোকে ভয় পায়। ভয় পায় কেন জানো? যারা ইহলোকের মানুষ, তারা পরলোকের কথা বোঝে না। পরলোক থেকে যাঁরা আসেন, তাঁদেরও বুঝতে পারে না। যা অজ্ঞেয়, তাকে মানুষ ভয় করে। তবে আত্মারা সচরাচর কারও ক্ষতি করেন না, যদি না আমরা তাঁদের বিরক্ত করি, অশ্রদ্ধা করি। কখনো কখনো কোনো দুষ্ট আত্মা হঠাৎ এসে যান। তাঁরাই বড় ভয়ংকর। তাঁরা কাউকে ভর করলে বিপদে পড়তে হয়। যাক, আবার একবার আমি চেষ্টা। করে দেখি তারাপদ–যদি কাউকে আনতে পারি। একটা কথা মনে রেখো, আত্মারা আমাদের ইচ্ছাধীন নন, আমরাই তাঁদের ইচ্ছাধীন। তোমার মা বাবাকে আজ অনেকক্ষণ আমরা ডেকে এনে কাছে রেখেছিলাম। এভাবে থাকতে ওদের বড় কষ্ট হয় । জানি না ওরা আর আসবে কিনা! তুমি কাকে আনাতে চাও আমি জানি না। “

তারাপদর মনে হল, মা-বাবার হয়ত কষ্ট হবে আসবে। হতেও তো পারে।

তারাপদ আচমকা বলল, “পরী আসবে না?”

“পরী?”

“পরীকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করে। সে যদি একবার আসত.” বলতে বলতে আবেগে গলা ধরে গেল তারাপদর।

ভুজঙ্গভূষণ অল্প নীরব থেকে বললেন, “তুমি যে-পরীকে দেখেছ সেই পরী–তোমার সেই ছোট্ট পরী কি এখনও অতটুকু আছে! আত্মা অমর, তার কোনো পরিবর্তন থাকে না–তবু নিজেদের মতন করে তারা কিছুটা বদলে যায়।...ঠিক আছে, আমরা পরীকেই ডাকব। যদি সে আসে–এই ঘরে তার আসার চিহ্ন রেখে যাবে। তোমাদের আমি সাবধান করে দি, এবার যে আসবে–সে সরাসরি আসবে, মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে নয়, তোমরা কোনো রকম নড়াচড়া করবে না, কথা বলবে না, কিছু ধরবার চেষ্টা করবে না–আত্মাকে ধরার চেষ্টা করা মুখ । শান্ত, ধীর-স্থির হয়ে বসে থাকবে–। দেখো কী। হয়! পরী আসে কি আসে না।”

সাধুমামা আবার ফিরে এলেন। সেই পাত্রটা ভুজঙ্গভূষণের টেবিলের সামনে নামিয়ে রাখলেন। ভুজঙ্গ ঘরে আরও কিছুটা ধুনো-গুগগুল দিয়ে দিতে বললেন। ঘরের কোণে কোণে ধূপের বাটি ছিল ঢাকা, ধূপ দিতে বললেন।

সবাই যেন তৈরি ছিল। সাধুমামা চলে যেতেই মৃত্যুঞ্জয় এল। তার দু হাতে ধোঁয়া-ওঠা ধুনোর পাত্র। গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ঘরে ধোঁয়া দিয়ে সে পাত্র দুটো আড়ালে রেখে দিল। একটুও আগুন বা আভা দেখা গেল না। বাটিতে ধূপ এনে সাধুমামা ঘরের কোণে আড়াল করা জায়গায় রেখে গেলেন। ধূপের আগুনও চোখে পড়ল না।

ঘরের সমস্ত বাতি নিভে গেল। ঘোর অন্ধকার । কোথাও এক বিন্দু আলো নেই। ভুজঙ্গভূষণ তাঁর জলদগম্ভীর গলায় আশ্চর্য সুরে দীর্ঘ এক সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। গানের সুরের মতন লাগছিল। ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, ধুনোর গন্ধ, গুগগুলের গন্ধ, ধূপের তীব্র এক গন্ধেও ঘর ভরে উঠল।

ভুজঙ্গভূষণ মন্ত্রের মতন করে সেই শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে শেষ পর্যন্ত থেমে গেলেন কিছুক্ষণ পরে বললেন, “যাকে আনতে চাইছ, তাকে চোখ বন্ধ করে একমনে ডাকো, তারাপদ। কোনো কথা বলো না। তোমরা কেউ কাউকে স্পর্শ করো না।”

তারাপদ পরীকে মনে মনে ভাবতে লাগল। ডাকতে লাগল। পরী-পরী সেই ছোট্ট পরী।

চন্দন চোখ খোলার চেষ্টা করল বার কয়েক। পারল না। যেন পাতালের তলায় তারা কোথাও নেমে গেছে, ঘটুঘুট করছে অন্ধকার।

কোনো শব্দ নেই, আলোর একটি ফোঁটাও কোথাও নেই। সময় বয়ে যাচ্ছে। এর যেন শেষ নেই। তারাপদ কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পরীকে ভাবতে লাগল।

কতক্ষণ যে কেটে গেল খেয়াল নেই। হঠাৎ ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "আমি ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। কে একজন এসেছে! কে?"

তারাপদ সচেতন হল। চন্দনও।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "পরী, তুমি যদি এসে থাকো, তোমার দাদার কাছে যাও। তাকে ওই গন্ধ, তোমার বয়ে আনা গন্ধ তাকে জানতে দাও মা।"

তারাপদ একেবারে ধীরস্থির হয়ে বসে থাকল। বুক কাঁপছে। তবু সে অধৈর্য।

পরী আসছে না। কেন আসছে না? তার দাদা তাকে ডাকছে–তবু কেন আসছে না?

একেবারে আচমকা তারাপদর নাকে এক গন্ধ ভেসে এল। কোন ফুলের গন্ধ সে বুঝতে পারল না। চাঁপা ফুলের মতনই অনেকটা।

পরী এসেছে। তারাপদ থরথর করে কাঁপতে লাগল। পরী এসেছে। পরী, পরী, সোনা বোন আমার।

আবেগে তারাপদ যখন কেঁদে ফেলেছে, হঠাৎ তার গালের পাশে পরীর চুলের ছোঁয়া পেল। তারপর আর নয়। ছোঁয়া নয়। গন্ধটাও ফিকে হয়ে যেতে যেতে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "পরী, তুমি যে এই ঘরে এসেছিলে তার কিছু চিহ্ন রেখে যাও। তোমার দাদা সামান্য কিছু চিহ্ন চায়। আমার সামনে মোমের পাত্র আছে। তোমার হাতের কিছু চিহ্ন রেখে যাও মা। অন্তত একটা-দুটো আঙুলের।"

আবার সব নিস্তব্ধ।

অনেকক্ষণ পরে জঙ্গভূষণ বললেন, "পরী চলে গেছে। আমি আর কোনো গন্ধ পাচ্ছি না।"

আরও সামান্য সময় গেল । ভুজঙ্গভূষণ ঘণ্টা নাড়লেন। তারাপদদের মাথার ওপরকার বাতি জ্বলে উঠল।

তারাপদ আর চন্দন অন্ধের মতন বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে তাদের চোখ ফুটল।

ভুজঙ্গভূষণ সামনের টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "তারাপদ, তোমার বোন পরী এসেছিল। ওই দেখো সে তোমার জন্যে তার আঙুলের ওই চিহ্ন রেখে গেছে।"

তারাপদ প্রায় পাগলের মতন সামনে ছুটে গেল। ভুজঙ্গভূষণের সামনের টেবিলে মোমের

একটা আঙুল পড়ে আছে।

আঙুলটা নেবার জন্যে তারাপদ হাত বাড়াল।

দশ

সকালে তারাপদর আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। ঘুম ভেঙে যাবার পরেও সে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। শরীর যেন ভেঙে যাচ্ছে, হাত-পা ভার, চোখ জ্বালা করছিল। সারা রাত জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকার পর সকালে ঘুম ভাঙলে যেমন লাগে, সেই রকম লাগছিল। শরীরের দোষ নেই, আজ ক'দিনই একটা-না-একটা এমন কিছু ঘটে যাচ্ছে যাতে মাথার ঠিক থাকে না, একের পর এক ভাবনা সারাক্ষণ জট পাকিয়ে থাকে মাথায় । রাত্রে ঘুম হয় না ভাল করে। তার ওপর কালকের ঘটনার পর তারাপদ একেবারেই ঘুমোত পারেনি। বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে, মাঝে মাঝেই কেঁদে উঠেছে বাবা-মা-পরীর কথা ভেবে। তবু বাবা কিংবা মা তাকে এমন করে বিহ্বল করে যায়নি। পরীই যেন সব উলটে-পালটে দিয়ে গেল। তার আত্মা তারাপদর গায়ের কাছে, সামনেই এসে দাঁড়াল, গন্ধ শুকিয়ে দিল, চুলের ছোঁয়া দিল মুহূর্তের জন্যে, একটা মোমের আঙুলও রেখে গেল চিহ্ন হিসেবে। এরপর তারাপদ কেমন করে স্থির থাকবে! সে কাকে বোঝাবে, এই ছোট্ট বোনটিকে সে কতদিন কোলে করে একটু বসে থাকার জন্যে মায়ের কাছে আবদার করত!পরী তখন চার ছ'মাসের বাচ্চা! ওইটুকু বাচ্চা কিছুই তো বোঝে না, তবু তারাপদ বিকেলে খেলাধুলো ছেড়ে বোনের পাশে শুয়ে-শুয়ে কাগজের ফুল দেখিয়েছে, ঝুমঝুমি নেড়েছে, প্রাণপণে ছড়া কেটেছে। পরী আরও যখন বড় হল একটু, তারাপদ বোনকে বসতে, পা-পা করে হাঁটতে, একটা দুটো আধো-আধো কথা বলতে শিখিয়েছিল। সেই বোন যখন থাকল না–তখন তারাপদর বুক ভেঙে গিয়েছিল। সমস্ত বাড়ি অসাড় থাকত তখন; মা আড়ালে বসে কাঁদত, বাবা কেমন পাথরের মতন হয়ে গিয়েছিল, আর তারাপদ বেড়াল-ছানার মতন সারা বাড়ি কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াত।

সেই পরী কাল এসেছিল। তারাপদ তাকে চোখে দেখতে পেল না বটে, তবে আসার প্রমাণ তো পেল। পরী আজও কোথাও-না-কোথাও রয়েছে এটা জানার পর বুকের মধ্যে কেমন হয় এ-কথা শুধু তারাপদই বুঝতে পারে। আর কেউ বুঝবে না।

মাঝরাত পর্যন্ত চন্দনকে জ্বালিয়ে শেষরাতে তারাপদ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর এখন উঠল বেশ খানিকটা বেলায়, ঘরে রোদ ঢুকে পড়ার পর ।

চন্দন বিছানায় নেই । অনেক আগেই বোধ হয় উঠে পড়েছে ।

শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠল তারাপদ, অনেকটা জ্বোরো রোগীর মতন বেখেয়ালে মুখটা ধুয়ে এল। একজনকে দেখতে পেয়ে চা দিতে বলল রুক্ষ গলায়। কেন যে রুক্ষ হল নিজেও বুঝল না।

ঘরে বসে যখন চা খাচ্ছে তারাপদ, চন্দন এল।

"ঘুম ভাঙল তোর?" চন্দন বলল।

"হ্যাঁ। তুই কোথায় গিয়েছিলি?"

চন্দন হাত বাড়িয়ে নিজের জন্যে এক পেয়ালা চা ঢেলে নিল; কথা বলল প্রথমটায়, তারপর বলল, "রোগী দেখতে!"

অবাক হয়ে তারাপদ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

চন্দন বলল, "সাধুমামার বুকে ব্যথা উঠেছিল।"

"সাধুমামার?"

"ভোর রাতে আমায় মৃত্যুঞ্জয় ডাকতে এসেছিল। তোকে আর আমি জাগাইনি। একটু আগে আর একবার দেখতে গিয়েছিলাম সাধুমামাকে।"

তারাপদ উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "কী হয়েছে সাধুমামার? কেমন আছে?"

"ভালই আছেন এখন!"

"বুকে ব্যথা কেন? হার্টের গোলমাল?" চন্দন পর পর দু' চুমুক চা খেল। সিগারেটও ধরাল। শেষে হেঁয়ালি করেই যেন বলল, "হতে পারে।"

"হতে পারে মানে?"

"বলতে পারছি না। হার্টের গোলমাল ধরা কঠিন। আমার কাছে স্টেথোও নেই। তবে ব্যথাটা হার্টের দিকটাতেই।"

"তোর কাছে তো ওষুধও নেই কিছু?"

"না। দু-চারটে যা এনেছি, তাতেই আপাতত কাজ চালিয়ে দিচ্ছি।"

তারাপদ কিছুই বুঝতে পারছিল না। সাধুমামার বুকের ব্যথা যদি এতই বেশি তাহলে চন্দন তেমন গা করছে না কেন? আশ্চর্য! যে ডাক্তারের না আছে স্টেথোসকোপ না কোনো ওষুধপত্র, সে-ডাক্তার কেন রোগীর ভার নেবে! তারাপদ বলল, "তুই সবে পাশ করেছিস, তোর কাছে ওষুধপত্র নেই–কেন তুই এই দায়িত্ব মাথায় নিচ্ছিস? সাধুমামা বুড়োমানুষ, একটা-কিছু হয়ে গেলে তখন সামলাতে পারবি না। তার চেয়ে ভুজঙ্গদের বল–কোনো ডাক্তার-টাক্তার ডেকে আনবে।"

চন্দন কথাগুলো কানে শুনেও গা করল না, বলল, "বোকার মতন কথা বলিস না। আমি যেমন ডাক্তারই হই বিপদে পড়ে কেউ যদি আমায় ডাকতে আসে আমি না বলতে পারি না। তা ছাড়া এখানে ধারেকাছে কোনো ডাক্তার নেই । হয় মধুপুর না হয় দেওঘর থেকে ডাক্তার আনতে হবে। তার মানে গোটা একটা দিনের ব্যাপার । তোকে বলেছি না–কাজে লাগতে পারে ভেবে আমি দু-একটা ইনজেকশানের ওষুধ নিয়ে এসেছিলাম। তার মধ্যে একটা হার্টের ওষুধ ছিল। ভেবেছিলাম ভুজঙ্গ অক্কা পাবার আগে কাজে লাগবে। সাধুমামার দরকারে লেগে গেল ।...যাক গে, সাধুমামা এখন ঘুমোচ্ছে; ইনজেকশান দিয়ে দিয়েছি ভোর রাতেই। মনে হচ্ছে, কোনো গণ্ডগোল হবে না। এর পর ভুজঙ্গ কী করবে না-করবে সেটা তার ব্যাপার। আমার যা করার করেছি, যা বলার মৃত্যুঞ্জয়কে বলেছি।"

তারাপদ চা শেষ করে ফেলল। হাই তুলল আবার। চা খাওয়ার পর সামান্য আরাম লাগছিল।

চন্দন বলল, "একবার কিকিরার কাছে যেতে হবে।"

"কেন?"

"চল না; গেলেই বুঝতে পারবি।"

মাথা নাড়ল তারাপদ। "আমার ভাল লাগছে না।"

"এই বাড়িতে বসে বসেই বা তোর কী ভাল লাগবে?"

কথার জবাব দিল না তারাপদ।

অপেক্ষা করে চন্দন হঠাৎ বলল, "তুই যদি আমার সঙ্গে না যাস, তারা–আমি কিন্তু আর এ-বাড়িতে ফিরব না; কিকিরার কাছে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেলের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাব।"

তারাপদ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন চন্দনের হঠাৎ এই মত পালটে ফেলার ব্যাপারটা বুঝতে না-পেরে তাকে লক্ষ করতে লাগল।

চন্দনও চা শেষ করে ফেলল। তারাপদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চল্।" ।

তারাপদ বলল, "কী হবে কিকিরার কাছে গিয়ে?"

"কী হবে না-হবে, তোর কাছে আমি এখন বলব না। যদি তুই না যাস, আমি বুঝব তুই ভুজঙ্গর ফাঁদে ধরা পড়ে গিয়েছিস। আমি আর এখানে থাকব না।"

চন্দনের মুখ দেখেই তারাপদ বুঝতে পারল, ও বাজে কথা বলছে না। সত্যিই-সত্যিই তারাপদকে রেখে চন্দন চলে যাবে। ও বরাবরই জেদী, একবার যা ঠিক করে নেয় তার নড়ানো যায় না। তবু তারাপদ বলল, "কী হল ব্যাপারটা? হঠাৎ তুই এরকম করছিস?"।

চন্দন চাপা গলায় বলল, "এখানে বসে সব কথা বলা যাবে না। তুই হয় আমার সঙ্গে চলনা হয় তুই এই লাখটাকার সম্পত্তির জন্যে ভুজঙ্গর কাছে বসে থাক–আমি থাকব না।"

তারাপদর কানে কথাটা বড় লাগল। আহত হয়ে বলল, "তুই আমায় এত লোভী ভাবলি?"

চন্দন বলল, "এই বাড়িতে বসে আমি আর একটা কথাও বলব না। যদি তোর ইচ্ছে না থাকে, তুই যাস না। আমি যাচ্ছি।"

তারাপদর সাধ্য হল, না চন্দনকে ছেড়ে দেয়। সে স্পষ্টই বুঝল, চন্দন তাকে। মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে না–সত্যিই ও চলে যাবে, যা একগুঁয়ে ছেলে। তা। ছাড়া তারাপদর সন্দেহ হল, চন্দনের যেন কিছু বলার আছে, গোপনে বলবে। অগত্যা তারাপদ বলল, "বেশ। আমি যাব।"

তারাপদ আর চন্দন বেরিয়ে পড়ল । মৃত্যুঞ্জয় তাদের দেখেছিল, কিছু বলল না। কেউ যে নজর রাখছে, তাও মনে হল না।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চন্দন বলল, "তোকে একটা কথা বলি তারা, কিছু মনে করিস না। ভুজঙ্গ তোকে জব্বর প্যাঁচ মেরে কবজা করে ফেলেছে।"

তারাপদ রেগে গেল। বলল, "কেন? কী করে বুঝলি?"

"বুঝেছি। তোকে আমি বুঝব না? তুই বরাবর নরম ধাতের । একটুতেই কেঁদে ফেলিস, বুক

চাপড়াস, ছটফট করিস। তোর মতন সেন্টিমেন্টাল ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। তোর মনে কোনো জোর নেই।"

চন্দন আরও কী বলতে যাচ্ছিল, তারাপদ বাধা দিয়ে রাগের গলায় বলল, "লেকচার মারিস না, চাঁদু । আমি অনেক লেকচার শুনেছি।"

"তুই চটে যাচ্ছিস কেন?"

"আলবাত চটব। তুই আমায় লোভী বলবি, সেন্টিমেন্টাল বলবি–আর আমি চটব না!"

চন্দন বন্ধুর রাগ দেখে হেসে ফেলল। তারাপদর রাগ ভাঙাবার জন্যে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই মিছিমিছি চটছিস। সকলের মন কি একরকম হয়? কারুর মন শক্ত হয়, কারুর নরম; কেউ নিষ্ঠুর হয় তোর ভুজঙ্গ-পিসেমশায়ের মতন, কেউ বা সাধুমামার মতন দুর্বল হয়। তোর মন নরম বললে তুই চটবি কেন?"

"তুই আমায় লোভী বলেছিস।"

"লোভ সব মানুষেরই অল্পস্বল্প থাকে, তারা। পড়ে-পাওয়া সম্পত্তির লোভ ভাই আমারও থাকত। যাকগে, তুই লোভী নোস, যা বলেছি–ভুল করে বলেছি। এবার হল তো?"

তারাপদ কোনো কথা বলল না। চন্দন বন্ধুর গলা জড়িয়েই হাঁটতে লাগল। খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, "ভুজঙ্গ তোকে বশ করে ফেলছে, তারা। ধীরে ধীরে তোকে মুঠোয় পুরে ফেলছে। এরপর তুই আর পালাতে পারবি না, সে-ক্ষমতা তোর থাকবে না। আমিও তোকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

তারাপদ বলল, "যা মনে করিস বল, আমি কিছু বলব না।"

"তুই সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করিস তোর মা-বাবার আত্মা আসে? তুই কি বাস্তবিকই মনে করেছিস–কাল তোর কাছে পরী এসেছিল?"

"হ্যাঁ, পরী এসেছিল।"

"আমি বিশ্বাস করি না। এ অসম্ভব।"

"তুই বিশ্বাস না করতে পারিস, কিন্তু আমি করি। যদি পরী না আসবে তবে কে আমার নাকের কাছে গন্ধ শুকিয়ে যাবে, কার মাথার চুল আমার মুখে লাগবে? কার আঙুলের ছাঁচ পড়ে থাকবে?"

চন্দন বন্ধুর গলা থেকে হাত সরাল। মুখোমুখি তাকাল। বলল, "তুই পাগলের মতন কথা বলছিস। পরী মারা গিয়েছিল ছোট্ট বয়সে, তুই বলিস বছর দুই-তিন বয়েসে । শোন তারা, যা বলছি ভেবে দেখ । পরী যখন মারা যায় তখন তুই নিজেই ছেলেমানুষ; পরীর ঠিক-ঠিক বয়েস কত হতে পারে তুই জানিস না। দু-তিন বছর হতে পারে, আবার চারও হতে পারে। সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু ছোট্ট পরী কি মরে গিয়েও পরলোকে বাড়ছে?"।

তারাপদ কথাটা বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে বলল, "মানে?"

চন্দন বলল, "এটা তো সোজা ব্যাপার। আমরা চেয়ারে বসেছিলাম–ঠিক কিনা বল? একটা

তিন-চার বছরের মেয়ে মাথায় কত লম্বা হবে রে যে তোকে গন্ধ শুকিয়ে যাবে, মুখে চুলে ছোঁয়া দিয়ে যাবে? যদি মেয়েটা কম করেও ফুট চারেকের মতন লম্বা না হয়, কখনোই আমরা চেয়ারে বসে থাকার সময় মুখে মাথার চুল ছোঁয়াতে পারে না। এটা সোজা অঙ্কের ব্যাপার। চেয়ারে বসে থাকার সময় আমাদের মুখ মাটি থেকে অন্তত সোয়া তিন সাড়ে তিনি ফুট উঁচুতে থাকে, ওই হাইটের কোনে মেয়ে পাশে না দাঁড়ালে তার চুলের ছোঁয়া তোর মুখে লাগতে পারে না। অবশ্য যে-মেয়ে মাথায় আরও লম্বা সে কিন্তু ঘাড় নামিয়ে হেঁট হয়ে তোর মুখে চুলের ছোঁয়া লাগাতে পারে। এবার তুই বল, মারা যাবার পর স্বর্গে গিয়ে পরী কি তোর-আমার মতন বছরে বছরে বাড়ছে? তা যদি বাড়ে–তবে তার বয়েস আজ ষোলো সতেরো হতে পারে।”

তারাপদ বোকার মতন বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কথা বলতে পারল না। পরীর মুখ কিংবা স্মৃতি যেটুকু মনে আছে তারাপদর, তাতে সেই ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে কখনোই মাথায় অত লম্বা হতে পারে না। বড় জোর বছর তিনেকের ছিল পরী। সে কতই বা লম্বা হবে? তা ছাড়া তার মাথার চুল ছিল ঝাঁকড়া, কিন্তু বল্ করে ছাঁটা। সেই চুলই বা কেমন করে মুহূর্তের জন্যে পালকের ছোঁয়ার মতন তারাপদর গালে লেগে সরে যাবে? মোমের আঙুলের যে ছাঁচ তারাপদ দেখেছে–সেটাও তো কচি মেয়ের নয়। তা হলে? আত্মারা কি মানুষের মতন পরলোকে গিয়ে বয়েসেও বাড়ে? যদি তা বাড়ত–তবে হাজার-হাজার আত্মার বয়েস শ, দুশ, পাঁচশ বছর হয়ে গেছে।

তারাপদ এরকম একটা হেঁয়ালির কোনো কূলকিনারা খুঁজে পেল না। বলল, “কী জানি, আমি কিছু জানি না। তবে ভুজঙ্গ তো আগেই বলেছে–পরী আর অত ছোট্টটি নেই। আত্মাদের অন্য কোনো ব্যাপার আছে।”

“কোনো ব্যাপার নেই”, চন্দন ঘাড় নেড়ে বলল, “আমি তোকে বলছি–যে-মেয়েটি আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসে, আত্মা নামাবার মিডিয়াম হয়–সেই মেয়েটাই কাল পরী সেজে তোর কাছে এসেছিল।”

তারাপদ প্রবলভাবে বাধা দিতে গেল, চন্দন শুনল না। বলল, “মেয়েটার মাথায় অনেক চুল, সব সময় চুল এলো করে থাকে, মাথায় লম্বা, গায়ে রোগা–তারা, এই মেয়েই কাল পরী সেজে এসেছিল।”

চন্দন আরও কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। পরে বলল, “কিকিরার কাছে চল । কিকিরা তোকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন ভুজঙ্গ কেমন করে আত্মা নামায়।”

.

মাঠেঘাটে নয়, কিকিরা বাড়িতে চন্দনদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ি মানে সেই হরিরামের আস্তানা। বালিয়াড়ির আড়ালে মাঠকোঠা ধরনের বাড়ি, দোতলা, কাঠের সিঁড়ি, মাথায় খাপরার চাল। চারদিকেই কিছু-না-কিছু গাছপালা। বাড়ির একপাশে বাঁধানো কুয়ো।

হরিরাম খেতখামার নিয়ে পড়ে থাকত একসময়, ছেলে গোরখপুরে বড়সড় ব্যবসা ফাঁদার পর বাবার কাছে বড় একটা আসতে পারে না। হরিরামের স্ত্রী মারা গিয়েছে বছর কয়েক আগে। সংসারে একলা মানুষই এখন হরিরাম। খেতখামারের ওপর তার আর টান নেই, ধর্মকর্ম নিয়েই দিন কাটায়। বাড়িতে জোয়ান বয়েসের কাজের লোক আছে একটা, আর আছে পাঁড়েজি, বুড়ো বামুন।

কিকিরা দোতলার ঘরে ডেকে নিলেন চন্দনদের। ঘরটা কাঠের, শীতের রোদ খেয়ে মোটামুটি গরমই লাগছিল, সরাসরি রোদ পড়েছে পেছন দিকটায়, সামনে সরু বারান্দা।

কিকিরার ঘরে একটা তক্তপোশ, টিনের চেয়ার আর কাঁঠালকাঠের টেবিল ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। দড়ির আলনায় জামাটামা ঝুলছে কিকিরার।

চন্দনরা বসার পর কিকিরা তারাপদর মুখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "রাত্তিরে ঘুম হয়নি, স্যার?" বলে একটু হাসলেন।

চন্দন বলল, "ওর ঘুম তো গেছেই, সঙ্গে-সঙ্গে আমারও। কাল সারারাত তারা যা করেছে– ভাবছিলাম ওকেই একটা ইঞ্জেকশান ঠুকে দিই।"

"কেন কেন?" কিকিরা কৌতূহল বোধ করে বললেন।

চন্দন বলল, "বলছি। তার আগে আর-একটা খবর আছে। সাধুমামার আজ শেষরাত থেকে শরীর খারাপ। বুকে ব্যথা। মৃত্যুঞ্জয় আমায় ডাকতে এসেছিল শেষরাতে।"

কিকিরা কেমন ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বুকে ব্যথা? কী হয়েছে?"

"আমার মনে হল, অনেকদিন ধরেই উনি কোনো দুঃখ-দুভাবনার মধ্যে রয়েছেন, শরীরটাও দুর্বল। হার্টের কিছু গোলমাল হয়ে থাকতে পারে। আমার কাছে স্টেথেসকোপও নেই। নাড়ি ধরে কতটুকু আর বুঝব! প্রেশার, হার্টসই দেখানো দরকার। তবে এই ব্যথাটা বোধ হয় মনের ভীষণ দুভাবনা থেকে হয়েছে।" বলে চন্দন অল্প সময় করে থেকে তারাপদকে দেখল দু পলক, শেষে কিকিরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যখন সাধুমামাকে দেখছিলাম, মৃত্যুঞ্জয় আমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন নিচে এসে ইনঞ্জেকশান নিয়ে আবার ওপরে গেলাম তখন আমি মৃত্যুঞ্জয়কে ঘর থেকে সরিয়ে দিলাম কায়দা করে।"

"কেমন করে?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"ব্যাপারটা সহজ। বললাম, আমার কাছে ইথার-টিথার নেই, ইনজেকশানের সিরিঞ্জ আর ছুঁচ স্টেরিলাইজ করতে হবে। গরম জলে এগুলো ফুটিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন তাড়াতাড়ি।"

কিকিরার মুখ দেখে মনে হল তিনি চন্দনের উপস্থিত বুদ্ধিতে খুশি হয়েছেন।

চন্দন বলল, "সাধুমামার মুখ চোখ দেখে আমি আগেই বুঝেছিলাম তিনি আমায় কিছু বলতে চান। তাই কায়দা করে মৃত্যুঞ্জয়কে সরালাম। ঘরে যখন আমি আর সাধুমামা ছাড়া অন্য কেউ নেই, তখন সাধুমামা বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটা চিরকুট বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, আপনার কাছে চিরকুটটা দিতে।" বলে চন্দন প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল।

তারাপদ বোকার মতন বসে থাকল । অবাক চোখ করে, সে একবার চন্দনকে দেখছে, একবার কিকিরাকে। কী যে হয়ে যাচ্ছে কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে সাধুমামা কিকিরাকে জানেন। এটাও জানেন যে কিকিরা এখন এখানে। তারাপদদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। সাধুমামাও যেন এক রহস্য।

কিকিরা চিরকুটটা নিয়ে পড়লেন। বার দুই মনে হল, চঞ্চল হয়ে পড়েছেন; প্রকাশ করতে

চাইলেন না। কী মনে করে একটা সিগারেট চাইলেন চন্দনের কাছে, তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে হঠাৎ উঠে গেলেন।

ঘরে তারাপদ আর চন্দন।

তারাপদ বলল, “কিসের চিরকুট?”

চন্দন বলল, “কিকিরা বলবেন।”

“তুই দেখিসনি?”

“দেখেছি। বুঝতে পারিনি।” চন্দন এ কথা এড়িয়ে গেল ।

তারাপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, “সাধুমামা তোকে চিরকুট দিল কেন?”

চন্দন বলল, “তোকে দিয়ে লাভ হত না বলে। কিংবা তোকে দেবার কোনো সুযোগ ছিল না বলে।”

তারাপদর সন্দেহ হল। কিছু যেন ভাবল তারাপদ; বলল, “তুই কী বলতে চাসবুকের ব্যথার নাম করে সাধুমামা তোকে ডেকে ওই চিরকুটটা দিয়েছে?”

“আমার তাই মনে হয়,” চন্দন ছোট করে জবাব দিল।

“সাধুমামাও তাহলে কিকিরাকে চেনে?” তারাপদ বলল।

চন্দন চুপ করে থাকল।

কিকিরা ফিরে এলেন। ফিরে এসে বসলেন না, ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করলেন, তারাপদকে দেখলেন বারবার। তারপর বললেন, “একটু দেহাতী চা খেয়ে নিন স্যার, তারপর কথা বলা যাবে।”

তারাপদর ধৈর্য থাকছিল না। সাধুমামা কেন চিরকুট পাঠিয়েছে কিকিরাকে? কী লিখেছে চিরকুটে? অসহিষ্ণু হয়ে তারাপদ বলল, “সাধুমামা আপনাকে কী লিখেছে?”

কিকিরা প্রথমটায় জবাব দিলেন না। পরে বললেন, “সবই বলব স্যার, রয়েসয়ে শুনতে হবে। তার আগে বলুন, ভুজঙ্গ কাল আপনাকে কোন্ খেলা দেখিয়েছে?”

তারাপদর রাগ হল। খেলা? কিকিরা সব জিনিসকেই খেলা মনে করেন? রাগ করে তারাপদ বলল, “ভুজঙ্গ যা যা দেখায়, সবই আপনি খেলা মনে করেন?

কিকিরা তারাপদর রাগ বুঝে যেন মনে-মনে হাসলেন। চন্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনিই বলুন স্যার।”

সাধুমামার চিরকুটে কালকের কথার একটু-আধটু উল্লেখ ছিল । কিকিরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কাল ভুজঙ্গ কোন্ খেলা দেখিয়েছে। তবু, সবটাই শুনতে চান তিনি। কাল যা যা ঘটেছে চন্দন বলতে লাগল ।

ওরই মধ্যে কাঁচের বড় বড় গ্লাসে চা এল। দেহাতী চা না দুধ-চা বলা মুশকিল, দুধে সাদা হয়ে রয়েছে, সর ভাসছে ওপরে।

চন্দন কথা শেষ করে থামল।

কিকিরা সব শুনে তারাপদর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনি ঠিক জানেন আপনার বোনের আত্মা এসেছিল?"

তারাপদ জেদীর মতন বলল, "আসেনি তার প্রমাণ কোথায়?"

চন্দন চা খেতে খেতে বলল, "তারা, তোর মতন মুখ্য আমি আর দেখিনি। তোকে আমি অত করে বোঝালাম সাধারণ নিয়মে এটা হতে পারে না, অসম্ভব ব্যাপার।"

তারাপদ বলল, "জগতে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। ভুজঙ্গ আমার পিসেমশাই হয়ে ডেকে পাঠাবে এটাই কি সম্ভব?" চন্দন ভীষণ বিরক্ত বোধ করে চুপ করে গেল ।

সামান্য চুপচাপ। কিকিরা বললেন, "তারাপদবাবু, আপনি তা হলে বিশ্বাস করেন, আত্মা আছে, আর পরলোক থেকে সেই আত্মারা ভুজঙ্গর ডাকে মাটিতে। নেমে আসে?"

তারাপদ একগুঁয়ের মতন বলল, "হ্যাঁ করি। আমি যা দেখেছি তা অবিশ্বাস করব কেমন করে?"

কিকিরা কয়েক মুহূর্ত তারাপদর দিকে তাকিয়ে থেকে মজার গলায় বললেন, "আপনি যা যা দেখেছেন আমি যদি আপনাকে সেগুলো দেখাতে পারি তাহলে কি আপনি স্বীকার করবেন ভুজঙ্গ আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে?"

তারাপদ প্রথমে অবাক হল, তারপর অবিশ্বাসের চোখে কিকিরার দিকে তাকাল।

কিকিরা তাঁর আলখাল্লার মতন জামাটা খুলে ফেললেন। মাথার সেই টুপিটাও খুললেন। বড় রোগা দেখাচ্ছিল তাঁকে; রোগা আর রুগ্ন। মাথার চুলও কিছু কিছু সাদা, লম্বা লম্বা চুল, ঘাড় পর্যন্ত নামানো ।

কিকিরা বললেন, "চলুন আমরা নিচে যাই। নিচের তলায় হরিরামের একটা গুদোমঘর আছে। পুরনো, পোড়ো, ঘর। ঘরটা বেশ অন্ধকার। সেখানে আমরা এই সাত-সকালেই আত্মা নামাব ।" বলে কিকিরা যেন হাসলেন; বললেন, "ভুজঙ্গর আত্মা-নামানোর ঘরে অনেক ব্যবস্থা আছে। সেটা স্যার মডার্ন । আমাদের পোড়ো গুদোমঘরে কিছু নেই। তবু দেখা যাক সেখানে আত্মা নামে কি না?"

তারাপদ এবার কেমন বিব্রত বোধ করল । ভুজঙ্গর আত্মা-নামানোর ব্যপারটা পুরো ধোঁকা এ-কথা এখন প্রমাণ হয়ে গেলেও তার যেন ভাল লাগবে না। অথচ এটা যে মিথ্যে তাও জানা দরকার।

কিকিরা বললেন, "চলুন স্যার, দিনের বেলায় আত্মারা বড় একটা আসতে চায় না, তবু একবার চেষ্টা করা যাক। কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান অনেকদিন পরে তার খেলা দেখাবে।" বলে ঠাট্টার গলায় হাসলেন কিকিরা। তারপর জাদুকরের ভঙ্গিতে পিঠ নুইয়ে মাথা নিচু করে অভ্যর্থনার ভঙ্গি করে ডাকলেন তারাপদদের, "আসুন।"

চন্দন প্রথমে উঠে দাঁড়াল, তারপর তারাপদ। তারাপদ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় কিকিরা বললেন, “তারাপদবাবু, একটা কথা আপনাকে বলে দি। ভুজঙ্গ যতবড় শয়তান তার চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান। কিন্তু বুদ্ধিমানও ভুল করে। ভুজঙ্গ মস্ত বড় ভুল করেছে। বারবার একই ফন্দি কাজে লাগে না। পরীর আত্মা নামিয়ে সে আপনার বাবাকে পাগল করেছিল। তাঁকে মেরেছিল বলা যায়। ওই একই কায়দা করে সে আপনাকে হাতের মুঠোয় ধরে ফেলেছে। কিন্তু ও জানে না—একই ফাঁদে দু’বার শিকার ধরা যায় না।”

বাবার কথায় তারাপদ সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কিকিরা কিন্তু দাঁড়ালেন না। রোগা, রুগ্ন, হাড় জিরজিরে মানুষটির মুখে ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা যেন জ্বলে উঠেছিল।

তারাপদ কিকিরার এমন মুখ কখনো দেখেনি। তার কেমন যেন ভয় হল।

কিকিরা নিচে নেমে গেলেন।

এগারো

হরিরামে গুদোমঘরটা বেশ অন্ধকার। তবু ভুজঙ্গর আত্মা-নামানোর ঘরটার মতন ঘুটঘুঁটে নয়। এখন আবার দিনের বেলা, বাইরের আলো ছোটখাট ফাঁকফোকর দিয়ে একটু না একটু ঢুকে পড়ছে। ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখতে গেলে হলের মধ্যে যেমন লাগে–অনেকটা সেই রকম অন্ধকার লাগছিল এখানে।

কিকিরা বড় বড় ফাঁক-ফোকরগুলো ছেঁড়া চট, কাগজ, আরও যা যা পেয়েছেন হাতের কাছে, তাই দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন আগেই; ছোটগুলো ঢাকতে পারেননি। তার জন্যে তিনি ব্যস্তও হলেন না।

ঘরের মাঝমধ্যিখানে একটা ছোট টেবিল ছিল চৌকো ধরনের; আর দুটো চেয়ার, মুখোমুখি।

গুদোমঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন কিকিরা। বললেন, "তারাপদবাবু, আপনি আর আমি চেয়ারে গিয়ে বসব। মুখোমুখি। টেবিলের ওপরে আমাদের হাত থাকবে, আমরা দুজনে দুজনের হাত ধরে থাকব। আর টেবিলের নিচে আমাদের পা থাকবে, আমরা পায়ে পা ছুঁইয়ে রাখব। চন্দনবাবু যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন।..আসুন।"

তারাপদ কিকিরার মতিগতি বুঝতে পারছিল না। ওই খেপা মানুষটি কী পাগলামি শুরু করলেন? তা ছাড়া তারাপদর মাথায় বাবার কথা বারবার এসে পড়ছিল। কিকিরা কেন বললেন, ভুজঙ্গই একরকম তার বাবাকে মেরেছে? কেন বললেন, পরীর আত্মা নামিয়ে ভুজঙ্গ বাবাকে পাগল করেছিল? কিকিরা কি তার বাবার কথা জানেন? আশ্চর্য! যদি জানেন তবে আগে কেন বলেননি?

তারাপদর মন বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল।

কিকিরা ততণে চেয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তারাপদকে আবার ডাকলেন তিনি, "আসুন।"

ঝাপসা অন্ধকারে তারাপদ ধীরে ধীরে এগিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"বসুন," কিকিরা বসতে বললেন।

কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে তারাপদ বলল, "জুতো রয়েছে পায়ে।"

কিকিরা বললেন, "আগেই দেখেছি। শু। চামড়ার। বেশ শক্ত জুতো। ওতে কোনো ক্ষতি হবে না। আমার পায়েও রয়েছে।" বলে চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর ঠাট্টার গলায় বললেন, "ধূপ ধোঁয়া স্তোত্রপাঠ গানটান কিছুই তো এ-ঘরে দেখছেন না । ভুজঙ্গর তাক-লাগানো ব্যাপার কোনোটাই নেই স্যার। তবু দেখবেন আপনার পছন্দসই আত্মারা সবাই একে-একে চলে আসবে।...নিন, বসে পড়ুন।"

তারাপদ চেয়ার টেনে বসল। কিকিরাও বসে পড়েছেন। চৌকো ধরনের ছোটখাট অথচ সামান্য উঁচু টেবিলের দু ধারে মুখোমুখি দুজনে বসে। কিকিরা তাঁর দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন। টেবিলের ওপরই ফেলে রাখলেন হাত দুটো। বললেন, "নিন, আপনার হাত দুটো

এগিয়ে দিন; আমার হাত ধরুন।”

তারাপদ হাত ধরল । কিকিরা টেবিলের তলায় জুতোসমেত পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারাপদও তার পা বাড়াল। কিকিরা বললেন, “না না, আপনি অত লজ্জা পাবেন না স্যার, জুতোর মুখে মুখে ছুঁইয়ে রাখছেন কেন–ডগাটার ওপর একটু চাপ দিয়ে থাকুন।”

সঙ্কোচ হচ্ছিল তারাপদর। কিকিরার পায়ের ওপর নিজের জুতোসমেত পা কেমন করে চাপানো যায়? তার ভদ্রতায় বাধছিল। ভুজঙ্গর ওখানে তারা শুধু মেয়েটির পায়ের আঙুলের সঙ্গে আঙুল ছুঁইয়ে রাখে। আর এখানে কিকিরা জুতোর মুখের ওপর পা চাপিয়ে দিতে বলছেন। এ

তারাপদ তার জুতোর ডগা দিয়ে কিকিরার জুতোর ডগা চেপে থাকল।

কিকিরা বললেন, “বাঃ বাঃ, চমৎকার হয়েছে। এবার আমরা চোখ বন্ধ করব । বন্ধ করে আত্মার কথা ভাবব । চন্দনবাবু, আপনি চোখ খুলে সবই দেখতে পারেন, যদি অবশ্য এই অন্ধকারে দেখা যায়। রেডি,...তা হলে এবার আমরা আত্মা ডাকতে বসতে পারি। নিন তারাপদবাবু, চোখ বুজে ধ্যান করুন। কাকে ডাকতে চান?”

“বাবাকে।”

“বেশ, বেশ।”

তারাপদ চোখের পাতা বুজে ফেলল। কিকিরাও চোখ বন্ধ করার ভান করলেন–কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করলেন না। চন্দন সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে কিকিরাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। এই অন্ধকারে দুজনকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল মাত্র।

তারাপদ তার বাবাকে ডাকবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু একমনে ডাকতে পারছিল না। নানা ধরনের চিন্তা এসে যাচ্ছিল। কখনো ভুজঙ্গ এসে পড়ছিল, কখনো। সেই মেয়েটি। বাবার কথা ভাবতে গিয়েও কিকিরার কথাটা মনে আসছিল। কিকিরা কেন বললেন ভুজঙ্গই তার বাবাকে মেরেছে?

সমস্ত মন এলোমেলো হয়ে থাকায় তারাপদ কিছুতেই তার বাবাকে তেমন করে ভাবতে পারছিল না।

এইভাবে সময় কেটে যাচ্ছিল, আস্তে আস্তে । কতক্ষণ যে কেটে গেল তাও বোঝা গেল না। সবই চুপচাপ। এক-আধবার বাইরে থেকে কোনো কাকের ডাক কিংবা দূরে কাঠ কাটার শব্দ খুব ফিকেভাবে ভেসে আসছিল।

হঠাৎ যেন কিকিরা সামান্য কেঁপে উঠলেন। তারপর বললেন, “তারাপদবাবু, উনি এসেছেন।”

তারাপদ বোধ হয় সামান্য অপ্রস্তুত ছিল। বলল, “কে?”

“আপনার বাবা।”

“বাবা?” তারাপদ বিশ্বাস করতে পারল না। কিকিরা কি তার সঙ্গে তামাশা করছেন! কোথায় বাবা?

কিকিরা বললেন, “আপনার বাবার আত্মা আমায় ভর করে নেই, কিন্তু তিনি আমার কাছেই রয়েছেন। প্রমাণ চান?”

তারাপদ মুখ ফুটে বলতে পারল না–হ্যাঁ চাই। তার মন বলছিল–চাই, নিশ্চয়ই চাই।

কিকিরা যেন তারাপদর মন বুঝেই বললেন, “আপনার বাবার আত্মা এসেছেন কিনা সেটা আপনিই যাচাই করে নিন। ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করুন। জবাব হ্যাঁ হলে ঘন্টার শব্দ শুনবেন; না হলে ঘণ্টা বাজবে না।”

তারাপদ এবার খানিকটা অবাক হল। কিকিরা ঘণ্টার ব্যবস্থাও রেখেছেন? আগে তো বলেননি! কেমন একটা থতমত ভাব হল তারাপদর সত্যি সত্যিই কি কিকিরা আত্মা নামিয়েছেন না মজা করছেন তার সঙ্গে?

কিকিরা বললেন, “কই, জিজ্ঞেস করুন?”

তারাপদ ঢোক গিলে প্রশ্ন করল,”বাবা! বাবা আপনি এসেছেন?”

প্রথমটায় চুপচাপ। তারপর সত্যি সত্যিই ঘণ্টা বেজে উঠল ।

তারাপদ চমকে গেল। সে স্বপ্নেও ভাবেনি কিকিরা এইভাবে তাকে অবাক করে দেবেন। হতবুদ্ধি হয়ে গেল তারাপদ। আর ওই অবস্থায় আবার জিজ্ঞেস করল, “বাবা, সত্যিই আপনি এসেছেন?”

আবার ঘণ্টা বাজল। তারাপদ কান পেতে শব্দটা শুনল। ভুজঙ্গর ঘরে ঘণ্টার শব্দ আরও সুন্দর শোনায়, এখানে শব্দটা একটু অন্যরকম। ঠাকুরঘরে ঘণ্টা বাজার মতনই অনেকটা। হঠাৎ তারাপদর ঝোঁক চাপল, কিকিরা কোনো চালাকি করছেন কিনা জানতে হবে। চোখ সামান্য খুলে তারাপদ কিকিরার দিকে তাকাল । কিকিরাও তাকিয়ে আছেন।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, “বাবা, আপনার সঙ্গে আর কেউ এসেছে?”

ঘণ্টা এবার বাজল না।

“কাল ভুজঙ্গর ঘরে পরী এসেছিল?”

ঘণ্টা বাজল।

“পরী কি কিছু রেখে গিয়েছে?”

এবারও ঘণ্টা বাজল।

তারাপদ বিচলিত হয়ে পড়ছিল। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন হেরে যাচ্ছে । কিকিরা তাকে জব্দ করছেন। খানিকটা রাগও হচ্ছিল তার, কেন রাগ হচ্ছিল বুঝতে পারছিল না। কিকিরা তার বিশ্বাস ভেঙে দিচ্ছেন বলে কি?

আচমকা তারাপদ কতকগুলো উলটো-পালটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসল। “আপনার নাম বিষ্ণুপদ না বিষ্ণুব্রত?...আপনি অ্যাকসিডেন্টে মারা যান না অসুখে ভুগে?...পরী বাড়িতে মারা গিয়েছিল না হাসপাতালে?”

হেরেই গেল তারাপদ। কিকিরার নামানো আত্মা ঠিক-ঠিক জবাবে ঘণ্টা বাজাল।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল তারাপদ।

এবার কিকিরা বললেন, "তারাপদবাবু, এ এক এমন আত্মা যে আপনার সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারে, যদি অবশ্য তার জানা থাকে। যাকগে, এবার আর লুকোচুরির দরকার নেই, আসল ব্যাপারটা আপনাকে দেখাই।" বলে কিকিরা তাঁর হাত টেনে নিলেন। চন্দনকে বললেন, "চন্দনবাবু, আপনাকে একটু হাত লাগাতে হবে। এখানে তো আলো নেই, না দেখলে ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারবেন না। দয়া করে ওই ভেতর দিকের জানলাটা খুলে দেবেন? দরজাও খুলে দিন। ওপাশের উঁচু ঘুলঘুলি থেকে চটটা নামিয়ে নিন স্যার।

চন্দন ঝাপসা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে জানলা-টানলা খুলল। এবার খানিকটা আলো আসছিল। মোটামুটি সবই চোখে পড়ে।

কিকিরা চন্দনকে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতে বললেন। তারপর তারাপদর দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি গলায় বললেন, "স্যার, এই আত্মা নামানোর ব্যাপারটা স্রেফ জোচ্চুরি। লোক ঠকানোর খেলা।...আপনারা স্যার লেখাপড়া-শেখা ছেলে–নিজেরাই জানেন মানুষ মনে-মনে কত দুর্বল। আমরা কেউই তো চাই না আমাদের মা বাবা ভাই বোন আমাদের ছেড়ে চলে যায়। অনেক বয়েস হল, মানুষ বুড়ো হল, অসুখবিসুখে ভুগে মারা গেল, সেটা অন্য কথা; কিন্তু সময় হল না, অথচ মা বাবা ছেলে মেয়ে ভাই বোন যদি চলে যায় তবে কে তা সহ্য করতে পারে বলুন। মানুষের এই দুর্বলতাকে কিছু লোক মাথা খাঁটিয়ে কাজে লাগায়। এরই নাম সেয়াঁস, বা আত্মা-নামানোর চক্র। আমাদের দেশ বলে নয়, সব দেশেই এটা বেশ ভাল ব্যবসা হিসেবে চলে। য়ুরোপ আমেরিকাতেও চলে, আবার হংকং-টংকংয়েও চলে। লাখ লাখ টাকার ব্যবসা চলছে স্যার এইভাবে। যাকগে, সে পরের কথা, এখন কাজের কথায় আসি।" বলে কিকিরা একটু থামলেন। তারপর হেসে বললেন, "এইবার দেখুন, স্যার ঘন্টাটা কেমন করে বাজে।"

তারাপদ আর চন্দন কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিকিরা হাসি-হাসি মুখ করে ঘণ্টাটা বাজাতে লাগলেন। তারাপদরা মাটির দিকে তাকাল, কিছু দেখতে পেল না। অথচ বেশ বুঝতে পারল টেবিলের তলায় ঘন্টা বাজছে।

কিকিরা বললেন, "আপনারা মাটিতে বসে পড়ন, উবু হয়ে বসুন, তা হলেই দেখতে পাবেন।"

চন্দন ঝপ করে বসে পড়ল। বসে পড়ে টেবিলের তলার দিকে তাকাল। দেখল, টেবিলের মাঝ-মধ্যিখানে একটা আঙটার ফাঁকে ছোট মতন এক পুজোর ঘণ্টা ঝোলানো। দেখে চন্দন বোবা হয়ে গেল।

তারাপদও চেয়ারে বসে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে টেবিলের তলাটা দেখতে লাগল ।

কিকিরা হেসে হেসে বললেন, "ভেরি ইজি স্যার, শুধু একটু প্র্যাকটিস দরকার। এই দেখুন, আমি আমার ডান পায়ের বুড়ো আর মাঝখানের আঙুল দিয়ে কেমন করে ঘন্টা বাজাচ্ছি।" কিকিরা ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন।

কিকিরার জুতো জোড়ার একটাতে তাঁর পা নেই। জুতো পড়ে আছে।

তারাপদ সন্দেহের গলায় বলল, "আপনার ডান পায়ের জুতো পড়ে আছে, পা নেই।"

চন্দন আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

কিকিরা বললেন, “পা যদি জুতোর মধ্যেই থাকবে স্যার, তবে ঘণ্টাটা বাজাব কেমন করে!”

তারাপদ বলল, “আপনি বলতে চান জুতোর মধ্যে থেকে পা বার করে নিয়ে ঘণ্টা বাজানো হয়?”

“এক্কেবারে ঠিক কথা। যদি ঘন্টাটা এ-দেশি হয় তবে ওইভাবে বাজাতে হবে।”

“কিন্তু আপনি জুতোর মধ্যে থেকে পা বার করলেন কেমন করে? আমি তো বুঝতে পারলাম না। আপনার জুতোর ডগার ওপর আমার পা চাপানো ছিল।“

“আমি বোকা বানিয়েছি। অবশ্য স্যার, এইভাবেই আমরা আপনাদের বোকা বানাই। ব্যাপারটা কী জানেন, আমার যে জুতো জোড়া দেখছেন এটা ঠিক আমার নয়, চেয়েচিন্তে বেছে জোগাড় করেছি। এটা হল খাদে পরে যাবার মালকাট্টাদের জুতো। হরিরামের কাছে পড়ে ছিল। এই জুতোর মুখটা খুব শক্ত, লোহার মতন। এরকম জুতো পাওয়া যায় বাজারে। এই ধরনের শক্ত মুখের আরও পাঁচ রকম জুতো আছে। কলকারখানায় যারা কাজ করে তারা

অনেকেই এই ধরনের জুতো পরে। আঙুলগুলো বাঁচে আর কি-ঠোক্কর, খান, হোঁচট খান, কিসসু হবে না।...সত্যি বলতে কী স্যার, আপনাকে আমি ইচ্ছে করেই বলেছিলাম, জুতোর ডগার ওপর আপনার জুতোসুদ্ধ পা চাপিয়ে রাখতে। আপনি পা ঠিকই চাপিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু বুঝতে পারেননি আমি আলগা জুতো থেকে পা বের করে নিয়েছি। কেমন করে বুঝবেন? খুব শক্ত মুখের জুতোর ওপর যদি আপনার জুতোর মুখটা চেপে থাকেন–আপনার মনে হবে, আপনি অন্যের জুতো ঠিকই চেপে ধরে আছেন।”

চন্দন বলল, “আপনার জুতোর ফিতে বাঁধা রয়েছে।”

কিকিরা হেসে উঠে বললেন, “সেটা ওপরে-ওপরে। প্রথমত ফিতে আমি আলগা করে বেঁধেছি, তা ছাড়া–ফিতের তলার দিকে কাটা আছে স্যার। জুতোটা একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন।”

তারাপদ বলল, “এ-সব আপনি কখন করলেন?”

“কেন, সেই যে একবার আপনাদের ঘরে বসিয়ে রেখে বাইরে গেলাম, তখন এই স্পেশ্যাল জুতো পরে এলাম। “

চন্দন কেমন কৌতূহলের সঙ্গে বলল, “আত্মারা তা হলে এইভাবে ঘণ্টা বাজায়?

কিকিরা মুচকি হাসলেন।

তারাপদ সন্দেহের গলায় বলল, “কিন্তু ওই মেয়েটি কেমন করে ঘণ্টা বাজাবে? সে আপনার মতন জুতো পায়ে এসে বসত না। খালি পায়ে বসত। আমরাও খালি পায়ে থাকতাম।”

কিকিরা সহজভাবেই বললেন, “স্যার, যে নিয়মে নৌকো জলে ভাসে, সেই একই নিয়মে জাহাজও জলে ভাসে। একই মাটি, একই খড়গড়ার বেলায় কখনো আমরা গড়ি মা দুর্গা, কখনও মা কালী ।” বলে জিবে একটা শব্দ করলেন কিকিরা। তারপর বললেন, “আপনি

যদি ম্যাজিকের লাইনে থাকতেন স্যার, বুঝতে পারতেন, খেলাটা একই, তবে এক একজন এক একভাবে দেখায়, সামান্য অদলবদল করে। ভুজঙ্গ খেলাটাকে একটু অন্যভাবে দেখাত।”

চন্দন বলল, “কেমন করে?”

কিকিরা বললেন, “ব্যাপারটা খুব কঠিন নয়। আপনারা হাতে পরার দস্তানা দেখেছেন তো? নরম শক্ত অনেক রকম দস্তানা থাকে। যদি বলি মেয়েটি পায়ের দস্তানা পরত–তা হলে?”

অবিশ্বাসের সুরে তারাপদ বলল, “কী বলছেন?”

“ঠিকই বলছি স্যার, তবে বলায় একটু ভুল হয়েছে। দস্তানা না বলে বলা উচিত পায়ের ঢাকনা, অবিকল পায়ের পাতার সামনের দিকটার মতন।” বলতে বলতে কিক্রি নিজের ডান পা তুলে ধরে দেখালেন। বললেন, “এই যে আঙুল দেখছেন–ঠিক এইরকম আঙুল-অলা একটা কাঠের কিংবা খুব শব্দ রবারের, বা মেটালের ফলস্ পায়ের পাতা দরকার । পুরো পাতা না হলেও চলে, আধখানা হলেই যথেষ্ট। মেয়েটা এই রকম ফলস্ আঙুল-অলা পায়ের পাতা পরে থাকত। দরকারের সময় সে এই খোপের মধ্যে থেকে পা বার করে নিত, আপনারা বুঝতে পারতেন না।”

তারাপদ বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। বিশ্বাস হচ্ছিল না যেন। বলল, “আমাদের পায়ের আঙুল তার পায়ের আঙুলের সঙ্গে ছোঁয়ানো থাকত।”

“না, কখনোই নয়, কিকিরা বললেন, “আপনারা ভাবতেন মেয়েটির পায়ের আঙুলের সঙ্গে আপনাদের পায়ের আঙুল ছোঁয়ানো আছে। কিন্তু তা থাকত না। আপনারা তার নকল পায়ের পাতার নকল আঙুলে নিজেদের আঙুল ছুঁইয়ে রাখতেন। আর সেই মেয়েটি দরকারের সময় ঢিলেঢালা ওই নকল পায়ের পাতা থেকে নিজের পা বার করে নিয়ে ঘণ্টা বাজাত।”

চন্দন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, “মাই গড়। ওই জন্যেই মেয়েটির পায়ের আঙুল আমার একদিন শক্ত-শক্ত লেগেছিল।”

তারাপদরও খেয়াল হল, তারও প্রথম দিন শক্ত-শক্ত লেগেছিল। চন্দন বলল, “তারা, তোর মনে আছে–আমি তোর সঙ্গে একদিন জায়গা বদল করে নিয়েছিলাম। যেদিকে মেয়েটা ঘণ্টা এনে রাখত সেদিকের চেয়ারে বসেছিলাম। আমার সেদিন কেমন মনে হয়েছিল মেয়েটির পায়ের আঙুল বেশ শক্ত।”

তারাপদ অস্বীকার করতে পারল না। চুপ করে থাকল। চন্দন খানিকটা উত্তেজনার গলায় বলল, “কিকিরা স্যার, মেয়েটা তা হলে একটা মাত্র পায়ে ফলস ফুট পরত?”

“খুব সম্ভব তাই পরত। যেদিকে ঘণ্টা থাকত–সেই দিকের পায়ে পরত।“

“ওই পায়ে ঘন্টা বাজাত?”

“কোনো সন্দেহ নেই।”

“অত বড় ঘণ্টা পায়ের আঙুলে ধরে কেমন করে বাজাত?”

“ওটা অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যাসে মানুষ সবই শেখে। সাকাসের খেলা দেখেছেন তো!

আপনি আমি পারব না। কিন্তু যে শিখেছে সে পারবে। অত কথায় দরকার কী স্যার, সামান্য একটা শাঁখ যদি আপনাকে বাজাতে বলি আপনি পারবেন না—অথচ কত ছোট-ছোট মেয়েরা কেমন চমৎকার শাঁখ বাজায়!”

তারাপদ আর. যেন কথা বলতে পারছিল না। এখন তার বিশ্বাস হচ্ছিল ভুজঙ্গ আগাগোড়া তাদের সঙ্গে ধাপ্পা মারছে! কিন্তু তাই কি?, সবই ধাপ্পা? মোমের আঙুলটাও ধাপ্পা?”

কিকিরা বললেন, “একটা কথা কিন্তু বলে রাখি। যে-ঘণ্টাটা পায়ের সামনে এনে রাখা হত—সেটা হয়ত আপনাদের ধোঁকা দেবার জন্যে। দেখানো হত—আত্মা কেমনভাবে এসে ঘণ্টা তুলে নিয়ে বাজায়। আসলে টেবিলের তলার দিকে লুকোনো একটা ঘণ্টা ঝুলানো থাকত। কিংবা এমনও হতে পারে—মেয়েটি পায়ের আঙুলে ঘণ্টার মুণ্ডুটা আঁকড়ে ধরে বাজাত। এতে অবশ্য কিছুই আসে যায় না। মোদ্দা কথা পা দিয়েই ঘণ্টা বাজানো হত?”

কেউ কোনো কথা বলল না কিছুক্ষণ। তারাপদর দীর্ঘ নিশ্বাস শোনা গেল।

সামান্য পরে ভারী গলায় তারাপদ বলল, “আপনি বাবার কথা তখন কী বলছিলেন? ভুজঙ্গই বাবাকে মেরেছে?”

কিকিরা বললেন, “সেকথাও বলব। তবে এখানে আর নয়—বাইরে চলুন।”

নিজের ঘরে এনে কিকিরা তারাপদদের বসালেন। আবার একবার দেহাতী চা খাওয়া হল। চন্দনের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরালেন কিকিরা । জোরে-জোরে টান মারলেন। তারপর তারাপদর দিকে তাকালেন।

কিকিরা বললেন, “তারাপদবাবু, এবার আপনার বাবার কথা শুনুন। আপনার বাবাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি। তবে তাঁর কথা শুনেছি। মানুষটি বড় ভাল ছিলেন, সরল সাদাসিধে। তাঁর মন খুব নরম ছিল, সামান্যতেই ছটফট করতেন, কেঁদেকেটে মরতেন। আপনার ছোট বোন পরী যখন ওইভাবে আচমকা একটা দুর্ঘটনায় মারা গেল, তিনি একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেলেন।”

তারাপদ তখনকার কথা মনে করবার চেষ্টা করল। ওই বয়েসের কথা স্পষ্ট করে কিছুই মনে পড়ে না, অস্পষ্ট করেও বা কতটুকু মনে পড়তে পারে । পরী মারা যাবার পর সমস্ত বাড়িটাই কেমন ফাঁকা, ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। বাবা, মা, সে নিজে—সকলেই যে যার মতন কেঁদে মরত।

কিকিরা বললেন, “মন একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল আপনার বাবার। এই সময়ে মানুষ বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। তার মতি নষ্ট হয়। আপনার বাবা সেই সময় পরলোক, আত্মা—এইসব ব্যাপার নিয়ে লেখা বইটই পড়তেন, নানা লোকের কাছে গল্প শুনতেন, লুকিয়ে লুকিয়ে প্ল্যানচেট করতে বসতেন। আপনার মা এ-সব একেবারেই পছন্দ করতেন না।...যাই হোক, এই সময় একবার আপনাদের সাধুমামা কলকাতার বাড়িতে এলেন। আপনার বাবা তাঁকে ধরলেন। সাধুমামাও আপনার বাবার অবস্থা দেখে তাঁকে ভুজঙ্গভূষণের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। লুকিয়ে। সেই যাওয়াই কাল হল।”

তারাপদর বুকটা কেমন যেন করে উঠল। দুঃখে না রাগে বোঝা গেল না। উত্তেজনাতেও হতে পারে। কিকিরার দিকে সে তাকিয়ে থাকল।

“সাধুমামা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার দু-দিন দিন পরে আপনার বাবা চুরি করে লুকিয়ে ভুজঙ্গভূষণের কাছে হাজির। ভুজঙ্গকে হাতে পায়ে ধরলেন–আমার মেয়েকে একবার দেখান। ভুজঙ্গ তো মেয়ে দেখাল না, কিন্তু মেয়ের আত্মাকে দেখাল, যেমন করে আপনাদের দেখিয়েছে। মেয়ের পুরো হাতের একটা মোমের ছাঁচও দেখাল। সেই ছাঁচ বুকে করে আগলে আপনার বাবা কলকাতায় ফিরে এলেন। কিন্তু আসবার পথেই তাঁর মাথায় কী যে হল, একেবারে অন্য মানুষ। কথাবার্তা বলতেন না, কাজকর্মে যেতেন না, বোবা হয়ে থাকতেন, পাগলের মতন তাকাতেন। আপনার মা কিছুই জানলেন না। আপনার বাবার অসুখ করল–মাথার গোলমালের দরুনই হবে। অল্প ক’দিনের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। সেই মোমের ছাঁচটার কী হল আমি জানি না। হয় আপনার বাবা নিজেই নষ্ট করে ফেলেছিলেন, না হয় আপনার মা কিছু না-জেনেই ফেলে দিয়েছিলেন।”

তারাপদর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুক ধকধক করছিল। চন্দনও যেন। বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিকিরাও অনেকক্ষণ কথা বললেন না ।

চন্দন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, “মোমের ছাঁচ–মানে হাতের ওই ছাঁচ তৈরি করা যায়?”

কিকিরা বললেন, “যায়। পৃথিবীতে যেখানেই সেয়াঁসের আড্ডা বসে–সেখানেই এটা চালু আছে। আত্মা যে এসেছে তার প্রমাণ দেবার জন্যে ছাঁচ দেখানো হয়।”

“কেমন করে হয়?”

“সেটা আপনি এখানে আপনাদের দেখাতে পারব না। কারণ খানিকটা মোম আমি এ-জায়গায় জোগাড় করতে পারলেও রবারের একটা দুস্তানা জোগাড় করতে পারব না। তবে নিয়মটা বলে দিই । রবারের একটা দস্তানার মধ্যে জল ভরে দস্তানাটা ইচ্ছেমতন ফুলিয়ে নিতে হয়। তারপর সেটা ভাল প্যারাফিন বা মোমের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হয়। দস্তানার গায়ে মোম জমে গেলেই সেটা উঠিয়ে নিয়ে জলের পাত্রে ডুবিয়ে দিতে হয়। তারপদ দস্তানার ভেতরের জল ফেলে দিলেই রবারের দস্তানা কুঁচকে যাবে। সেটা বেরিয়ে আসবে । ছাঁচটা ঠিক থাকবে। এইভাবে আঙুল করা যায়, হাতের মুঠো করা যায়.. । অনেক সময় এগুলো আগে থেকেই করা থাকে। সেয়াঁসের সময় লুকোনো জায়গা থেকে বার করে দেওয়া হয়।”

তারাপদ আর সহ্য করতে পারল না। রাগে, ক্ষোভে সে কাঁপতে লাগল। চিৎকার করে বলল, “এ সমস্তই তা হলে ধোঁকাবাজি? ব্লাফ?”

“সমস্তই।”

“আমার বাবাকে ভুজঙ্গ ভাঁওতা দিয়েছিল? আর বেচারি বাবা সেই ধোঁকাবাজিতে বিশ্বাস করে পাগল হয়ে গেল?”

“আমি তাই মনে করি। শুধু আমি কেন, আপনাদের সাধুমামা–মানে সাধনদাও তা জানে। সে এর সাক্ষী ।”

তারাপদ কেমন এক শব্দ করে উঠল। তারপর মুখ নিচু করে যেন মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল নিজেরই। সে কেঁদে ফেলেছিল।

চন্দন চুপ। কিকিরাও চুপ। তারাপদকে সান্ত্বনা দিতেও পারছিলেন না।

কিছু পরে চন্দন চাপা গলায় বলল, “আপনি যা বললেন তা কি সবই সত্যি?”

কিকিরা বললেন, “সমস্তই সত্যিই। ঘণ্টা বাজানোই বলুন আর মোমের ছাঁচের কথাই বলুন, এর কোনোটাই আত্মা এসে করে দিয়ে যায় না। সবটাই ধোঁকা, চালাকি, হাত সাফাই । জাদুর রাজা হুডিনির নাম শুনেছেন? তিনি নিজে এইসব লোক-ঠকানো খেলা ধরে দিয়ে গেছেন। তাঁর বইয়ে যেমন-যেমন আছে, আমি ঠিক সেই-সেইভাবে ঘণ্টা বাজিয়েছি, রবারের দস্তানা থাকলে হাতের ছাঁচও গড়ে দেখিয়ে দিতাম।”

তারাপদ মুখ তুলল। তার মুখ কেমন যেন খেপার মতন দেখাচ্ছে, চোখের জলে গাল ভেজা। তারাপদ বলল, “ঠিক আছে, ভুজঙ্গকে আমি দেখছি। “

কিকিরা হাত তুলে বললেন, “না না, ওভাবে দেখা নয়। আমি বলে দেব কী ভাবে আপনারা তাকে দেখবেন। ভুজঙ্গ বড় চালাক, ভীষণ শয়তান। তা ছাড়া এটা কলকাতা নয়। এখানে ভুজঙ্গর অনেক শক্তি। তার সঙ্গে সোজাসুজি লড়া চলবে না। অন্য পথ আছে। চলুন– আপনাদের একটু এগিয়ে দিই। এগিয়ে দিতে দিতে বলব।“ কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন।

বারো

সন্ধের পর পর তারাপদ ভুজঙ্গভূষণের আত্মা-নামানোর সেই রহস্যময় ঘরে এসে বসল। আজ সে একা, চন্দন নেই। চন্দন আসবে না।

দুপুরটা যে কেমন করে কেটেছে, তারাপদ নিজেই শুধু জানে, আর জানে চন্দন। উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়েছিল মাঝে মাঝে; দুঃখে ঘৃণায় এক এক সময় সে খেপার মতন কাণ্ড করছিল। চন্দন তাকে অনেক কষ্টে সামলেছে। বলেছে, “ওরকম করিস না তারা, ভুজঙ্গর কোনো চেলা যদি একবার বুঝতে পারে আমরা ভুজঙ্গর সিক্রেট জানতে পেরেছি তা হলে তুইও গেলি, আমিও গেলাম। নিজেকে কন্ট্রোল কর। তোকে এখন অ্যাক্টিং করতে হবে, কিকিরা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন।”

চন্দন অনেক বুদ্ধিমান। তারাপদর ওই ছটফটে ভাবটাকে সে বুদ্ধি করে কাজে লাগাল। কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলল বন্ধুকে। তারপর মৃত্যুঞ্জয়কে ডেকে পাঠাল। তারাপদকে বলল, “ভুজঙ্গর সঙ্গে আর একবার দেখা করতে চাস তুই; একলা। শেষবারের মতন তোর মা-বাবার কাছে দুটো কথা জানতে চাস। বুঝলি?”

তারাপদ সবই বুঝল। ভুজঙ্গর ওই ঘরে বসে আজ তাকে সত্যিই অনেক কিছু করতে হবে। কিকিরা বলে দিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয় এল, চন্দনই কথা বলল বেশি, তারাপদ কেমন ভেঙে পড়েছে, কী ভীষণ কান্নাকাটি করছে—এই সব বুঝিয়ে বলল, আজ আর-একবার সে ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

তারাপদ প্রায় কিছুই বলল না, বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগল। তার চোখমুখ দেখে মৃত্যুঞ্জয় কী ভাবল কে জানে, ভুজঙ্গভূষণকে তারাপদর কথা বলতে গেল। খানিকটা পরেই আবার ফিরে এল, বলল, “হ্যাঁদেখা হবে।”

সেই দেখা করতেই তারাপদ এখন সন্ধেবেলায় ভুজঙ্গভূষণের রহস্যময় ঘরে এসে বসেছে। একলা।

তারাপদ চুপচাপ বসেই থাকল। আজ ক’দিন আসা-যাওয়া করতে করতে এই ঘর তারাপদর চেনা হয়ে গেছে। অভ্যেসও হয়ে এসেছে অনেকটা। আগের মতন অতটা গা-ছমছম করে না। তবু এই ঘরের একটা ভৌতিক পরিবেশ রয়েছে, মন যেন অন্যরকম হয়ে যায়, বুকের মধ্যে শিরশিরে ভাব হয়।

তারাপদ এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল। এত অস্পষ্ট, প্রায়-ঘুটঘুঁটে ঘরে কোনো কিছুই ভাল করে দেখা যায় না। এই ঘর যেমন ছিল সেই রকমই রয়েছে। সেই একই মিটমিটে আলো, সেই ধূপধুনোর গন্ধ, সেই ভুজঙ্গভূষণের সিংহাসন, সেই বেড়াল ।

ছোট টেবিলের ওপর বসানো কালো বেড়ালটাকে দেখল তারাপদ। এই বেড়াল তাদের খুব অবাক করেছিল, ভয়ও পাইয়ে দিয়েছিল। আজ তারাপদ কালো বেড়ালটাকে দেখল। তার ভয় হল না। কেনই বা হবে? এটাও তো চালাকি, কিংবা মানুষকে বোকা বানিয়ে দেবার ফন্দি। চন্দন কিকিরাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন করে বেড়ালটা ঘুরে যায়?

কিকিরা হেসে হেসে বলেছিলেন, ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘোরে। ঘড়িতে দুটো কাঁটা থাকে, ছোট কাঁটা আর বড় কাঁটা, যদি একটা থাকত কী হত? একটাই ঘুরত। খুব পুরনো আমলের বড় বড় দেওয়াল-ঘড়ি কিংবা দেরাজের ওপর রাখা ঘড়ি দেখেছেন স্যার? এক একটা ঘড়ি থাকত যার মধ্যে ঘণ্টার কাঁটার ওপর ছোট্ট রঙিন পাখি বসানো থাকত মেটালের। ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও ঘুরত। এটাও সেই রকম, তফাতের মধ্যে কী জানেন, ঘড়ির যন্ত্রপাতিগুলো নিচে আছে, আর ওপরে–কাঁটার বদলে একটা ফুঁকো বেড়াল, পেপার পাল্পের কিংবা হালকা কিছুর। ঠিক যেভাবে গ্রামোফোনের রেকর্ড ঘোরে–সেইভাবে বেড়ালটা ঘুরছে, তবে খুব ধীরে ধীরে–বোঝা যায় না। যদি একটা ওয়াল-ক্লক মাটিতে শুইয়ে রাখেন চিত করে তার কাঁটাও এইভাবে ঘুরবে।

তারাপদ কালো বেড়ালটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেবার আগেই স্তোত্রপাঠ শুরু হল। যেমন রোজই হয়–সেইরকম। দামি লাউডস্পিকারটা যে কোথায়, বোঝা যায় না, কিন্তু বড় নিখুঁত। এই নিঃশব্দ ঘরে চমৎকার শোনায়, মন ধীরে ধীরে কেমন যেন হয়ে যায়।

স্তোত্রপাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সেই ক্ষীণ আলো নিবে গেল। নিবে গিয়ে ভুজঙ্গভূষণের বসবার দিকটায় লাল আলো জ্বলে উঠল । ভেলভেটের পরদা সরিয়ে ভুজঙ্গভূষণ এলেন, সেই একই রক্ত-গৈরিক বসন, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, মুখ মুখোশে ঢাকা।

নিজের আসনে বসলেন ভুজঙ্গভূষণ। তাঁর পায়ের দিকে একপাশে ঘণ্টা।

তারাপদ এইবার ভয় পেতে শুরু করল। উত্তেজনা আর ভয়ে তার গলা শুকিয়ে আসছে। আজ যে কী হবে শেষ পর্যন্ত সে জানে না। হয়ত ভীষণ কোনো বিপদে পড়বে, তেমন কিছু ঘটলে বাঁচবে না মরবে–কে বলতে পারে । মনের এই ভয়ের ভাবটাও কাটাবার জন্যে প্রাণপণে তারাপদ বাবার কথা ভাবতে লাগল। এই লোকটা–ওই ভুজঙ্গভূষণ তার সরল, ভালোমানুষ, সাদাসিধে স্বভাবের বাবাকে কী ভীষণ প্রবঞ্চনা করেছে। শুধু প্রবঞ্চনা নয়, সেই প্রবঞ্চনার দরুন তার বাবা-বেচারি মিথ্যেকে সত্য বলে জেনেছে। বাবা-বেচারির হয় মানসিক আঘাত লেগেছিল, না হয় বাবা মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে পাগলের মতন হয়ে পড়েছিল। তাতেই বাবার অসুখ, আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যু।

এই সমস্তর জন্যে ওই ভুজঙ্গই দায়ী। বাবাকে ওই লোকটাই মেরেছে। তারাপদদের সংসার, তাদের জীবন, এত দুঃখকষ্ট, মার অত কষ্ট সওয়াসবই ওই শয়তানটার জন্যে। তারাপদ কেমন করে লোকটাকে ক্ষমা করবে?

তারাপদকে চমকে দিয়ে ভুজঙ্গভূষণই কথা বললেন, “তারাপদ, তুমি আজ আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ কেন? আমার শরীর ভাল নেই, ভাবছিলাম বিশ্রাম করব।”

প্রথমে কথা বলতে পারল না তারাপদ, গলা কাঠ হয়ে থাকল। বার দুই গলা পরিষ্কার করে শেষে কাঁপা কাঁপা গলায় তারাপদ বলল, “আপনার সঙ্গে আমার ক’টা কথা ছিল।”

“বলো।”

একটু থেমে নিজেকে সামলে নিতে নিতে তারাপদ বলল, “কাল সারারাত আমি ঘুমোত পারিনি, শুধু ভেবেছি। আজও সারাদিন ভেবেছি। আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি।” বলে আবার একটু থামল তারাপদ, তারপর গলায় যতটা সম্ভব আবেগ দিয়ে বলল, “পিসেমশাই, আপনি রাগ করবেন না, আপনার। কথামতন আমি চলতে রাজি। কিন্তু আর একবার, একটিবার মাত্র আমি মা-বাবার কাছে তাঁদের আদেশ জানতে চাই। মনে কোনো খুঁত রাখতে

চাই না। আপনি দয়া করে আজ একবার ওঁদের ডাকুন।”

“আবার?” ভুজঙ্গভূষণ বললেন।

“শুধু আজকের মতন-” তারাপদ মিনতি জানাল।

“তোমার মনে কি এখনো সন্দেহ আছে, তারাপদ? তোমার মা বাবার যা ইচ্ছে সে তো আগেই জেনেছ।”

“আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবু সব ছেড়েছুঁড়ে যখন আপনার এখানে চলে আসব ভাবছি– তখন আসবার আগে আর একবার মা বাবার আদেশ নিতে চাই।”

দু মুহূর্ত অপেক্ষা করে ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “বেশ। আজই তোমায় মনঃস্থির করতে হবে, আর সময় পাবে না।”

ভুজঙ্গভূষণ ঘণ্টা বাজালেন। মৃত্যুঞ্জয় এল ।

কিছু যেন বললেন ভুজঙ্গভূষণ, তারাপদ কিছুই শুনতে পেল না, বুঝতেও পারল না। মৃত্যুঞ্জয় চলে গেল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, “তোমার বন্ধু কবে ফিরবে?”

“ফিরবে। শীঘ্রি।”

তারাপদ বেশি কথা বলল না। কিছু না বলে চুপ করে থাকাই ভাল। কথা ঘুরোবার জন্যেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক, তারাপদ আচমকা বলল, “পিসেমশাই, একটা কথা বলব?”

“বলো।”

“আপনার এই ঘরবাড়ি সম্পত্তি আপনি কেন আমায় দিয়ে যেতে চাইছেন?”

“কেন চাইছি তোমায় বলেছি। আমার নিজের বলতে কেউ নেই, তুমি ছাড়া। আমি যা করেছি ও রেখেছি, তা তোমার হাতে থাকলেই খুশি হব। “

মৃত্যুঞ্জয় ততক্ষণে আবার ফিরে এল। ভুজঙ্গভূষণকে কিছু বলল মুখটা নামিয়ে । ভুজঙ্গ ইশারায় ঘরের দিকে আঙুল দিয়ে কী দেখালেন। চলে গেল মৃত্যুঞ্জয়। একটু পরেই আর-একজন এল, ঘরের মধ্যে আবার ধুনো দিয়ে গেল, লুকোনো জায়গায় ধূপ বসিয়ে গেল।

ঘরটা আবার ধোঁয়ায় আরও অস্পষ্ট হল। ধুনো-গুগগুলের গন্ধে চাপা বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

আর-একটু পরেই সেই মেয়েটি এল। কালো শাড়ি জামা পরা, মাথায় এলো চুল। এল, ভুজঙ্গর সামনে দাঁড়াল, তারপর ঘণ্টাটা তুলে নিয়ে গোল টেবিলের অন্যদিকে বসল। আজ চন্দন নেই, সে থাকলে যেমনভাবে তিনজনে গোল হয়ে বসা যায়, কানামাছি খেলার মতন হাত ছড়িয়ে-তেমনভাবে বসা গেল না। মুখোমুখি বসতে হল; সকালে কিকিরার সামনে যেমনভাবে বসেছিল তারাপদ।

নতুন করে শেখাবার কিছু নেই। তারাপদ টেবিলের ওপর হাত ছড়িয়ে দিল, পা বাড়িয়ে দিল টেবিলের তলা দিয়ে। মেয়েটিকে একবার ভাল করে দেখল। অন্য দিনের চেয়ে আজ যেন মেয়েটিকে শুকনো দেখাচ্ছে। রোগা মুখ আরও শুকনো।

এরপর রোজই যেমন হয়—সেই রকম। ঘরের বাতি নিবে গেল। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। টেবিলের ওপর তারাপদ হাত বাড়িয়ে মেয়েটির হাত ধরে রেখেছে। তার পায়ের আঙুলের সঙ্গে মেয়েটির পায়ের আঙুল ছোঁয়াননা। ভুজঙ্গভূষণ তাঁর গম্ভীর গলায় বললেন, "তারাপদ, তুমি তোমার মার কথা ভাব। তাকে ডাকো। মন যেন চঞ্চল না হয়!"

তারাপদ মা বাবার কথা ভাবল না। কোনো প্রয়োজন নেই।

খুব সতর্ক ছিল তারাপদ। সমস্ত কিছু অনুভব করার চেষ্টা করছিল। চোখ খুলছিল মাঝে মাঝেই। যদিও চোখ খোলার কোনো অর্থ হয় না। এই জমাট অন্ধকারে এক বিঘত দূরের জিনিসও বিন্দুমাত্র চোখে পড়ে না।

প্রথমেই একটা জিনিস অনুভব করতে পারল তারাপদ। মেয়েটির ডান পায়ের আঙুল শক্ত শক্ত লাগলেও বাঁ পায়ের আঙুল অত শক্ত লাগছে না। তার মানে, আগের কদিন মেয়েটির দুটি পায়ের একটি চন্দন ছুঁয়ে থাকত, অন্য পা ছুঁয়ে থাকত তারাপদ। একই লোকের পক্ষে এই তফাত বোঝার উপায় ছিল না, মেয়েটির এক পায়ের আঙুল কেন কাঠের মতন শক্ত, অন্য পায়ের আঙুল স্বাভাবিক? এই তফাতটুকু কেন?

তারাপদ খুব সহজেই এই ধাঁধা ধরে ফেলতে পারল। মেয়েটি তার ডান পায়ে নকল পাতা পরে। সেই পা কাঠ কিংবা শক্ত রবারের পায়ের ফাঁপা পাতা থেকে বের করে নিয়ে ঘণ্টা বাজায়। কিকিরা ঠিকই বলেছেন।

আজও মেয়েটি ঘণ্টা বাজাতে পারবে। সে সুযোগ তারাপদ তাকে দেবে।

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সত্যিই এক সময় ঘণ্টা বেজে উঠল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "কে, বেণু? তুমি এসেছ?"

ঘণ্টা বাজল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "বেণু, তোমার ছেলে তোমায় ডেকেছে। সে তোমার আদেশ চায়। তোমাদের মনের ইচ্ছে তাকে জানাও..."

তারাপদ আত্মা আবিভাব, ঘণ্টা বাজানোর দিকে মন দিল না, ভুজঙ্গর কথাতেও নয়। খুব সাবধানে নিজের বাঁ পা দিয়ে মেয়েটির ডান পায়ের ফেলে রাখা নকল ফাঁপা পাতা আস্তে আস্তে টেনে নিতে লাগল। যে কোনো সময়ে এই চালাকি মেয়েটি বুঝে ফেলতে পারে। ভয় করছিল তারাপদর, শুধু সাবধানে সে তার কাজ করে যাচ্ছিল। এর আগে চন্দনও একদিন ঘণ্টা বাজানোর রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল, কিকিরার কথা মতন। মাফলার থেকে ছিঁড়ে আনা সাদা উলের টুকরো ঘণ্টার পাশে ফেলে রেখেছিল। ধরবার চেষ্টা করছিল ঘন্টাটা কেউ তুলে নিয়ে বাজায় কিনা? মানুষেই হোক অথবা ভূতেই হোক, ঘণ্টা তুলে নিয়ে বাজানোর পর আবার যখন রাখবে—তখন একটুও নড়চড় হবে না, উলের টুকরোর ঠিক পাশেই থাকবে—এটা হতে পারে না। চন্দন দেখেছিল, ঘন্টা আর উলের টুকরো ঠিক জায়গাতেই আছে। তখন থেকেই চন্দনের সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই তুচ্ছ একটা প্রমাণ প্রমাণই

নয়, আরও বড় প্রমাণ চাই।

ভুজঙ্গ আত্মা নামিয়ে যাচ্ছেন। বেণু গেল, বিষ্ণু এল। কথা বলছেন ভুজঙ্গ। তারাপদ ততক্ষণে তার কাজ সেরে ফেলেছে। বাজাক-টেবিলের তলায় গোপনে ঝুলিয়ে রাখা ঘণ্টা যত খুশি বাজাক মেয়েটি কিছু আসে যায় না তারাপদর।

আত্মারা শেষ পর্যন্ত বিদায় নিল। তারাপদ নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল, এবার মেয়েটি পা নামাবে, নামিয়ে তার নকল পায়ের পাতা খুঁজবে।

তারাপদ বুঝতে পারছিল মেয়েটি পা নামিয়েছে, পায়ের পাতা খুঁজছে। তার পা নড়ছে, শাড়িও নড়ছে। ঠিক জায়গায় নকল জিনিসটি না পেয়ে পা দিয়েই যেন চারদিক খুঁজছে, অন্ধকারে আমরা যেভাবে পায়ের চটি খুঁজি।

মেয়েটির হাতের আঙুলের ওপর সামান্য চাপ দেবার চেষ্টা করল তারাপদ, বোঝাতে চাইল- তুমি ধরা পড়ে গেছ। চলে যাও।

এইবার সেই ক্ষীণ বাতি জ্বলল। আত্মারা চলে যাবার সামান্য পরে যেমন রোজই বাতি জ্বলে ওঠে। মেয়েটি তারাপদর মুখের দিকে তাকাল। তার ফরসা মুখে ভয় ও বিস্ময়। চোখের পাতা পড়ল না মেয়েটির। কয়েক মুহূর্ত একই ভাবে তাকিয়ে থেকে মেয়েটি উঠে পড়ল। তারাপদর মনে হল, ভুজঙ্গকে বলে দেবে।

মেয়েটি কিছু বলল না। মুখ নিচু করে অন্য দিনের মতন ভুজঙ্গর পাশ দিয়ে চলে গেল।

তারাপদর এবার সত্যি সত্যিই বুক কাঁপছিল।

ভুজঙ্গ বললেন, “তোমার আর কিছু বলার আছে, তারাপদ?”

কথার জবাব দেবার আগে তারাপদ প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিল। শেষে বলল, “না। আর কিছু নেই।” একটু থেমে আবার বলল, “পিসেমশাই, পরীকে আজ আর-একবার দেখতে পাব না?”

ভুজঙ্গ যেন বিরক্তই হলেন; বললেন, “তোমায় আমি বারবার বলেছি–আত্মাদের যখন-তখন খেয়াল-খুশি মতন ডাকতে নেই। তাতে তাঁদের কষ্ট হয়।”

তারাপদ মনে মনে বুঝতে পারল, ভুজঙ্গ কেন বারবার পরীকে আনতে চান না। ধরা পড়ে যাবার ভয় রয়েছে। যতই চালাকি করে শিখিয়ে পড়িয়ে, কায়দা কানুন করে পরীর নাম দেখিয়ে ওই মেয়েটিকে আনা হোক না কেন–তবু ঘণ্টা বাজানোর চেয়ে এই ব্যাপারটা কঠিন। সামান্য ভুলচুক হলেই ধরা পড়ে যাবার ভয় রয়েছে। এই ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে যে-কোনো মানুষের পক্ষে আসা, আর ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো মুশকিল। তার চেয়েও মুশকিল হল, একেবারে গায়ের সামনে এসে দাঁড়ানো রুমালে মাখানো সেন্টের গন্ধ নাকের কাছে ধরা, খুব আলগা করে মাথার ছড়ানো চুলের ছোঁয়া দিয়ে যাওয়া। কাল। তারাপদকে এইভাবে ঠকানো হয়েছে। যদি ওই মেয়েটি সামান্য ভুলচুক করত–তারাপদর গায়ে এসে পড়ত । হয়ত তারাপদ তখন উত্তেজনার মাথায় হাত বাড়িয়ে পরীকে ধরতে গিয়ে মেয়েটিকে ধরে ফেলত।

ভুজঙ্গ চতুর লোক। ঝুঁকি নিতে বারবার রাজি হবে না। কিন্তু তেমন একটা বড় ঝুঁকি কি

ভুজঙ্গ নেয়? কিকিরা বলেছেন, এই সশরীরে আত্মা আসার ব্যাপারটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের মতন। এখানে একটু অন্যরকম চালাকি করতে হয়। অন্ধকারে দেখা যাবার একরকম দূরবীন আছে। যুদ্ধের সময় রাত্রে ঝোঁপঝাড়ের আড়াল থেকে শত্রুরা গুলি ছুঁড়তে পারে ভেবে অন্ধকার দেখার জন্যে সৈনিকেরা এই দূরবীন ব্যবহার করে। একে বলে স্নাইপারস্কোপ। পরীর বেশে যখন মেয়েটি এসেছিল–তখন তার হাতে ওই দূরবীন ছিল, ছোট ধরনের। কাজেই এই অন্ধকারে সে সবই দেখতে পাচ্ছিল। কোনো অসুবিধে তার হয়নি।

তবু কখনো কখনো এ-সব কাজে ভুল হয়ে যায়। ভুজঙ্গ খুব সাবধানী।

তারাপদ বলল, “আমি তা হলে উঠি?”

ভুজঙ্গ বললেন, “তুমি মনঃস্থির করেছ?”

“হ্যাঁ।”

“তুমি রাজি?”

“রাজি।”

“আমার সমস্ত শর্ত মানছ?”

“মানছি।”

“খুশি হলাম, তারাপদ। তোমায় আমি আমার আশীর্বাদ জানাচ্ছি।” বলে ভুজঙ্গ একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, “ঘন্টাটা আমার কাছে দিয়ে যাও।”

তারাপদ ঘণ্টা তুলে নিল। তার চেয়ারের পেছন দিকে পায়ের নকল পাতা পড়ে আছে। ভুজঙ্গর দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ভুজঙ্গভূষণের পায়ের কাছে ঘণ্টাটা নামিয়ে তারাপদ দাঁড়িয়ে থাকল।

ভূজঙ্গভূষণ হাত নেড়ে ইশারায় তারাপদকে তার নিজের জায়গায় ফিরে যেতে বললেন। ফিরে এল তারাপদ ।

ঘণ্টাটা বাজালেন ভুজঙ্গ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “তারাপদ, আমাদের পালনীয় কিছু আচার আছে, নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। আজ তোমায় তার জন্যে ব্যস্ত হবে না। কাল সকালে মৃত্যুঞ্জয় তোমাকে যেমন-যেমন বলবে তুমি সেইভাবে কাজ করবে। আজ আর তোমায় আমি বসিয়ে রাখব না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আমার সমস্ত শর্ত মেনে কাজ করলে এই আসনের তুমি হবে একমাত্র উত্তরাধিকারী। যদি প্রবঞ্চনা করো, ছলনা করো–তবে তার। শাস্তি কত ভয়ংকর হবে তুমি জানো না।”

তারাপদকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই ভুজঙ্গ ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল । নিকষ কালো অন্ধকার।

সেই অন্ধকার যেন এবার পাতালের অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল। থমথম করছে সব, স্তব্ধ। আচমকা ভুজঙ্গভূষণের গলা শোনা গেল, বজ্রগম্ভীর। “আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করলে তোমার কী হবে তুমি জানো না। সামনে তাকাও। দেখো।”

ভুজঙ্গর কথা শেষ হবার আগেই ঘরের মাথার দিকে ক্ষীণ একটা আলো জ্বলে উঠল । তারাপদ মাথা তুলে আলোটা দেখবার চেষ্টা করে মুখ নামাতেই ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

ঘরের মাঝখানে একটা রক্তাক্ত মুণ্ডু ঝুলছে। শরীর হিম হয়ে গেল তারাপদর। মাথা ঘুরতে লাগল। দু হাতে চোখ ঢাকল।

সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাস্য হেসে উঠলেন ভুজঙ্গ। সেই হাসি যেন ঘরের বাতাসে ঘূর্ণির মতন পাক খেতে লাগল। অসহ্য। একেবারেই অসহ্য। চোখ ছেড়ে দিয়ে দু হাতে কান চেপে ধরল তারাপদ। আবার তাকাল। দেখল মুণ্ড নয়, একটা মাথার খুলি, টকটকে লাল রক্তে যেন চোবানো। তার চোখের গর্ত, মুখের হাঁ–বীভৎস। মাথার খুলিটা ঘরের একপাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত শূন্যে লাফাতে লাফাতে আসা-যাওয়া করছিল।

ভুজঙ্গভূষণ তখনো হাসছেন। তারাপদ টেবিলের ওপর মাথা থেকে বেহুঁশের মতন পড়ে থাকল।

.

রাত অনেক হয়েছে। বারোটা বাজতে চলল।

তারাপদদের ঘর অন্ধকার। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। বাইরে প্রচণ্ড শীত।

চন্দন আর-একটা সিগারেট শেষ করে নিচু গলায় বলল, “আর দেরি করে লাভ নেই।”

চন্দনের বিছানার একপাশে কিকিরা সেই অলেস্টার পরে, মাথায় টুপি এঁটে বসে আছেন। গলায় মাফলার। অন্ধকারে তিনজনে বসে আছে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

তারাপদ তার বিছানায়। শীতের সবরকম সাজ তার পরনে। কিকিরা চাপা গলায় বললেন, “আরও পনেরো বিশ মিনিট অপেক্ষা করা যাক।”

তারাপদ বলল, “সাধুমামার দায়িত্ব আপনার।”

কিকিরা বললেন, “সাধনদার দায়িত্ব আমি ঠিক লোককে দিয়েছি। আপনি স্যার নিশ্চিন্ত থাকুন।”

চন্দন বলল, “আপনি আর আমাদের সম্মান করে আজ্ঞে-আপনি করবেন না কিকিরাবাবু, বড় লজ্জা লাগে।”

কিকিরা একটু হাসলেন, “তা হলে বলব না।”

তারাপদ বলল, “ওই মেয়েটির জন্যে আমার বড় ভয় হচ্ছে।”

“ভয়ের কিছু নেই,” কিকিরা ফিসফিস করে বললেন, “সাধনদা যদি বেঁচে থাকে–ওই মেয়েটিও বেঁচে থাকবে । ও হল সাধনদার ভাইঝি। ইন্দু। ছেলেবেলায় মা বাপ হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়েছিল ও সাধনদা ওকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন অনাথ মেয়েকে মানুষ করবেন বলে। কিন্তু ও ভুজঙ্গর চোখে পড়ল । ভুজঙ্গ ওকে হাতে পেয়ে নিজের আত্মা নামানোর কাজে লাগাচ্ছিল।“

তারাপদ বুঝতে পারছিল, মেয়েটি আজ তাকে বাঁচিয়েছে। মেয়েটি তার নকল পায়ের পাতা খোয়া যাবার কথা ভুজঙ্গকে বলে দিতে পারত। বলেনি। বলেনি, কারণ মেয়েটি সাধুমামার কাছে সব শুনেছে।

তারাপদ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেঁপে উঠল। কেমন শব্দ করল, বিড়বিড় করে কিছু বলল।

চন্দন বলল, "কী হল তোর?" তারাপদ বলল, "মাঝে মাঝেই সেই মড়ার মাথা-খুলিটা আমার চোখে ভেসে উঠছে। হরি। এখনো বমি আসছে।"

কিকিরা বললেন, "আপনার–তোমার নার্ভ বড় দুর্বল তারাপদ। তুমি কখনো ম্যাজিকে মেয়েদের পেট কাটা, স্টেজের ওপর কংকাল নেচে বেড়ানো দেখোনি? আশ্চর্য! আমি তো তোমায় বললাম, ওটা কিছু নয়। প্রথম দিন যেভাবে তোমরা রঙিন বল নাচতে দেখেছিলে, এটাও সেইভাবে নাচানো হয়েছে। সবই চালাকি। ওই খেলাটা হবার সময় মাথার ওপরে যে বাতিটা জ্বলে ওঠে–সেটা ব্ল্যাক ল্যাম্প। আর যে বস্তুটা নাচে তার গায়ে লাগানো থাকে লুমিনাস পেন্ট। পাশের ঘর থেকে কেউ একজন ওটা নাচায়। কেমন করে নাচায় তাও বলছি। তোমরা ভাল করে কিছু লক্ষ করোনি। করার মনও তোমাদের ছিল না। ওই ঘরের মাথায় কালো রঙ করা লম্বা তার ঝোলানো আছে। এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত। সেই তারের সঙ্গে আবার কালো রঙ করা অন্য তারে রঙিন বলই বলো আর মাথার খুলিই বলো ঝোলানো আছে। পুলি জানো? কিংবা গোল গোল চাকা! চাকার গায়ে তার জড়িয়ে এই খেলা দেখানো হয়। একটা স্ট্রেট লাইনে একদিক থেকে অন্যদিকে টেনে নেওয়া কিংবা ঢিলে করা কিছুই নয়। ঢিলে করলে ঝুলবে, টানলে উঠবে। নাথিং বাট পুলি সিস্টেম। পুতুল নাচের মতন ব্যাপার, তবে পুলিটাই হচ্ছে এখানে আসল। আর ওই ব্ল্যাক ল্যাম্প। দুটো পুলি দিয়ে এ কাজ করতে হয়। পাশের ঘরে বসে ভুজঙ্গর কোনো চেলা এই ভূতের নাচ দেখায়।"

তারাপদ অত বুঝল না। তবে বুঝতে পারল, ঘণ্টা বাজানোর মতন এও একটা ধাপ্পা, ধোঁকা ।

চন্দন দেশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে দু মিনিট। ঘড়িটা দেখাল কিকিরাকে ।

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "ডায়নামো দশটার পর বন্ধ হয়ে গেছে। আর চলবে না?"

"না", চন্দন বলল, "সে ব্যবস্থা আমি করেছি। খারাপ হয়ে গেছে।"

"বেশ। তা হলে তারাপদ থাকবে আস্তাবলে, গাড়িতে ঘোড়া জোতা থাকবে। রামবিলাস থাকবে। সাধনদা, ইন্দু, আর তারাপদ গাড়ি করে পালাবে।" বলতে বলতে কিকিরা তাঁর লুকোনো ছোট টর্চটা বার করে নিয়ে জ্বালালেন একবার । নিবিয়ে দিলেন আবার।

"ফটক?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"খোলা আছে," কিকিরা মুচকি হাসলেন। "এই বাড়িতে যারা থাকে তারা সকলেই ভুজঙ্গ নয়। দায়ে পড়ে থাকে। ভয়ে। দু-চারজন ভাল লোকও আছে যারা এই পাপের রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তারাপদ সাধনদার মতনই তারা একদিন এসে পড়েছিল, হয় কিছু পাবার আশায়, না হয় পেটের দায়ে। তারপর আর ফিরে যেতে পারেনি। মৃত্যু ছাড়া তাদের মুক্তি ছিল না। ওরাই আজ আমাদের সহায় সম্বল বন্ধু। নয়ত আমি কেমন করে এখানে এলাম বলো?"

তারাপদ কিছু বলল না। কিকিরা বিচিত্র মানুষ। এই লোকটির আসল পরিচয় আজও জানা গেল না।

বারোটা বাজতেই চন্দন উঠে দাঁড়াল।

কিকিরাও ধীরে-সুস্থে উঠলেন। টর্চ জ্বালালেন। বললেন, "আমার পকেটে দু বোতল পেট্রল আছে। ভুজঙ্গ শয়তানের আত্মার ঘর তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।...তুমি একটা কিছু নাও চন্দন। কিছু নেই?"

চন্দন পকেট থেকে পাতলা সরু ছুরিটা বার করল। বলল, "আপনি চলুন।"

তিনজনেই দাঁড়াল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

তারাপদ চন্দনকে বলল, "তোরা আগুন লাগিয়েই পালিয়ে আসবি। আমরা বাইরে থাকব।"

কিকিরা বললেন, "ভয় পেয়ো না, আমরা আসব। তোমরা সাবধানে থেকো।"

.

ফটকের বাইরে সামান্য তফাত থেকে তারাপদ দেখল, ভুজঙ্গভূষণের দোতলায় আগুন জ্বলে উঠেছে। শীতের বাতাসে দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুনটা যেন ছড়িয়ে যাচ্ছিল। দমকা হাওয়ায় আগুনের শিখা যেন ঝাঁপটা মারছে, আকাশের দিকে লকলক করে উঠে যাচ্ছে, তারপর ধোঁয়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। চারদিকের জমাট অন্ধকার আলো হয়ে উঠল। ভীত, ত্রস্ত মানুষের কলরব। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ভুজঙ্গভূষণের বাড়ির চারদিক।

তারাপদ হঠাৎ কেমন আনন্দ অনুভব করল। প্রতিহিংসার আনন্দ। একজন শয়তানের সর্বনাশ হবার আনন্দ। তারপরই সে ব্যাকুল হয়ে উঠল । চন্দনের জন্যে, কিকিরার জন্যে। ওরা কোথায়?

একটু পরেই চন্দনকে দেখতে পেল। বাগান দিয়ে প্রাণপণে ছুটে আসছে।

কিকিরা! কিকিরা কোথায়?

চন্দন ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যাবার পর তারাপদ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। পরনে লাল গেরুয়ার বস্ত্র, গায়ে চাদর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে ব্যান্ডেজ এক উন্মাদ ছুটে আসছে। হাতে তার খঙ্গ। চোখে বুঝি দেখতে পাচ্ছে না। তবু ছুটে আসছে । গায়ের চাদরে আগুন জ্বলছে। চাদরটা ফেলে দিল ও নগ্ন গা।

তারাপদ চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "চাঁদু–চাঁদু–চাঁদু, আমরা এখানে।"

চন্দন মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। দেখল। তারপর ছুটতে ছুটতে গাড়ির কাছে এসে পড়ল।

চন্দন হাঁপাচ্ছিল।

"কিকিরা কোথায়?" তারাপদ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল।

চন্দন আগুনের দিকে তাকাল। সমস্ত বাড়িতেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কী ভীষণ কোলাহল

হচ্ছে ওদিকে।

“কিকিরা কোথায়?” তারাপদ আবার বলল।

“আমরা একসঙ্গে ঘরে আগুন দিই। তারপর আর তাঁকে দেখিনি। কোথায় যে ছুটে চলে গেলেন!”

তারাপদ বিহ্বল হয়ে পড়ল। এখন কী করা যাবে? সেই উন্মাদ ততক্ষণে ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের খড়্গ উঁচু হয়ে আছে। আগুনের আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। চারিদিকে পাগলের মতন তাকাচ্ছে। ও যে ভুজঙ্গ বুঝতে কষ্ট হয় না। তারাপদ বলল, “ভুজঙ্গ আমাদের খুঁজছে। কী করব?”

কম্বল মুড়ি দিয়ে সাধুমামা ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বসে ছিলেন। তাঁর পাশে ইন্দু। কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা। সে থরথর করে কাঁপছিল।

সাধুমামা বললেন, “গাড়িটাকে আরও একটু আড়ালে নিয়ে যেতে বলি।”

গাড়ির কোচোয়ানকে সাধুমামা কী যেন বললেন। কোচোয়ান হাতের লাগাম টেনে ঘোড়ার গাড়িটাকে আরও আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ভুজঙ্গর লোকেরা দু একজন প্রাণ বাঁচাতে বাগানে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কিকিরা কোথায়?

সময় বয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত যেন কত দীর্ঘ! তারাপদ অস্থির হয়ে পড়ছিল, চন্দন বুঝতে পারছিল না তার কী করার আছে।

তারাপদ ব্যাকুল হয়ে বলল, “সাধুমামা, আমরা কী করব?” সাধুমামা বললেন, “ভুজঙ্গর বাড়িতে বন্দুক আছে। মৃত্যুঞ্জয় বন্দুক চালাতে পারে। সেও যদি এসে পড়ে আমরা বিপদে পড়ব।”

“কিন্তু কিকিরা?”

সাধুমামাও কিছু বলতে পারলেন না।

ভুজঙ্গ যেন কিছু অনুমান করে আরও কয়েক পা এগিয়ে এলেন। হঠাৎ চন্দন বলল, “কিকিরা!”

কিকিরাকে বাগানের কাছে দেখা গেল। প্রাণপণে ছুটে আসার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। বাগানের লোকগুলো চিৎকার করে উঠল। কিকিরার ওভারকোটটা গায়ে নেই। হাতে। আগুন জ্বলছে কোটটায় দাউ দাউ করে। কিকিরা সেই কোটটাকেই আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে লাঠি ঘোরানোর মতন চারপাশে ঘোরাচ্ছেন ।

ভুজঙ্গ কিন্তু দেখতে পেয়ে গিয়েছেন কিকিরাকে। ছুটে গেলেন । মাথার ওপর খাঁড়া তুলে।

তারাপদ ভয়ে চোখ বুজে ফেলল । চন্দন কেমন আর্তনাদ করে উঠল।

আবার যখন চোখ খুলল তারাপদ, দেখল, ভুজঙ্গর খাঁড়া কিকিরার মাথার ওপর। কিকিরা

কোটটা ঘোরাচ্ছেন। আগুনের হলকায় খাঁড়া ঝকঝক করে উঠল। ভুজঙ্গর খাঁড়া পড়ল। কিকিরার মাথাতেই পড়ার কথা কিন্তু কেমন করে যেন সরে গেলেন কিকিরা, খাঁড়ার কোপ থেকে নিজেকে বাঁচালেন। ভুজঙ্গ ক্ষিপ্ত হয়ে আবার কিকিরার শরীর লক্ষ করে খাঁড়া তুললেন। তারাপদ বুঝতে পারছিল, কিকিরার হাত দুর্বল। এতক্ষণ তিনি নিজেকে ভাগ্যের জোরে, সামলেছেন–আর পারবেন না। চোখের সামনে মানুষটা মরবে।

পারলেন না কিকিরা, জ্বলন্ত কোটটা খাঁড়ায় জড়িয়ে গেল। ভুজঙ্গ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন কোটটা ফেলে দেবার । কিকিরাও সেই ফাঁকে ছুটতে শুরু করেছেন।

কোচোয়ান রামবিলাস বলল, “সামালকে বসুন বাবুরা। জান বাঁচান।” বলতে বলতে রামবিলাস তার ঘোড়াকে হঠাৎ ঘুরিয়ে নিল ফটকের দিকে। তারপর চাবুক কষাল।

আচমকা চাবুক খেয়ে ঘোড়া লাফ মেরে উঠল। তারপরই সামনের দিকে ছুটল।

কিকিরার কোটের আগুন ভুজঙ্গর কাপড়ে লেগে গিয়েছিল। তিনি এই অবস্থাতেই ছুটে আসছিলেন, হাতের খাঁড়া থেকে কোটটা মাটিতে পড়ে গেছে।

রামবিলাস কোনো দিকে তাকাল না, সোজা ভুজঙ্গর দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

তারাপদ পলকের জন্যে দেখল ভুজঙ্গ খাঁড়া তুললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা তাঁর সামনে লাফ মেরে, ভুজঙ্গকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ফটক পর্যন্ত ছুটে গেল ।

রামবিলাস ফটকের কাছ থেকে আবার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল। ফেরার সময় দেখল ভুজঙ্গ মাটিতে পড়ে আছেন। উপুড় হয়ে। তার খাঁড়া একদিকে, তিনি অন্যদিকে। কাপড়ে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে।

কিকিরাকে গাড়িতে তুলে নিল রামবিলাস।

তারাপদ বলল, “আপনি এত দেরি করলেন কেন?”

কিকিরার কথা বলার শক্তি ছিল না। হাঁপাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, “মৃত্যুঞ্জয়কে খুঁজছিলাম। ভুজঙ্গর ঘরে সিন্দুক খুলে সে পাগলের মত টাকা-পয়সা সোনাদানা হাতড়াচ্ছিল। তাকে ঘরের মধ্যেই বন্ধ করে রেখে এলাম। জানলা দিয়ে লাফানো ছাড়া তার আর উপায় নেই।”

ভুজঙ্গর বাড়ি ছেড়ে গাড়িটা অনেক দূর চলে এল। এখনো দূরে তাকালে আকাশের একটা দিক লাল দেখায়। অথচ আশপাশে মাঠ আর ঝোঁপঝাড়ে অন্ধকার ঘন হয়ে আছে। শীতের বাতাস বইছে শনশন করে, ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দ আর খুরের আওয়াজ উঠছে খটখট।

সাধুমামা বসে থাকতে থাকতে কেঁদে উঠলেন।

কিকিরা প্রথমে কিছু বললেন না, পরে বললেন, “সাধনদা, তুমি কাঁদছ কেন? আজ এতকাল পরে তোমার মুক্তি হল।”

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সাধুমামা কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, “আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল। তারাপদর বাবাকে আমিই এনেছিলাম।”

কিকিরা বললেন, “তারাপদকেও তুমি এনেছ। ভুজঙ্গকে শেষ করবে বলে তুমি ধীরে ধীরে ধৈর্য কতকাল ধরে জাল ছড়িয়েছে সাধনদা। সেই জালে একে একে সবাই জড়িয়ে পড়েছে।”

সাধুমামা কাঁদতে কাঁদতে বললেন “না না, আমার কিসের সাধ্য। তুমিই তো করলে সব। তোমার ও কত ক্ষতি করেছিল আমি জানি।”

চন্দন জিজ্ঞেস করল, “কিকিরাবাবু, আপনি কে? আপনার সত্যিকারের পরিচয়টা জানতে পারি?”

কিকিরা তাঁর আগুনে ঝলসানো হাত সামলাচ্ছিলেন মনের জোরে। যন্ত্রণার শব্দও করছিলেন মাঝে মাঝে। বললেন, “আমি সাধনদার বন্ধু। কিঙ্করও বলতে পার । সাধনদা আমায় কলকাতায় খবর দিয়েছিল তোমরা শংকরপুরে আসছ।” বলে একটু থেমে কিকিরা আবার বললেন, “সলিসিটার মৃণাল দত্তর বাড়িতে যে বুড়ো মতন লোকটিকে তোমরা দেখেছ, সে আমাদের লোক। আমরা তাকে মধুপুর থেকেই সলিসিটার দত্তর বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম কাজে লাগাব বলে।”

তারাপদ চুপ করে ছিল। খানিক পরে বলল, “আপনি সত্যি সত্যি কে–আমরা জানি না। কিন্তু আপনার দয়াতেই আমরা বাঁচলাম।”

কিকিরা বললেন, “অতশত জানি না বাবা, তবে এটুকু জানি–তুমি যদি একবার ভুজঙ্গর ফাঁদে পা দিতে তুমিও ভুজঙ্গ হয়ে যেতে। পাপের পথ, লোভের পথ–মানুষ যদি একবার ধরে, সে আর সহজে ছেড়ে আসতে পারে না। দেড় দু লক্ষ টাকার সম্পত্তির লোভ থেকে তুমি বেঁচেছ।”

তারাপদ মনে মনে বলল, “হ্যাঁ, সে বেঁচেছে।” বেঁচে গিয়েছে।

রাজবাড়ির ছোরা

০১.

কলকাতায় তখনো শীত ফুরোয়নি। মাঘের শেষটেষ। পাড়ায়-পাড়ায় সরস্বতী পুজোর তোড়জোড় চলছে। আর মাত্র দিন দুই বাকি। এমন সময় আকাশ ঘুটঘুটে হয়ে আচমকা এক ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল! এমন বৃষ্টি যেন শ্রাবণ-ভাদ্রতেই দেখা যায়। এক রাত্রের ঝড়বৃষ্টিতেই কলকাতার চেহারা হল ভেজা কাকের মতন। সরস্বতী পুজোর তোড়জোড় জলে ভেসে যায় আর কি! ছেলের দল আকাশের এই কাণ্ড দেখে মহাখাপ্পা। কাণ্ড দেখেছ, বৃষ্টি আসার আর সময় হল না! বুড়োরা অবশ্য খনার বচন আউড়ে বলতে লাগল যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ।

পুজোর ঠিক আগের দিন দুপুর থেকে আকাশ খানিকটা নরম হল। মেঘ আর তত ঘন থাকল না, হালকা হল, ফেটে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। ঝিরঝির এক-আধ পশলা বৃষ্টি আর হাওয়া থাকল। মনে হল, কাল সকালে হয়ত রোদ উঠবে।

বিকেলের দিকে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে চন্দনরা এল কিকিরার বাড়ি। কিকিরার সঙ্গে চন্দনদের এখন বেশ ভাব। বয়েসে কিকিরা অনেকটাই বড়, নয়ত তিনি হয়ত গলায় গলায় বন্ধু হয়ে যেতেন তারাপদ আর চন্দনের। ঠিক সেরকম বন্ধু তো কিকিরা হতে পারেন না, তবু সর্কটা বন্ধুর মতনই হয়ে গিয়েছিল। কিকিরা তারাপদদের স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। আর তারাপদরাও কিকিরাকে যথেষ্ট মান্য করত, পছন্দ করত; রবিবার দিনটা তারা কিকিরার জন্যে তুলে রেখেছিল। বিকেল হলেই দুই বন্ধু কিকিরার বাড়ি এসে হাজির হত, গল্পগুজব, হাসি-তামাশা করে, খেয়েদেয়ে রাত্রে যে যার মতন ফিরে যেত।

দিনটা ছিল রবিবার। চন্দন আর তারাপদ কিকিরার বাড়ি এসে দেখে এক ভদ্রলোক বেশ দামি ছাতা আর কালচে রঙের নাইলনের বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের চোখমুখ দেখলেই মনে হয়, মানুষটি বেশ বনেদি। পুরোপুরি বাঙালি চেহারাও যেন নয়, চোখের মণি কটা, ভুরুর রঙও লালচে, লম্বা নাক, থুতনির তলায় ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

ভদ্রলোক যাবার সময় চন্দনদের একবার ভাল করে দেখে নিলেন।

উনি চলে গেলে দরজা বন্ধ করে কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। হেসে বললেন, "এসো, এসো–আমি ভাবছিলাম আজ বুঝি তোমরা আর আসবে না।"

চন্দন বলল, "আসব না কেন, আজ আপনি আমাদের আফগান খিচুড়ি খাওয়াবেন বলেছিলেন।"

কিকিরা বললেন, "আফগানি খিচুড়ি, মুলতানি আলুর দম।..বৃষ্টি দেখে আমার মনে হচ্ছিল– তোমরা বোধ হয় আফগানি ভুলে গেছ।"

চন্দন বলল, "খাওয়ার কথা আমি ভুলি না।"

কিকিরা বললেন, “ভেরি গুড। যাও ঘরে গিয়ে বসো, আমি বগলাকে চায়ের জল চাপাতে বলি।”

পায়ের জুতো জলে-কাদায় কদাকার হয়ে গেছে। ছাতা রেখে, জুতো খুলে তারাপদ বাথরুম থেকে পা-হাত ধুয়ে এল। চন্দনও। এই বাড়িতে কোথাও তাদের কোনো সঙ্কোচ নেই। যেন সবই নিজের।

ঘরে এসে বসল দুজনে। বাতি জ্বলছে। যে-রকম মেঘলা দিন, বাতি বিকেল থেকেই জ্বালিয়ে রাখতে হয়। চন্দন কোণের দিকে চেয়ারে বসল। এই চেয়ারটা তার খুব পছন্দ। সেকেলে আর্মচেয়ার। বেতের বুনুনির ওপর কিকিরা পাতলা গদি বিছিয়ে রেখেছেন। হাত পা ছড়িয়ে, গা ডুবিয়ে দিব্যি শোয়া যায়। চন্দন বেশ আরাম করে বসে তারাপদকে ডেকে সিগারেট দিল, নিজেও ধরাল। কিকিরাকে যখন চিনত না চন্দনরা, এন্তার সিগারেট খেয়েছে। চেনাজানা হয়ে যাবার পর ওঁর সামনে সিগারেট খেতে লজ্জাই করত কিন্তু কিকিরা ঢালাও হুকুম দিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন–”নো লজ্জা-শরম, খাও। তোমরা তো সাবালক ছেলে।”

চন্দন আরাম করে সিগারেট টানতে টানতে ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগল। কিকিরার মতন এই ঘরটাও বড় বিচিত্র। পাড়াটাও কিছু কম বিচিত্র নাকি। ওয়েলিংটন থেকে খানিকটা এগিয়ে এক গলির মধ্যে বাড়ি। পার্ক সাকাসের ট্রামে উঠলেই সুবিধে। কিংবা পঁচিশ নম্বর বালিগঞ্জের ট্রামে উঠতে হয়। নানা জাতের মানুষ থাকে এপাশে। লোকে যাকে বলে অ্যাংলো পাড়া, সেই ধরনের। তবে শুধু অ্যাংলোই থাকে না, চীনে বেহারী বোম্বাইঅলাও থাকে। কিকিরার বাড়ির নিচের তলায় মুসলমান করিগররা দরজিগিরি করে, কেউ কেউ টুপি বানায়। পুরনো আমলের বাড়ি। বোধ হয় সাহেব-সুবোতেই তৈরি করেছিল। কাঠের সিঁড়ি মস্ত উঁচু ছাদ, কড়িবরগার দিকে তাকালে ভয়। হয়। কিকিরার এই দোতলার ঘরটি বেশ বড়। ঘরের গা লাগিয়ে প্যাসেজ। তারই একদিকে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। কাজ চলার মতন বাথরুম। এক চিলতে পার্টিশানকরা ঘরে থাকে বগলা, কিকিরার সব্যসাচী কাজের লোক।

চন্দনরা যতবার কিকিরার ঘরে এসেছে, প্রায় বারেতে দেখেছে একটা-না-একটা নতুন জিনিস আমদানি করেছেন কিকিরা। এমনিতেই ঘরটা মিউজিয়ামের মতন, হরেক রকম পুরনো জিনিসে বোঝাই, খাট আলমারি দেরাজ বলে নয়, বড় বড় কাঠের বাক্স, যাত্রাদলের রাজার তরোয়াল, ফিতে-জড়ানো ধনুক, পুরনো মোমদান, পাদরি টুপি, কালো আলখাল্লা, চোঙঅলা সেকেলে গ্রামোফোন, কাঠের পুতুল, রবারের এটা সেটা, অ্যালুমিনিয়ামের এক যন্ত্র, ধুলোয় ভরা বই–আরও কত কী। কাচের মস্ত বড় একটা বল-ও রয়েছে, ওটা নাকি জাদুকরের চোখ।

চন্দন বলল, “তারা, কিকিরা নতুন কী আমদানি করেছেন বল তো?”

তারাপদ একটা বাঁধানো বইয়ের মতন কিছু নাড়াচাড়া করছিল, বলল “কী জানি! চাঁদু, এই জিনিসটা কী রে?”

চন্দন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বই বলেই মনে হল তার। চামড়ায় বাঁধানো। তারাপদ মামুলি বই চিনতে পারছে না। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। চন্দন বলল, “কেন, বই।”

মাথা নেড়ে তারাপদ বলল, “বই নয়।”

“মানে?”

“বইয়ের মতনই অবিকল দেখতে। বই নয়। বাক্স।”

“বাক্স? কই দেখি।”

তারাপদ এগিয়ে এসে জিনিসটা দিল। হাতে নিয়ে দেখতে লাগল চন্দন। সামান্য ভারী। একেবারে বাঁধানো বইয়ের মতন দেখতে। আগেকার দিনে মরক্কো-চামড়ায় যেরকম বই বাঁধানো হত, বিশেষ করে বিদেশি দামি বইটই, সেই রকম। বই হলে পাতা থাকত। এর চারদিকই বন্ধ। ঘন কালো রঙের চামড়া দিয়ে মোড়া। আঙুল দিয়ে টোকা মেরে বোঝার উপায় নেই, কার্ডবোর্ড না পাতলা টিনের ওপর বোর্ড দিয়ে আগাগোড়া বাক্সটা তৈরি করা হয়েছে। কোথাও কোনো চাবির গর্তও চোখে পড়ল না।

চন্দন বাক্সটা নাড়াচাড়া করছে, এমন সময় কিকিরা ঘরে এলেন।

বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে দেখাল চন্দন।”এটা কি আপনার লেটেস্ট আমদানি?”

কিকিরার নিজের একটি বসার জায়গা আছে। নিচু সোফার মতন দেখতে অনেকটা, তার চারধারে চৌকো, গোল, লম্বা নানা ধরনের কুশন। রঙগুলোও বিচিত্র; লাল, কালো, সোনালি ধরনের। মাথার দিকে একটা বাতি। গোল শেড, শেডের গায়ে নকশা।

কিকিরা বসলেন। হেসে বললেন, “ঘণ্টাখানেক আগে হাতে পেয়েছি।”

“মনে হয়, চোরাবাজার, না হয় চিতপুর, কিংবা কোথাও পুরনো জিনিসের নীলাম থেকে কিনে এনেছেন।”

কিকিরা মাথা নাড়তে লাগলেন। তাঁর পোশাক বলতে একটা ঢলঢলে পাজামা, পায়ে চটি, গায়ে আলখাল্লা। আলখাল্লার বাহার দেখার মতন, যেন কম করেও দশ বারো রকমের কাপড়ের ছাঁট সেলাই করে কিকিরার এই বিচিত্র আলখাল্লা তৈরি হয়েছে।

তারাপদ নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসেছে ততক্ষণে।

কিকিরা যেন খানিকটা মজা করার জন্যে প্রথমে কিছু বললেন না—শুধুই মাথা নাড়তে লাগলেন। শেষে মজার গলায় বললেন, “নো থিফমার্কেট, নো চিতপুর। সিটিং সিটিং রিসিভিং।”

চন্দন হেসে ফেলল। বলল, “ইংলিশ রাখুন। এটা কী জিনিস? বাক্স?”

কিকিরা চন্দনের দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, “স্যান্ডাল উড, ওই পদার্থটি নিয়ে আমার কাছে এসো। ম্যাজিক দেখাব।” চন্দনকে মাঝে মাঝে কিকিরা ঠাট্টা করে স্যান্ডাল উড বলে ডাকেন।

উঠে গেল চন্দন। কিকিরা তারাপদকে ডাকলেন, “ওই টিপয়টা নিয়ে এসো তো।”

কিকিরার সামনে টিপয় এনে রাখল তারাপদ। মাথার দিকের বাতি জ্বালিয়ে দিলেন কিকিরা। বাক্সটা হাতে নিয়ে একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর বললেন, “তোমরা চৌকোনা টিফিন বাক্স কিংবা পানের কৌটা দেখোনি? এটাও সেই রকম। তবে এর কায়দাকানুন খানিকটা আলাদা, একে জুয়েলবক্স বলতে পারো।” কিকিরা কথা বলতে বলতে বাক্সর সরু দিকের একটা উঁচুমতন জায়গা বুড়ো আঙুল টিপতে লাগলেন।

তারাপদরা দেখতে লাগল। যদি এটা কোনো বাঁধানো বই হত তা হলে বলা যেত-বইয়ের যেটা পুটের দিক–যেখানে পাতাগুলো সেলাই করা হয়–সেই দিকে শিরতোলা বা দাঁড়া-ওঠানো একটা জায়গায় কিকিরা চাপ দিচ্ছিলেন। বার কয়েক চাপ দেবার পর তলার দিকে পুটবরাবর পাতলা কিছু বেরিয়ে এল সামান্য। কিকিরা তার আলখাল্লার পকেট থেকে হাতঘড়ির চাবির মতন একটা চাবি বার করলেন। বললেন, "এই দেখো চাবি।"

হাতে একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস থাকলে হয়ত আলপিনের মাথার সাইজের ফুটোটা দেখা যেত। আশ্চর্য, বাক্সর ডালা খুলে গেল। যেন স্প্রিং দেওয়া ছিল কোথাও ওপরের ডালা লাফিয়ে উঠল একটু।

চন্দন আর তারাপদ অবাক।

কিকিরা যেন আড়চোখে চন্দনদের মুখের ভাবটা দেখে নিলেন। হাসলেন মিটমিটে চোখে। তারপর ওপরের ডালাটা পুরোপুরি তুলে ধরলেন।

ঘাড় মুখ সরিয়ে নিয়েছিলেন কিকিরা। চন্দন আর তারাপদ প্রথমটায় যেন কিছুই বুঝতে পারল না। কী ওটা? মেয়েদের গয়নার মতন মনে হচ্ছে। চকচক করছে। কত রকমের পাথর! দুজনেই ঝুঁকে পড়ল। বাক্স থেকে বিঘতখানেক তফাতে মাথা রেখে হাঁ করে দেখতে লাগল। ভেলকি না ভোজবাজি? চোখের পলক আর পড়ে না।

ধীরে ধীরে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে আসছিল চোখে, মাথায় ভাসা-ভাসা একটা ধারণা জাগছিল। না, মেয়েদের গয়নাগাটি নয়। অন্য কিছু। কিন্তু কী?

তারাপদ বলল, "কী এটা?" কিকিরা বললেন, "একে বলে কিডনি ড্যাগার।"

"ড্যাগার? মানে ছোরা?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু ছোরা কোথায়? ওটা তো গয়নার মতন দেখতে।"

কিকিরা হাত বাড়িয়ে বাক্সটা তুলে নিলেন। বললেন, "যেটা গয়নার মত দেখছ, সেটা হল ছোরার বাঁট। দেখেছ একবার ভাল করে বাঁটটা? কত রকমের পাথর আছে জানো? দামি সবরকম পাথর রয়েছে। বাজারে এর দাম কত হবে আন্দাজ করতে পারো?"

চন্দন মুখ তুলেছিল। তারাপদও হাঁ করে কিকিরাকে দেখছে।

কিকিরাও মুগ্ধ চোখে সেই পাথর বসানো, কারুকর্ম করা বাঁটটা দেখছিলেন। নীলচে ভেলভেটের ওপর রাখা হয়েছে বাঁটটা। গয়নার মতনই কী উজ্জ্বল, সুন্দর দেখাচ্ছে।

কিকিরা বললেন, "বাঁটটা দেখছ, ছুরিটা দেখতে পাচ্ছ না তো! ওটাই তোত সমস্যা।"

"সমস্যা?" চন্দন বলল।

"ব্যাপারটা তাই। বাঁটটা আছে, ছুরির দিকটা নেই!...ওটা জোগাড় করতে হবে।"

কিকিরার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তারাপদরা বুঝতে পারল না। কিসের ছুরি, বাঁটটাই বা কোথা

থেকে এল? কিকিরা কত টাকা খরচ করে এটা কিনলেন? অত টাকাই বা পেলেন কেমন করে? বড়লোক মানুষ তো কিকিরা নন।

একেবারে পাগলামি কাণ্ড কিকিরার। পুরনো জিনিস কেনার কী যে খেয়াল ওঁর-তারাপদরা বুঝতে পারে না।

চন্দন বলল, "আপনি এটা কিনলেন?"

"কিনব? এর দাম কত জানো? এখনকার বাজারে হাজার ত্রিশ-চল্লিশ তো হবেই–বেশিও হতে পারে।"

"তবে পেলেন কোথায়?"

কিকিরা এবার রহস্যময় মুখ করে বললেন, "পেয়েছি, তোমরা আসার সময় যে ভদ্রলোককে বেরিয়ে যেতে দেখলে, উনি আমায় এটা দিয়ে গেছেন।"

তারাপদ আর চন্দন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ভদ্রলোককে মনে পড়ল। তেমন করে খুঁটিয়ে তো লক্ষ করেনি, তবু চেহারার একটা ছাপ যেন থেকে গেছে মনে।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "কে ওই ভদ্রলোক?"

কিকিরা তখনোও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলেন ছোরার বাঁটটা, যেন তারিফ করছিলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

চন্দন বলল, "কিকিরা স্যার, আপনি দিন দিন বড় মিস্টিরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন।"

কিকিরা চোখ না-তুলেই রহস্যময় গলায় বললেন, "আমার চেয়েও এই ছোরার ইতিহাস আরও মিস্টিরিয়াস।"

চন্দন হেসে-হেসেই বলল, "আপনার চারদিকেই মিস্ট্রি, স্যার; একেবারে মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স হয়ে বসে আছেন।"

তারাপদ হেসে ফেলল। কিকিরাও মুখ তুলে হাসলেন।

এমন সময় চা এল। চা আর গরম গরম ডালপুরী।

কিকিরা শুধুই চা নিলেন। তারাপদ আর চন্দন যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে খাবার আর চা নিয়ে বসল। চন্দনদের জন্যে প্রতি রবিবারেই কিকিরাকে কিছু না-কিছু মুখরোচক খাদ্যের ব্যবস্থা রাখতে হয়। রান্নাবান্নাতেও হাত আছে কিকিরার।

ডালপুরী খেতে খেতে চন্দন বলল, "তা ইতিহাসটা বলুন?"

তারাপদরও ধৈর্য থাকছিল না। বলল, "ভদ্রলোক আপনার চেনা?"

কিকিরা বাক্সটা বন্ধ করে রেখেছিলেন আলগা করে। চা খেতে-খেতে বললেন, "ভদ্রলোক আমার চেনা নন, মানে তেমন একটা পরিচিত নন। গত পরশু দিন আগে এক জায়গায় আলাপ হয়েছিল।"

“কী নাম?” তারাপর আবার জিজ্ঞেস করল।

“দীপনারায়ণ। দীপনারায়ণ সিং।”

“কোথায় থাকেন?”

“এখন কয়েক দিনের জন্যে রয়েছেন পার্কসার্কাসে।”

চন্দন বলল, “ভদ্রলোকের চেহারায় একটা আভিজাত্য আছে।”

কিকিরা বললেন, “রাজ-রাজড়ার বংশধর, চেহারায় খানিকটা রাজ-ছাপ থাকবেই তো।”

তারাপদ বলল, “আপনার এই ক্রমশ আর ভাল লাগছে না কিকিরা, স্পষ্ট করে বলুন ব্যাপারটা।”

কিকিরা আরাম করে কয়েক চুমুক চা খেলেন। তারপর বললেন, “আগে কোনটা শুনবে, বংশের ইতিহাস, না ছোরার ইতিহাস? দুটোই দরকারি, একটাকে বাদ দিলে আরেকটা বোঝা যাবে না। আগে বংশের ইতিহাসটা বলি, ছোট করে।” কিকিরা একটু থামলেন, তাঁর জোব্বা থেকে সরুমতন একটা চুরুট বের করে ধরালেন। ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন, “দীপনারায়ণের চার পুরুষের ইতিহাস শুনে তোমাদের লাভ হবে না। আমার আবার ওই বাবার বাবা তার বাবা–ওসব মনে থাকে না। সোজা কথাটা হল, আগেকার দিনে যারা ধন-সম্পত্তি গড়ে তুলতে পারত তারা এক-একজন রাজাগজা হয়ে উঠত সমাজে। দীপনারায়ণের কোনো পূর্বপুরুষ মুসলমান রাজার আমলে এক সেনাপতির সৈন্যসামন্তর সঙ্গে বিহার বাংলা-ওড়িশার দিকে হাজির হন। সৈন্যসামন্তরা যুদ্ধটুদ্ধ সেরে যখন ফিরে যায় তখন আর তাঁকে নিয়ে যায়নি। কেন নিয়ে যায়নি–তা জানা যায় না। হয় কোনো দোষ করেছিলেন তিনি, না হয় কোনো রোগটোগ হয়েছিল বড় রকমের। সেই পূর্বপুরুষই ওদিকে একদিন দীপনারায়ণদের বংশ স্থাপন করেন। তারপর দু পুরুষ ধরে মস্ত জমিদারি গড়ে তুলে, জঙ্গলের মালিকানা কিনে নিয়ে অনেক ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বে ছোট বড় রাজার তো অভাব ছিল না বাপু, দীপনারায়ণের বাপ-ঠাকুরদাও সেই রকম ছোটখাট রাজা হয়ে বসেছিলেন। দীপনারায়ণের বাবার আমলে সাহেব কোম্পানিরা কতকগুলো জায়গা ইজারা নেয়। মাটির তলায় ছিল সম্পদ-মিনারেলস। দীপনারায়ণের বাবা আদিত্যনারায়ণ ইজারার টাকাতেই ফুলেফেঁপে ঢোল হয়ে যান। ভদ্রলোক মারা যান শিকার করতে গিয়ে বন্দুকের গুলিতে।…এই ছোরাটা হল তাঁর–আদিত্যনারায়ণের। এ-দেশি ছোরা এরকম হয় না, এ-ছোরা বিদেশি। হয় তিনি বিদেশ থেকে তৈরি করে আনিয়েছিলেন–না হয় এদেশের কোনো বিদেশি কারিগর তাঁকে ছোরাটা তৈরি করে দিয়েছিল। আগেকার দিনে য়ুরোপ-টুরোপ-এ যখন তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ হত, তখন এই রকম সব ছোরাছুরি কোমরে গোঁজার রেওয়াজ ছিল। আদিত্যনারায়ণ অবশ্য কোমরে গুঁজতেন না। রাজবাড়িতে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছিলেন। রাজবংশের ওটা পবিত্র সম্পদ।”

তারাপদ আর চন্দন মন দিয়ে কথা শুনছিল কিকিরার। চন্দন তার ডালপুরী শেষ করে ফেলল। তারাপদ ধীরে-সুস্থে খাচ্ছে।

কিকিরা বললেন, “এই ছোরাটাকে দীপনারায়ণেরা বিগ্রহের মতন মনে করেন, মান্য করেন। তাঁদের বিশ্বাস এই ছোরার দৈবশক্তি রয়েছে। কিংবা দৈবগুণ বলতে পারো। আমরা সোজা কথায় যাকে বলি মন্ত্রঃপূত, এই ছোরাও তাই। দীপনারায়ণ বলেছেন, কখনো কোনো কারণে যদি কেউ প্রতিহিংসার বশে, কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে এই ছোরা দিয়ে আহত

করেন, খুন করেন–তা হলে এই ছোরার মুখ থেকে রক্তের দাগ কোনোদিনই, হাজার চেষ্টাতেও উঠবে না। আর প্রতিদিন, একটু একটু করে, ছোরাটা ভোঁতা হয়ে যাবে, ছোট হয়ে যাবে।”

তারাপদ বলল, “সে কী!”

চন্দন অবিশ্বাসের গলায় বলল, “গাঁজাখুরির আর জায়গা হল না। দীপনারায়ণ আপনাকে ব্লাফ ঝেড়েছে।”

কিকিরা চন্দনকে দেখতে-দেখতে বললেন, “সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে। আগে দীপনারায়ণ যা বলছেন সেটা শোনা যাক।”

“কী বলছেন তিনি?” চন্দন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের গলায় বলল।

কিকিরা বললেন, “দীপনারায়ণ বলছেন, গত এক মাসের মধ্যে তাঁদের পরিবারে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। দীপনারায়ণের ছোট ভাই জয়নারায়ণ খুন হয়েছেন।”

তারাপদ আঁতকে উঠে বলল, “খুন?”

কিকিরা বললেন, “এই ঘটনা ঘটে যাবার পর–খুবই আশ্চর্যের কথা–এই ছোরার বাক্স থেকে কেউ ছোরার ফলাটা খুলে নিয়েছে, শুধু বাঁটটা পড়ে আছে।”

চন্দন বলল, “তার মানে আপনি বলতে চান, দীপনারায়ণের ছোট ভাই জয়নারায়ণকে কেউ খুন করেছে এই ছোরা দিয়ে? খুন করে ফলাটা খুলে নিয়েছে?”

মাথা নেড়ে কিকিরা বললেন, “দীপনারায়ণ তাই মনে করেন। তাঁর ধারণা, যে জয়নারায়ণকে খুন করেছে সে এই ছোরা রহস্যটা জানে। জানে যে, ছোরার ফলা থেকে রক্তের দাগ মুছবে না–হাজারবার জলে ধুলেও নয়। তা ছাড়া ছোরার ফলাটা ক্রমশই ক্ষয়ে আসবে। কাজে-কাজেই পুরো ফলাটাই সরিয়ে ফেলেছে।”

“কিন্তু আপনি কি বলতে চান–এই ছোরার বাঁট থেকে ফলাটা খুলে ফেলা যায়?”

“যায়,” মাথা নেড়ে কিকিরা বললেন, “তোমরা ভাল করে ছোরাটা দেখলে বুঝতে পারতে বাঁটের নিচের দিকে সরু ফাঁক আছে। ওই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ফলা গলিয়ে–দু দিকের স্প্রিং টিপলে ফলাটা আটকে যায়।”

চন্দন এবার একটু চুপ করে থাকল। চা খেতে লাগল।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, “কিডনি নাম হল কেন?”

কিকিরা বললেন, “ছোরার ওপর দিকের গড়নটা মানুষের কিডনির মতন। দু দিকে দুটো বরবটির দানা বা বিচির মত জিনিস রয়েছে, অবশ্য বড় বড় দানা, প্রায় ইঞ্চিটাক। এটা দু রকম কাজ করে। স্পিংয়ের কাজ করে, আবার ছোরা ধরার সময় ধরতে সুবিধেও হয়।

চন্দন রসিকতা করে বলল, “বোধ হয় মানুষের কিডনি ফাঁসাবারও সুবিধে হয়–কী বলেন কিকিরা? নামটাও তাই কিডনি ড্যাগার।”

কিকিরা কোনোরকম উচ্চবাচ্য করলেন না।

সামান্য চুপচাপ থেকে তারাপদ বলল, “ব্যাপারটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আর একটু পরিষ্কার হয়ে নিই। রাজবাড়ির পুরনো ইতিহাস এখন থাক। আসল ব্যাপারটা কবে ঘটেছে, কিকিরা?”

“মাসখানেক আগে।”

“রাজবাড়িতে?”

“হ্যাঁ। রাজবাড়ির লাইব্রেরি-ঘরে।”

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, “কেন?”

“তা কেমন করে বলব! কেন খুন হয়েছে আর কে খুন করেছে সেটাই তো জানার জন্যে এত–!”

চন্দন পাকা গোয়েন্দার মতন ভুরু কুঁচকে বলল, “রাজবাড়িতে কে কে থাকে?”

“রাজপরিবারের লোকরা। দীপনারায়ণের এক অন্ধ কাকাও আছেন-ললিতনারায়ণ। আদিত্যনারায়ণের বৈমাত্র ভাই।”

“জন্মান্ধ?”

“না, মাসঙ্কয়েক হল অন্ধ হয়েছেন। খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখতে গিয়ে।”

“বোগাস। ওরকম শোনা যায়, আসলে অন্য কোনো রোগ ছিল চোখের।”

“কাকার কেমন বয়েস?”

“ললিতনারায়ণের বয়স ষাটের কাছাকাছি। জয়নারায়ণের বছর বত্রিশ।”

“দীপনারায়ণ নিশ্চয় বছর-পঁয়তাল্লিশ হবেন?”

“আর একটু কম। বছর চল্লিশ। দীপনারায়ণের পর ছিলেন তাঁর বোন। তিনি এখন শ্বশুরবাড়ি মধ্যপ্রদেশে থাকেন।”

তারাপদ চা খাওয়া শেষ করে মুখ মুছল। বলল, “ছোরাটা থাকত কোথায়?”

“রাজবাড়িতে, দীপনারায়ণের ঘরে, সিন্দুকের মধ্যে।”

“কবে দীপনারায়ণ জানতে পারলেন ছোরার ফলা চুরি হয়েছে?”

কিকিরার চুরুট নিবে গিয়েছিল। চুরুটটা আঙুলে রেখেই কিকিরা বললেন, তা জয়নারায়ণ খুন হবার আট-দশ দিন পরে।”

“কেন? অত দিন পরে জানলেন কেন?”

কিকিরা বললেন, “জয়নারায়ণ যে ভাবে খুন হয়েছিলেন, তাঁকে যে ভাবে লাইব্রেরি ঘরে পাওয়া গিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল, ওটা দুর্ঘটনা। পরে একদিন আচমকা ছোরার বাক্সটা খুলতেই তাঁর চোখে পড়ে, ছোরার বাঁট আছে, ফলাটা নেই। তখন থেকেই তাঁর সন্দেহ।”

চন্দন বলল, “পুলিশকে জানিয়েছেন দীপনারায়ণ?”

“না। পুলিশ দুর্ঘটনার কথা জানে। অন্য কিছু জানে না। দুর্ঘটনায় জয়নারায়ণ মারা গেছেন এই কথাটাই ছড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া ওই জঙ্গল-অঞ্চলে কোথায় পাচ্ছ তুমি থানা পুলিশ কলকাতার মতন। ওসব জায়গায় ডেথ সার্টিফিকেটও নেই, পোস্টমর্টেমও নেই। তার ওপর রাজবাড়ির ব্যাপার।”

তারাপদ বলল, “দীপনারায়ণের কথা আপনি বিশ্বাস করেছেন?”

কিকিরা বললেন, “বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমি কোনোটাই করিনি। আমার কথা হল, কোনো দলেই ঝুঁকবে না। একেবারে মাঝামাঝি থাকবে। যখন দেখবে বিশ্বাসের দিক টানছে তখন বিশ্বাসের দিকে টলবে, যদি অবিশ্বাসের দিক টানে তবে অবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকবে। আমার হল চুম্বকের কাঁটা–যেদিকে টানবে সেদিকে ঝুঁকব।”

চন্দন বলল, “আপনি যাই বলুন আমি বিশ্বাস করি না, কোনো ছোরার ফলার ওসব গুণ থাকতে পারে! এ একেবারে গাঁজাখুরি। ব্লাফ।”

কিকিরা চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন। আস্তে-আস্তে টানলেন। তারপর বললেন, “স্যান্ডাল উড়, আমাদের এই জগতে কত কী অদ্ভুত-অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে তার সব কি আমরা জানি। জানলে তো ভগবান হয়ে যেতুম।”

“আপনি তা হলে বিশ্বাস করছেন যে এমন ছোরাও আছে যার গায়ে রক্তের দাগ পড়লে মোছে না? আপনি বিশ্বাস করছেন, ইস্পাতেও ক্ষয় ধরে?”

মাথা নেড়ে নেড়ে কিকিরা বললেন, “আমি বিশ্বাস করছি না। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তারা কেন করে, সত্যিই তার কোনো কারণ আছে কিনা সেটা আমি খুঁজে দেখতে চাই।”

চন্দন চুপ করে থেকে বলল, “বেশ, দেখুন।...আপনি তা হলে গোয়েন্দাগিরিতে নামলেন?”

“মাথা খারাপ নাকি তোমার। আমি হলাম ম্যাজিশিয়ান। কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান। গোয়েন্দারা কত কী করে, রিভলবার ছেড়ে, নদীতে ঝাঁপ দেয়, মোটর চালায়; আমি তো রোগা-পটকা মানুষ, পিস্তল রিভলবার জীবনে হাতে ধরিনি।..তা ওসব কথা থাক। কথা হচ্ছে আগামী পরশু কি তরশু আমি তারাপদকে নিয়ে একবার দীপনারায়ণের রাজবাড়িতে যাচ্ছি! তুমি কবে যাচ্ছ?”

চন্দন অবাক হয়ে বলল, “আপনি যাচ্ছেন তারাপদকে নিয়ে?” কিকিরা বললেন, “দিন দশ-পনেরো রাজবাড়ির ভাত খেয়ে আসব। মন্দ কী।”

০২.

তারাপদর আর ঘুম আসছিল না। বটুকবাবুর মেসের কোথাও আর ছিটেফোঁটা বাতি জ্বলছে না বৃষ্টির দরুন ঠাণ্ডাও পড়েছে, খুব, এ-সময় লেপ মুড়ি দিয়ে তোফা ঘুম মারবে কোথায়, তা নয়, মাথার মধ্যে যত রকম এলোমেলো ভাবনা। আগের বার, যখন তারাপদর কপালে ভুজঙ্গ কাপালিক জুটেছিল, তখন দশ-পনেরোটা দিন মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল তার। তারাপদ নিজেই সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, তার ভাগ্য নিয়ে অদ্ভুত এক খেলা চলছিল, মাথা খারাপ না হয়ে উপায় ছিল না তার। কিন্তু এবারে তারাপদ নিজে কোথাও জড়িয়ে নেই। তবু এত ভাবনা কিসের?

কিকিরা মানুষটি সত্যিই অদ্ভুত। এই ক'মাসের মেলামেশায় তারাপদরা বুঝতে পেরেছে, কিকিরা মুখে যত হাসি-ঠাট্টা তামাশা করুন না কেন, তাঁর একটা বিচিত্র জীবন আছে। স্পষ্ট করে, খুলে কিকিরা এখন পর্যন্ত কোনোদিন সে জীবনের কথা বলেননি। বলেছেন, সে-সব গল্প পরে একদিন শুনো, বললে মহাভারত হবে, তবে বাপু এটা ঠিক–আমি ম্যাজিকের লাইনের লোক। তোমরা ভাবো, ম্যাজিক জানলেই লোকে ম্যাজিশিয়ান হয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। তা কিন্তু নয়, কপালে না-থাকলে শেষ পর্যন্ত কেউ দাঁড়াতে পারে না। আমার কপালটা মন্দ। এখন আমি একটা বই লেখার চেষ্টা করছি ম্যাজিকের ওপর, সেই পুরনো আমল থেকে এ পর্যন্ত কেমন করে ম্যাজিকের ইতিহাস চলে আসছে বুঝলে?

তারাপদরা অতশত বোঝে না। কিকিরাকে বোঝে। মানুষটি চমৎকার, খুব রসিক, তারাপদদের স্নেহ করেন আপনজনের মতন। সত্যি বলতে কী, এতকাল চন্দন ছাড়া তারাপদর নিজের বলতে কেউ ছিল না, এখন কিকিরাকেও তারাপদর নিজের বলে মনে হয়।

কিকিরা যখন বলেছেন, তখন তারাপদকে সিংভূমের কোন এক জঙ্গলে যেতেই হবে তাঁর সঙ্গে। তবে দীপনারায়ণের ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় তারাপদরা আবার কথাটা তুলেছিল। চন্দন কিকিরাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি যাঁকে চেনেন না জানেন না, তাঁর কথা বিশ্বাসই বা করছেন কেন, আর এইসব খুনখারাপির মধ্যে নাকই বা গলাচ্ছেন কেন?"

কিকিরা তখন যা বললেন, সেটা আরও অদ্ভুত।

এই কলকাতাতেই কিকিরার এক বন্ধু আছেন, যিনি নাকি আশ্চর্য এবং অলৌকিক এক গুণের অধিকারী। কিকিরার চেয়ে বয়েসে সামান্য বড়, নাম রামপ্রসাদ। সন্ন্যাসীধরনের মানুষ, কোনো মঠের সন্ন্যাসী নন, সাত্ত্বিক ধরনের লোক, চিতপুরের দিকে গানবাজনার যন্ত্র সারাবার একটা দোকান আছে তাঁর। একা থাকেন। এই মানুষটির এক অলৌকিকশক্তি আছে। অদেখা কোনো কোনো ঘটনা তিনি দেখতে পান। তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বা জানতে চাইলে তিনি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর ওই অবস্থায় যদি কিছু দেখতে পান সেটা বলে যান। যখন আর পান না, থেমে যান। সব সময় সব প্রশ্নের জবাবও দেন না। বলেন, তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর এই অলৌকিক শক্তির কথা সকলে জানে না, কেউ-কেউ জানে। মুখে-মুখে তাঁর কথা খানিকটা ছড়িয়ে গেলেও মানুষটি অন্য ধাতের বলে তাঁকে নিয়ে হইচই করার সুযোগ হয়নি। নিজেও তিনি কারও সঙ্গে গলাগলি করছে চান না। একলা থাকতে ভালবাসেন। তবু গণ্যমান্য জনাকয়েক আছেন,

যাঁরা রামপ্রসাদবাবুর অনুরাগী। কিকিরা রামপ্রসাদবাবুকে যথেষ্ট মান্য করেন।

রামপ্রসাদবাবুর বাড়িতেই কিকিরা দীপনারায়ণকে দেখেছিলেন। আলাপ সেখানেই। রামপ্রসাদবাবুই কিকিরাকে বলেছিলেন, "কিঙ্কর, তুমি এর ব্যাপারটা একটু দেখো তো, আমি ভাল কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"চন্দন জিজ্ঞেস করেছিল, "রামপ্রসাদবাবু চোখ বন্ধ করে কী দেখতে পান?"

"ভূত আর ভবিষ্যৎ–দুইই কিছু কিছু দেখতে পান।" বলেছিলেন কিকিরা।

চন্দন ঠাট্টা করে বলেছিল, "দৈবজ্ঞ!"

কিকিরা বলেছিলেন, "যদি দৈবজ্ঞ বলতে চাও বলো, তবে ব্যাপারটা ঠাট্টার নয় চন্দন। তোমায় আগে বলেছি, আবার বলছি, এই জগৎটা অনেক বড়, বড়ই অদ্ভুত, আমরা তার কণার কণাও জানি না। তুমি রামপ্রসাদবাবুকে দৈবজ্ঞ বলে ঠাট্টা করছ, কিন্তু তুমি জানো না, বিদেশে–যেমন হল্যাণ্ডে সবচেয়ে পুরনো যে বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে সাইকলজির ডিপার্টমেন্টে বিশ বাইশজন এই ধরনের মানুষকে রেখে নিত্যিদিন গবেষণা চালানো হচ্ছে। এই বিশ বাইশজনকে আনা হয়েছে সারা য়ুরোপ খুঁজে–যাঁদের মধ্যে কমবেশি এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দেখা গিয়েছে যা সাধারণ মানুষের দেখা যায় না। ডাক্তার আর সাইকলজিস্টরা মিলে কত এক্সপেরিমেন্ট না করছে এদের ওপর। জানার চেষ্টা করছে– কোন্ ক্ষমতা এদের আছে, যাতে এরা যা চোখে দেখেনি তার কথাও কিছু না-কিছু বলতে পারে।"

কিকিরা যত যাই বলুন, চন্দন বিশ্বাস করেনি কোনো মানুষ অলৌকিক কোনো ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়।

তারাপদ চন্দনের মতন সবকিছু অবিশ্বাস করতে পারে না। বিশেষ করে কিকিরা যখন বলছেন। ব্যাপারটা যদি গাঁজাখুরি হত–কিকিরা নিজেই মানতেন না। ভুজঙ্গের আত্মা নামানো তিনি মানেননি। তারাপদ ঠিক বুঝতে পারছে না, কিন্তু তারও মনে হচ্ছে, কিছু থাকলেও থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ সাধারণই, তারা কী পারে না-পারে, তা নিয়ে অসাধারণের বিচার হতে পারে না। রাজার ছেলে রাজাই হয়, এটা সাধারণ কথা, কিন্তু রাজার ছেলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে গৌতম বুদ্ধও তো হয়।

এই সব দশরকম ভাবতে-ভাবতে শেষ পর্যন্ত তারাপদ কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন বিকেলে সে একাই কিকিরার বাড়ি গিয়ে হাজির। আজ সারাদিন আর বৃষ্টি নেই। তবে মাঝে মাঝে রোদ উঠলেও আকাশটা মেঘলা-মেঘলা। কলকাতা শহরে সব পুজোতেই হইচই আছে সরস্বতী পুজোর বেলায় কম হবে কেন! তারাপদর আজ টিউশানি নেই, কালও নয়। ছুটি। দু-চার দিন ছুটি নিতে হবে আরও। তারাপদর একটা চাকরির জন্যে কিকিরাও উঠে পড়ে লেগেছেন। বলেছেন, "দাঁড়াও, তোমায় আমি চাকরিতে না বসিয়ে মরব না।"

কিকিরা বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, "এসো এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

তারাপদ বলল, "কেন?"

কিকিরা বললেন, কালকেই আমাদের যেতে হবে, বুঝলে! টিকিট-ফিকিট দিয়ে গেছে।"

“কালকেই? কখন ট্রেন?”

“রাত্তিরে।”

তারাপদ বসল। কিকিরাকে দেখতে লাগল।

কিকিরা সুটকেসের মতন একটা বাক্সে নানা রকম জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। পাশে একটা ঝোলা।

তারাপদ বলল, “আপনার সেই দীপনারায়ণ আজ আবার এসেছিলেন?”

না। সকালে আমি গিয়েছিলাম।” কিকিরা বললেন।”একটা জায়গায় যাব, তার আগে কিছু ব্যবস্থা করা দরকার তো! তার ওপর তুমি সঙ্গে যাচ্ছ, চন্দনও যাবে দু-চার দিন পরে– দীপনারায়ণকে বলে আসা দরকার।”

সামান্য চুপ করে থেকে তারাপদ বলল, “উনি নিজে যাবেন না?”

“আজই ফিরে যাবেন!”

কী মনে করে তারাপদ হেসে বলল, “আমরা তা হলে কাল থেকে রাজ-অতিথি?”

কিকিরা মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, “কাল এ-বাড়ি ছাড়ার পর থেকে।”

“থাকব কোথায়?”

“রাজবাড়ির গেস্ট হাউসে।”

তারাপদ মনে মনে রাজবাড়ির একটা ছবি কল্পনা করবার চেষ্টা করল। দেখল, হিন্দি সিনেমার রাজবাড়ি ছাড়া তার মাথায় আর কিছু আসছে না। গঙ্গাধরবাবু লেনে বটুকবাবুর মেসের বাসিন্দে বেচারি, রাজবাড়ির কল্পনা তার মাথায় আসবে কেন? নিজের মনেই হেসে ফেলল তারাপদ।

কিকিরা নিজেই বললেন, “আমরা রাজবাড়িতে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকব না, বুঝলে!”

তারাপদ বুঝতে পারল না। নিজেদের পরিচয় ছাড়া আর কী পরিচয় আছে তাদের। অবাক হয়ে কিকিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সুটকেস গুছোতে-গুছোতে কিকিরা বললেন, “দীপনারায়ণ চান না যে, রাজবাড়ির লোক বুঝতে পারে আমরা তাঁর হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি। আমরা যাব পুরনো বই কেনাবেচার ব্যবসাদার হিসেবে। পুরনো বই, পুরনো ছবি।”

বুঝতে না-পেরে তারাপদ বলল, “সেটা কী?”

“সেটা ভয়ংকর কিছু নয়। এই কলকাতা শহরে আগে এক ধরনের ভাল ব্যবসা ছিল। প্রেস্টিজঅলা ব্যবসা। একশো সওয়াশো দেড়শো বছর আগেকার সব ছবি-সাহেবদের আঁকা–বিলেতে ছাপা হত নানা জায়গায় বিক্রি হত, এ-দেশেও। ছবিগুলো সব এদেশের মানুষকে নিয়ে, এখানকার নদী পাহাড় বন জঙ্গল নিয়ে। ছবিগুলো মোটা দামে বিকোত,

রাজারাজড়ারা, ধনী লোকেরা কিনত, বাড়িতে লাইব্রেরি বৈঠকখানা সাজাত। ছবি ছিল, বইও ছিল। সে সব বই আর পাওয়া যায় না, ছাপা হয় না। কোনো ধনী লোক মারা গেল, কিংবা রাজা স্বর্গে গেল, দেখাশোনার লোক নেই, তখন সে সব বই বিক্রি হয়ে যেত। কখনো কখনো নীলামে আজকাল সেব্যবসা নেই। দু-একজন অবশ্য খোঁজে থাকে। তারা কোনোরকমে কেনা-বেচা করে পেট চালায়—এই আর কী।”

তারাপদ বলল, “আমি তো ওসব কিছু জানি না।”

কিকিরা বললেন, “জানবার দরকার নেই। আমিই কি ছাই জানি। যাদের বাড়িতে যাব, তারাও জানে না। বাপ-ঠাকুরদা ঘর সাজিয়েছিল, তারাও সাজিয়ে রেখেছে। নয়ত হাজার টাকা দামের ছবি একশো টাকায় ছাড়ে, না পাঁচশো টাকার বই পঞ্চাশ টাকায় ছেড়ে দেয়? তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাকবে; যা করতে বলব, করে যাবে। বুঝলে?”

তারাপদ মাথা নাড়ল। বলল, “নামটামও পালটাতে হবে নাকি?”

“না, মোটেই নয়। ফাদার-মাদারের ডোনেট করা নাম পালটাবে কেন?”

কিকিরা এতক্ষণ পরে একটা রসিকতা করলেন। তারাপদ হেসে ফেলল। বলল, “কিকিরা, আমরা তা হলে সত্যি সত্যি গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি? শার্লক হোমস আর ওয়াটসন?”

কিকিরা বললেন, “বলতে পারো। কিন্তু ওয়াটসনসাহেব, সেখানকার জঙ্গলে তোমার এই ফতুয়া চলবে না। একটা লম্বা গরম কোটটোট—পুরনো হলেই ভাল—জোগাড় করতে পারো না? নয়ত শীতে মরবে।”

তারাপদ বলল, “বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে নেব।”

কিকিরা সুটকেস বন্ধ করলেন। বাইরে গেলেন। সামান্য পরে ফিরে এলেন।

তারাপদ যেন কিছু ভাবছিল বলল, “কাল আমি রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো? রামপ্রসাদবাবুর জন্যেই কি আপনি দীপনারায়ণের এই ব্যাপারটা হাতে নিলেন?”

নিজের চেয়ারে বসে কিকিরা একটা সরু চুরুট ধরাচ্ছিলেন। চুরুট ধরানো হয়ে গেলে বললেন, “খানিকটা তাই।”

“খানিকটা তাই মানে?”

ফুঁ দেবার মতন করে ধোঁয়া ছেড়ে কিকিরা বললেন, “রামপ্রসাদবাবুর কোনো ভৌতিক ক্ষমতা আছে, মন্তর-ফন্তর জানা আছে তা আমি বিশ্বাস করি না, তারাপদ। তবে আমি পড়েছি এবং দেখেছি এক-একজন মানুষ থাকে যারা সচরাচর না-দেখা জিনিস দেখতে পায়, কিংবা ধরো বুঝতে পারে। রামপ্রসাদবাবু যেটা পারেন সেটা হল, দেখা। যেমন ধরো, একটা ছেলে স্কুলে গেল-বিকেলেও বাড়ি ফিরে এল না, সন্ধেতেও নয়। বাড়ির লোক দুশ্চিন্তায় ভাবনায় ছটফট করছে, ভাবছে কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটল কি না! থানা-পুলিশ হাসপাতাল করে বেড়াচ্ছে। এখন তুমি রামপ্রসাদবাবুকে গিয়ে ধরলে। তিনি যদি রাজি হন, তবে চোখ বন্ধ করে বসে থাকবেন কিছুক্ষণ। তারপর হয়ত চোখ বন্ধ করেই বলবেন—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তার মানে—সেই ছেলেটি সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে পারছেন না। আবার এমনও হতে

পারে, তিনি বললেন : ছেলেটিকে তিনি আর-একটি কালো প্যান্ট-পরা ছেলের সঙ্গে সাইকেল চেপে রাস্তায় ঘুরতে দেখছেন, কোনো পার্কের কাছে গিয়ে দুজনে বসল, তারপর দুই বন্ধু মিলে আবার সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। হঠাৎ কোনো বাস এসে পড়ল রাস্তায়। সাইকেলটাকে ধাক্কা মারল...তারপর–তারপর আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

তারাপদ শিউরে উঠে বলল, "মানে ছেলেটি বাস চাপা পড়েছে?"

"চাপাই পড়ুক আর ধাক্কা খেয়ে ছিটকেই পড়ক–সেটা অন্য কথা। মরল, না হাসপাতালে গেল, সেটাও আলাদা কথা। ওই যেটুকু তিনি দেখলেন, মাত্র সেইটুকুই বলতে পারলেন।"

অবাক হয়ে তারাপদ কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "উনি যা বলেন তা কি সত্যি হয়?"

"হতে দেখেছি। শুনেছি।"

"এটা কেমন করে হয়?"

"তা বলতে পারব না। জানি না। কেমন করে হয় তা জানার জন্যেই তো কত লোক, পণ্ডিত-টণ্ডিত, দিনের পর দিন মাথা ঘামাচ্ছে। ওই যে তোমাদের প্যারা-সাইকোলজি বলে কথাটা আছে, এ-সব বোধ হয় তার মধ্যে পড়ে।"

তারাপদর অবাক ভাবটা তখনো ছিল, তবু খুঁতখুঁত গলায় বলল, "কেমন করে এটা হয় তার একটা যুক্তি দেবার চেষ্টাও তো থাকবে।"

সরু চুরুটটা ঠোঁটে চুঁইয়ে আবার নামিয়ে নিলেন কিকিরা। বললেন, "বুঝতে পারলে, ধরতে পারলে তবে না যুক্তি। এখন মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় সিক্সথ সেন্স।"

"সিক্সথ সেন্স?"

"মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা আমরা জানি। এটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, কিংবা বোধ। কেউ কেউ বলছেন, মানুষ যখন পশুর পর্যায়ে ছিল, আদিম ছিল, তখন তার মধ্যে একটা বোধ ছিল যার ফলে সে অজানা আপদ-বিপদ-ক্ষতি বুঝতে পারত। এখনো বহু পশুর মধ্যে সেটা দেখা যায়। মানুষ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যত সভ্য হয়েছে ততই তার আদিমকালের অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে, সেই হাজার-হাজার বছর আগেকার মানুষের কোনো দোষ বা গুণ কোটিতে এক আধজনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে থেকে গেছে। একে তুমি প্রকৃতির রহস্য বলতে পারো। এ ছাড়া আর কী বলা যায় বলো।"

তারাপদ বরাবরই খানিকটা নরম মনের ছেলে। সহজে কিছু উড়িয়ে দিতে পারে না। বিশ্বাস করুক না করুক অলৌকিক ব্যাপারে বেশ আগ্রহ বোধ করে। কিকিরার কথা তার ভাল লাগল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর তারাপদ বলল, "রামপ্রসাদবাবু কি আপনাকে বলেছেন, দীপনারায়ণের সন্দেহ সত্যি?"

"তিনি সত্যি মিথ্যে কিছু বলেননি। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে থেকেও তিনি কিছু দেখতে পাননি রাজবাড়ির। কাজেই এমনও হতে পারে দীপনারায়ণের সন্দেহ মিথ্যে। বা

এমনও হতে পারে সত্যি। রামপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে আমরা কোনো রকম সাহায্য এখানে পাচ্ছি না, তারাপদ। কিন্তু আমি ওঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করি। উনি যখন দীপনারায়ণের ব্যাপারটা দেখতে বেললেন, আমি না বলতে পারিনি।”

তারাপদ যেন কিছু মনে করে হেসে বলল, “তা হলে ধাঁধার পেছনে ছুটছি?”

“তা বলতে পারো।”

“ওহো, একটা কথা কাল আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি। রাত্রে আমার মনে পড়ল। দীপনারায়ণদের যে ছোরার বাঁটটা আপনি রেখেছেন, সেটার হাজার-হাজার টাকা দাম বললেন। অত দামি জিনিস আপনি নিজের কাছে রাখলেন কেন? দীপনারায়ণই বা কোন বিশ্বাসে আপনার কাছে রেখে। গেল?”

কিকিরা এবার মজার মুখ করে তারাপদকে দেখতে-দেখতে হেসে বললেন, “ওয়াটসনসাহেব, এবার তোমার বুদ্ধি খুলেছে। সত্যি ব্যাপারটা কী, জানো? ছোরার যে বাঁটটা তোমরা দেখেছ, ওটা নফল, ইমিটেশান। আসলটা রাজবাড়িতে রয়েছে। সিন্দুকের মধ্যেই।”

তারাপদ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

খানিক পরে আবার বললেন, “না, তোমার সঙ্গে মজা করলাম। ওটা আসলই। ও জিনিসের কি নকল হয়। উনি আমায় বিশ্বাস না করলে রাজবাড়িতে নিয়ে যাবেন কেন! যাকগে, যাঁর জিনিস তাঁকে ফেরত দিয়ে এসেছি।”

০৩.

তারাপদ চিরটাকাল কলকাতায় কাটিয়েছে। একেবারে ছেলেবেলায় অবোধ বয়সে মা বাবার সঙ্গে কবে এক-আধবার দেশের বাড়িতে গেছে, কবে কলেজ-টলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে দলে ভিড়ে ব্যান্ডেল চার্চ কিংবা বিষ্ণুপুর বেড়াতে গেছে, সেসব কথা বাদ দিলে তার ঘোরা-ফেরার কোনো বালাই কোনকালে ছিল না। ভুজঙ্গভূষণকে দেখতে গিয়েছিল শংকরপুর, আর এবার এল কিকিরার সঙ্গে দীপনারায়ণের রাজত্বে। অবশ্য এখন রাজত্ব বলতে কিছুই নেই, রাজার দল প্রজা হয়ে গিয়েছে। রাজত্ব না থাক, পুরনো সম্পদ-সমৃদ্ধি তো খানিকটা থাকবেই। আর লোকের মুখে রাজা নামটা অত সহজে কি যায়।

রাত্রে হাওড়া ছেড়েছিল যে গাড়িটা, পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ তারাপদদের এক স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। তারাপদর কাছে সবই বিস্ময়! কলকাতায় বাস, ট্রাম, কর্পোরেশানের ময়লা ফেলা গাড়ি, ঠেলা, রিকশা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কলকাতা থেকে দশ পা বাইরে গেলেই হয় কলকারখানা, না হয় এঁদো পুকুর, বাঁশঝোঁপ, কচুরিপানা। এদিকে যে-মুহূর্তে এসে পড়ল তারাপদ, ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে জানলা দিয়ে দেখল–সব পালটে গেছে। মাঠের পর মাঠ, কোথাও নিচু, কোথাও বা উঁচু, হিমে কুয়াশায় সাদা চারপাশ, ঝোঁপঝাড়, বন, পাহাড়ি বা পাথুরে ঢল নেমেছে, বালিয়াড়ি। এ একেবারে আলাদা দৃশ্য। এমনি করেই সূর্য উঠে গেল, বেলা বাড়তে লাগল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, মাটির রঙ পালটে গিয়েছে। বনজঙ্গলের দৃশ্যগুলোও ঘনঘন চোখে পড়ছিল। পাহাড়ের মাথা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলেছে তো চলেইছে, ঢেউয়ের মতন উঁচুনিচু হয়ে।

তারাপদা যেখানে নামল, তাকে বড় ছোট কোনো স্টেশনই বলা যায় না। তবু রেলগাড়ি যেখানে থামে, কাঁকর-বিছানো স্টেশন পাওয়া যায় দেখতে, তাকে স্টেশন না বলে উপায় কী?

স্টেশনের গায়ের ওপরই যেন জঙ্গল হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তারাপদ গাছটাছ চেনে না, তবু তার মনে হল, নিশ্চয় শাল-সেগুন হবে।

স্টেশনের বাইরে জিপ ছিল। দীপনারায়ণ পাঠিয়েছেন।

কিকিরাকে কিছু বলতে হল না, তাঁদের দেখামাত্র জিপগাড়ির লোক এগিয়ে এল। কলকাতার লোক বুঝতে এদের বোধ হয় অসুবিধে হয় না। অন্য যারা পাঁচ-দশজন নেমেছিল–সবই স্থানীয়।

মালপত্র জিপে তুলে নিল যে, তার নাম বলল, দশরথ। বাঙালি। তার বাংলা উচ্চারণে মানভূম-সিংভূমের টান, তারাপদ যা জানে না, কিকিরাই বলে দিলেন।

জিপগাড়ির ড্রাইভারের নাম জোসেফ। মাথায় খাটো, বেঢপ প্যান্ট পরনে, গায়ে কালো সোয়েটার, গলায় মাফলার। মাথায় একটা নেপালি টুপি।

কিকিরা আর তারাপদ গাড়ির পেছনে, সামনে জোসেফ আর দশরথ। গাড়ি চলতে শুরু করল।

কিকিরা আলাপী লোক, দশরথ আর জোসেফের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। কে কতদিন আছে রাজবাড়িতে, কার কোথায় বাড়ি, জায়গাটা কেমন, এখানকার জঙ্গলে কোন্ কোন্

পশু দেখা যায়–এইরকম সব গল্প। দশরথরা দু পুরুষ রাজবাড়িতে কাজ করে কাটাচ্ছে, তার বাড়ি ঝাড়গ্রামে, দশরথের কাজ হল বাইরের লোকের তদারকি করা; যখন বাইরের লোকজন থাকে না, তখন তার প্রায় কোনো কাজই থাকে না সারাদিন; রাজবাড়ির বাগানের তদারকি করে দিন কাটে।

জোসেফ লোকটা ক্রিশ্চান। আগে কাজ করত চাঁইবাসায়। বছর দুয়েক হল রাজবাড়িতে এসে ঢুকেছে। আগে ট্রাক চালাত, পিঠের শিরদাঁড়ায় এক বেয়াড়া রোগ হল, ট্রাক চালানো ছেড়ে দিল জোসেফ। তার কোনো দেশ বাড়ি নেই, আত্মীয়স্বজন নেই।

তারাপদ কিকিরাদের কথাও শুনছিল, আবার চারপাশের বনজঙ্গল গাছপালা দেখছিল। মাইল চল্লিশ যেতে হবে জিপে। রাস্তা সরু, পিচ করা। এক-একটা জায়গায় যেন ঘন জঙ্গলের গা ছুঁয়ে চলে গেছে রাস্তাটা, কখনো কখনো পাহাড়তলি দিয়ে, মাঝে মাঝে ছোট-ছোট লোকালয় ভেসে উঠছে, পাঁচ সাতটা কুঁড়ে, আদিবাসী লোকজন চোখে পড়ছে, সামান্য কিছু খেত-খামার।

দেখতে-দেখতে জিপগাড়িটা কখন একেবারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বিশাল বিশাল গাছ, বড় বড় ফাটল, পাথর, ঝোঁপ, সূর্যের আলোও ভাল করে ঢুকতে পারছে না যেন।

তারাপদ কিকিরাকে বলল, "ভীষণ জঙ্গল। ডিপ ফরেস্ট।"

কিকিরা বললেন, "সরকারি জঙ্গল সব, বুঝল। এখন যত জঙ্গল সব রিজার্ভ ফরেস্ট হয়ে গিয়েছে।" বলে তিনি দশরথকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই জঙ্গলের নাম কী দশরথ!"

"আজ্ঞে, আমরা বেরার জঙ্গল ডাকি," দশরথ বলল, "বিশাল জঙ্গল উত্তরে।"

বেরার জঙ্গলের মধ্যে অবশ্য জিপ ঢুকল না। জঙ্গলের পাশ দিয়ে আরও পূবের দিকে এগিয়ে চলল।।

যেতে যেতে এক জায়গায় গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। জোসেফ ইশারা করে তার ডান দিকটা দেখাল। জোসেল বলল, "সাপ।"

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে কিকিরা আর তারাপদ দেখলেন একটা বিশাল সাপ রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে। একেবারে স্থির। যেন মরে পড়ে রয়েছে।

এত বড় সাপ তারাপদ জীবনে দেখেনি। সাপটা দেখতে-দেখতে হঠাৎ তার গা কেমন গুলিয়ে উঠল।

শীতকালে সাপ বড় একটা বেরোয় না বলে শুনেছিলেন কিকিরা, কিন্তু এ যে মস্ত সাপ।

জোসেফ জিপ নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকল। সাপটা রাস্তা ছেড়ে সরে না গেলে সে গাড়ি নিয়ে এগুতে পারবে না।

দশরথ গাড়ি থেকে নেমে পাথর কুড়িয়ে সাপের দিকে ছুঁড়তে লাগল, যাতে সাপটা রাস্তা ছেড়ে চলে যায়। তারাপদর এতই গা ঘিনঘিন করছিল যে, বমি চেপে সে বসে থাকল কোনোরকমে।

কিকিরা আস্তে গলায় বললেন, "সর্পযাত্রা ভাল না মন্দ, তারাপদ?"

তারাপদ কিছু বলল না।

.

রাজবাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুরই হয়ে গেল প্রায়।

তারাপদ কল্পনাই করেনি এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা রাজবাড়ি থাকতে পারে। চোখের সামনে যেন ভোজবাজির মতন এক বিশাল ইমারত ভেসে উঠল। বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা রাজবাড়ির কম্পাউন্ড। বিশাল ফটক। মূল রাজবাড়িটা সামনে, দোতলা বিশাল বাড়ি, সেকেলে দোতলা, মানে আজকালকার বাড়ির প্রায় চারতলার কাছাকাছি উঁচু। কলকাতার অনেক পুরনো বনেদি বাড়ির এই রকম ধাঁচ দেখেছে তারাপদ, একটানা বারান্দা, আর ঘর। মাথার দিকে আর্চ করা। মোটা মোটা গোল থাম। মূল রাজবাড়ির মুখেও লোহার ফটক।

রাজবাড়ির মুখোমুখি, খানিকটা তফাতে গেস্ট হাউস। একতলা বাড়ি। উঁচু পাঁচিল দিয়ে কম করেও বিঘে দশ পনেরো জমি ঘেরা। ফুলের বাগান, পাখিঘর, একদিকে ছোট মতন এক বাঁধানো পুকুর। মন্দিরের মতনও কিছু একটা দেখা যাচ্ছে পশ্চিমে।

দশরথ জিনিসপত্র নামাতে লাগল। জোসেফ গেল জল খেতে। এ

তারাপদ চারদিকে তাকাতে-তাকাতে বলল, "এই জঙ্গলের মধ্যে এমন বাড়ি, ভাবাই যায় না।"

কিকিরা বললেন, "একসময়ে করেছিল, এখন আর ধরে রাখতে পারছে না। দেখছ না, চারিদিকে কেমন পড়তি চেহারা। রাজবাড়ির গায়ে ছোপ ধরে গেছে, শ্যাওলা জমেছে, বাগানে ফুলের চেয়ে আগাছাই বেশি। ওদিকে তাকিয়ে দেখো, রাজবাড়ির মাঠে কিছু চাষবাস হচ্ছে। দীপনারায়ণ বলেছিলেন, লাখ পাঁচেক টাকা ধার ঝুলছে মাথার ওপর। দেখছি, সত্যিই তাই।"

কিকিরা খেয়াল করেননি, তারাপদও নয়, হঠাৎ পেছন থেকে কার যেন গলা শোনা গেল। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন কিকিরা। তাকিয়ে অবাক হলেন। যাত্রাদলের শকুনির মতন চেহারা, রোগা লিকলিকে শরীর, মাথার চুল সাদা, পাটের মতন রঙ, তাও আবার বাবরি করা, গর্তে ঢোকা চোখ, ধূর্ত দৃষ্টি, পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়া আর চাদর। খুব বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করে সেই শকুনির মতন লোকটা বলল, "আমার নাম শশধর সিংহ। রাজবাড়ির কর্মচারী। আসুন আপনারা, বিশ্রাম স্নান সেরে খাওয়া-দাওয়া করুন। আপনাদেরই অপেক্ষা করছিলাম। আসুন।"

রাজবাড়ির অতিথিশালা; ব্যবস্থা সবই রয়েছে–খাট, বিছানা, আয়না, ড্রয়ার, যা যা প্রয়োজন। এক সময় ঘরের শোভা ছিল, ঝকমকে ভাব ছিল বোঝ যায়–এখন সেই শোভার অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। তবু যা আছে–তেমন পেলেই তারাপদর মতন মানুষরা বর্তে যায়।

পাশাপাশি দুটো ঘর ব্যবস্থা করা ছিল কিকিরাদের। স্নান-টানের ঘর সামনেই, শোবার ঘরের গায়ে-গায়ে। খাবার ব্যবস্থা খাবার ঘরে।

শশধর ছিল না। কিকিরা এক সময়ে তারাপদকে বললেন, "কেমন লাগছে শশককে?"

“শশক? কে শশক?”

“ওই শশধরকে?”

তারাপদ বলল, “সুবিধের লাগছে না।”

“ওর বাঁ হাতে ছ’টা আঙুল লক্ষ করেছ?”

“না।” তারাপদ অবাক হয়ে বলল।

“লক্ষ করো। যতটা পারবে লক্ষ করবে।...বাঁ হাতের আঙুল ছ’টা; কানের লতিতে ফুটো, বোধ হয় এক সময় মাকড়ি পরত।”

“পুরুষমানুষ মাকড়ি পরবে কেন?”

“অনেক জায়গায় পুরুষমানুষও মাকড়ি পরে। এদের বোধ হয় রাজবংশের ব্যাপার– পারিবারিকভাবে পরতে হত আগে, এখন ছেড়ে দিয়েছে “

“শশধর কি রাজবংশের লোক?”

“পদবী সিংহ বলল, সিং সিংহ হতে পারে। রাজবংশের সরাসরি কেউ নয় হয়ত-তবে সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। যাক গে, নাও; আর দেরি করো না। স্নানটান করে নাও। খিদে পেয়ে গেছে বড়।”

স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে কিকিরা আর তারাপদ যে-যার ঘরে শুয়ে পড়লেন। তখন শীতের দুপুর ফুরিয়ে আসছে।

অবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় গড়ানো মানেই ঘুম। তার ওপর কাল ট্রেনে রাত কেটেছে। কিকিরা যখন তারাপদকে ডাকলেন তখন শীতের বিকেল বলে কিছু নেই, ঝাপসা অন্ধকার নেমে এসেছে।

মুখে চোখে জল দিয়ে চা খেল তারাপদ কিকিরার সঙ্গে। তারপর অতিথিশালার বাইরে এসে পায়চারি করতে লাগল। সন্ধের আগেই শীতের বহরটা বোঝা যাচ্ছিল, রাত্রে যে কতটা ঠাণ্ডা পড়বে তারাপদ কল্পনা করতে পারল না।

এমন সময় শশধর আবার হাজির। পোশাক-আশাক খানিকটা অন্যরকম। লম্বা কোতার ওপর জ্যাকেট, তার ওপর চাদর। পায়ে ক্যানভাস জুতো।

শশধর সদালাপী মানুষের মতন হাসল, বিনয় করে জিজ্ঞেস করল, কোথাও কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না! তারপরে বলল, “দু বার এসে ফিরে গিয়েছি, আপনারা ঘুমোচ্ছিলেন। রাজাসাহেব বলেছেন, আপনারা জেগে উঠলে তাঁকে খবর দিতে।”

কিকিরা চুরুট টানতে-টানতে বললেন, “খবর দিন।”

“উনি নিচেই আছেন, দেখা করতে চাইলে চলুন।”

“অপেক্ষা করছেন?”

“না, অপেক্ষা করছেন না; শরীর ঠিক রাখার জন্য এ-সময় তিনি ভেতরের লনে একটু টেনিস খেলেন।”

“বাঃ বাঃ! কার সঙ্গে খেলেন?”

“ছেলের সঙ্গে।”

“আচ্ছা–আচ্ছা। তা চলুন দেখা করে আসি। এখন রাজাসাহেব নিশ্চয় বিশ্রাম করছেন?”

“আসুন।”

শশধরের সঙ্গে কয়েক পা মাত্র এগিয়েই কিকিরা বললেন, “ওহে, একটু দাঁড়ান শশধর, আমি আসছি।” বলেই কিকিরা অতিথিশালার দিকে চলে গেলেন।

শশধর কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর তারাপদর দিকে তাকিয়ে বলল, “ওঁর নামটা যেন কী বলেছিলেন তখন–?”

“কিঙ্করকিশোর রায়।”

“আপনার?”

নাম বলল তারাপদ।

শশধর বললেন, “বইপত্রের ব্যবসা করেন আপনারা?”

“ওল্ড বুকস্ অ্যান্ড পিকচার্স।” তারাপদ মেজাজের সঙ্গে বলল।

“দোকানটা কোথায় মশাই?”

তারাপদ ঘাবড়ে গেল। এরকম একটা আচমকা প্রশ্ন সে আশাই করেনি। কিন্তু যার দোকান রয়েছে সে দোকানের ঠিকানা বলতে পারবে না–এ কেমন কথা? তারাপদ ধরা পড়ে যেতে যেতে কোনোরকমে সামলে নিয়ে কিকিরার বাড়ির ঠিকানা বলল। নিজের ঠিকানাটাই বলত–শেষ সময়ে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়–গঙ্গাচরণ মিত্তির লেন বললেই কেলেঙ্কারি হত; দোকানের ঠিকানায় লেন-টেন’ মানে গলিখুঁজি থাকলেই ইজ্জত চলে যেত।

“জায়গাটা কোথায়?” শশধর জিজ্ঞেস করল ছোট ছোট চোখ করে।”

“পার্কসার্কাস।”

“আপনার দোকান? না ওই ভদ্রলোকের?”

“ওঁর। আমি কাজ করি।”

শশধর পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল। চতুর চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, “আপনার মনিব লোকটি ভালই, কর্মচারীকে আদর-যত্ন করে দেখছি।”

তারাপদ বুঝতে পারল গোলমেলে ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। শশধর ধূর্ত, তাকে ধাপ্পা দিয়ে পার

পাওয়া সহজ নয়। কথা ঘোরাবার জন্যে সে বলল, “জায়গাটা বেশ ভাল। এদিকে কতদিন শীত থাকে?”

“থাকবে। আরও মাসখানেক।”

কিকিরা আসছিলেন। তারাপদ কিকিরাকে দেখতে পেয়ে যেন বেঁচে গেল।

কাছে এসে কিকিরা বললেন, “সিংহীমশাই, অপনাদের গেস্টরুমের দরজাগুলো কোন্ কাঠের?”।

শশধর ঠিক বুঝতে পারল না। “আজ্ঞে?”

“শাল না সেগুন কোন্ কাঠের বলুন তো?”

“শাল কাঠের। আপনি দরজা দেখতে গিয়েছিলেন?”

“দরজা দেখতে কি কেউ যায়, মশাই? গিয়েছিলুম চশমা আনতে। আমি আবার রাতকানা— নাইট ব্লাইন্ড। সন্ধে হলে কি আমি অন্ধ হয়ে গেলুম একরকম।” বলে কিকিরা হাতে রাখা চশমার খাপ দেখালেন।

শশধর বলল, “এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। দেখছেন কেমন করে?”

“কই আর দেখছি! ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। আপনাকে ভাসা ভাসা দেখতে পাচ্ছি। এইবার চশমাটা পরব।”

কিকিরা খাপ খুলে একটা নিকেল ফ্রেমের চশমা বের করে পরতে লাগলেন। তারাপদ কোনোদিন কিকিব্রাকে চশমা পরতে দেখেনি। বুঝতে পারল না কোন মতলবে কিকিরা ঘরে গিয়েছিলেন, কেনই বা চশমা নিয়ে ফিরলেন।

তিনজনেই হাঁটতে লাগল আবার। হঠাৎ কোথা থেকে যেন কুকুরের ডাক শোনা গেল। সাধারণ ডাক নয়, গর্জনের মতন। রাজবাড়ির দিক থেকে প্রথমে একটা পরে যেন একদল কুকুরের ভয়ংকর ডাক শোনা যেতে লাগল। তারাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শশধর বিনীতভাবেই বলল, “ইন্দরবাবুর কুকুর। ভয় নেই।”

.

০৪.

কিকিরাদের দীপনারায়ণের কাছে পৌঁছে দিয়ে শশধর চলে গেল।

রাজবাড়ির নিচের তলায় একসারি ঘরের মধ্যে তারাপদরা যে-ঘরটায় এসে বসল সেটা ঠিক বসার ঘর নয়, বসা এবং অফিস করা–দুই যেন চলতে পারে। বেশ বড় মাপের ঘর, মস্ত মস্ত দরজা জানলা মেঝেতে কার্পেট পাতা, আসবাবপত্র সাবেকি এবং ভারী ধরনের। রাজবাড়িতে ইলেকট্রিক নেই, ডিজ ল্যাম্প, পেট্রমাক্স, হ্যাঁজাক-এইসব জ্বলে।

দীপনারায়ণ বসতে বললেন কিকিরাদের।

কিকিরা ঘরের চারদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বসলেন। তারাপদ বোকার মতন দাঁড়িয়েছিল, কিকিরাকে বসতে দেখে বসে পড়ল।

দীপনারায়ণ বললেন, "গাড়িতে আপনাদের কোনো কষ্ট হয়নি তো?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "না, আরামেই এসেছি। জিপ গাড়িতে খানিকটা সময় লাগল।"

"অনেকটা দূর। জঙ্গলের রাস্তা।"

তারাপদ নজর করে দীপনারায়ণকে দেখছিল। কলকাতায় সেদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যে যাকে দেখেছিল–সেই মানুষই সামনে বসে আছেন–তবু আজ অন্যরকম লাগছে। দীপনারায়ণ সুপুরুষ, গায়ের রঙ উজ্জ্বল, চোখমুখ পরিষ্কার, সুশ্রী, মাথার চুল পাতলা, শরীর স্বাস্থ্য দেখলে মনে হয় চল্লিশের বেশি বয়েস। অথচ কিকিরা বলেছেন, দীপনারায়ণের বয়েস পঞ্চাশ। দেখতে ভাল লাগে মানুষটিকে। ভদ্র, নিরহঙ্কার ব্যবহার।

দীপনারায়ণ কিকিরার সঙ্গে আরও দু-একটা কী যেন সাধারণ কথা বললেন, তারাপদ খেয়াল করে শুনল না।

কলকাতায় ঠাকুর বিসর্জন কিংবা মারোয়াড়ি বিয়ে-টিয়েতে তাসা পার্টি সঙ্গে যেমন গ্যাস বাতি নিয়ে আলোর মিছিলদাররা চলে তাদের হাতে থাকে বাহারি বাতি–সেই রকম একটা বাতি ঘরের একপাশে জ্বলছিল। আজকাল এরকম বাতি কলকাতাতেও কম দেখা যায়, আগে যেত। কার্বাইডের আলো, কিন্তু অন্য ধাঁচের; চারদিক থেকে চারটে সরু সরু নল বেরিয়ে চারদিক ঘিরে রেখেছে, মুখ খোলা কাচের শেড, আলোর শিখা যেন কাচে না লাগে। মাত্র দুটি নলের মুখে শিখা জ্বলছিল, অন্য দুটো নেবানো। শিখাও কমানো রয়েছে। ঘরে কার্বাইডের সামান্য গন্ধ।

দীপনারায়ণ বললেন, "এবার কাজের কথা হোক, কিংকরবাবু?"

"বলুন।"

"আমি আপনাদের কথা বলে রেখেছি। তিনজনের কথাই। দুজনে এসেছেন।"

"আর একজন পরশু নাগাদ আসবে।"

"আমারও তাই বলা আছে।...আমি বলেছি, আপনারা এই রাজবাড়ির লাইব্রেরির ছবি আর

বইয়ের ভ্যালুয়েশান করতে আসছেন। যদি দর-দস্তুরে পোষায় আপনারা কিছু কিনতে পারেন। নয়ত কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনারা পার্টি জোগাড় করবেন, বিক্রি বাটা হয়ে গেলে কমিশন পাবেন। ভ্যালুয়েশান করার জন্যে ভ্যালুয়ার হিসেবে আপনারা রাজবাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকবেন, আর কাজ শেষ হয়ে গেলে দু হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাবেন। ...বোধ হয় ঠিক বলেছি, কী বলেন?"

কিকিরা বললেন, "ঠিকই বলেছেন।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "শশধরবাবু আমায় কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।"

দীপনারায়ণ তারাপদর দিকে তাকালেন, কিকিরাও।

একটু আগে যে-সব কথা হয়েছে শশধরের সঙ্গে, তারাপদ তা বলল।

কিকিরা বললেন, "যা বলেছ ঠিকই বলেছ। আবার কিছু জিজ্ঞেস করলে বলো, হিসেব তৈরি করা চিঠি লেখা এইসব কাজগুলো তুমিই করো, আমি ও-সব করতে পারি না।"

ঘাড় নাড়ল তারাপদ।

কিকিরা দীপনারায়ণকে বললেন, "আমায় ক'টা কথা বলতে হবে দীপনারায়ণবাবু।"

"বলুন।"

"তার আগে আরও একটা কথা আছে। কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে রাজবাড়ির ছবি বই–এ-সব কেন আপনি বেচে দিতে চাইছেন তার জবাব কী হবে?"

দীপনারায়ণ তাঁর সিগারেটের কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে কেসটা কিকিরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

কিকিরা সিগারেট নিলেন না।

দীপনারায়ণ সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, "কেউ জিজ্ঞেস করবে না। বিক্রি করার অধিকার আমার আছে। তবু যদি জিজ্ঞেস করে, তার জবাব আমার তৈরি আছে।"

"সেটা জানতে পারি?"

"পারেন। পুরনো ছবি কিংবা বই আমি বুঝি না। আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। জয়নারায়ণ কিছু কিছু বুঝত। তার ভালও লাগত। জয়নারায়ণ ছাড়া লাইব্রেরি ঘরে এবাড়ির কেউ পা দিত না। সে যখন নেই, লাইব্রেরি সাজিয়ে রাখা অকারণ।" দীপনারায়ণ একটু থেমে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন–দরজার দিকে পরদা নড়ে উঠল। তিনি চুপ করে গেলেন।

মাঝবয়সী একটা লোক এসে কফি দিয়ে গেল।

লোকটা চলে যেতে দীপনারায়ণ বললেন, "জয় নেই এটা একটা কারণ। আর অন্য কারণ হল, আমাদের অবস্থা। আপনাকে আমি আগেই কলকাতায় বলেছি–আমাদের অবস্থা পড়ে গেছে, জমি-জায়গা হাতছাড়া হয়েছে আগেই, জঙ্গল-টঙ্গল এখন সরকারি সম্পত্তি, আমাদের একটা ক্লে মাইন ছিল–সেটা নানা ঝামেলায় বেচে দিতে হয়েছে লাখ পাঁচেক টাকা

ধার। মামলা মোকদ্দমায় বছরে হাজার দশ পনেরো টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে এখনো।“

তারাপদ বেশ অবাক হচ্ছিল। রাজরজাড়া মানুষ–তারও টাকা-টাকা চিন্তা। তা হলে আর তারাপদ কোন দোষ করল। দীপনারায়ণ মানুষটিকে ভালই লাগছিল তারাপদর, কেমন খোলামেলাভাবে সব কথা বলে যাচ্ছেন।

কফি নিতে বললেন দীপনারায়ণ।

কিকিরা কাপে চিনি মেটাতে মেশাতে বললেন, “এবার আমায় অন্য কয়েকটা কথা বলুন।”

দীপনারায়ণ জবাব দেবার জন্যে তাকিয়ে থাকলেন।

“রাজবাড়িতে কে কে থাকেন? মানে আপনাদের পরিবারের?”

“আমাদের এই বাড়ির তিনটে মহল। কাকার, আমার আর জয়নারায়ণের।”

“মহলগুলো কেমন একটু বলবেন?”

“কাকা থাকেন পুবের মহলে, জয় থাকত মাঝ-মহলে, আর আমি পশ্চিম মহলে... ।”

“নিচের মহলে কারা থাকে?”

দীপনারায়ণ কালো কফিতে চিনি মিশিয়ে কাপটা তুলে দিলেন।”নিচের মহলের এই সামনের দিকটা আমাদের অফিস কাছারি, বাইরের লোকজন এলে বসাটসা, লাইব্রেরির জন্যে রাখা আছে। বাবার আমল থেকেই। ভেতর দিকে আমরা সকলেই ওপর আর নিচের মহল যে যার অংশ মতন ব্যবহার করি। শুধু নিচের একটা দিক রাজবাড়িতে যারা কাজ করে তাদের থাকার জন্যে।”

কফি খেতে খেতে কিকিরা বললেন, “আপনার কাকা কি একা থাকেন?”

“না। কাকিমা জীবিত রয়েছেন। কাকার প্রথমা স্ত্রীর ছেলে আমার খুড়তুতো ভাই এখানে থাকে না। সে আসামে থাকে। ডাক্তার। দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি মেয়ে। সে বোবাহাবা। সে এখানেই থাকে। তার বিয়ে হয়নি। কাকিমার এক ছোট ভাই, সেও থাকে কাকার কাছে।”

“ছোট ভাইয়ের নাম?”

“ইন্দর।”

“কী করে?”

“কিছু করে না। ভাল শিকারি। খায় দায় ঘুমোয় আর কুকুর পোষে।”

“কুকুর পোষে?”

“কুকুরের শখ ওর। পাঁচ-সাতটা কুকুর এনে রেখেছে। একেবারে জংলি। চেহারা দেখলে ভয় করে। বুনো কুকুর, অ্যালসেশিয়ান কিংবা টেরিয়ারের চেয়ে কম নয়।”

তারাপদ ভয়ে ভয়ে বলল, "খানিকটা আগে আমরা কুকুরের ডাক শুনেছি।"

"ইন্দরের একটা কুকুর-ঘর আছে। কুকুরদের মাঝে মাঝে হান্টার কষায়। বলে ট্রেনিং দিচ্ছে।"

কিকিরা কুকুরের কথা কানেই তুললেন না যেন, বললেন, "আপনার পরিবারের কে কে আছেন দীপনারায়ণবাবু?"

দীপনারায়ণ সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "আমার মা শয্যাশায়ী, পঙ্গু। স্ত্রী মারা গেছেন। বড় ছেলে দেরাদুন মিলিটারি কলেজে। ছোট ছেলে সিবাস্টিন কলেজে পড়ে, মাদ্রাজের কাছে। এখন সে ছুটিতে। এখানেই রয়েছে।"

"জয়নারায়ণবাবুর কে কে আছেন?" কিকিরা জিজ্ঞেস করল।

"জয়ের স্ত্রী রয়েছেন। একটি ছোট মেয়ে, বছর চার বয়েস। এখন এঁরা নেই, ভুবনেশ্বর গিয়েছেন।"

কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে কিকিরা যেন কিছুক্ষণ কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "শশধর কি আপনাদের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়?"

"না", মাথা নাড়লেন দীপনারায়ণ, "এ বাড়িতে পঁচিশ ত্রিশ বছর রয়েছে। বাবার আমলের কর্মচারী। অনুগত।"

"এই লোকটাকে আপনার সন্দেহ হয় না?"

দীপনারায়ণ তাকালেন কিকিরার দিকে। সামান্য পরে বললেন, "এত দুঃসাহস ওর হবে? শুনেছি, বাবা ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।"

"কেন?"

"আমি জানি না।"

"ইন্দর লোকটাকে আপনি সন্দেহ করেন?"

"করি। ও একটা জন্তু। অথচ জয় ওকে পছন্দ করত। বন্ধুই ছিল জয়ের।"

কিকিরা আবার চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "দীপনারায়ণবাবু, আপনি কি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করেন, আপনাদের রাজবাড়িতে যে ছোরাটা ছিল তার কোনো জাদু আছে?"

দীপনারায়ণ বললেন, "করি। হয়ত এটা আমাদের সংস্কার। বিশ্বাস। কোনো প্রমাণ তো দেখাতে পারব না কিংকরবাবু!"

কিকিরা আর কিছু বললেন না।

.

০৫.

তিন চারটে দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। চন্দনও এসে পড়েছে। তারাপদরা যেভাবে এসেছিল সেই ভাবেই। জিপ গিয়েছিল চন্দনকে আনতে, সঙ্গে ছিল তারাপদ। দশরথ আর জোসেফের সামনে দুই বন্ধু কেউই মুখ খোলেনি, অন্য পাঁচ রকম গল্প করেছিল, কখনো কখনো সাঁটে কথা বলছিল।

চন্দন বুঝতে পারল, কিকিরা কোনো দিকেই এগুতে পারেননি.; লাইব্রেরি ঘরে বসে বসে দিন কাটাচ্ছেন আর চুরুট যুঁকছেন, কাগজ-পেনসিল নিয়ে অকারণে লিস্টি করছেন। চন্দন মনে মনে একটু যেন খুশিই হল, কিকিরা এবার জব্দ হয়েছেন। বললে শোনেন না, কোথাকার কোন্ দীপনারায়ণ গিয়ে এক গাঁজা ছাড়ল, আর এক অন্তর্যামী রামপ্রসাদ কী বলল-কিকিরা অমনি নাচতে নাচতে ছুটে এলেন এবয়সে এ-সব পাগলামি করলে কি চলে!

এ-সব দিকে চন্দনও আগে আসেনি। বেড়াতে আসার পক্ষে জায়গাটা নিঃসন্দেহে ভাল। তবে কখনো কখনো ঘন জঙ্গল দেখে তার মনে হচ্ছিল, সিনেমার ছবিতে আফ্রিকার জঙ্গল বলেও এটা চালিয়ে দেওয়া যায়।

.

গেস্ট হাউসে পৌঁছে কিকিরার সঙ্গে দেখা হল। বললেন, "এসো এসো স্যান্ডাল উড, তোমার জন্যেই হাঁ করে বসে আছি।"

চন্দনহেসে বললে, "শুনলাম তাই তারার কাছে, বসে আছেন, উঠে দাঁড়াতে পারছেন না।"

"এখনো পারিনি।"

"পারবেন বলে মনে হয়?"

"দেখা যাক। তুমি আমার জিনিস এনেছ?"

"এনেছি।" বলে চন্দন চোখের ইশারায় তারাপদকে দেখাল, বলল, "তারা জানে?"

"না।"

চন্দন বলল, "সে কী? তারা জানে না?" তারাপদর দিকে তাকাল চন্দন। "কিকিরা আমায় খানিকটা কুকুর-বিষ আনতে বলেছিলেন–জানিস। সিক্রেট মেসেজ। খামের ওপর ছোট্ট করে লিখেছেন–ব্রিং ডগ পয়জন তার ওপর স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছেন। কার বাবার সাধ্যি ধরে। স্ট্যাম্প না তুললে দেখা যাবে না।"

তারাপদর মনে পড়ল, হাওড়া স্টেশন ছাড়ার আগে কিকিরা চন্দনকে এই ম্যাজিকটা বলে দিচ্ছিলেন। বলেছিলেন, চিঠি মতন কাজ করা, কোনো স্পেশ্যাল মেসেজ থাকলে ওই কায়দায় জানাব।

তারাপদ কিকিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, বুঝতে পারল না কুকুর-বিষ কী কাজে লাগবে। কুকুর মারবেন নাকি কিকিরা? কিকিরাও কিছু বললেন না।

স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে চন্দন এসে তারাপদর ঘরে শুয়ে পড়ল। চন্দনের জন্যে একটা বাড়তি খাট তারাপদর ঘরে ঢোকানো হয়েছে। আলাদা ঘর অবশ্য ছিল কিন্তু চাকরবাকরকে বলে কয়ে একই ঘরে দু জনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় শুয়ে চন্দন বলল, "বল, এবার তোদের গোয়েন্দাগিরি শুনি।"

তারাপদ রাজবাড়ির একটা বর্ণনা ও বিবরণ দিল। কারা থাকে, কে কী করে, কার কার ওপর আলাদা করে নজর রাখার চেষ্টা করছেন কিকিরা, সে-সব বৃত্তান্তও বলল। শেষে তারাপদ হতাশ গলায় বলল,"আমাদের কী কাজ হয়েছে জানিস এখন?"

"কী?"

"সকাল বেলায় চা-টা খেয়ে এক দিস্তে কাগজ, এক বান্ডিল পুরনো ক্যাটালগ, গোটা তিনেক ছোট বড় ম্যাগনিফায়িং গ্লাস, কার্বন পেপার, পেনসিল নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢোকা। বেলা বারোটা পর্যন্ত ওই ঘরে বসে থাকতে হয়। স্নান খাওয়া-দাওয়ার জন্যে ঘণ্টা দেড়েক ছুটি। আবার যাই, সারাটা দুপুর কাটিয়ে ফিরি।"

"করিস কী?"

"ঘোড়ার ডিম। বইয়ের নাম লিখি সাদা কাগজে। মাঝে মাঝে পাতা ওলটাই। বই ঘাঁটি।"

"কিকিরা কী করেন?"

"বায়নাকুলার চোখে দিয়ে এ-জানালা সে-জানালা করে বেড়ান মাঝে মাঝে। আর মস্ত-মস্ত ছবিগুলো দেখেন কখনো-সখনো চুরুট ফোঁকেন। খেয়াল হলে বই দেখেন।"

"তার মানে—তোরা বসে বসে ভেরাণ্ডা ভাজছিস?"

"পুরোপুরি!..তবে একটা কথা সত্যি চাঁদু, টাকা থাকলে বড়লোকদের শখ যে কেমন হয়—তুই রাজবাড়ির লাইব্রেরি দেখলে বুঝতে পারবি। এক-একটা ছবি আছে—দেখলে মনে হবে দেওয়ালসাইজের, এত বড়। বইয়ের কথাই বা কী বলব! গাদা গাদা বই নানা ধরনের, অর্ধেক বইয়ের পাতাও কেউ ছোঁয়নি। শুধু শখ করে মানুষ এত টাকা খরচ করে তুই না দেখলে বিশ্বাস করবি না।"

চন্দনের ঘুম আসছিল। জড়ানো চোখে আলস্যের গলায় বলল, "দুর—তোরা ফালতু এসেছিস। একটা অ্যাডভেঞ্চার গোছের কিছু হলেও বুঝতাম।"

তারাপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমাদের ওপর এরা চোখ রেখেছে।"

"কাবা?"

"শশধররা। প্রথম দিন আমরা যখন দীপনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে যাই—আমাদের ঘরে কেউ ঢুকেছিল। কিকিরার মনে সন্দেহ হয়, আমরা যখন থাকব না—কেউ ঘরে ঢুকতে পারে। তিনি দরজা বন্ধ করার পর কতকগুলো দেশলাইকাঠি চৌকাঠে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দরজা খুলে ঢুকতে গেলেই পা লাগার কথা। দীপনারায়ণের কাছ থেকে ফিরে এসে আমরা দেখলাম, কাঠিগুলো ছড়িয়ে রয়েছে।" তারাপদর মনে পড়ল, কিকিরা চশমা আনার ছুতো করে সেদিন কেমন ভাবে কাঠি সাজিয়ে এসেছিলেন।

চন্দন ঘুম-ঘুম চোখে বলল, "আর কিছু নয়?"

তারাপদ বলল, "সন্ধের পর এখানে থাকা যায় না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। শীতও সেই রকম। যত রাত বাড়ে, হাত পা একেবারে জমে যায়। তার ওপর এখানে কত কী যে হয়, চাঁদ! এ একটা ভুতুড়ে জায়গা। পাঁচ সাতটা কুকুর রাত্তিরে মাঠের মধ্যে ছুটে বেড়ায়, একবার ডাকতে শুরু করল তো সে কী ডাক ভাই, বুক কেঁপে যায়। ইন্দর বলে একটা লোক আছে রাজবাড়িতে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গাল-ভরা দাড়ি, ছুরির মতন চোখ; সে আবার মাঝে মাঝে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সঙ্গে কুকুর। মোটরবাইক চালায় ঝড়ের মতন। একদিন তো আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল প্রায়।"

চন্দন কিছুই শুনছিল না। ঘুমিয়ে পড়েছিল।

.

দুপুরে কিকিরা লাইব্রেরিতে যাননি, তারাপদও নয়। বিকেলে চন্দনকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন কিকিরা, সঙ্গে তারাপদ। রাজবাড়ির চৌহদ্দিটাই ঘুরে দেখাচ্ছিলেন কিকিরা। সেটা কম নয়। উঁচু পাঁচিল দিয়ে চারপাশ ঘেরা। একটা মাত্র বড় ফটক। চারদিকে মস্ত মাঠ, বড় বড় গাছ সারি করে সাজানো, একপাশে ফুলবাগান, চৌকোনা বাঁধানো পুকুরটা পশ্চিমদিকে, তারই কাছাকাছি মন্দির। এ-সব হল মূল রাজবাড়ির বাইরে, মুখোমুখি। রাজবাড়িতে ঢোকার মুখে আবার এক মস্ত লোহার ফটক। অবশ্য রাজবাড়ির বাইরের দিকের ঘর, বারান্দা সবই দেখা যায়। বাইরের দিকটায় বাইরের মহল, রাজবাড়ির কাউকে বড় একটা দেখাও যায় না।

বেড়াতে বেড়াতে চন্দন নানারকম প্রশ্ন করছিল। কিকিরা জবাব দিচ্ছিলেন। তারাপদও কথা বলছিল। চন্দন বুঝতে পারছিল, এক সময়ে রাজবাড়ির শখ-শৌখিনতা কম ছিল না, অর্থব্যয়ও হত অজস্র। এখন পড়তি অবস্থা। যা আছে পড়ে রয়েছে; কারও কোনোদিকে চোখ নেই, অর্থও নেই। যদি অর্থ এবং শখ-শৌখিনতা থাকত, তবে জাল দিয়ে ঘেরা, গোল, অত বড় পাখি-ঘরটায় মাত্র একটা ময়ুর পঁচিশ-ত্রিশটা পাখি থাকত না, আরও অজস্র পাখি থাকতে পারত। অমন সুন্দর পুকুরের কী অবস্থা! পাথর দিয়ে বাঁধানো পুকুরের চারপাশের পথের কী বিশ্রী হাল হয়েছে। বাঁধানো পুকুর, কিন্তু তার জলের ওপর শ্যাওলা আর শালুক-পাতা, জল চোখেই পড়ে না প্রায়। মন্দিরটা অবশ্য কোনোরকমে চকচকে করে রাখা হয়েছে। সকালে পুরোহিত এসে পুজোটুজো করেন, সন্ধেবেলায় আরতি হয়, অন্য সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে।

চন্দনরা যখন পুকুরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আচমকা শশধরকে দেখা গেল। গোলমতন একটা লতাপাতা-ঘেরা জায়গার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল।

নজরে পড়েছিল কিকিরার। দাঁড়িয়ে পড়লেন।

শশধর এগিয়ে এল।

শশধর কাছে এলে কিকিরা বললেন, "এদিকে কোথায় সিংহীমশাই?"

শশধর বলল, "ওদিকে গিয়েছিলাম। যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেলে মেরামতের যা হাল হয়–" বলে শশধর অনেকটা দূরে রাখা একটা ছোট ট্রাকটর দেখাল।

চন্দনের সঙ্গে শশধরের আলাপ করিয়ে দিলেন কিকিরা।"তারাপদর বন্ধু। ওর সঙ্গে আপনার

আলাপ হয়নি।”

শশধর বলল, “দুপুরে আমি ছিলাম না। উনি আসছেন শুনেছিলাম।”

“ছেলেটি বড় কাজের সিংহীমশাই। বয়স কম, কিন্তু চোখ বড় পাকা। পুরনো জিনিস ঠাওর করা মুশকিল, আসল নকল বোঝা যায় না। চন্দন এসব ব্যাপারে পাকা লোক। ঠিক জিনিসটি ধরতে পারে। কলকাতার মিউজিয়ামে চাকরি করে করে চোখ পাকিয়ে ফেলেছে।”

শশধর ধূর্তের মতন বলল, “আপনার দলের লোক?”

কিকিরা ঘাড় নেড়ে হাসি মুখে বললেন, “ধরেছেন ঠিক।...আমার যখনই কোনো ব্যাপারে সন্দেহ হয়, ওকে ডেকে পাঠাই, সে ছবিই বলুন বা দু-একশো বছরের পুরনো কিছু জিনিস হলেই। আপনাদের রাজবাড়িতে কত যে জিনিস আছে সিংহীমশাই যার মূল্য আপনারাও বোঝেন না। চন্দনের আবার এসব ব্যাপারে বড় শখ। চোখে দেখলেও ওর শান্তি। বড় গুণী ছেলে ভাল কথা, আপনি কি কোনো দৈবচক্ষুর কথা শুনেছেন?”

“দৈবচক্ষু?”

“আছে। এই রাজবাড়িতেই আছে।” কিকিরা বললেন।

শশধর আর দাঁড়াল না। বলল, “উনি আছেন; পরে আলাপ করব। আমি যাই।”

শশধর চলে গেল। কিকিরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর চন্দনদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, “এই শশধরটাকে আমি প্রায়ই এই পুকুরের দিকটায় ঘোরাফেরা করতে দেখি! কী ব্যাপার বলো তো?”

চন্দন বলল, “সে তো আপনিই বলবেন!”

মাথা নেড়ে কিকিরা বললেন, “না, লোকটা মিছেমিছি এদিকে ঘুরে বেড়াবার পাত্র নয়। কিছু রহস্য আছে।” বলে কিকিরা চুপ করে গিয়ে কিছু যেন ভাবতে লাগলেন, চারদিক দেখতে লাগলেন তাকিয়ে-তাকিয়ে।

চন্দন বলল, “কিকিরা স্যার, আমার মনে হচ্ছে আপনিই বেশি রহস্যময়।”

“কেন?”

“আপনি এখানে বসে বসে যে কী করছেন আমি বুঝতে পারছি না। তারা বলছিল, আপনি রোজ সকালে এক দফা, আর দুপুরে এক দফা তারাকে সঙ্গে করে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে থাকেন। মাত্র দু বার দীপনারায়ণের সঙ্গে। আপমার দেখা হয়েছে এ পর্যন্ত।”

কিকিরা একবার তারাপদকে দেখে নিয়ে চন্দনকে বললেন, “লাইব্রেরিতে আমি বসে থাকি না চন্দন, বসে বসে দেখি-সব দেখি, অবজার্ভ করি। আমার একটা বায়নাকুলার আছে, তারাপদ তোমায় বলেনি?”

“বলেছে?”

"লাইব্রেরির পজিশনটা খুব ভাল। বড় বড় জানলা, স্কাই লাইট। দূরবীন চোখে লাগিয়ে বসে থাকলে ভেতর আর বাইরের অনেক কিছু দেখা যায়। শশধরটাকে আমি এদিকে ঘোরাফেরা করতে যে দেখেছি, সে তত ওই দূরবীন চোখে দিয়েই।"

"বেশ করেছেন দেখেছেন। কিন্তু শশধরকে দেখেই দিন কাটাচ্ছেন?"

"না", মাথা নাড়লেন কিকিরা, "ব্রেন শেক্ করছি?"

চন্দন হাঁ হয়ে গেল। "সেটা কী?"

"মগজ নাড়াচ্ছি", গম্ভীর মুখে কিকিরা বললেন।

চন্দন প্রথমটায় থমকে গেল, তার পর হো হো করে হেসে উঠল। তারাপদও।

হাসি থামিয়ে চন্দন বলল, "কিছু তলানি পেলেন, স্যার?"

"গট অ্যান্ড নো গাই।"

"তার মানে?"

"পাচ্ছি আবার পাচ্ছিও না। চলো, ঘরে ফিরি, তারপর বলব।"

তিনজন গেস্ট হাউসের দিকে ফিরতে লাগলেন। শীতের বিকেল বলে আর কিছু নেই, অন্ধকার হয়ে আসছিল। আকাশে দু একটা তারা ফুটতে শুরু করেছে। বাতাসও দিচ্ছিল ঠাণ্ডা।

গেস্ট হাউসের কাছাকাছি পৌঁছতে শব্দটা কানে গেল। রাজবাড়ির দিক থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে আসছে। মোটর বাইক। আলো পড়ল। ভটভট শব্দটা কানে গর্জনের মতন শোনাল। যেন ঝড়ের বেগে গাড়িটা রাস্তা ধরে সোজা বড় ফটকের দিকে চলে গেল।

হাত বিশেক দূর থেকে কিকিরা মানুষটিকে দেখতে পেলেন।

ইন্দরের পরনে প্যান্ট, গায়ে সেই চামড়ার কোট, গলা পর্যন্ত বন্ধ। মাথায় একটা টুপিকালো রঙেরই।

যাবার সময় ইন্দর একবার তাকাল। দেখল কিকিরাদের।

বড় ফটকের কাছে একটু দাঁড়াতে হল ইন্দরকে, বোধ হয় ফটক খোলার জন্য। তারপর বেরিয়ে গেল। তার মোটর বাইকের শব্দ বাতাসে ভেসে থাকল কিছুক্ষণ; শেষে মিলিয়ে গেল।

কিকিরা বললেন, "আজ হল কী? এক সময়ে দুই অবতার?"

চন্দন কিছু বুঝল না তারাপদও কথা বলল না।

হাঁটতে হাঁটতে কিকিরা বললেন, "ওই যে মানুষটিকে দেখলে চন্দন, ওর নাম ইন্দর। ও শুধু ভটভটি চালাতে পারে যে তা নয়, ওর অনেক গুণ। ঘোড়ায় চড়তে পারে, শিকার করতে

পারে, কুকুর পোষে–আবার সার্কাসের রিং মাস্টারদের মতন খেলাও দেখাতে পারে। তবে বাঘ-সিংহর নয়, কুকুরের। ও হল দীপনারায়ণের কাকা ললিতনারায়ণের শ্বশুরবাড়ির লোক। এখানেই থাকে। বছর দশেক ধরে আছে। জয়নারায়ণের চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও জয়নারায়ণের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। লোকটাকে দিনের বেলায় দেখলে তুমি বুঝতে পারবে।”

০৬.

কিকিরার ঘরে বাতি জ্বালা হয়ে গিয়েছিল। কেরোসিনের টেবিলবাতি, দেখতে কিন্তু সুন্দর, সাদা ঘষা কাচের শেড় পরানো, সরু মতন, চিমনিটা শেডের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। গেস্ট হাউসে ঠাকুর চাকর থাকে সব সময়। সন্ধেবেলায় চা দিয়ে গিয়েছে চাকরে।

ঘরের দরজাটা খোলাই রেখেছিলেন কিকিরা, তারাপদকে দরজার কাছাকাছি বসিয়ে রেখেছিলেন পাছে কেউ এসে আড়ি পাতে। মাঝে-মাঝে তারাপদকে দরজার বাইরে গিয়ে দেখে আসতে হচ্ছিল আশেপাশে কেউ ঘোরাঘুরি করছে কিনা!

কিকিরা তাঁর সরু চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, "সমস্ত ব্যাপারটা এবার একবার ভাল করে ভেবে দেখা যাক, কী বলো?"

চা খেতে খেতে মাথা হেলাল চন্দন।

কিকিরা বললেন, আস্তে গলায়, "সোজা কথাটা হচ্ছে এই মাসখানেক আগে জয়নারায়ণ রাজবাড়িতেই মারা গেছেন। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, সেটা দুর্ঘটনা; দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন জয়নারায়ণ। বাইরের লোক এই কথাটাই জানে। কিন্তু জয়নারায়ণের দাদা দীপনারায়ণের পরে সন্দেহ হয়েছে, তাঁর ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা নয়, কেউ তাকে খুন করেছে। তাই না?"

চন্দন আরাম করে চায়ে চুমুক দিল। দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

কিকিরা বললেন, "প্রশ্নটা হল, জয়নারায়ণকে কেউ খুন করেছে, নাকি তিনি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন? যে মারা গিয়েছে তাকে আমরা চোখে দেখিনি। মানুষ দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার পোস্ট মর্টেম হয়, ডাক্তারেরা অনেক কিছু বলতে পারে। এখানে কোনোটাই হয়নি। কাজেই কিছু জানার বা সন্দেহ করার প্রমাণ আমাদের নেই। তবু মানুষের মন মানতে চায় না; তার সন্দেহ বলল, ধোঁকা বলল, থেকে যায়। দীপনারায়ণের মনে একটা ঘোরতর সন্দেহ জন্মেছে, জয়নারায়ণকে কেউ খুন করেছিল।"

তারাপদ চন্দনের দেওয়া সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে একবার উঠল; দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল। কাউকে দেখতে পেল না। ফিরে এসে বসল।

কিকিরা চা খাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। বললেন, "দীপনারায়ণের সঙ্গে কথা বলে আমি দেখেছি, এরকম সন্দেহ হবার প্রথম কারণ রাজবাড়ির ওই ছোরা, যার নাকি একটা আশ্চর্য গুণ আছে। কী গুণ তা তোমরা শুনেছ। ওই ছোরা কাউকে অন্যায় কারণে খুন করলে ছোরা থেকে রক্তের দাগ কিছুতেই যায় না, তা ছাড়া দিন দিন ছোরাটা ভোঁতা আর ছোট হয়ে আসে।"

চন্দন সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, "গাঁজা।"

"গাঁজা না গুলি—সেটা পরে ভাবলেও চলবে", কিকিরা বললেন, "আপাতত ধরে নাও দীপনারায়ণ যা বলছেন সেটাই সত্যি। যদি তাই হয় তবে জয়নারায়ণকে খুন করল কে? কেনই বা করল?"

তারাপদ মাথা নাড়ল। তাকাল দরজার দিকে। চন্দন চুপ করে থাকল।

কিকিরা বললেন, “আমি একটা জিনিস ভেবে দেখেছি। রাজবাড়ির ওই ছোরার জাদু যাই থাক না কেন–তার বাঁটটার বাজার-দর আছে। দামি পাথর দিয়ে কারুকার্য করে বাঁটটা যেভাবে বাঁধানো–তাতে ওটা যেন কোনো মানুষকে রাতারাতি বেশ কিছু পাইয়ে দিতে পারে। যদি কেউ অর্থের লোভে খুন করে, থাকত–তবে বাঁটটা রেখে যেত না। তাই না?”

চন্দন কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন বলল, ঠিক কথা।

চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন কিকিরা।”অর্থের লোভে কেউ জয়নারায়ণকে খুন করেনি। কিংবা যদি করেও থাকে–শেষ পর্যন্ত বাঁটটা নিয়ে পালাবার পথ পায়নি। যে অর্থের লোভে ছোরা চুরি করবে, খুন করবে–সে বাঁটটা ফেলে রাখবে এ বিশ্বাস করা যায় না।”

চন্দন বলল, “ছোরাটা না দীপনারায়ণের ঘরে সিন্দুকে থাকত?”

“হ্যাঁ।”

“দীপনারায়ণের শোবার ঘরে ঢুকে কেউ একজন সিন্দুক খুলে ছোরাটা চুরি করবে, সেই ছোরা দিয়ে খুন করবে, আবার সিন্দুকে রেখে আসবে বাঁটটা–এটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কিকিরা?”

মাথা হেলিয়ে কিকিরা বললেন, “হচ্ছে বইকি! খুবই বাড়াবাড়ি হচ্ছে।”

“এরকম বোকা লোক কে থাকতে পারে! রাজবাড়ির ছোরা-রহস্যের কথা জেনেও, ধরা পড়ার জন্যে সেই ছোরা বার করে আনবে, আবার খুন করে রেখে আসবে?”

“আমিও তো তাই ভাবছি। জয়নারায়ণ কেমন করে মারা গিয়েছিলেন। জানো?”

“অ্যাকসিডেন্টে। মাথার ওপর ভারী জিনিস পড়ে।”

“হ্যাঁ। লাইব্রেরি-ঘরে জয়নারায়ণ মারা যান। তাঁর মাথার ওপর একটা বড় সেলফ বইপত্রসমেত ভেঙে পড়ে, সেই সঙ্গে বড় একটা ছবি, কাঁচে গলা হাত কেটে গিয়েছিল। মাথায় চোট লেগেছিল, তা ছাড়া রক্তপাত হয়েছিল প্রচুর। গলার নলি কেটে গিয়েছিল, হাত কেটেছিল, মুখের নানা জায়গায় কাঁচ ঢুকে গিয়েছিল।”

তারাপদ উঠল। বাইরে চলে গেল।

চন্দন বলল, “ঘটনাটা ঘটেছিল কখন?”

“রাত্রের দিকে। আটটা নাগাদ।”

“কোনো ডাক্তার আসেনি?”

“এখানে কোনো ডাক্তার নেই। মাইল কুড়ি দূরে ডাক্তার আছে। রাজবাড়ি থেকে গাড়ি গিয়ে যখন ডাক্তার নিয়ে এল–ততক্ষণে জয়নারায়ণ মারা গেছেন।”

“কাছেপিঠে কোনো হাসপাতাল নেই?”

“না। এ-জঙ্গলে তুমি হাসপাতালে কোথায় পাবে!”

তারাপদ ফিরে এসে আবার বসল।

কিকিরা বললেন, “কাল তোমাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে যাব। দেখবে লাইব্রেরির চেহারাটা কেমন। মেঝে থেকে পনেরো আঠারো ফুট উঁচুতে ছাদ। চারদিকে বিরাট বিরাট র‍্যাক। বই পড়তে হলে সিঁড়ি লাগে। সিঁড়ি রয়েছে কাঠের। র‍্যাকে ঠাসা বই। বিশাল বিশাল চেহারা। ওজনও কম নয়। জয়নারায়ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেলফ থেকে বই টানছিলেন এমন সময় হুড়মুড় করে এক তাক বই তাঁর ঘাড়ে মুখে পড়ে, সিঁড়িসমেত উলটে মাটিতে পড়ে যান। র‍্যাকটাও ভেঙে যায়।”

“জয়নারায়ণ কি পণ্ডিত লোক ছিলেন?” জিজ্ঞেস করল চন্দন।

কিকিরা বললেন, “দীপনারায়ণ বলেন, লাইব্রেরি-ঘরে প্রায়ই গিয়ে বসে থাকতেন।”

“পড়াশোনা করতেন?”

“হয়ত করতেন, আমি জানি না।” কিকিরা একটু থেমে হঠাৎ বললেন, “তুমি একটা জিনিস মোটেই লক্ষ করছ না। বই পড়তে গিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো বই হঠাৎ পড়ে যাওয়া সম্ভব। র‍্যাক ভেঙে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু অত বড় একটা বাঁধানো ছবি, যার ওজন অন্তত পনেরো কুড়ি সের হবে, কেমন করে দেওয়াল থেকে ভেঙে পড়ল তা বলতে পারো? দীপনারায়ণকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, তাঁদের ধারণা হয়েছিল, জয়নারায়ণ যখন সিঁড়ি সমেত উলটে পড়ছিলেন–তখন হয়ত হাত বাড়িয়ে ছবিটা ধরবার চেষ্টা করেছিলেন।”

“ছবিটা কি নাগালের মধ্যে ছিল?”

“দুটো পাশাপাশি র‍্যাকের ফাঁকে ছবিটা টাঙানো ছিল। ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো ছবি।”

“অত বড় ছবি কেমন করে টাঙানো ছিল?”

“তার দিয়ে।”

“তার ছিঁড়ে গেল?”

“পুরনো তার ছিঁড়তে পারে। মরচে ধরে ক্ষয় হতে পারে। কিংবা কোনো জায়গায় পলকা ছিল।”

“আমি বিশ্বাস করি না। তবু দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। ঘরের টাঙানো পাখাও তো মাথায় পড়ে। ছাদ খসে মানুষ মারা যায়।”

চন্দন কিছু বলল না।

কিকিরা বললেন, “বিপদের সময় মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। ছবিটা কেমন করে পড়ল, কেমন করে তার কাঁচে জয়নারায়ণের গলা মুখ হাত কেটে রক্তে সব ভেসে গেল তা কেউই খেয়ালও করল না। জয়নারায়ণ মারা যাবার পর দীপনারায়ণ যখন একদিন নিতান্তই আচমকা নিজের সিন্দুকের মধ্যে ছোরাটাকে দেখলেন তখন তাঁর টনক নড়ল। তখনই তাঁর

সন্দেহ হল, ভাইয়ের মৃত্যু দুর্ঘটনা নয়। ছবির ব্যাপারটাও তাঁর খেয়াল হল।”

তারাপদ বলল, “আপনি বলতে চাইছেন, জয়নারায়ণকে আগে খুন করা হয়েছে; তারপর বাকি যা কিছু সাজানো হয়েছে।”

“আমি এখনই কিছু বলতে চাইছি না। যা বলার পরশু রাত্রে বলব, শুধু রাজবাড়ির ছোরা নয়, ওই ছবিও নয়, জয়নারায়ণ যখন দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন তখন ইরচাঁদের ওই ডালকুত্তার মতন কুকুরগুলো কেন তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে চারপাশে ছোটাছুটি করছিল এবং ডাকছিল– সেটাও রহস্য। কুকুরের ডাকের জন্যে আশপাশের কেউ অনেকক্ষণ কিছু শুনতে পায়নি।”

চন্দন কিছু বলার আগেই কিকিরা আবার বললেন, “কাল আমার অনেক কাজ তোমাদের নিয়ে। চন্দন, কতটুকু ড পয়জেন এনেছ?”

চন্দন হাত দিয়ে মাপ দেখাল।

পরের দিন সকাল থেকেই দেখা গেল কিকিরা খুব ব্যস্ত। সকালে চা খেয়ে তারাপদদের নিয়ে লাইব্রেরিতে চলে গেলেন, ফিরলেন দুপুরে। তারাপদ আর চন্দনকে দেখলেই বোঝা যায় যত রাজ্যের ধুলো ঘেঁটেছে, মুখে চোখে মাথায় ধুলোর ছোপ।

দুপুরে স্নান-খাওয়ার পর চন্দন আর তারাপদ দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল; কিকিরা সামান্য বিশ্রাম সেরে তাঁর ঝোলাঝুলি নিয়ে বসলেন। দরজা বন্ধ থাকল। কী যে করলেন তিনি সারা দুপুর, কেউ জানল না।

বিকেলে চন্দনদের নিয়ে প্রথমে গেলেন দীপনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর দীপনারায়ণের সঙ্গে রাজবাড়ির ভেতর মহল ঘুরে বেড়ালেন, দেখলেন সব। মায় দীপনারায়ণের ঘরের সিন্দুক পর্যন্ত।

ফিরে এসে আবার দীপনারায়ণের নিচের অফিস-ঘরে বসলেন সকলে।

কিকিরা বললেন, “দীপনারায়ণবাবু, এবার খোলাখুলি ক’টা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।”

“বলুন।”

“এই রাজবাড়িতে আপনার অনুগত বিশ্বাসী লোক ক’জন আছে?”

দীপনারায়ণ কেমন যেন অবাক হলেন। বললেন, “কেন?”

“দরকার আছে। আপনি যাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেন, এমন লোকদের বাদ দিয়ে বলছি।“

সামান্য ভেবে দীপনারায়ণ বললেন, “চার-পাঁচজন আছে।”

“আপনার বাড়িতে বন্দুক রাইফেল, রিভলবার নিশ্চয় আছে?”

মাথা নেড়ে সায় দিলেন দীপনারায়ণ।

“কার কার আছে?”

"আমার আর জয়নারায়ণের। কাকারও বন্দুক ছিল।"

"কে কে বন্দুক-টন্দুক চালাতে পারে আপনারা তিনজন বাদে?"

আমার ছেলেরা পারে। ইন্দরও পারে।"

"অন্য কোনো মারাত্মক অস্ত্র আছে?"

"পুরনো কিছু অস্ত্র ছিল, কৃপাণবল্লম গোছের, সেসব কোথায় পড়ে আছে, কেউ ব্যবহার করে না।"

কিকিরা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "রাজবাড়িতে কাঠের মিস্ত্রি আছে কেউ?"

"কাঠের মিস্ত্রি? কেন?"

"কেউ নেই?"

"আছে।"

"তাদের মধ্যে একজনকে কাল আমার একটু দরকার। সকালের দিকে। আর আপনার বসার ঘরে উঁচু গোল হালকা একটা টেবিল দেখেছি। ওটাও দরকার।"

দীপনারায়ণ অবাক হয়ে বললেন, "কাঠের মিস্ত্রি, টেবিল–এ-সব নিয়ে কী .. করবেন আপনি?"

কিকিরা মজার মুখ করে বললেন, "ম্যাজিক দেখাব।"

"ম্যাজিক?"

"আপনি তো জানেন, আমি ম্যাজিশিয়ান, কিকিরা দি ওয়ান্ডার…!" কিকিরা হাসতে লাগলেন।

দীপনারায়ণ বিরক্ত বোধ করলেও মুখে কিছু বললেন না। সংযতভাবে বললেন, "কিংকরবাবু, এখন আমার মনের অবস্থা ম্যাজিক দেখার মতন নয়।"

কিকিরা বললেন, "জানি দীপনারায়ণবাবু, কিন্তু কাল সন্ধের পর ওই লাইব্রেরি-ঘরে আমি একটা ম্যাজিক দেখাব। আপনাকে সেখানে থাকতে হবে; শুধু আপনি হাজির থাকলেই চলবে না, ইন্দর, শশধর, আপনার কাকা ললিতনারায়ণকেও থাকতে হবে।"

দীপনারায়ণ কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। বললেন, "কাকা অন্ধ। তিনি কেমন করে ম্যাজিক দেখবেন?"

"তাঁকে দেখতে হবে না। তিনি হাজির থাকলেই চলবে।" বলে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন, চোখের ইশারায় চন্দনদের উঠতে বললেন।

দীপনারায়ণ বোবা বোকা হয়ে বসে থাকলেন।

কিকিরা হেসে হেসেই বললেন, “দীপনারায়ণবাবু, আপনি আপনাদের রাজবাড়ির ছোরার অদ্ভুত-অদ্ভুত গুণের কথা বিশ্বাস করেন। আমার একটা ম্যাজিক আছে যার নাম দিয়েছিলাম–'মিস্ট্রিরিয়াস আইজ'–এই খেলাটার মধ্যে একটা অলৌকিক গুণ আছে। কাল সেটা দেখাব। ওই খেলা ছাড়া জয়নারায়ণের খুনিকে ধরবার আর কোনো উপায় আমার জানা নেই। আপনার দায়িত্ব হল, যাদের কথা বলেছি তাদের প্রত্যেককে ঠিক সময়ে ঠিক মতন লাইব্রেরিতে হাজির করা। আপনার হুকুম সবাই মানতে বাধ্য। আর আমরা যখন লাইব্রেরিতে বসব কাল রাত্রে, তখন আপনার বিশ্বাসী লোক দিয়ে। লাইব্রেরি-ঘরের চারপাশে পাহারা বসাবেন। খেলার কথা কাউকে বলবেন না।”

দীপনারায়ণ কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বলার কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষে বললেন, “আপনি এসেছেন পুরনো বইয়ের ভ্যালুয়ার হিসেবে। লোকে সেটাই জানে। আপনি তাদের ম্যাজিক দেখাবেন?”

কিকিরা বললেন, “আপনি ম্যাজিক দেখানোর কথা বলবেন না কাউকে। অন্য কিছু বলবেন। হুকুম করবেন। ও দায়িত্বটা আপনার।...আর একটা কথা, কাল আপনি যখন লাইব্রেরিতে আসবেন, ছোরার বাক্সটা সঙ্গে রাখবেন। লুকিয়ে।...পারলে একটা পিস্তল গোছের কিছু রেখে দেবেন।”

.

০৭.

লাইব্রেরি-ঘরে সবাই হাজির ছিল : দীপনারায়ণবাবু, ললিতনারায়ণ, ইন্দর, শশধর–সকলেই। তারাপদও ছিল। চন্দন ছিল না, সবে ঘরে এসে ঢুকল। কিকিরার সঙ্গে চোখে চোখে ইশারা হল চন্দনের।

সন্ধে উতরে গিয়েছে। রাত বেশি নয়, তবু লাইব্রেরি-ঘরের উঁচু ছাদ, রাশি রাশি বই, ছবি, নানা ধরনের পুরনো জিনিস, বন্ধ জানলা এবং অনুজ্জ্বল বাতির জন্যে মনে হচ্ছিল রাত যেন অনেকটা হয়ে গিয়েছে।

কালো রঙের পায়া-অলা গোল টেবিল ঘিরে সকলে বসে ছিলেন। টেবিলটা প্রায় বুকের কাছাকাছি ঠেকছিল। টেবিলের ওপর পাতলা কালো ভেলভেটের কাপড় বিছানো। শশধর তার মনিবদের সামনে বসতে চাইছিল না, দীপনারায়ণ হুকুম করে তাকে বসিয়েছেন।

চন্দন ফিরে আসার পর কিকিরা ঘরের চারপাশে একবার ভাল করে তাকিয়ে নিলেন। আজ তাঁর একটু অন্যরকম সাজ। গায়ের আলখাল্লার রঙটা কালো, পরনের প্যান্টও বোধহয় কালচে, দেখা যাচ্ছিল না। চোখে চশমা। কাঁচটা রঙিন। তাঁর চোখ দেখা যাচ্ছিল না।

কিকিরা তারাপদকে বললেন, দরজাটা বন্ধ আছে কিনা দেখে আসতে।

তারাপদ দরজা দেখে ফিরে আসার পর কিকিরা তাকে বাতিটা আরও কম। করে দিতে বললেন।

টেবিল থেকে সামান্য তফাতে উঁচু টুলের ওপর একটা বাতি ছিল। তারাপদ মিটিমিটে সেই আলো আরও কমিয়ে দিল। অত বড় লাইব্রেরি-ঘর এমনিতেই প্রায় অন্ধকার হয়েছিল, বাতি কমাবার পর আরও অন্ধকার হয়ে গেল।

টেবিলের চারধারে গোল হয়ে বসে আছেন : কিকিরা, কিকিরার ডান পাশে দীপনারায়ণ, বাঁ পাশে ললিতনারায়ণ, দীপনারায়ণের একপাশে ইন্দর, ইন্দরের পর বসেছে শশধর। তারাপদ আর চন্দন কিকিরার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে।

সকলকে একবার দেখে নিয়ে কিকিরা প্রায় কোনো ভূমিকা না করেই বললেন, “দীপনারায়ণবাবু, আপনি আমাদের একটা কাজের ভার দিয়ে এই রাজবাড়িতে এনেছিলেন। আমরা এই ক’দিন সাধ্যমত খেটে আপনার কাজ শেষ করে এনেছি। সামান্য একটু কাজ বাকি আছে। কাজটা সামান্য, কিন্তু সবচেয়ে জরুরি। আপনাদের সকলকে আজ শুধু সেই জন্যেই এখানে ডেকেছি। হয়ত কেউ-না-কেউ আপনারা আমায় সাহায্য করতে পারেন।”

দীপনারায়ণ তাকিয়ে থাকলেন, ললিতনারায়ণ অন্ধ হয়ে যাবার পর চোখে গগলস্ পরেন, তাঁর চোখের পাতা খোলা থাকে, দেখতে পান না। ললিতনারায়ণ সামান্য মাথা ঘোরালেন। ইন্দর কেমন অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে থাকল; শশধর ধূর্ত দৃষ্টিতে।

দীপনারায়ণ বললেন, “কী ধরনের সাহায্য আপনি চাইছেন?”

কিকিরা বললেন, “বলছি। তার আগে বলি, এই লাইব্রেরি-ঘরের কোনো খোঁজই বোধ হয় আপনারা কেউ কোনোদিন রাখতেন না। রাজবাড়ির কেউ এ-ঘরে ঢুকতেন বলেও মনে হয়

না।”

দীপনারায়ণ বললেন, “আমরা এক আধ দিন এসেছি; তবে “জয়নারায়ণ প্রায়ই আসত।”

“কেন?”

“ওর বই ঘাঁটা, ছবি ঘাঁটা বাতিক ছিল। পুরনো কিছু জিনিস আছে–ওর পছন্দ ছিল।”

কিকিরা যেন দীপনারায়ণের কথাটা লুফে দিলেন। বললেন, “একটা জিনিস দেখাচ্ছি। এটা কী জিনিস কেউ বলতে পারেন?” বলে কিকিরা পকেট থেকে বড় মার্বেল, সাইজের কাচের একটা জিনিস বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন।”এই জিনিসটা ওঁর কাজ করার টেবিলের ড্রয়ারে ছিল। এই ঘরে।”

দীপনারায়ণরা ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন। আশ্চর্য রকম দেখতে। ঠিক যেন একটা চোখের মণি। অথচ বড়। মণির বেশির ভাগটা কুচকুচে কালো, মধ্যেরটুকু জ্বলজ্বল করছে। কেমন এক লালচে আভা দিচ্ছে। অবাক হয়ে দীপনারায়ণ মণিটা দেখতে লাগলেন। ইন্দর এবং শশধরও দেখছিল। ললিতনারায়ণ পিঠ সোজা করে বসে।

“কী দেখছ তোমরা?” ললিতনারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন।

দীপনারায়ণ বললেন, “চোখের মণির মতন দেখতে। মানুষের নয়। মানুষের চোখের তারা এত বড় হয় না, বিন্দুটাও লালচে হতে দেখিনি।”

কিকিরা বললেন, “মানুষের চোখের তারা ওটা নয়, দীপনারায়ণবাবু।” বলে পকেটে হাত দিয়ে ছোট-মতন একটা বই বার করলেন, পাতাগুলো ছেঁড়া, উইয়ে খাওয়া। বইটা টেবিলের ওপর রাখলেন না। শুধু দেখালেন। বললেন, “এই যে চটিবইটা দেখছেন–এটা ওই মণির পাশে ছিল। বইটা কোন ভাষায় লেখা বোঝা মুশকিল। নেপালি হতে পারে। আমি জানি না। তবে এর পেছন দিকে পেনসিলে ইংরেজিতে সামান্য ক’টা কথা লেখা আছে। তাই থেকে আমরা ধারণা হল, আপনাদের কোনো পূর্বপুরুষ বইটা পেয়েছিলেন। বই আর মণি। এই বইয়ে ওই মণির কথা লেখা আছে। লেখা আছে যে, মণিটা হিমালয় পাহাড়ের জঙ্গলে পাওয়া হায়না ধরনের কোনো জন্তুর। এই জন্তুদের চোখের অলৌকিক এক গুণ আছে।”

দীপনারায়ণ অবাক হয়ে বললেন, “অলৌকিক গুণ! মণিটার অলৌকিক গুণ কেমন করে থাকবে? এটা তো জ্যান্ত কোনো পশুর নয়?”

কিকিরা বললেন, “আপনি একটু ভুল বললেন। মণিটা জ্যান্ত পশুরই ছিল–এখন সেটা আলাদা করে তুলে রাখা হয়েছে।”

ললিতনারায়ণ বললেন, “আমি কখনো শুনিনি, রাজবাড়িতে এমন একটা জিনিস আছে!”

কিকিরা হঠাৎ বললেন, “রাজবাড়িতে অলৌকিক কিছু কি নেই রাজাসাহেব?”

দীপনারায়ণ তাড়াতাড়ি বললেন, “থাকতে পারে। কিন্তু মণিটার অলৌকিকত্ব কী?”

কিকিরা বললেন, “এর অলৌকিকত্বর কথা ছোট করে লেখা আছে পেনসিলে। কোনো মানুষ, যে নরহত্যা করেছে, পাপ কাজ করেছে, এমন কি প্রবঞ্চনা করেছে–সে যদি এই মণির ওপরে হাত রাখে মণিটা তার হাতের ছায়াও সহ্য করবে না–ছিটকে বেরিয়ে যাবে।”

দীপনারায়ণ কেমন একটা শব্দ করে উঠলেন। শশধর কিকিরার দিকে তাকাল। ইন্দর কেমন বোকার মতন তাকিয়ে হেসে উঠল। ললিতনারায়ণ মাথা নাড়তে লাগলেন।

"অসম্ভব", ললিতনারায়ণ বললেন, "অসম্ভব। আমাদের বাড়িতে এরকম ভুতুড়ে কোনো জিনিস ছিল না। আমি শুনিনি।"

কিকিরা বিনীত গলায় বললেন, "আপনি শোনেননি, জানেন না–এটাই আমার জানার কথা, রাজাসাহেব। আপনি চোখে দেখতে পান না। মণিটা দেখতেও পাচ্ছেন না। তবু আপনাকে এখানে আনার উদ্দেশ্যই ছিল–যদি সব কথা শুনে কিছু সাহায্য করতে পারেন।"

ইন্দর হাসতে হাসতে বলল, "ভূতুড়ে গল্প শোনার জন্যে আমরা এখানে আসিনি। ...শুনে ভালই লাগল। আমি চলি।"

কিকিরা বাধা দিয়ে বললেন, "যাবার আগে চোখে একবার দেখে যাবেন না?"

"কী দেখব?"

"মণিটা সত্যি সত্যি নড়ে কিনা?"

"পাগলের মতন কথা বলবেন না।"

"একটু পরীক্ষা করে দেখলে ক্ষতি কী!..এই লাইব্রেরি-ঘরে জয়নারায়ণ মারা গিয়েছিলেন। তিনি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন, না কেউ তাঁকে খুন করেছিল–এটা একবার দেখা যেত।"

ঘরের মধ্যে সবাই যেন কেমন চমকে গেল। একেবারে চুপচাপ। শশধর আর ইন্দর কিকিরার দিকে অপলকে তাকিয়ে। চমকটা কেটে গেলে দু জনেই যেন জ্বলন্ত চোখে কিকিরাকে দেখতে লাগল।

ইন্দর বলল, "খুন? কে বলল?"

কিকিরা বললেন, "বলার লোক আছে।"

খেপে উঠে ইন্দর বলল, "খবরদার, আবার যদি ও কথা শুনি, জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব। রাজবাড়ির বদনাম করতে এসেছেন আপনি!"

কিকিরা বললেন, "না। আমি রাজা দীপনারায়ণের কথায় এসেছি।"

ইন্দর অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।"ননসেন্স। আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি।" বলে সে দীপনারায়ণের দিকে তাকাল। "আপনি কোথা থেকে একটা ইডিয়েট, পাগলকে ধরে এনেছেন? ওকে তাড়িয়ে দিন। কথা বলতে জানে না।"

দীপনারায়ণ গম্ভীর গলায় বললেন, "বসো। চেঁচামেচি করো না। উনি যা। বলছেন সেটা আমিও বিশ্বাস করি না কিন্তু যা বলছেন সেটা পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কিসের? মণিটা যদি বাজেই হয়বাজেই থাকবে। নিশ্চয় নড়বে না।"

শশধর বলল, "রাজাসাহেব, আপনি ওঁর কথা বিশ্বাস করছেন?"

দীপনারায়ণ কোনো জবাব না দিয়ে কিকিরাকে বললেন, “কেমন করে হাত রাখব আপনি বলুন?”

কিকিরা নিজের ডান হাত মণিটার ওপর বিঘতখানেক উঁচুতে তুলে রাখলেন। মণিটা স্থির হয়ে থাকল। নড়ল না।

দীপনারায়ণ বললেন, “আমি রাখছি।”

দীপনারায়ণ মণির ওপর হাত রাখলেন উঁচু করে, নড়ল না।

নিশ্বাস ফেলে দীপনারায়ণ বললেন, “ইন্দর, তুমি রাখো।”

ইন্দর যেন ঘামতে শুরু করেছিল। তার মুখ কঠিন। শক্ত চোখে কিকিরার দিকে তাকাল। বলল, “বেশ, আমি হাত রাখছি যদি দেখা যায় মণিটা নড়ল না, ওই লোকটাকে আমি দেখে নেব।”

ইন্দর যেন রাগের বশে টেবিলে হাত দিয়ে মণিটা তুলে নিতে যাচ্ছিল। কিকিরা হাত ধরে ফেললেন। বললেন, “না না, ছোঁবেন না। ওপরে হাত রাখুন, আমরা যেভাবে রেখেছি।”

ইন্দরের হাত কাঁপছিল। ডান হাতটা সে তুলে রাখল।

খুবই আশ্চর্যের কথা মণিটা এবার নড়তে লাগল ধীরে ধীরে। ইন্দর অবাক। তার চোখের পাতা পড়ছে না। মুখে আতঙ্ক। হাতটা সে সরিয়ে নিল অন্য পাশে, চোখের মণিটাও গড়াতে গড়াতে তার হাতের দিকে চলে গেল। আবার হাত সরাল ইন্দর, মণিটাও গড়িয়ে গেল।

আচমকা খেপে উঠে ইন্দর চেঁচিয়ে উঠল। প্রায় লাফ মেরে গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল কিকিরার। চন্দনও পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দীপনারায়ণ হাতের ঠেলা দিয়ে ইন্দরকে বসিয়ে দিলেন। বললেন, “গোলমাল করো না। বসো!” বলে পকেট থেকে রিভলবার বার করে সামনে রাখলেন। হাতের কাছে।

ইন্দর রিভলবারের দিকে তাকাল। তার মুখ রাগে ক্ষোভে ভয়ে উত্তেজনায় কেমন যেন দেখাচ্ছিল। ইন্দর থামল না, চেঁচিয়ে বলল, “আপনি আমাকে খুনি বলতে চান? কোথাকার একটা উন্মাদ...”

দীপনারায়ণ ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ করো।”

কিকিরা শশধরের দিকে তাকালেন।

শশধর ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার ধূর্ত চোখে আতঙ্ক।

কোনো উপায় নেই, শশধর যেন সাপের ফণার দিকে হাত বাড়াচ্ছে এমনভাবে হাত বাড়াল। তার হাত কাঁপছিল থরথর করে।

মণিটা এবারও নড়তে লাগল, গড়িয়ে গেল; শশধর যেদিকে হাত সরায়, সেদিকে গড়িয়ে যায় মণিটা। ভয়ের শব্দ করে হাত সরিয়ে নিল শশধর। চোখ যেন ভয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে, দীপনারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলল, “রাজাসাহেব, আমি নিদোষ; আপনি বিশ্বাস

করুন।

দীপনারায়ণ কোনো কথা বললেন না, রিভলবারের ওপর হাত রাখলেন।

কিকিরা তাঁর বাঁ-পাশে বসা ললিতনারায়ণের দিকে তাকালেন। বললেন, “ললিতনারায়ণবাবু, আপনি কি একবার হাত রাখলেন?”

ললিতনারায়ণ বিন্দুমাত্র উত্তেজনা দেখালেন না। বললেন, “রাখব।”

“আপনার সামনেই টেবিল-হাতটা সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে দিন।”

ললিতনারায়ণ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

মণিটার ঠিক ওপরেই হাত রাখলেন না ললিতনারায়ণ, অথচ সামান্য সময় মণিটা স্থির থেকে পরে তাঁর হাতের দিকেই গড়িয়ে আসতে লাগল। দীপনারায়ণ দেখছিলেন। কিকিরা ললিতনারায়ণকে হাত সরাতে বললেন। ললিতনারায়ণ হাত সরালেন-মণিটাও সরে এল। টেবিলের চারদিকে হাত ঘঘারাতে লাগলেন ললিতনারায়ণ-মণিটাও গড়াতে লাগল।

হঠাৎ বাঁ হাত উঠিয়ে নিয়ে ললিতনারায়ণ ডান হাত দিয়ে কিকিরার বাঁ হাত চেপে ধরলেন। তারপর হেসে উঠে বললেন, “এসব জোচ্চুরি কতদিন ধরে চলছে? হাত হঠাও।”

কিকিরা বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হলেন না। বাঁ হাতটা সকলের সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, “দীপনারায়ণবাবু, আপনার কাকা জোচ্চুরিটা ঠিকই ধরেছেন। আমার এই হাতে একটা শক্তিশালী চুম্বক ছিল। আর ওই কাচের মার্বেলটার তলায় লোহা দেওয়া আছে। এই ভেলভেটের তলায় যা আছে–সেটাও পাতলা কাঠ। কোনো সন্দেহ নেই এটা ম্যাজিকের খেলা। ধাপ্পা। কিন্তু রাজাসাহেব, আপনার অন্ধ কাকা কেমন করে আমার হাত নাড়া বুঝলেন সেটা একটু ভেবে দেখুন। আপনারা কেউ একবারও সন্দেহ করেননি–আমার বাঁ হাত নিচে ছিল-টেবিলের তলায়। এবং বাঁ হাতে চুম্বক ছিল। আপনার অন্ধ কাকা কেমন করে সেটা লক্ষ করলেন? আমি একবারও তাঁর পা ছুঁইনি। তাঁর যদি দৃষ্টিশক্তি না থাকত তিনি কিছুতেই এই অন্ধকারে আমার হাত নাড়া দেখতে পেতেন না। উনি আগাগোড়াই এটা লক্ষ করেছিলেন; এবং আমার জোচ্চুরি ধরবেন বলে ডান হাত না বাড়িয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উনি কি বাঁ হাতে কাজ করতে অভ্যস্ত? তা নয়। আগেই আমি সেটা লক্ষ্য করে নিয়েছি। ললিতনারায়ণ অন্ধ নন। অন্ধ সেজে রয়েছেন।”

“কে বলল আমি অন্ধ নয়?” ললিতনারায়ণ বেপরোয়াভাবে বললেন।

কিকিরা বললেন, “আপনি যে অন্ধ নন সেটা আজ স্পষ্ট হল। আরও যদি শুনতে চান–তা হলে বলব, আমি দূরবীন তাগ করে আগেই একদিন দেখেছি, আপনি আপনার মহলে ছাদে দাঁড়িয়ে কোনো চিঠি বা কাগজ পড়ছিলেন। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। আজ তা প্রমাণিত হল। আপনি যথেষ্ট চালাক। সন্দেহ এড়াবার জন্যে আগে থেকেই অন্ধ সেজেছেন।”

কিকিরা চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

.

ঘরের মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থা। দীপনারায়ণ চমকে উঠেছিলেন। তারাপদ আর চন্দন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। ইন্দর যেন কোনো ভূত দেখেছে সামনে। শশধর কাঁপছিল।

দীপনারায়ণ রিভলভারটা তুলে নিলেন।

কেউ কোনো কথা বলছিল না।

ললিতনারায়ণ চোখের গগলস খুলে ফেললেন। বয়স হলেও তাঁর চেহারা। এখনও মজবুত। চোখ দুটি তীব্র দেখাল। বললে, "জয়কে কেউ খুন করেনি। সে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।"

কিকিরা বললেন, "খুনের প্রমাণ আছে।"

"কী প্রমাণ?"

"দীপনারায়ণবাবু, ছোরার বাক্সটা একবার দেবেন?"

দীপনারায়ণ চেয়ারের তলায় ছোরার বাক্স রেখেছিলেন। সতর্ক চোখ রেখে বাঁ হাতে বাক্সটা তুলে দিলেন। চাবিও!

কিকিরা বাক্সটা নিলেন। চাবি খুলে ছোরার বাঁটটা বার করলেন। বললেন, "এর ফলাটা কে খুলে নিয়েছে ললিতনারায়ণবাবু?"

"ছোরার বাঁটটা আপনি চুরি করেও আবার সিন্দুকে রেখে এলেন কেন?"

ললিতনারায়ণ চুপ। দু হাতে মুখ ঢাকলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "ছোরাটা আমার ঘরে যে কদিন ছিল–আমি ঘুমোতে পারতাম না সারা রাত। ভয় করত। দুঃস্বপ্ন দেখতাম। জয় আমার পাশে-পাশে যেন ঘুরে বেড়াত। তা ছাড়া ইন্দর আমায় শাসাচ্ছিল। বলছিল, ছোরাটা তাকে দিয়ে দিতে। বিক্রি করে সে আমায় অর্ধেক টাকা দেবে। আমি ওকে বিশ্বাস করতাম না। ছোরার বাঁটটা পেলে ও পালাবে। কোনো উপায় না দেখে, মাথা ঠিক রাখতে–পেরে-বাক্সটা আবার দীপনারায়ণের সিন্দুকে রেখে আসি চুরি করে। আমার পাপ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি।"

ললিতনারায়ণের দু চোখের তলা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন মানুষটা।

ঘোড়া সাহেবের কুঠি

০১.

তারাপদ অফিস থেকে মেসে ফিরতেই বটুকবাবুর সঙ্গে দেখা। বটুক বললেন, "ওহে, তোমার সেই ম্যাজিশিয়ান কিকিরা এসেছিলেন। আবার আসবেন। বলে গেছেন, তুমি যেন মেসেই থাকো।"

সামান্য অবাক হল তারাপদ। আজ সপ্তাহ দুই হল, কিকিরা কলকাতা-ছাড়া। দু-দুটো রবিবার তারাপদ আর চন্দন অভ্যেসমতন কিকিরার বাড়ি গিয়েছে, গিয়ে ফিরে এসেছে। কিকিরার দেখা পায়নি। কিকিরার বাড়ি গিয়েছে, গিয়ে ফিরে এসেছে। কিকিরার দেখা পায়নি। সর্বজ্ঞ বগলাচন্দ্রও কিছু বলতে পারল না। বরং মনে হল, বগলা খানিকটা চটেই রয়েছে কিকিরার ওপর। সংসারের যা কিছু বগলাই করবে–চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো পালিশ, আর বগলাকে বিন্দুমাত্র কিছু না জানিয়ে একটা লোক বেপাত্তা হয়ে বসে থাকবে–এ কেমন কথা! বগলার কি ভাবনাচিন্তা হয় না! যাবার সময় বগলার হাতে কিছু টাকাপত্তর খুঁজে দিয়ে কিকিরা নাকি বলে গেছেন : "বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। সাবধানে থাকবি। তারা আর চাঁদু এলে বলবি, দিন সাত-আট পরে ফিরব।"

সেই সাত-আট দিন পনেরো-ষোলো দিনের মাথায় গিয়ে ঠেকল। যাক্, কিকিরা ফিরে এসেছেন, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়ে তারাপদ জামা-প্যান্ট ছাড়ল। ছেড়ে সাবেকি লুঙ্গি জড়াল; তারপর সাবান আর গামছা নিয়ে নিচে নেমে গেল স্নান সারতে। আজ তার মন বেশ হালকা। একটা দিন আর, পরশু থেকে পুজোর ছুটি শুরু। আজই মাইনে পেয়ে গিয়েছে। অফিস-টফিসে কাজ করার সময় ছুটিছাটা পাওয়া যে কত আনন্দের, তারাপদর আগে জানা ছিল না। এখন জানছে। অবশ্য এ-সবই কিকিরার দয়ায়। কিকিরা বেছে-বেছে নিজে তদ্বির করে তারাপদকে এই চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছেন। বেসরকারি চাকরি, কিন্তু ভাল। ছোট অফিস। কোনো গোলমাল নেই। যাও, খাতা খুলে কলম ধরে হিসেবপত্র মেলাও, চা-সিগারেট খাও, ছুটি হলে বাড়ি ফিরে এসো ভালই লাগছে তারাপদর। সে স্বপ্নেও ভাবেনি, মাস গেলে শ' ছয়েক টাকার মতন তার পকেটে আসবে! চাকরি পাবার প্রথম দিকে ভেবেছিল, টাকা যখন আসছে হাতে, তখন বটুকবাবুর মেস ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। কিন্তু যাওয়া হল না। এতকাল থাকতে-থাকতে কেমন মায়া পড়ে গিয়েছে বটুকবাবুর মেসের ওপর, নিজের ওই হতকুৎসিত ঘরের ওপরেও। এক সময় বটুকের টাকার তাগাদায় তারাপদ কেঁচো হয়ে থাকত, এখন বটুককেই কেঁচো করে রেখেছে! না না, বটুকবাবু মানুষ খারাপ নয়, কথাবাতার ধরনটাই যা খরখরে। বটুকবাবু যদি মন্দ হতেন, তারাপদ কি তার দুর্দিনে টিকে থাকতে পারত। এই মেসে! না, তারাপদ নেমকহারামি করতে পারবে না বটুকবাবুর সঙ্গে। বটুকের জয় হোক।

নিচের শ্যাওলা-পড়া কলতলা থেকে স্নান সেরে "বটুকের জয় হোক" গাইতে গাইতে তারাপদ তার ঘরে ফিরে এল। ফিরে এসে মুখ মুছে চুল আঁচড়াচ্ছে, দরজায় পায়ের শব্দ শুনল। মুখ না ফিরিয়েই তারাপদ বলল, "আসুন, কিকিরা মশাই! কোথায় যাওয়া হয়েছিল,

স্যার?

কোনো সাড়াশব্দ কানে এল না।

ঘুরে দাঁড়াল তারাপদ। দরজার সামনে বটুকবাবু দাঁড়িয়ে! হাসল তারাপদ। ও, আপনি! টাকা চাইতে এসেছেন?”

“না। বলতে এসেছি, তুমি বড় এঁচোড়ে-পাকা হয়ে গিয়েছ! আমি তোমার ইয়ার? খুব যে গান গাইতে-গাইতে এলে!”

তারাপদ জোরে হেসে উঠল।”আপনার কানে গিয়েছিল? সরি, বটুকদা! ভেরি সরি। তা আপনার টাকাটা এখন নেবেন?”

“আজ বেস্পতিবার। কাল দিও। মাইনে পেয়েছ?”

মাথা হেলাল তারাপদ।

বটুক বললেন, “তোমায় একটা কথা বলব, ভাবছি। দুলালবাবু আজ দু’ তিন মাস ধরে ভুগছেন। কেউ বলছে আলসার, কেউ বলছে লিভার খারাপ হয়েছে। তোমার ওই ডাক্তার-বন্ধুকে বলে হাসপাতালে ঢুকিয়ে দাও না, ভাই; মানুষটার একটা চিকিৎসা হয়!”

তারাপদ দু’মুহূর্ত বটুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, “আগে কেন বলেননি? আমি চন্দনকে বলব। নিশ্চয় বলব।”

এমন সময় কিকিরাকে দেখা গেল। বটুকবাবু চলে গেলেন।”

“কী গো অফিসের বাবু? কখন ফেরা হল?” কিকিরা ঘরে ঢুকে বললেন।

“খানিকটা আগে। তা আপনার হঠাৎ-আবির্ভাব কেন কিকিরা-স্যার? কোথায় হাওয়া হয়েছিলেন?”

“অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলাম। মাঝে-মাঝে তোমাদের এই কলকাতায় হাঁপিয়ে উঠি। তখন দু-চার দিন কোথাও পালিয়ে যাই।”

“দু-চার দিন তো নয়, স্যার; আপনি সপ্তাহ-দুই ডুব মেরে ছিলেন। বগলা ফায়ার হয়ে গিয়েছে, তা জানেন?”

“ও একটা আস্ত উজবুক। পইপই করে বলে গেলাম, তুই ভাবিস না, আমি দিন কতকের জন্যে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। অনেক দিন যাইনি। কদিন থেকে আসব। তা হতচ্ছাড়া যাকেই পেয়েছে, তার কাছেই প্যানপ্যান করেছে।”

“গিয়েছিলেন কোথায়?”

“বেশি দূরে নয়। আসানসোলের কাছে কালীপাহাড়ি বলে একটা জায়গা আছে। কোলফিল্ডকে কোলফিল্ড, আবার গ্রামও।”

“সেখানে বন্ধু আছে?”

"পুরনো বন্ধু, বাপু। একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি। স্কুল ফ্রেন্ড।...তা নাও, সাজগোজ শেষ করো; চলল, একটু ঘুরে আসি।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় ঘুরবেন! পুজোর ভিড়। রাস্তাঘাটে হাঁটা যায় না। আজ পঞ্চমী, তা জানেন?"

"সব জানি। নাও, পাজামা চড়িয়ে নাও। চলো।"

তারাপদ কিছু বুঝল না। কিকিরা যখন বলছেন, তখন যেতেই হবে। বলল, "একটু চা হবে না, কিকিরা-স্যার?"

"সে বাইরে হবে। তুমি ঝটপট নাও তো।"

তারাপদ গায়ে গেঞ্জি গলাতে লাগল।

পার্ক তো নয়, নেড়া মাঠ। বর্ষার দৌলতে কোথাও কোথাও সামান্য ঘাস গজিয়ে কোনো রকমে টিকে ছিল। কিকিরা বেছে-বেছে একটা জায়গায় বসলেন। কাছাকাছি কেউ নেই।

তারাপদও বসল। বসে একটা সিগারেট ধরাল।

কিকিরা হাত বাড়ালেন।"দাও তো, একটা ধোঁয়া দাও।"

তারাপদ প্যাকেট দিল সিগারেটের।

কিকিরা ন'মাসে ছ'মাসে শখ করে সিগারেট খান। গোটা কয়েক কাঠি নষ্ট করে সিগারেট ধরালেন। বললেন, "তোমার অফিস কবে বন্ধ হচ্ছে?"

"কাল অফিস হয়ে।"

"খুলবে কবে?"

"খুলবে দ্বাদশীর দিন। তবে আমার লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত ছুটি। অবাঙালিরা দেওয়ালির ছুটি পাবে চার দিন, আমরা শুধু কালীপুজোর দিন।"

"ভালই হল। আমরা তা হলে কালকেই কালীপাহাড়ি স্টার্ট করতে পারি।" কিকিরা বেশ সহজভাবেই বললেন।

তারাপদ অবাক হয়ে কিকিরার দিকে তাকাল।"কালীপাহাড়ি! সেখানে যাব কেন?"

কিকিরা হাসিমুখে বললেন, "পুজোর এই ভিড় হই-হট্টগোলের মধ্যে কলকাতায় থেকে কী করবে? চারদিকে শুধু মাইক আর ঢাকের বাজনা। আমার সঙ্গে ঘুরে আসবে চলল। তোফা থাকবে, পোলাও-মাংস খাবে, কত সিনসিনারি দেখবে–ধানখেত, পলাশ ঝোপ, কাশফুল, মাঝে-মাঝে বৃষ্টি। শরৎকাল দেখবে হে, রিয়েল শরৎকাল। পদ্য পড়েছ আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে...? সেই জিনিস দেখবে।"

তারাপদ সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। কেমন সন্দেহ হচ্ছিল তার। কিকিরা শরৎকাল দেখতে কালী পাহাড়ি যাবেন? বর্ধমান লোকালে গিয়েও তো শক্তিগড় থেকে

শরৎকাল দেখে আসা যায়।

“কিকিরা স্যার,” তারাপদ বলল, “খুলে বলুন তো ব্যাপারটা?”

“কেন, কেন! খোলাখুলির কী আছে! একেবারে সিপিল ব্যাপার। পুজোর ছুটিতে দিন কয়েক নিরিবিলিতে থেকে আসা।”

“তা ঠিক,” তারাপদ অবিকল কিকিরার মতন করে বলল, “ভেরি সিমপি। তবে কিনা আপনি এই দিন-পনেরো নিরিবিলিতে কাটিয়ে এলেন, আবার সেই একই জায়গায় নিরিবিলিতে কাটাতে যাচ্ছেন তো, তাই বলছিলাম ব্যাপারটা কী?”

“তোমাদের বড় সন্দেহবাতিক?”

“সঙ্গদোষ স্যার! আপনার রহস্য দেখে-দেখে আমরাও সাসপিশাস হয়ে উঠেছি।...তা সত্যি করে বলুন তো, এবারের মিস্ট্রিটা কী? আবার কোনো ভুজঙ্গ কাপালিক?”

“না।”

“রাজবাড়ির ছোরা-গোছের কিছু পেয়েছেন?”

“না হে, না।”

“তবে?”

কিকিরা বললেন, “এবার দুশো শক্ত কাজ করতে হবে, একই সঙ্গে। ওঝাগিরি করব একদিকে, আর অন্যদিকে একটা খুন।”

“খুন? মার্ডার?” তারাপদ চমকে উঠল। বড় বড় চোখ করে দেখতে লাগল কিকিরাকে।

কিকিরা বেশ সহজভাবেই বললেন, “তুমি ভেবো না, এমন ছিমছাম, নিট অ্যান্ড ক্লিন খুন হবে যে, কারুর সাধ্য হবে না আমাদের ধরে।”

তারাপদ বলল, “আপনি একলাই যান, খুন সেরে ফেলুন। আমি যাচ্ছি না।”

কিকিরা হেসে ফেললেন। তারাপদর কাঁধের কাছে থাপ্পড় মেরে বললেন, “তুমি একটি আস্ত হাঁদা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথা শোনোনি কখনো? বিষ দিয়ে বিষক্রিয়া নষ্ট করা? শোনোনি? এটাও হল সেই রকম। একটাকে

হেভেনে পাঠিয়ে দেব, আর-একটাকে হেল্ থেকে টেনে তুলব।

“হেভেনে কাকে পাঠাবেন? আমাকে?” তারাপদ ঠাট্টা করে বলল।”ঠিক ধরেছ! তোমার মাথার ঘিলু অনেককাল জমাট ছিল। এবার দেখছি গলে যাচ্ছে। শীতকালে নারকেল-তেল যে ভাবে গলে, সেই ভাবে।”

রসিকতা করে তারাপদ বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার তাতে।”

কিকিরা জোরেই হাসলেন। হাসি সামলে বললেন, “এবার কাজের কথা বলি। কাল রাত্রের

প্যাসেঞ্জারে আমরা যাচ্ছি। তুমি গোছগাছ করে আমার বাড়িতে সন্ধের মধ্যে চলে আসবে। আর চন্দনের সঙ্গে কাল সকালে দেখা করে বলবে, সে কবে যেতে পারবে?”

“চাঁদু পারবে না।”—

“কেন?”

“অনেক কষ্টে দিন চারেক ছুটি ম্যানেজ করেছ; বাড়ি যাবে মা-বাবার কাছে।”

“বেশ তো, বাড়ি থেকে ফিরে এসে যাবে।”

“ওর হসপিটাল-ডিউটি নেই?”

“তুমি বড় বাগড়া দাও। বেশ, স্যান্ডেল-উডকে বলল, কাল আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। দুপুরের পর আমি থাকব। বুঝলে? সকাল আমাকে পাবে না। দুপুরের পর পাবে।”

“বলব।”

“ব্যস, তা হলে ওঠো। কাল দেখা হবে।”

”আপনি কিন্তু ব্যাপারটা বললেন না?”

“অত অধৈর্য হচ্ছ কেন? কাল ট্রেনে যেতে-যেতে বলব।” কিকিরা উঠলেন।

তারাপদকেও উঠতে হল।

পা বাড়িয়ে কিকিরা বললেন, “একটা ব্যাপার বেশ মন দিয়ে ভেবো তো! তেতালার সমান উঁচু থেকে একটা লোক যদি লাফিয়ে পড়ে, সে মাটিতে-না পড়ে আর-কোথায় যেতে পারে? হাওয়ায় কি মিলিয়ে যাওয়া যায়।”

তারাপদ কিছুই বুঝল না।

০২.

ষষ্ঠীপুজোর দিন হাওড়া স্টেশনে পা দেয়, কার সাধ্য। ভিড়ে-ভিড়াক্কার, থিকথিক করছে মানুষ। রাশি রাশি মালপত্র। পায়ে-পায়ে কুলি। হাজার কয়েক লোক একই সঙ্গে কথা বলছে, চেঁচাচ্ছে, দৌড়ঝাঁপ করছে। দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

কিকিরা বুদ্ধি করে প্যাসেঞ্জারের টিকিট কিনেছিলেন। রাত্রের দিকে প্রায় শেষ ট্রেন। যারা যাবার তারা মেলে, এক্সপ্রেসে, পূজা স্পেশ্যালে চলে যাবার পর ঝড়তি-পড়তি ভিড়টা পড়ে ছিল মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের জন্যে। মামুলি যাত্রী ছাড়া এ-গাড়িতে কেউ চড়ে না। তবু ভিড় কম হল না।

একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিলেন কিকিরা। একটু আরামে যেতে চান আর কী! বললেন, “ক ঘণ্টার নবাবি করে নিচ্ছি, বুঝলে তো, তারাপদ। প্যাসেঞ্জারের ফার্স্ট ক্লাস– তাও কালীপাহাড়ি পর্যন্ত। আমাদের মতন বাবুর এইটুকুই দৌড়।”

চার বার্থের কামরা। কিকিরা আর তারাপদ ছাড়া অন্য দুজনই অবাঙালি। একজন হলেন, বিশাল চেহারার এক পঞ্জাবি ভদ্রলোক, যাবেন বর্ধমান পর্যন্ত। অন্যজন বোধহয় আসানসোলের কোনো ব্যবসাদার, প্রচুর লটবহর নিয়ে উঠেছেন গাড়িতে, মারোয়াড়ি। কিকিরার সঙ্গে মালপত্র তেমন বেশি না হলেও একটা বড়সড় ট্রাংক রয়েছে।

গাড়ি ছাড়ার পর বিশাল চেহারার পঞ্জাবি ভদ্রলোক সটান শুয়ে পড়লেন, সঙ্গে একটা অ্যাটাচি ছাড়া কিছু নেই। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক গন্ধমাদন নিচে রেখে, ওপরে বসলেন, পা ঝুলিয়ে। সামান্য আলাপ-পরিচয়ের চেষ্টাও করলেন, কিকিরা তেমন উৎসাহ দেখালেন না।

ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠেছিল তারাপদ। হাতমুখে জল দিয়ে এসে রুমাল ঘাড় গলা মুছে জলের বোতল খুলে জল খেল।

কিকিরা বসে ছিলেন নিচের বার্থে।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর বাতাস আসছিল। রাত হয়েছে। বাতাস ঠাণ্ডা।

কিছুক্ষণ দুজনেই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে শরীরটা জুড়িয়ে নিলেন।

কিকিরাই কথা বললেন প্রথমে। বললেন, “চন্দন বলেছে, বাড়ি থেকে ফিরে এসে দিন-দুই হাসপাতাল করবে। তারপর ডুব দিতে পারবে।”

তারাপদ বলল, “জানি। ওর ডাক্তারির আপনিই বারোটা বাজাবেন’।”

“কে বলল! চাঁদুবাবুর হাসপাতাল তো আর মাস-দুই পরে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারপর বাবুকে চরে বেড়াতে হবে।”

ঠাট্টা করে তারাপদ বলল, “আপনার সঙ্গে চরবার প্ল্যান করেছে নাকি?”

হাসলেন কিকিরা।

কিছুক্ষণ হাসিঠাট্টার কথা হল। গাড়ির ভেতরে গুমোটভাব ছিল, সেটাও কেটে গিয়েছে

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে। লিলুয়ায় গাড়ি থেমে আবার চলতে শুরু করেছে।

তারাপদ বলল, "কালীপাহাড়িতে তো নিয়ে চললেন কিকিরাস্যার; কিন্তু কেন নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা এবার বলুন।"

"বলছি, বলছি" কিকিরা পা তুলে আরাম করে বসলেন।" তোমাদের কোথাও নিয়ে গেলেই রহস্যের গন্ধ পাও, তাই না?"

ঠাট্টার গলায় তারাপদ বলল, "তা পাই। কেন পাব না, বলুন। আপনি কিকিরা দি ওয়ান্ডার! মিস্টিরিয়াস ম্যাজিশিয়ান।"

কিকিরা বললেন, "তা হলে শোনো। একটু গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে শুরু করি?"

"করুন।"

সামান্য চুপ করে থেকে কিকিরা শুরু করলেন, "আমার এক বন্ধু আছে ছেলেবেলার। আগেই তো বলেছি, একেবারে অল্প বয়েসের বন্ধু। তার নাম ফকিরচন্দ্র রায়। আমরা বলতাম ফকির। ফকিররা দু-তিন পুরুষ ধরে কালীপাহাড়িতে থাকে। নামে ফকির হলেও ওরা মোটামুটি ধনী লোক। এক সময়ে জমিজমাই ছিল ওদের সব, সে ওর ঠাকুরদার আমলে। বাবার আমলে জমি-জায়গা ছাড়াও কোলিয়ারিতে নানা রকমের কনট্রাকটারি ধরেছিল। তাতে আরও ফেঁপে ফুলে ওঠে। বিস্তর পয়সা এলে যা হয়–শবাবিতে ধরে যায়, ফকিরদেরও তাই হল, নবাবিতে ধরল। পয়সা ওড়াতে লাগল চোখ বুজে। কিন্তু ওই যে বলে, চিরদিন সমান যায় না। ফকিরদেরও হল তাই অবস্থা। অবস্থা পড়তে শুরু করল, রবরবা কমতে লাগল।"

তারাপদ বলল, "কেন?"

কিকিরা বললেন, "ঠাকুরদার আমলে ছিল এক। বাবা কাকার আমলে হল তিন। ফকিরের বাবার আরও দুই ভাই ছিল। ফকিরদের আমলে সেটা আরও ভাগ হয়ে গেল। তার মানে এই নয় যে, সে ফকির হয়ে গিয়েছে, এখনো যা আছে, তাতে তোমার আমার মতন মানুষের বরাতে থাকলে বর্তে যেতুম।"

"মানে এখনো বেশ আছে?"

"ওদের কাছে বেশ নয়, তোমার আমার কাছে যথেষ্ট।"

"গোলমালটা কেথায়?"

"মুখে শুনলে গোলমালটা ভাল বুঝতে পারবে না। চোখে দেখলে আঁচ করতে পারবে খানিকটা। তা হলেও ঘটনাটা ছোট করে শুনে রাখো।" কিকিরা একবার মুখ ফিরিয়ে বাইরেটা দেখে নিলেন। আবার স্টেশন এসে গেল। বললেন, "ফকিরদের বিষয়-সম্পত্তি এখন একরকম ভাগ-বাঁটরা হয়ে গিয়েছে। যে-সব সম্পত্তি কেউ কাউকে ছাড়তে রাজি নয়, তাই নিয়ে কোর্ট কাছারি চলছে। এইরকম এক সম্পত্তি ঘোড়া-সাহেবের কুঠি।"

"ঘোড়া-সাহেবের কুঠি? সেটা আবার কী?"

"একটা বাড়ি। যেমন-তেমন বাড়ি অবশ্য নয়; দুর্গ বলতে পারো। পাথরের তৈরি। এক-

একটা পাথর হাতখানেকের বেশি লম্বা। চওড়াও আধ হাত।“

“কী পাথর?”

“এমনি পাথর, সাধারণ। পাথরের বাড়ি দেখোনি?”

তারাপদ ঘাড় হেলাল। দেখেছে।

গাড়ি থামল। সামান্য থেমে আবার চলতে শুরু করল।

তারাপদ বলল, “বলুন তারপর। ঘোড়া-সাহেবটা কে?”

কিকিরা বললেন, “অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। তা ধরো বছর পঞ্চাশ তো বটেই। তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। এ-দিককার অনেক কোলিয়ারির মালিকানা ছিল সাহেবদের। ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার বেশির ভাগই ছিল সাহেব। ওয়েলকাম কোলিয়ারিজ বলে একটা কোম্পানি ছিল সাহেবদের। এদিকে তাদের ছোট-বড় অনেকগুলো কয়লাকুঠি ছিল। ফারকোয়ার সাহেব বলে এক সাহেব ছিল। সে-ই কয়লাকুঠিগুলোর সর্বেসর্বা। এজেন্ট অ্যান্ড জেনারেল ম্যানেজার। ঘোড়া-সাহেবের কুঠি ছিল তাঁর বাংলো আর অফিস দুই-ই।”

“তা ঘোড়া-সাহেব নাম হল কেন?” তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

“সাহেবের ঘোড়া বাকি ছিল। আস্তাবল ছিল বাংলোয়, ঘোড়া রাখতেন, ঘোড়ার তদ্বির করার জন্যে লোজন থাকত। সাহেব নিজে প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে সকাল-বিকেল টহল মারতেন। তাই লোকে নাম দিয়েছিল ঘোড়া-সাহেব।”

তারাপদ মাথা নাড়ল। ব্যাপারটা যেন সহজ হল এতক্ষণে। বলল, “ঘোড়া-সাহেবের বাড়ি আপনি দেখেছেন?”

“দেখেছি বই কি! আমাদের ছেলেবেলায় ওটা দেখার মতন জিনিস ছিল। ধরো, কলকাতায় যেমন মনুমেন্ট। সবাই অন্তত একবার তাকিয়ে দেখে। ঘোড়া-সাহেবের কুঠি দেখা ছিল সেইরকম। ওখানকার মানুষ, গাঁ-গ্রামের লোক, কোলিয়ারির লোকজন, সবাই দেখত। বাইরে থেকেই। বিঘে আট-দশ জমি, মস্ত পাঁচিল, নানা রকম গাছগাছালি, ফুলের বাগান, মধ্যিখানে দোতলা বাংলো ঘোড়া-সাহেবের। পাশেই ছিল নালার মতন এক নদী, নুনিয়া। বর্ষায় জল থাকত, অন্য সময় শুকনো।...তা আমাদের যখন বাচ্চা বয়েস, তখন ঘোড়া-সাহেব বুড়ো হয়ে পড়েছেন। তিনি আর বেশিদিন থাকেননি, নিজের দেশে ফিরে গেলেন। অন্য কে একজন এল, তার নাম মনে নেই।”

“আপনিও কি কালীপাহাড়ির লোক?”

“না না, লোক নই। আমার মামা কাজ করত একটা কোলিয়ারিতে। মাঝে মাঝে মামার বাড়ি গিয়ে থাকতাম। আর ফকিরের সঙ্গে আমার ভাব স্কুলে। আমি শহরের স্কুল-বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম, ফকির আসত বাড়ি থেকে।”

তারাপদ এবার একটা সিগারেট ধরাল।”তারপর বলুন, কী হল?”

কিকিরা বললেন, “ওয়েলকাম কোম্পানির সুদিন ফুরলো। ঘুষিকের দিকের একটা কোলিয়ারিতে বিরাট এক অ্যাকসিডেন্ট হল। আরও পাঁচরকম গোলমাল। ওয়েলকাম

কোম্পানি তাদের কোলিয়ারি বেচে দিতে লাগল। দু-একটা করে। ঘোড়াসাহেবের কুঠি ফাঁকা হয়ে গেল। মারোয়াড়ি, কচ্ছিরা কোলিয়ারি কিনে নিতে লাগল। এক বাঙালি ভদ্রলোকও কিনলেন একটা। তিনিই ওই ঘোড়াসাহেবের কুঠিটা কিনেছিলেন। বাগান-টাগানের বেশির ভাগই তখন নষ্ট। কিন্তু সেই ভদ্রলোক বেশিদিন বাঁচেননি। অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন। তখন ফকিরদের উঠতি সময়, টাকা আসছে বস্তা বস্তা। ফকিরের বাবা আর কাকা বেশ সস্তায় ওই কুঠি সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর কাছ থেকে কিনে ফেললেন। কেন যে কিনলেন নিজেরাও জানেন না। পয়সা আছে, লোকের কাছে চাল দেখাতে হবে বলেই বোধ হয়। ওই কুঠিতে কেউ কিন্তু থাকতে যায়নি। খানিকটা ভয়ে, খানিকটা দরকার পড়েনি বলে। ঘোড়া-সাহেবের কুঠি ধীরে ধীরে জঙ্গল হয়ে আসতে লাগল। ফকিরের বাবা কাকা একসময়। এক একরকম প্ল্যান করতেন বাড়িটাকে নিয়ে। কাজে কিছুই করতেন না। শেষে ফকিরদের মন্দ দিন এল। মারা গেলেন ফকিরের বাবা। বছর কয় পরে মেজকাকা। ফকিররা সব সেয়ানা হয়ে উঠেছে ততদিনে, জমিজমা ব্যবসাপত্র দেখছে। শরিকের ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। সেটা আর থামল না। পরিবার আলাদা হল, ভাঙল, বিষয়সম্পত্তি ভাগাভাগি হতে লাগল, মামলা ঝুলতে থাকল মাথায়।” কিকিরা একটু থামলেন। আবার বললেন, “ফকিরের নিজের ছোট ভাই তার সব বেচেবুচে বিদেশে চলে গেছে। কাকার ছেলেদের মধ্যে ছোটজন পুরীতে থাকে। ব্যবসা করে হোটেলের।”

প্যাসেঞ্জার গাড়িটা আপন খেয়ালে চলছে। থামছে, চলছে, আবার থামছে। লোকও উঠছে নামছে কম নয়।

তারাপদ বার দুই হাত তুলল। বলল, “ঘোড়া-সাহেব কুঠির ইতিহাস তো শুনলাম। কিন্তু গণ্ডগোলটা কী নিয়ে?”

কিকিরা বললেন, “গণ্ডগোল বাড়িটা নিয়ে। ফকিররা বাড়িটা তাদের বলে দাবি করছে, আবার তার খুড়তুতো ভাই বলছে, বাড়ি তাদের।”

“এটা তো মামলা-মকদ্দমা করে ঠিক করতে হবে। বাড়িটা কাদের! তাই না?”

“হ্যাঁ, সেই রকমই। কিন্তু এর মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।”

“কী কাণ্ড?”

“ওই বাড়ির দোতলায় একজন খুন হয়েছে।”

“খুন হয়েছে?” তারাপদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিকিরার দিকে। কিকিরা বললেন, “খুন হয়েছে, কিন্তু যে-খুন হয়েছে, তাকে ঘরে কিংবা নিচে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুন হবার পর সে বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে।”

তারাপদ বলল, “তা আবার হয় নাকি?”

“হয় না,” মাথা নাড়লেন কিকিরা।”তুমিও জানো হয় না, আমিও জানি হয় না। কিন্তু ফকিরের বড় ছেলে বলছে, সে স্বচক্ষে খুন দেখেছে।”

তারাপদ বিশ্বাস করল না। বলল, “সে কেমন করে বলছে? খুনের সময় সে ছিল সামনে?”

“হ্যাঁ, ছিল।”

“বয়েস কত ছেলেটির?”

“বছর কুড়ি-একুশ। ফকিরদের সব অল্পবয়সে বিয়ে-থা হত। কাজেই, তার বড় ছেলে এখন সাবালক।”

তারাপদর সন্দেহ হল। বলল, “ছেলেটার মাথায় গোলমাল নেই তো?”

“আগে ছিল না। এই ঘটনার পর হয়েছে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। ভূতে পেলে যেমন হয়।”

তারাপদ ঠিক ধরতে পারল না।”কেন?”

“ভয়ে।” বলে একটু থেমে কিকিরা বললেন, “ওর মাথায় ঢুকেছে, পুলিস ওকে ধরবে। এটা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ।”

“উদ্দেশ্য?”

“উদ্দেশ্য নানা রকম হতে পারে। তবে একটা উদ্দেশ্য, ফকিররা যেন আর ঘোড়া-সাহেবের কুঠির দিকে নজর না দেয়।”

“তার মানে–” তারাপদ বলল, “ফকিরের খুড়তুতো ভাইরা প্যাঁচ মেরে কুঠিটা বাগাবার চেষ্টা করছে?”

“ভাইরা নয়, ভাই। খুড়তুতো এক ভাইকে নিয়েই গোলমাল। ফকির তাই বলে।”

তারাপদ কিছুক্ষণ যেন কিছু ভাবল, তারপর বলল, “একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। খুনই যদি হবে, তবে তো সেটা পুলিশকে জানানো হয়েছে। আর পুলিশ যদি জানে, তারা তো মুখ বুজে থাকবে না। ফকিরের ছেলেকেই বা ধরবে কেন?”

কিকিরা পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করলেন। বাহারি চৌকোনো ডিবে। তারাপদ আগে কখনো কিকিরাকে নস্যি নিতে দেখেনি। অবাক হল। কিছু অবশ্য বলল না।

নস্যির টিপ নাকের কাছে ধরে আস্তে আস্তে টানলেন কিকিরা। বললেন, “মজাটা তো সেইখানে, তারাপদবাবু! যে খুন হয়েছে তাকে যদি জলে-স্থলে খুঁজে না পাওয়া যায়–তবে পুলিসের কাছে কে প্রমাণ করবে, অমুক লোক খুন হয়েছে। বড় জোর বলতে পারে–আমাদের অমুক লোক বেপাত্তা হয়েছে। ফকিরের খুড়তুতো ভাই পুলিসে যায়নি, যেতে পারছে না–শুধু এই কারণেই। প্রমাণ কী খুনের? কিন্তু থানায় না গিয়ে আড়ালে থেকে ফকিরকে চাপ দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে, আর তার ছেলেটাকে তো আধ পাগলা করে তুলেছে। বুঝলে?”

“কিন্তু ফকিরের ছেলে তো খুনি নয়।” তারাপদ বলল।”

“সে বলছে, নয়। কিন্তু অন্যপক্ষ যদি প্রমাণ করতে পারে, ফকিরের ছেলে খুনি-তা হলে!”

তারাপদ কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। বলল, “ভাল বুঝলাম না।”

“মুখে শুনে এর বেশি কিছু বুঝবে না। জায়গায় চলো; থাকো কয়েকদিন। ওদের সবাইকে

চোখে দেখো—তখন বুঝতে পারবে।”

কিকিরা জল খাবার জন্যে উঠলেন। ওয়াটার বটল ঝুলছিল একপাশে।

জল খেয়ে আরামের শব্দ করলেন কিকিরা। “একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক, কী বলো?”

তারাপদ বলল, “নিন।”

“একেবারে ভোরের মুখে কালীপাহাড়ি পৌঁছব। তুমিও শুয়ে পড়ো।”

তারাপদর আবার হাই উঠল। সারাটা দিন কম হুড়োহুড়ি যায়নি। একবার চন্দনের কাছে, তারপর অফিস, অফিস থেকে ফিরে কিছু কেনাকাটা, সেখান থেকে কিকিরার বাড়ি। চরকিবাজি চলছে আজ।

হাই-জড়ানো গলায় তারাপদ বলল, “আমি কিন্তু মড়ার ঘুম ঘুমোব। আপনি সময়-মতন ডাকবেন।”

কিকিরা বললেন, “তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও।”

০৩.

তখনো ভোর হয়নি, সাদাটে ভাব ফোটেনি আকাশে, গাড়ি এসে কালীপাহাড়ি স্টেশনে পৌঁছল। কিকিরা খানিকটা আগেই তারাপদকে ঘুম থেকে ডেকে দিয়েছিলেন।

স্টেশনে গাড়ি থামতেই দু'জনে মালপত্র সমেত নেমে পড়ল। তারাপদর লাগেজ বলতে একটা সুটকেস আর কাঁধ-ঝোলা। কিকিরার সঙ্গে ছিল কালো রঙের এক ট্রাভেলিং ট্র্যাংক, গোটা-দুই বেয়াড়া সুটকেস। ট্র্যাংকটা যে কেন সঙ্গে নিয়েছেন কিকিরা, তারাপদর মাথায় আসছিল না। কলকাতায় তারাপদ জিজ্ঞেস করেছিল, "এই গন্ধমাদনটা আপনি কেন নিচ্ছেন? ওঠাতে-নামাতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।" কিকিরা খানিকটা রহস্য করে জবাব দিয়েছিলেন, "ওটায় আমার ধনদৌলত থাকে, বাপু। সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।" তারাপদ আর কিছু বলেনি।

প্ল্যাটফর্মে নেমে তারাপদ বলল, "এখনো রাত রয়েছে।"

"আরে না, দেখতে-দেখতে ফরসা হয়ে যাবে।"

স্টেশনে লোক কিন্তু খুব একটা কম নামল না। বেশির ভাগই গাঁ-গ্রামের মানুষ। প্ল্যাটফর্মে তখনো বাতি জ্বলছে।

এমন বিদঘুটে সময় যে, কুলিও জুটছিল না। কোনো রকমে দুজনে মালপত্র প্ল্যাটফর্মে নামাতে পেরেছে। এখন সকাল না-হওয়া পর্যন্ত হাঁ করে বসে থাকা।

"আপনার বন্ধুর বাড়ি থেকে তোক আসবে না?" তারাপদ বলল।

"আসবে। এত ভোর-ভোর আসা, একটু দেরি হচ্ছে বোধহয়।"

"আমরা তা হলে কী করব?"

"এখানে বসে থাকি খানিকক্ষণ।"

তারাপদর গা শিরশির করছিল। শরঙ্কাল। ভোর হয়ে আসার আগের মুহূর্ত। এই সময় গা শিরশির করাই স্বাভাবিক। ওভারব্রিজের বাঁ দিকে মস্ত-মস্ত গাছ। ডান দিকে ঘরবাড়ি। আসলে, স্টেশনটা নিচে, দু পাশে বালিয়াড়ির মতন উঁচু জমি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে তারাপদ কাছাকাছি পায়চারি করতে লাগল। বেশ লাগছে ঠাণ্ডা বাতাস, একটু হিম-হিম ভাব রয়েছে। আকাশ সাদা হয়ে আসছে বোধ হয়। কিকিরা ঠিকই বলেছিলেন।

আর খানিকটা পরে একেবারে ফরসা হবার মুখে-মুখে ফকিরের বাড়ি থেকে জনা-দুই লোক চলে এল।

দু'জনেই কিকিরার চেনা। লোচন আর নকুল। লোচন ফকিরদের বাড়ির কাজের লোক, বাইরের কাজকর্মগুলো সে করে; আর নকুল গাড়ির ড্রাইভার।

কিকিরার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুজনে ভারী ট্র্যাংকটা তুলে নিল। বললে, গাড়িতে রেখে

আবার আসছে।

তারাপদ কৌতূহলের সঙ্গে দু’জনকেই দেখছিল। দু’জনেই গড়নে-পেটনে তাগড়া। নকুল বেঁটে, বয়সেও কম, পঁচিশ হবে। একমাথা চুল, ভোঁতা মুখ। লোচনের বয়েস খানিকটা বেশি, বছর পঁয়ত্রিশ তো হবেই। মাথায় সে মাঝারি।

দু’জনে যেভাবে অক্লেশে ভারী ট্র্যাংকটা নিয়ে ওভারব্রিজে উঠতে লাগল, মনে হল এ-সব তাদের কাছে সাধারণ ব্যাপার।

তারাপদ তারিফ করার গলায় বলল, “গায়ে বেশ ক্ষমতা তো?”

কিকিরা বললেন, “ওরা কি কলকাতার লোক হে, রোদে-জলে তেতেপুড়ে মানুষ। ওই নকুল সের দেড়েক ভাত নাকি একপাতে বসে খেতে পারে। বিশ-পঁচিশখানা রুটি হজম করা ওর কাছে কিছুই নয়।”

হাসল তারাপদ। ”খাইয়ে লোক।”

“শুধু খাইয়ে নয়, খুন-জখম করতেও ওস্তাদ।”

ঘাবড়ে গেল তারাপদ। “মানে? ও কি খুন-জখম করে বেড়ায়?”

“খুন করে কি না জানি না, তবে জখম করে। ফকিরের গাড়ি নকুলই চালায়। ফকির বড়-একটা দূরে কোথাও যায় না গাড়ি নিয়ে।”

“কেন?”

“এমনিতে তো শত্রুর অভাই নেই আজকাল। তার ওপর ব্যবসাপত্রের জন্যে দূরে যখন যেতে হয়, কাঁচা টাকা সঙ্গে থাকে। হয় আদায় করে ফিরছে, না হয় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। রাত-বিরেত হয়ে যায়। এসব জায়গায় হামেশাই ডাকাতি হয়।”

“নকুল তা হলে ফকিরবাবুর বডিগার্ড?” তারাপদ বলল।

”খানিকটা তাই।”

ফরসার ভাব আরও বেড়ে গেল। এখন কাছাকাছি অনেক কিছুই চোখে পড়ছে স্পষ্টভাবে। তারাপদ স্টেশন, গাছপালা, প্ল্যাটফর্ম দেখছিল।

লোচন আর নকুল ফিরে এল।

জিনিসপত্র উঠিয়ে চারজনেই এবার এগিয়ে চলল ওভারব্রিজের দিকে।

তারাপদ হাঁটতে হাঁটতে গন্ধ শুকছিল। সকালের গন্ধ। গাছগাছালি থেকে কী সুন্দর গন্ধ উঠছে এই সকালে, বনতুলসীর ঝোপ বাঁ দিকে, তারই সামান্য তফাতে মাঠ। ওভারব্রিজের বাঁ দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনে তাকালে কিছুটা দূরে কয়লার স্তূপ চোখে পড়ে, সেই কয়লার একটা কাঁচা গন্ধও যেন বাতাসে মেশানো রয়েছে।

“এ-দিকে হে,” কিকিরা তারাপদকে ডান দিকে টানলেন।

ওভারব্রিজের ডান দিক দিয়ে নিচে নামলেই স্টেশনের কম্পাউন্ড। একটা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যায় ফকিরবাবুর জিপ। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, বেশ পুরনো কাজ-চালানো গোছের গাড়ি।

স্টেশনের দোকানপত্র এক-এক করে খোলার তোড়জোড় চলছিল। চায়ের স্টলের সামনে উনুনে ধোঁয়া উঠছে, দুটো কুকুর ঘুমিয়ে রয়েছে, একপাশে, বারোয়ারি কলকতলায় নিমের দাঁতন হাতে একটি কুলি দাঁড়িয়ে আছে।

তারাপদ বলল, "এক কাপ চা খেয়ে নিলে হত না?"

"বেশ তো, চলো," কিকিরা বললেন, "আমারও হাই উঠছে।" বলেই লোচনকে ডাকলেন, "লোচন, চা-সেবা হবে নাকি? তোমরা মালগুলো রেখে এসো।"

স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কিকিরা। চায়ের কথা বললেন।

চা-অলা সকালের বউনির জন্যে মন দিয়ে চা করতে লাগল।

"কেমন লাগছে, তারাপদ?"

"ভালই লাগছে।"

"খানিকটা ভেতর দিকে চলো, আরও ভাল লাগবে। একসময় বড় সুন্দর জায়গা ছিল–এখন কোলিয়ারি আর কয়লা সব গিলে খাচ্ছে। গাছপালা, মাঠঘাট কতটুকু আর আছে!"

চা তৈরি হল। কিকিরা লোচনদের ডাকলেন।

খানিকটা সঙ্কোচ বোধ করলেও লোচনরা কাছে এল, চায়ের খুরি হাতে নিয়ে আবার জিপগাড়ির দিকে চলে গেল।

তারাপদ আর কিকিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেতে লাগলেন।

তারাপদ হঠাৎ বলল, "ফকিরবাবুর জিপ দেখে মনে হচ্ছে, ওটারও ঘুম ভাঙেনি।" বলে হাসল।"কেমন ময়লা দেখছেন?"

কিকিরা বললেন, "কোলিয়ারির গাড়ি ওই রকমই হয় হে, এ কি তোমার কলকাতা? কয়লার দেশ। চলো না রাস্তাঘাটের চেহারা দেখবে।"

জিপগাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তারাপদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "ফকিরাবুর কি ওই একটিই ছেলে?"

"দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। বড় বিশু–মানে বিশ্বময়; ছোট, অংশু। মেয়ে সকলের ছোট। পূর্ণিমা। বড় মিষ্টি দেখতে! ফকিরের ছেলেমেয়েদের সকলকেই দেখতে সুন্দর। ফকির নিজেও দেখতে সুপুরুষ ছিল। গ্রামে যাত্রাপার্টি করেছিল ফকির, রাজাটাজা সাজত।" কিকিরা হাসলেন।

চা খাওয়া শেষ করে তারাপদ আবার একটা সিগারেট ধরাল। একটা কথা সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল কিকিরা ফকিরের বাল্যবন্ধু শুধু নন, ফকিরকে তিনি ভালবাসেন। কিকিরার

কথাবার্তা বলার ধরনে সেটা বোঝা যায়।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে কিকিরা বললেন, "চলো, যাওয়া যাক।"

কিকিরা আর তারাপদকে সামনেই বসিয়ে নিল নকুল। পেছনে মালপত্র সমেত লোচন।

স্টেশনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে গাড়ি ডান দিকে ঘুরল।

তারাপদর ভালই লাগছিল। কিকিরা মিথ্যে বলেননি। জিপ মিনিট দশেক ধরে চলছে, সকালও হয়ে গিয়েছে, রোদ উঠল এইমাত্র, রাস্তা ভাল নয়, কিন্তু চারপাশে কত রকম দৃশ্য ছড়িয়ে আছে। মস্ত-মস্ত নিমগাছ, বট, ছোট-ছোট কুঁড়ে, সাঁওতাল গোছের মেয়ে-পুরুষ চোখে পড়ছে, মুরগি চরছে কুঁড়ের সামনে, কুকুর, হঠাৎ খানিকটা জায়গায় ধানের খেত, তারপরই নেড়া মাঠ, কোথাও সামান্য জল জমে রয়েছে পুকুরের মতন, শালুক ফুল ফুটছে, আবার দূরে তাকালে কোলিয়ারির পিটও দেখা যাচ্ছে।

দেখছিল তারাপদ। জায়গা বেশ শুকনো, পানা-পুকুর কিংবা বাঁশঝাড় চোখে পড়ে না। বরং পলাশ-ঝোপ আর কুল-ঝোপই বেশি চোখে পড়ে। হ্যাঁ, একপাশে অনেক কাশফুল ফুটে আছে। বাতাসে দুলছে। চোখ জুড়িয়ে যায়।

জিপ আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল।

কিকিরা বললেন, "আর তিন-চার মিনিট।"

তারাপদর হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ কানে এল। কোথায় যেন ঢাক বেজে উঠল। এই বাজনা একেবারেই আলাদা, কলকাতার মতন নয়, কানে বড় মিষ্টি লাগছিল। মনে পড়ল আজ সপ্তমী পুজো। কলকাতায় থাকলে তারাপদ এতক্ষণে বটুকবাবুর মেসে পড়ে-পড়ে ঘুমোত। আর এখানে সে চোখ চেয়ে-চেয়ে সব দেখছে ওই যে কত বড় ধানখেত, সবুজ হয়ে রয়েছে, মাথা দুলছে ধানের শিষের; ওই দেখো কত বিরাট এক পুকুর আর্ট-দশটা আমগাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে; ছোট্ট এক টুকরো খেত, সবজি ফলেছে। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল তারাপদর। আকাশ রোদে রোদে ভরে উঠছে, পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে সাঁতরে।

কেমন যেন ঘোর এসেছিল তারাপদর, আচমকা জিপগাড়ির হর্নে চমকে উঠল। তারপরই দেখল, দোতলা এক বিরাট বাড়ির সামনে এসে তাদের গাড়ি থামল। ওই বাড়িরই গালাগানো ঠাকুর-দালান থেকে ঢাকের শব্দ আসছে।

কিকিরা নেমে পড়লেন। তারাপদ আগেই নেমেছে।

"ফকিরদের বাড়ি," কিকিরা বললেন, "আদি বাড়ি।"

বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় একালের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, পুরনো টঙ, পুরনো ছাঁদ। কলকাতায় চিতপুরের গলির মধ্যে, বউবাজারের এ-গলি ও-গলিতে এই ছাঁওদর বাড়ি দেখেছে তারাপদ। সামনের দিকে কোনো ভাঙচুর নেই, একেবারে সটান, লম্বার দিকটা বেশি, বড়বড় থাম, মোটা পাঁচিল, খড়খড়িকরা দরজা জানালা। রং-চং তেমন কিছু চোখে পড়ছিল না।

লোচন আর নকুল জিনিসপত্র নামাতে লাগল।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "এবাড়ি কত কালের?"

"সামনের দিকটা অনেককালের। শ খানেক বছরের। পেছনের দিকটা পরে হয়েছে–ফকিরের বাবা কাকারা করেছিলেন। তাও সেটা ধরো বছর পঞ্চাশ-ষাট আগেকার।"

"ঠাকুর-দালান বাইরে কেন?"

"অন্দরমহল আলাদা রাখার জন্যে। গ্রামের লোকজন আসে যায়, দু-চারটে দোকানও বসে, তার ওপর এই যাত্রা–এ-সবের জন্যে বোধহয়। ভেতরেও ফকিরদের গৃহদেবতার ঘর রয়েছে।"

কথা বলতে বলতে তারাপদ কিকিরার সঙ্গে ভেতরে এল। এসে অবাক হয়ে গেল। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না যে, ভেতরটা স্কুল বাড়ির মৃতন। মাঝখানে মস্ত চাতাল-অনায়াসেই টেনিস খেলা যায়–এত বড়সড় ফাঁকা জায়গা। আর চারদিক ঘিরে ফকিরের বাড়ি। সবটুকুই প্রায় দোতলা, শুধু একপাশের খানিকটা একতলা। দোতলার বারান্দা আর রেলিং দেখা যাচ্ছিল।

এক-তলার দিকটা আঙুল দিয়ে দেখালেন কিকিরা।"ওই আমাদের আস্তানা। বাইরের লোকজন এলে ওখানে থাকে।"

"কিন্তু আপনি তো বাইরের লোক নন, স্যার।"

"না, ঠিক সেভাবে নই, তবে যেখানের যা আচার। আমি যখনই আসি, ওখানে থাকি।"

"আসেন মাঝে-মাঝে?"

"আসি। ফকির আমার নিতান্ত বন্ধুই নয়, ভাইয়ের মতন।"

তারাপদ আর কিছু বলল না।

প্রায় গোটা বাড়ি পাক দিয়ে তারাপদ নিজেদের জায়গায় এসে পৌঁছল। ততক্ষণে লোচনেরা ঘর খুলে দিয়েছে। জিনিসপত্রও রাখছে নামিয়ে। ফকিরদের বাড়ির লোকজনের গলা পাওয়া যাচ্ছিল। দু-একজনকে দেখাও গেল।

ঘরে ঢুকে তারাপদ থমকে দাঁড়াল। তাকাল চারপাশ। তারপর বলল, "বাঃ! বেশ ঘর তো।"

পছন্দ হবার মতনই ঘর। বড়সড়। বিরাট-বিরাট জানলা। কাচের শার্সি আর খড়খড়ি দুইই রয়েছে। দরজা-জানলা সবই ভোলা। বাইরে গাছপালা, বাগান। রোদ নেমেছে বাগানে।

কিকিরা বললেন, "এটা আমার ঘর; তোমারটা পাশে। "

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "এত বড়বড় ঘরে মাত্র একজনের থাকার ব্যবস্থা?"

হাসলেন কিকিরা। বললেন, "একেই বলে বনেদিয়ানা। ফকিরলাটের ব্যাপার?" বলে আবার হাসলেন, "আমরা ফকিরের বড়লোকি দেখে ওকে ঠাট্টা করে লাট বলতাম।"

তারাপদ আসবাবপত্র দেখছিল। যা যা প্রয়োজন, সবই গোছানো।

লোচনরা গেল পাশের ঘর খুলতে।

তারাপদ ঘরের বাইরে দিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখছিল। এ-দিকটায় বাগান। গাছগাছালি কম নয়। এখনো ঢাক বাজছে। শিউলি ফুলের গন্ধও পাচ্ছিল তারাপদ।

হঠাৎ বিশ্রী কানফাটা আওয়াজে চমকে উঠল তারাপদ। সঙ্গে-সঙ্গে সরে গেল একপাশে। গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। ফাঁকায় অনেকটা ছড়িয়ে গিয়েছে শব্দটা। কাক ডাকছে, পাখিরা ভয় পেয়ে ডেকে উঠল। উড়তে লাগল গাছপালার মাথায়।

কিকিরা চেঁচিয়ে বললেন, "দরজার কাছ থেকে সরে এসো।"

তারাপদ সরে গেল। আর কোনো শব্দ হল না।

০৪.

হাত-মুখ ধুয়ে কিকিরা আর তারাপদ চা খেতে বসেছে, লোচন এসে বলল, কতাবাবু আসছেন।

তারাপদর মনটাই বিগড়ে গিয়েছিল। সপ্তমী পুজোর সকালটা শুরু হয়েছিল ভাল, চমৎকার লাগছিল তারাপদর, চোখ জুড়িয়ে আসছিল, ঝরঝরে লাগছিল শরীর-মন, হঠাৎ কোত্থেকে একটা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজে সব নষ্ট হয়ে গেল। কে বন্দুক ছুড়ল, কেনই বা ছুড়ল, তাও বোঝা গেল না।

কিকিরা বললেন, "দেখো তারাপদ, বন্দুক যেই ছুড়ক, আমাদের লক্ষ করে ছোড়েনি। তা যদি ছুড়ত তবে আগেই ছুড়ত। জিপে করে যখন আসছিলাম। বাড়িতে পৌঁছানোর পর কেন আমাদের দিকে নজর দেবে? ওটা অন্য কিছু। ফকির আসুক, জানা যাবে।"

যুক্তিটা তারাপদও স্বীকার করল। মন কিন্তু বিগড়েই থাকল।

"ফকিরবাবুর খুড়তুতো ভাইরা কোথায় থাকেন?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"ভাইরা মানে অমূল্যদের বাড়ি। সেবাড়ি এখান থেকে সিকি মাইলটাক হবে। এই যে বাড়ি দেখছ ফকিরদের, এই রকমই দেখতে, তবে বাহার একটু বেশি, আকার কিছু ছোট।"

"আপনি তো ওদের চেনেন?"

"মুখে চিনি একজনকে, ফকিরের খুড়তুতো ভাই অমূল্যকে। অমূল্যর ছেলেমেয়েদের চিনি না।"

"মানুষ কেমন?"

"সুবিধের নয় শুনেছি। বুদ্ধি খুব প্যাঁচালো, বুকের পাটা রয়েছে অমূল্যর, শুনেছি খুনটুন করিয়েছে, বেআইনি কাজকর্ম করে।"

তারাপদ এক কাপ চা শেষ করে আরও এক কাপ ঢালতে লাগল। এখানে সবই বোধ হয় এলাহি কাণ্ড। সাত-আট কাপ চা তৈরি করে একটা কাচের পটে করে দিয়ে গিয়েছে লোচন, বড় একটা কাচের প্লেটে একরাশ মিষ্টি।

চটির শব্দ পাওয়া গেল বাইরে। ফকির রায় ঘরে ঢুকলের। তারাপদ তাকাল।

কোনো সন্দেহ নেই, ফকির রায় সুপুরুষ। মাথায় বেশ লম্বা, ছ'ফুট তো হবেই'। গায়ের রঙ নিশ্চয় টকটকে লালই ছিল কোনো সময়ে, বয়েসে এবং এই কয়লার দেশে সে রঙ জ্বলে এখন তামাটে দেখায়। কাটা কাটা চোখমুখ, নাক লম্বা, গড়ন শক্ত। মাথার চুল কোঁকড়ানো। অবশ্য, চুল বেশি নেই মাথায়। অল্পস্বল্প পেকেছে।

ফকির একেবারে সাদামাটা পোশাকেই এসেছেন। পরনে দামি সাদা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, হাতে সিগারেটের প্যাকেটে আর লাইটার। গলা আর গেঞ্জির ফাঁকে পইতে দেখা যাচ্ছিল।

"এই যে কিঙ্কর, তুমি তা হলে ঠিক সময়মতনই এসে পড়েছ?" ফকির বললেন।

কিকিরা বললেন, "আমি ভাবছিলাম, তোমারই না ভুল হয়ে যায়।..আলাপ করিয়ে দিই। এই হল সেই তারাপদ। এর কথা তোমায় বলেছি। আমার সাকরেদ। আর এক সাকরেদ–চাঁদু-ডাক্তার, সে পুজোর পর আসবে।" বলে কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন, "তারাপদ, ফকিরের পরিচয় তো তুমি শুনেছ। এখন চোখে দেখো।"

তারাপদ হাত তুলে নমস্কার জানাল।

ফকিরও নমস্কার জানিয়ে কাছে এসে চেয়ার টেনে বসলেন।

কিকিরা বললেন, "নাও, চা খাও। আজ তোমার সকাল-সকাল ঘুম ভাঙল নাকি?"

বাড়তি কাপ ছিল। কিকিরা চা ঢেলে দিলেন।

ফকির বললেন, "ঘুমোলাম কোথায় যে ভাঙবে! সারা রাত জেগে। সকালে চোখ লেগেছিল, তা তুমি আসবে তো, একবার লোচনকে দেখতে বেরুলাম। ফিরে আর ঘুম এল না। নানান চিন্তা।" ফকির চায়ের কাপ তুলে নিলেন।

তারাপদ ফকিরের মুখ দেখছিল। মণির রঙ বেশ কটা, চোখের পাতা মোটা। সারা মুখে ক্লান্তি ও অশান্তির ছাপ। অনিদ্রার জন্যে ফকিরের চোখমুখ শুকনো দেখাচ্ছিল।

কিকিরা বললেন, "খানিকটা আগে বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হল? ব্যাপারটা কী?"

ফকির একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বিশু ছুঁড়েছে।"

কিকিরা যেন চমকে উঠলেন, "সে কী! বিশু? বিশু বন্দুক পেল কোথায়? তার কিছু হয়নি তো?"

"না, কিছু হয়নি।...বন্দুকটা আমার। কদিন ধরে ঘরে রাখছি, কেমন একটা ভয় এসে গিয়েছে কিঙ্কর। কিসের ভয় তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না। আমার শোবার ঘরে হাতের নাগালের মধ্যে রাখি বন্দুকটা।"

"তা না হয় রাখো; কিন্তু বিশুর হাতে গুলিভরা বন্দুক গেল কেমন করে? তা ছাড়া তুমি নিজেই জানো, বন্দুক তো বড় কথা, একটা সামান্য ছুরি ওর হাতে পড়াও সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

ফকির অপরাধীর মতন মুখ করলেন।"সবই জানি ভাই। তবু কেমন করে যে হল…।"

"কেমন করে?"

"আমার মনে হয়, আমি যখন নিচে লোচনকে ডেকে দিতে এসেছিলাম। তখন বোধহয় বিশু আমার ঘরে ঢুকছিল।"

"ও ঘুমোয়নি?"

"হয়ত রাত্তিরে ঘুমিয়েছিল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শেষ রাত্রে।"

"ওকে তো ঘুমোবার ওষুধ খাওয়ানো হয়?"

“খায়। তবে সব সময় যে সমান কাজ করবে ওষুধে–তা তো নয়।”

কিকিরা আর কোনো কথা বললেন না। বোধ হয় ফকিরকে চা খাবার সময় দিলেন।

ফকির চা খেতে-খেতে একটা সিগারেট ধরালেন। অন্যমনস্ক চিন্তিত। তারাপদর দিকে তাকালেন ফকির। ম্লান হাসলেন, “আমি বেশ খানিকটা পারিবারিক গণ্ডগোলের মধ্যে আছি। কিঙ্করের কাছে শুনেছেন?”

মাথা হেলাল তারাপদ।”শুনেছি।...গুলির শব্দে বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলাম।”

ফকির সিগারেটের প্যাকেটটা তারাপদ দিকে ঠেলে দিলেন।”ঘাবড়ে যাবার মতনই ব্যাপার। বন্দুকে টোটা ভরা ছিল। বিশু একটা অঘটন ঘটাতে পারত। ঘটায়নি এই আমার সৌভাগ্য। মা বাঁচিয়েছেন।” ফকির হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বোধ হয় দেবী দুর্গাকেই স্মরণ করলেন।

তারাপদ বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল ফকিরকে। শক্ত মানুষ নিশ্চয়, সংসারের আপদ-বিপদে পোড় খাওয়া, তবু ফকিরকে কেমন ভীত চিন্তিত দেখাচ্ছে।

কিকিরা হঠাৎ বললেন, “বিশু এমনিতে কেমন আছে?”

“সেই রকমই। উনিশ-বিশ। ভালমন্দ বোঝা যায় না। তবে আগের চেয়ে খারাপ নয়।”

“ডাক্তার আসছে?”

“কাল আসেনি। পরশু এসে দেখে গিয়েছে।”

“কে থাকছে ওর কাছাকাছি?”

“ওর মত থাকত। গত পরশু দিন ভবানী এসেছে। ভবানীই থাকে এখন।”

“ভবানী কে?”

“আমার ভাগ্নে। বড়দির ছেলে। বিশুর চেয়ে বছর দুয়েকেরে বড়, দুজনের মেলামেশা বরাবরই।“

কিকিরা চুপ করে গেলেন। কিছু ভাবছিলেন।

তারাপদ অনেকক্ষণ কথাবাতা কিছু বলেনি। তার মনে হল দু-একটা কথা বলা দরকার ফকিরবাবুর সঙ্গে, নয়ত বড় খারাপ দেখাচ্ছে। তারাপদ বলল, “বিশু বন্দুক ছুঁড়তে পারে? না এমনি অন্ধাড়াক্কা ছুঁড়ে ফেলেছে?”

ফকির তাকালেন তারাপদর দিকে, “পারে। আমার ছোট ছেলেও বন্দুক ছুঁড়তে জানে।”

কথাটা এমনভাবে বললেন ফকির যে, তারাপদর মনে হল, এ বাড়ির ছেলেদের ওটা শিখে রাখতেই হয়।

“ও বাড়ির খবর কী?” কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

“অমূল্যদের কথা বলছ? কাল একবার এসেছিল। ওরাও আজকাল দুগা পুজো করে, বলতে এসেছিল। বিশুকে দেখতে চাইছিল। এড়িয়ে গিয়েছি।

কিকিরা কপাল কুঁচকে চোখ ছোট করে ফকিরকে দেখছিলেন। দেখতে-দেখতে বললেন, “কিছু বলল?”

“না, সরাসরি কিছু বলল না। তবে হাবেভাবে বুঝিয়ে গেল, বিশুকে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।”

“তুমি কিছু বললে না?”

“বলেছি। ঘুরিয়ে বলেছি। বিশুর যদি কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করে আমি তাকে ছেড়ে দেব না। আমার হাতে সে মরবে।” ফকিরের কটা চোখ ঝকঝক করে উঠল প্রতিহিংসায়।

কিকিরা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নিলেন।”না, না, এখন মাথা গরম করে কাজ করার সময় নয়, ফকির। মাথা গরম করলে কিচ্ছু হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় যা করার করতে হবে। তা ছাড়া তুমি ভাবছ কেন? অমূল্যদের হাতে যদি তেমন কোনো প্রমাণ থাকত, তবে তারা থানা-পুলিশ না করে বসে থাকত নাকি এতদিন?”

“সবই জানি, ভাই। আমার বরাতের দোষ, নয়ত আর কী বলব, বলো? আমি নিজেই বুঝতে পারি না, বিশু কেন, কার পাল্লায় পড়ে ঘোড়াসাহেবের কুঠিতে গেল? কী দরকার ছিল তার ওখানে যাবার?”

কিকিরা বললেন, “ছেলেমানষ, এত কি বুঝতে পেরেছিল!..যাক, সে পরে ভাবা যাবে। এখন অন্য ক’টা কাজের কথা বলি, শোনো।”

“বলো?”

“তোমার কাছে তোমাদের সাত-পুরুষের একটা বংশলতিকা গোছের কি আছে না?”

“আছে একটা। সাতও হতে পারে, দশও হতে পারে।”

“সেটা একবার পাঠিয়ে দিতে পারো না?”

“অনায়াসেই পারি।”

“তা হলে পাঠিয়ে দিও, এ-বেলাতে।...এবার আর একটা কথা বলল, তোমার বাবা কাকারা তিন ভাই ছিলেন তো?”

“হ্যাঁ। তিন ভাই দুই বোন।”

“অমূল্যের বাবা তোমার মেজো কাকা? ছোট কাকা মারা গেছেন। কবে তুমি জানো?”

“জানি বই কি। বছর বারো–হাঁ, মোটামুটি তাই হবে।”

“তুমি বলেছিলে, এখানে মারা যাননি।

“না। ছোটকাকার শেষের দিকে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ভাব হয়েছিল। বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। কোথায় ঘুরে বেড়াত কে জানে! কেউ বলত শ্মশানে বসে সাধনা করে, কেউ বলত পঞ্চকোট পাহাড়ের তলায় ধুনি জ্বেলে বসে থাকে। আমরা সঠিক কিছু জানি না।”

“ছোটকাকা মারা গিয়েছেন, এটা কেমন করে জানলে?”

“একদিন এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী এসে খবর দিয়েছিল।”

“কী ভাবে মারা গিয়েছিলেন ছোটকাকা?”

“সাপের কামড়ে।”

“মৃতদেহ তোমরা কেউ দেখোনি তো?”

“না। বরাকর নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।”

“সেই কাকার কে কে আছে?”

“কাকিমা বেঁচে আছেন। কাকার ছেলেমেয়ে নেই। কাকিমা এখানে। কেন না। বহুকাল। বাপের বাড়ি কাশীতে সেখানেই থাকেন। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই নেই। তা তুমি এ-সব জিজ্ঞেস করছ কেন? সবই তো আগে শুনেছ।”

কিকিরা তারাপদর দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, “তারাপদ শুনে রাখল।...যাক, তুমি একবার তোমাদের ওই বংশের লিস্টিটা পাঠিয়ে দাও। ভাল করে একবার দেখব। আর শোনো, আজ বিকেলে আমি আর তারাপদ একবার ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে যাব। তারাপদকে দেখিয়ে আনব কুঠিটা। তুমি কিছু ভেব না। আমরা সাবধানে যাব-আসব।”

০৫.

ফকির রায়দের বাড়ি থেকে ঘোড়া-সাহেবের কুঠি মাইল দুয়েকের পথ। মাঠঘাট ভেঙে গেলে সামান্য কম। ফকির চেয়েছিলেন, কিকিরাদের সঙ্গে নকুল যাক জিপ নিয়ে; কিকিরা রাজি হননি। জিপের দরকার নেই, মাঠ ভেঙে হাঁটাপথে তাঁরা চলে যাবেন। জিপ সঙ্গে থাকলে পাঁচজনের চোখ পড়বে, হাঁটাপথে বেড়াতে বেরুলে কে আর নজর করবে।

বিকেলে ছোট হয়ে আসছে, আলো থাকতে-থাকতেই কুঠিতে পৌঁছতে চান কিকিরা পড়ন্ত বেলার রোদ নিস্তেজ হয়ে আসার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন তারাপদকে নিয়ে।

রোদ সরাসরি মুখে লাগায় সামান্য অস্বস্তি হচ্ছিল তারাপদর। নয়ত এই হাঁটাপথ তার ভালই লাগছিল এখানকার মাঠের চেহারা খানিকটা আলাদা, অনবরত উঠছে আর নামছে, যেন ঢেউ-খেলানো মাঠ, মাটির রঙ কোথাও কোথাও গেরুয়া রঙের হলেও বেশির ভাগটাই কালচে গোছের। পায়ে-পায়ে পলাশ-ঝোপ, আর আকন্দ। কিকিরা চিনিয়ে দিচ্ছিলেন ওটা শিশুগাছ, ওকে বলে অর্জুন।

কিকিরা যে এই অঞ্চলের অনেক কিছুই জানেন, বেশ বোঝা যাচ্ছিল। এমনকী, তিনি ঘোড়া-সাহেবের কুঠি যাবার মেঠো রাস্তাও বেশ চেনেন।

তারাপদ একবার ঠাট্টা করেই বলেছিল, "কিকিরা স্যার, ঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবেন তো?"

কিকিরা জবাব দিয়েছিলেন, "চলো দেখবে, সব জায়গায় মাকা করে এসেছি।"

কথাটা ঠিকই। কদিন আগেই কিকিরা ফকিরের বাড়িতে এসে দশ-পনেরো দিন থেকে গিয়েছেন, তখন লোচনকে নিয়ে বার তিনেক এই হাঁটাপথেই ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে গিয়েছেন এসেছেন। অবশ্য কোথায় কী মাকা করে এসেছেন তিনিই জানেন।

মাঠ দিয়ে যেতে-যেতেই সামান্য তফাতে কয়লাখনিও চোখে পড়ছিল। লোহার উঁচু-উঁচু থাম, তার মাথায় বিশাল চাকা ঘুরছে, ডুলি উঠছে নামছে, কয়লার টব গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কুলি মজুর, এক-এক জায়গায় কয়লার পাহাড় জমে আছে, বাতাসে কেমন কয়লা-কয়লা গন্ধ।

বেশ খানিকটা রাস্তা এগিয়ে এসে গাছপালা ঝোপঝাড় পাওয়া গেল। ছায়াও ঘন। তারাপদ বলল, "স্যার, একটু জল খেয়ে নিই। আপনার বন্ধুর বাড়িতে যেভাবে খেয়েছি, তাতে গলা পর্যন্ত বুজে আছে এখনো।"

তারাপদর কাঁধেই জলের বোতল ঝুলছিল। কিকিরাই নিতে বলেছিলেন। তারাপদ জল খেল।

কিকিরাও জল খেয়ে নিলেন। ঢিলেঢালা পোশাক তাঁর, হাতে একটা সরু ছড়ি, হাতলটা ছাতার হাতলের মতন বাঁকানো। ঘন খয়েরি রঙ ছড়িটার; বোঝাই যায় না ওটা লোহার।

জল খেয়ে তারাপদ একটা সিগারেট ধরাল। আবার হাঁটতে লাগল দুজনেই।

হাঁটতে হাঁটতে কিকিরা বললেন, "তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তারাপদ। ফকিরদের যে বংশতালিকা দেখলে, তা থেকে কিছু আন্দাজ করতে পারো?"

তারাপদ বলল, “সত্যি কথা বলতে কী কিকিরা, ওই টেবল–কিংবা বলুন চার্ট-এর ছেলে অমুক, তার ছেলে তমুক–এসব আমার মাথায় ঢোকে না। একরাশ নাম দেখলাম এই মাত্র।”

“তা ঠিক। নাম থেকে কী আর বোঝা যায়?” বলে সামান্য চুপ করে থেকে কিকিরা আবার বললেন, “আচ্ছা, ফকিরের ছোটাকাকা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়?”

“ছোটকাকা! মানে সেই সন্ন্যাসী! তিনি তো মারা গিয়েছেন।”

“হ্যাঁ। কিন্তু কেউ চোখে দেখেনি। লোকের মুখের খবর থেকে জেনেছে ফকিররা।”

তারাপদ বেশ অবাক হয়ে কিকিরার মুখের দিকে তাকাল।”আপনার কথা বুঝলাম না। আপনার কি মনে হয়, ছোটকাকা মারা যায়নি?”

“তা আমি বলছি না। হয়ত গিয়েছেন। ..আবার ধরো, না-ও যেতে পারেন?”

“মানে?”

“মানেটা তো এখন বোঝা যাচ্ছে না। ...তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগছে। ফকিরের ঠাকুরদারা দুই ভাই। বড় হলেন ফকিরের ঠাকুরদা। ছোটজনের একটি ছেলের নাম দেখতে পেলাম ওই লিস্টিতে, কিন্তু তারপর আর কোনো নাম নেই। অর্থাৎ ফকিরের ছোট ঠাকুরদার বংশের একজনকে পাচ্ছি। অন্যরা কোথায়? কেউ কি ছিল না?”

তারাপদ এত জটিল ব্যাপার বুঝল না। বলল, “আপনার সন্দেহ আমি বুঝতে পারছি না।”

কিকিরা হাঁটতে হাঁটতে বললেন, “বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত নিয়ে বড়বড় রাজরাজড়াদের মধ্যে যত না গণ্ডগোল বাধে, এই সব ছোটখাট রাজা-টাইপের লোকের মধ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি গোলমাল। উটকো বড়লোকদের মধ্যে আকছাড়। তা ছাড়া এই সব এলাকায় পারিবারিক ঝগড়াঝাটি, খুনোখুনি, মামলা-মকদ্দমা খুব বেশি। আমার মনে হচ্ছে, ফকিরদের ফ্যামিলিতে আরও কিছু রহস্য আছে।”

“সে তো আপনারই জানার কথা। ফকিরবাবু আপনার বন্ধু।”

“বন্ধুরাও সব সময় সব কথা বলে না। যেমন আজ ফকির বলল, তার ছেলে বিশু ছুঁড়েছিল। আমার কিন্তু কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না।”

তারাপদ কোনো কথা বলল না। বরং কিকিরার মাথায় কেমন করে এত। চিন্তা আসে ভেবে অবাক হচ্ছিল।

আর কিছুক্ষণ হেঁটে আসার পর কিকিরা তাঁর ছড়ি তুলে দূরে কিছু দেখালেন। বললেন, “ওই যে দেখো, দেখতে পাচ্ছ? ওটাই ঘোড়া-সাহেবের কুঠি।”

তারাপদ দূরে তাকাল। গাছপালার জঙ্গলের মতন খানিকটা জায়গা, ঘর বাড়ি কিছুই চোখে পড়ে না। তারাপদ বলল, “ওই জঙ্গলটা?”

“আর-একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে।”

বেশি এগিয়ে যেতে হল না, গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা বাড়ির সামান্য অংশ চোখে পড়ল।

তারাপদ বলল, “নদী কোথায়? আপনি বলেছিলেন বাড়ির পাশে নদী আছে?”

“নদী নয়; নালা। এখানকার লোক নদীই বলে। নুনিয়া নদী। এখান থেকে দেখতে পাবে না। বাড়ির কাছে গেলে পাবে। নুনিয়া ও-পাশ দিয়েই চলে গিয়েছে।”

“জল নেই?”

“বর্ষাকালে থাকে। ভরেই থাকে। এখন হাঁটুতক থাকতে পারে। চলো, দেখা যাবে।”

“আপনি কদিন আগেই এসেছিলেন, তখন ছিল?”

“অল্প।”

কথা বলতে বলতে কুঠির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তারাপদরা। সামান্য পরে একেবারে কাছাকাছি এসে গেল।

ঘোড়া-সাহেবের কুঠির কাছাকাছি এসে তারাপদ থমকে দাঁড়াল।

কিকিরার কথা থেকে এতটা বোঝেনি সে। এখন বুঝতে পারছে। বিশাল-বিশাল গাছপালায় ঘেরা একটা পরিত্যক্ত, ভাঙা দুর্গর মতনই দেখতে। মনে হয়, এককালে এখানে বোধ হয় কোনো রাজাটাজা দুর্গ বানিয়ে থাকত। কিকিরা বললেন, “এদিক দিয়ে এসো। পেছন দিক দিয়ে যাব।”

“কেন? সামনে কেউ থাকে?”

“সাবধানের মার নেই। তা ছাড়া সামনে দিয়ে ঢুকতে পারব না। সদর-ফটকটা কাঁটা-তার দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ। আগাছার পাঁচিল হয়ে গেছে ওখানটায়।”

তারাপদ কিকিরার কথামতন তাঁর পেছনে-পেছনে এগুতে লাগল। নালার মতন নদীটাও চোখে পড়ল এবার। বাড়ি আর পাথর, মাঝ-মধ্যিখানে গোড়ালি-ডোবা জল। চারদিক ফাঁকা মাঠ আর মাঠ, একেবারে নেড়া মাঠই বলা যায়, গাছপালা নামমাত্র।

এবড়ো-খেবড়ো জমি, কাঁটা-ঝোপ, বনতুলসীর ভেতর দিয়ে এগুতে-এগুতে তারাপদ বুঝল, কিকিরা একটা ঢোকার রাস্তা আগেই বেছে রেখে গিয়েছেন। অবশ্য না বেছে রাখলেও চলত, কেননা কুঠিবাড়ির চারদিকে যে মানুষ-সমান উঁচু পাঁচিল, তার অনেক জায়গাই ভেঙে গিয়েছে, ভেতরের গাছপালার শেকড় পাঁচিল ফাটিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া ওই আম-জাম-জারুলের ডালপালা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, সামান্য চেষ্টা করলেই পাঁচিলের বাইরে হাত পাওয়া যায়।

রোদের তাত আর নেই, আলোও মরে এসেছে। চারদিক থেকে গাছপালার জংলা গন্ধ ছড়াচ্ছিল, বনতুলসীর গন্ধ বেশ ভারী, অজস্র নয়নতারা ফুটে আছে, কাঁটাঝোপে নানা রঙের ছোট-ছোট ফুল।

অনেকটা হেঁটে এসে কিকিরা বললেন, “এসো। ওই ফাটলটার মধ্যে দিয়ে ঢুকে যাব।”

“পেছনে কোনো ফটক নেই?”

"আছে। গোটা দুয়েক আছে। ছোট ছোট। সেদিকটা এত অপরিষ্কার নয়। তবু ওখান দিয়ে ঢুকব না।"

"কেন বলুন তো? বাড়ির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এখানে কেউ ভুলেও পা দেয় না। এক যদি ভূতটুত থাকে তো আলাদা কথা।" তারাপদ ঠাট্টা করেই বলল শেষের কথাগুলো।

কিকিরা বললেন, "ভূতের কাছে সাহস দেখানো ভাল। কিন্তু অদ্ভুতের কাছে নয়। এখানে যদি অদ্ভুত কিছু দেখো। এসো। সাবধানে আসবে।"

ভাঙা পাঁচিলের গায়ে আতা ঝোপ, কোনোরকমে শরীরটাকে গলানো যায়। কিকিরা রোগা মানুষ, দিব্যি গলে গেলেন। তারাপদ কিকিরার মতন করে সাবধানে ভেতরে মাথা গলিয়ে দিল।

পাঁচিলের এ-পারে গাছ। লতাপাতার জঙ্গল। দু-চার পা এগুতেই বড় বড় গাছের সারি। কতকালের পুরনো। ডালপালায় ছায়া করে রেখেছে নিচেটা। খানিক পরে সূর্য ডুবে গেলে হয়ত অন্ধকার হয়ে যাবে।

কিকিরার পাশে-পাশে আসছিল তারাপদ। গাছপালা পেরিয়ে আসতেই ঘোড়া-সাহেবের কুঠির মুখোমুখি হল। না, তারাপদই কল্পনাই করতে পারেনি এই কুঠি এত বড়, শুরু আর শেষ চোখে যেন ধরাই যায় না। বিশাল বাড়ি। গড়নটা কলকাতার পুরনো সাহেববাড়ির মতন, অন্তত পাশ থেকে সেই রকমই দেখাচ্ছে। পাথরের বাড়ি। রোদে বৃষ্টিতে পড়ে থাকতে থাকতে পাথরের গায়ে। শ্যাওলা ধরে-ধরে কালচে রঙ হয়ে গিয়েছে। বিশাল বিশাল জানলা। জানলার মাথাগুলো বাঁকানো। খড়খড়ি-করা পাল্লা। কোনোটা বন্ধ, কোনোটা ভেঙে জানলার গায়ে ঝুলছে। ভেতরের শার্সিও ভাঙাচোরা। বাড়ির গা-বেয়ে বাঁধানো নালা ছিল চারপাশে জল যাবার জন্যে, আর্বজনায় ভরতি হয়ে সেখানে আগাছা জন্মেছে নানারকমের।

বাড়িটা দোতলা হলেও অনেক অনেক উঁচু দেখাচ্ছিল। সেকালের বাড়ি, তার ওপর সাহেববাড়ি–উঁচু, উঁচু-ছাদ দোতলাই বোধ হয়, সাধারণ বাড়ির চারতলার কাছাকাছি। তারাপদ বলল, "কত উঁচু হবে? ওই ছাদ পর্যন্ত?"

"তা বলতে পারব না। আগেকার দিনে বাংলোবাড়ির ঘরও যত বড় হত, মাথার ছাদও তত উঁচু হত। এতে ঘর ঠাণ্ডা থাকে, বাতাস-চলাচল ভাল হয়। আসলে, এইটেই ছিল তখনকার ধরন। কলকাতার বনেদি পুরনো বাড়িতেও এই রকম ব্যবস্থা।"

"আপনি তেতলা থেকে লাফ মারার কথা বলছিলেন না? তেতলা কোথায়?"

"এ-বাড়ির দোতলার ছাদ কম করেও সাধারণ বাড়ির তেতলা হবে। তাই নয়? আমি কতটা উঁচু থেকে লাফ মারা হয়েছিল সেটা বোঝাতে চেয়েছিলাম। ধরো, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুটের কাছাকাছি হবে ছাদটা।"

তারাপদ অত বুঝল না।

কিকিরা ধীরে-ধীরে বাড়ির সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। এক সময় বাংলো ঘিরে রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা এখন ঘাস আর বুনো লতায় ভরতি, ফাটল ধরেছে, এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে।

“একটু সাবধানে,” কিকিরা বললেন, “সাপখোপ আছে কিন্তু।“

তারাপদ সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। সাপের নামে গা শিরশির করে উঠেছিল। বলল, “আপনি কি আমাকে সাপের মুখে ফেলবেন?”

কিকিরা হাসলেন। “কলকাতার ছেলে তোমরা, সাপের নামেই চমকে ওঠো। না, তোমায় সাপের মুখে ফেলব না। আমি নজর রাখছি।”

তারাপদ ভয়ে-ভয়ে বলল, “বিষাক্ত সাপ রয়েছে?”

“থাকলে বিষাক্ত থাকবে,” কিকিরা মজার গলায় বললেন।”কেউটে, গোখরো?”

তারাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, “তা হলে আর এগিয়ে দরকার নেই ফিরে চলুন। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। এখুনি ঝপ করে অন্ধকার হয়ে যাবে। সাপের মুখে পড়ার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল।”

কিকিরা বললেন, “তা ঠিক। অন্ধকারে এ বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করা ভাল না। বিপদ হতে পারে। বাড়িটা তোমাকে চোখের দেখা দেখাবার জন্যে এনেছিলাম। কেমন দেখছ?”

“পুরনো সাহেবি কেল্লার মতন?”

কিকিরা তাঁর ঢিলেঢালা পোশাকের ভেতর থেকে বায়নাকুলার বের করে তারাপদকে দিলেন। বললেন, “এটা চোখে দিয়ে দেখো।”

তারাপদ দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল বাড়িটা। সেকেলে কোনো বিশাল ইমারতের মতনই দেখাচ্ছিল। দেওয়ালের গায়ে গাছ পর্যন্ত গজিয়ে গিয়েছে।

“কত ঘর আছে জানো এই বাড়িটায়?” কিকিরা বললেন, “মোটামুটি কুড়ি পঁচিশটা। বাড়িটা সামনের দিকে ছিল ঘোড়া-সাহেবের অফিস। পেছনে থাকত খানসামা, বাবুর্চি, আয়া। আস্তাবল ছিল আলাদা। ঘোড়া থাকত। সাহেব থাকত ওপরে। বুড়োবুড়ি। মেয়ে থাকত দার্জিলিংয়ে। ছেলে বিলেতে।”

তারাপদ লক্ষ করছিল, বিকেল পড়ে যাবার পর খুব তাড়াতাড়ি ছায়া ঘন হয়ে আসছে। হয়ত আর আধ ঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার নেমে যাবে। তার অশান্তি হচ্ছিল। ভয় করছিল। এত গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে তার সাহস হচ্ছিল না। বাড়িটাও ভীষণ ভুতুড়ে দেখাচ্ছিল। দূরবীন নামিয়ে নিল তারাপদ।

কিকিরা আবার এগুচ্ছেন দেখে তারাপদ বলল, “আবার কোথায় যাচ্ছেন?”

“চলো, সামনেটা একবার দেখে আসবে?”

“না। অন্ধকার হয়ে যাবে।”

“হবে না। এসো। আমার সঙ্গে টর্চ আছে।”

“আপনি স্যার বেশি-বেশি সাহস দেখাচ্ছেন। অন্ধকার হয়ে গেলে ঝোপঝাড় গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাব কেমন করে?”

“চলে যেতে পারব। এসো। দাঁড়িয়ে থেকো না।”

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারাপদ পা বাড়াল। তার ভাল লাগছিল না।

খানিকটা এগিয়ে তারাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিকিরাও দাঁড়ালেন।

”কিসের শব্দ?” তারাপদ বলল।

”বাড়ির ভেতর থেকে আসছে?” কান পেতে থাকলেন কিকিরা।

শব্দটা দূরে মেঘ ডাকার মতন লাগছিল অনেকটা। বাড়ল। তারপর থেমে গল হঠাৎ।

তারাপদর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল বড়বড় চোখ করে।

কিকিরা যেন কিছু ভাবছিলেন। বললেন, “না, ফিরেই চলল।”

“শব্দটা কিসের?”

“বুঝতে পারছি না। মনে হল, কোনো ভারী জিনিস কেউ সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে দিয়েছে। কাঠের সিঁড়ি। শব্দ হচ্ছিল।”

“বাড়িতে কেউ আছে তা হলে?”

“থাকাই সম্ভব। যে আছে, সে হয়ত আমাদের দেখতে পেয়েছে। বোধ হয় ভয় দেখাল।” কিকিরা তারাপদকে টেনে নিয়ে ফিরতে লাগলেন।

০৬.

অষ্টমী পুজোর দিন সকাল থেকেই মেঘলা। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মেঘলা আরও ঘন হয়ে এল। বৃষ্টি যেন মেঘের নিচে দাঁড়িয়ে আছে–যে-কোনো সময় ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরই মধ্যে ফকির রায়দের ঠাকুর-দালানে পুজো চলছিল। ঢাক বাজছে, ফকিরদের বুড়ো পুরোহিত পুজোয় বসেছেন, অন্দরমহলের লোকজন বাইরে, ঠাকুর-দালানে, গ্রামের অনেকেই এসেছে পুজোতে। কলকাতার বারোয়ারি পুজো নয়, গ্রামের বাড়ির পুজো, তারাপদ একপাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পুজো দেখল। ভালই লাগছিল তার। শহুরে জাঁকজমক নেই, অথচ কিসের যেন এক সাদামাটা সৌন্দর্য রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত তারাপদ ঠাকুর-দালান ছেড়ে চলে এল। ঘরে গেল না। কাছাকাছি খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। বৃষ্টি আসতে পারে। এলেও ক্ষতি নেই। কাছাকাছি থাকবে তারাপদ।

ফকির রায়দের বাড়ির শ'খানেক গজের মধ্যেই গ্রাম। বোধ হয় গ্রামের শুরু, কেননা, যত পুব দিকে যাওয়া যায় ততই ঘরবাড়ি বেশি করে চোখে পড়ে। পাকা বাড়ি, কাঁচা বাড়ি, দুরকম বাড়ি রয়েছে। চোখে দেখলে মনে হয়, নিতান্ত ছোট গ্রাম নয়। তিরিশ-চল্লিশ ঘর লোকের বসবাস তো নিশ্চয়। কোথাও আকন্দগাছের বেড়া, কোথাও কাঁটাগাছের, বাঁশের খুঁটি আর কাঁটাতার দিয়েও কেউ-কেউ বেড়া বেঁধেছে, নানা ধরনের গাছপালা, শিউলী করবী জবা, কোথাও লাউ কিংবা কুমড়োর মাচা। পুজো বলেই বাড়ির সামনে দাওয়া নিকোনো, গ্রামের মুদির দোকানের বেঞ্চিতে বসে আছে কেউ কেউ, ময়রা-দোকানে ফুলুরি ভাজা চলছে, একরাশ ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে।

তারাপদ যেন মজা পাচ্ছিল। ফুলুরি খাবার সাধ হলেও সে এগুল না। সময় বুঝে এক বেলুনঅলাও হাজির হয়েছে। কাঁধে কাগজের খেলনা, কাঁধের ঝুলিতে বেলুন, এক হাতে সাইকেলের পাম্প, মুখে একটা বিচিত্র হুইসল। মাঝে মাঝে হুইসল বাজাচ্ছে।

এগিয়ে আসতেই তারাপদ পুকুর দেখতে পেল। খুব বড় না। পুকুরের চারদিকে কিছু গাছপালা। জনা-দুই লোক পুকুরের পাশে সবজি-খেতে কাজ করছে।

আরও সামান্য এগুতেই পেছন থেকে যেন কে ডাকল। দাঁড়াল তারাপদ। ঘর তাকাল।

বাউল বৈরাগী গোছের কে একজন এগিয়ে আসছে। বোধ হয় গাছপালার আড়ালে ছিল–চোখে পড়েনি।

কাছে এসে লোকটি তারাপদকে দেখল সামান্য, তারপর হাত জোড় করে নমস্কার করল। ”বাবু লতুন বটে। চিনতে লারছি।”

তারাপদ লোকটাকে নজর করতে লাগল। বয়েস হয়েছে। একমাথা বাবরি চুল। জট পড়েছে যেন। মুখে দাড়ি, অর্ধেক সাদা হয়ে গেছে। গায়ে একটা আলখাল্লা ধরনের জামা। হয়ত কোনোকালে কালো জামাটার রঙ গেরুয়া ছিল, এখন মাটির মতন রং ধরেছে। পায়ে ছেঁড়া-ফাটা চটি। লোকটা মাথায় লম্বা। তবে রোগা। মুখের আদলও লম্বা। সাদামাটা নিরীহ মুখেই তাকিয়ে ছিল লোকটা।

তারাপদ বলল, “হ্যাঁ, আমি নতুন।”

"কুথা থেকে আসছেন বটে?"

"কলকাতা।"

"কে আছেন হেথায়? লিজের লোক?"

"ফকিরবাবুর বাড়িতে উঠেছি। তুমি এখানে থাকো?"

"আজ্ঞা না। আমার গাঁ দামড়া। চতুর্দিকেই ঘুরি ফিরি।...বাবু ঘুরতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, বেড়াতে।"

"একা বটে?"

"না," মাথা নাড়ল তারাপদ।"সঙ্গে লোক আছে বলেই তারাপদ হঠাৎ কেমন সাবধান হয়ে গেল। সন্দেহের চোখে লোকটাকে দেখল।"তোমার নাম কী?"

লোকটা আচমকা কেমন থতমত খেয়ে গেল। মুখে একই রকম হাসি। সামান্য যেন শুকনো দেখাল হাসিটা। তারপর বলল, "আমাদের নির্দিষ্ট ডাক আই, বাবু। যে যেমন ডাকে। কেউ হাঁকে খেপা, কেউ ডাকে বোরেগি। আমার নাম শশিপদ পঞ্জি।"

তারাপদ হাসির মুখ করল।"বাঃ, বেশ নাম।"

আরও দু-একটা মামুলি কথার পর তারাপদ আকাশের দিকে তাকাল। বলল, "বৃষ্টি আসবে। আমি চলি।"

শশিপদ দাঁড়িয়ে থাকল। তারাপদ ফিরতে লাগল। অনেকটা এগিয়ে এসে পেছন ফিরে তাকাল একবার, দেখল, শশিপদ পুকুরের দিকে চলে যাচ্ছে।

তারাপদ খুব সময়ে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। দু-চার ফোঁটা জল গায়ে মাথায় মেখে তারাপদ কিকিরার ঘরে গিয়ে হাজির।

কিকিরা জানলার কাছে চেয়ার টেনে বসে আছেন। সামান্য তফাতে টেবিলের ওপর একটা বন্দুক পড়ে আছে।

তারাপদ বেশ অবাক হল। বন্দুক কেন ঘরে! কার বন্দুক?

"ঘরে বন্দুক কেন, কিকিরা?" তারাপদ বলল।

কিকিরা খুবই অন্যমনস্ক। কিছু ভাবছেন। আজ সকালেও তারাপদ। কিকিরাকে অন্যমনস্ক দেখেছে।

তাকালেন কিকিরা। "বেড়ানো হল?"

"হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু বন্দুক সামনে রেখে বসে আছেন কেন?"

"দেখছিলাম। বোসো।"

জলের ছাট এদিকের জানলায় আসছে না। বাইরের কালচে রঙ আরও ঘন হয়ে বৃষ্টি বেশ জোরেই নেমেছে।

তারাপদ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বলল, "ফকিরবাবুর বন্দুক?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "না। আমার।"

"আপনার বন্দুক? আপনার বন্দুক হল কবে?" তারাপদ বিশ্বাস করতে পারছিল না। আবার একবার বন্দুকটার দিকে তাকাল।

কিকিরা বললেন, "ওটা আমারই বন্দুক। ম্যাজিক বন্দুক বলতে পারো। ম্যাজিক দেখবার সময় দরকার হত। বাইরে থেকে কিছু বুঝবে না। ভেতরে তেমন কিছু নেই।"

তারাপদ নিশ্বাস ফেলল।"সত্যি বন্দুক তা হলে নয়। ওটা আপনি আনলেন কেমন করে? সঙ্গে তো দেখিনি?"

"ট্রাংকে ছিল। খোলা যায় পার্টসগুলো।"

"সত্যি কিকিরা, আপনি মিস্টিরিয়াস" তারাপদ হেসে ফেলল। কালো ট্রাংকটায় কি ম্যাজিকের জিনিস ভরে এনেছেন?"

"কিছু কিছু এনেছি। দাও, একটা ধোঁয়া দাও।"

তারাপদ সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই দিল ককিরাকে। দুজনেই সিগারেট ধরাল।

তারাপদ বলল, "এবার আপনাকে আমি সারপ্রাইজ দেব। খানিকটা আগে একজনের সঙ্গে আলাপ হল। নাম শশিপদ পঞ্জি। বলল, বৈরাগী।"

তাকালেন কিকিরা। "এই গ্রামের লোক?"

"না, ঠিক এই গ্রামের নয় বলল।" বলে তারাপদ শশিপদর সঙ্গে দেখা হবার ঘটনাটা পুরো বলল।

কিকিরা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, "লোচনকে জিজ্ঞেস করলেই বোঝা যাবে, ওই নামে আশেপাশের গ্রামে কেউ থাকে কি না। তা ছাড়া এই গ্রামে আসা-যাওয়া করলে তোক নিশ্চয় তাকে চিনবে।"

"ডাকব লোচনকে?"

"এখন কি তাকে পাবে? শুনেছিলাম, এই সময়টায় সন্ধিপুজো। ফকির তাই বলছিল।"

জানলার বাইরে আরও তোড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। মেঘও ডাকছিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে তারাপদ বলল, "ফকিরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। খানিকটা আগে উঠে গেল। স্নান করে সন্ধিপুজো দেখতে যাবে।"

ইতস্তত করে তারাপদ আবার বলল, "কালকের কথা বলেছেন?"

“বলেছি।..ফকির বিশ্বাসই করল না, ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে কেউ থাকতে পারে। বলল, পুরনো বাড়ি, অনেক কিছুই ভেঙেচুরে পড়ে। হয়ত কিছু ভেঙে পড়েছিল।”

“কোথাও কিছু নেই, ভেঙে পড়বে?”

“হতে পারে। তা আমি ঠিক করলাম, আগামী কাল সকালের দিকে আমরা আবার ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে যাব।” বলে মুহূর্তের জন্যে থেমে আবার বললেন, “এবার শুধু তুমি আর আমি নয়। সঙ্গে ফকির থাকবে। নকুলকেও সঙ্গে নেব। বিশুকে নিতে পারলে আরও ভাল হত। কিন্তু তাকে নেবার। উপায় নেই।”

“বিশুকে কেন নেবেন?”।

“ঠিক কোথায়, কোন জায়গায় খুনের ব্যাপারটা ঘটছিল সেটা জানা দরকার। কখনো শুনছি পুব দিকের ঘরে, কখনো শুনছি উত্তর দিকের ঘরের বড় জানলার কাছে। সঠিকভাবে বলতে পারছে না।”

“যে জানালার কাছেই হোক, তফাত কোথায়?”

“তফাত,” কিকিরা তারাপদর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থেকে একটু যেন হাসির মুখ করলেন, “তফাত অনেক। সে তুমি এখনো বুঝতে পারবে না।”

“আপনি বুঝেছেন?”

“না,” মাথা নাড়লেন কিকিরা, “বুঝিনি; বোঝার চেষ্টা করছি।”

তারাপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। বৃষ্টির, তোড় কমে এসেছে খানিকটা। শরৎকালের বৃষ্টির অনেকটা এই ধরন।

কিকিরা বললেন, “তোমার সঙ্গে খানিক পরামর্শ করা যাক।...কাল থেকে আজ পর্যন্ত যা দেখলে তাতে কিছু আন্দাজ করতে পারো?”

তারাপদ ভাবল সামান্য। মাথা নাড়ল।”না, আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে অপরিষ্কার।”

“যেমন?”

“প্রথমত ধরুন, ঘোড়া-সাহেবের কুঠি নিয়ে ফকিরবাবুদের মধ্যে রেষারেষি এত বেশি হবে কেন? অন্য পাঁচটা সম্পত্তি যদি তাঁরা ভাগাভাগি করে নিয়ে থাকতে পারেন, এটাও পারতেন। যদি ভাগাভাগিতে রাজি না-থাকতেন, মামলা-মকদ্দমা করতেন–তারপর কোর্টের বিচারে যা হবার হত। মামলা তো ওঁদের হাতের পাঁচ।”

কিকিরা বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ। ফকিররা পাঁচ-সাতটা মামলা তো লড়ছেই, আর-একটা বেশি হলে কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু তারা লড়ছে না। কেন? এর নিশ্চয় কোনো কারণ রয়েছে। কারণটা কী?”

“সে তো আপনার বন্ধু ফকিরবাবু বলবে।”

"ফকির বলছে না। এড়িয়ে যাচ্ছে। ও যা বলছে তাতে মনে হয়, নেহাতই রেষারেষির ব্যাপার। আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

"আপনার কী মনে হয়?"

"ঘোড়া-সাহেবের কুঠির মধ্যে অন্য কোনো রহস্য আছে। সেটা যে কী রহস্য, তা আমি তোমায় বলতে পারছি না।"

"যদি কোনো রহস্য থাকবে–সেটা কি এতকাল পরে জানা গেল?"

কিকিরা বললেন, "বোধ হয় তাই। তা বলে ভেবো না আমি বলছি দু'দশ দিনের মধ্যে জানা গিয়েছে। হয়ত আরও আগে গিয়েছে। তবে খুব বেশিদিন আগে নয়।"

তারাপদ কী মনে করে ঠাট্টার গলায় বলল, "কোনো গুপ্তধনের খবর পাওয়া গিয়েছে নাকি?"

কিকিরা বললেন, "হতে পারে।"

তারাপদ চুপ করে থাকল।

সামান্য পরে কিকিরাই আবার বললেন, "দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল, ফকিরের ছেলে বিশু কেন ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে গিয়েছিল?"

কেন গিয়েছিল তারাপদ জানে না, কিকিরাও নয়। ফকিরও বলেছেন, তিনি জানেন না। সত্যি বলেছেন না মিথ্যে বলেছেন, তিনিই জানেন।

তারাপদ যা শুনেছে, তা এই রকম ঘোড়া-সাহেবের কুঠির কাছাকাছি নুনিয়ার এক পাশে এক সাধু এসে আড্ডা গেড়েছিল। বিশাল এক বটগাছের তলায় বসে থাকত সাধুবাবা। ধুনিও জ্বালাত না, গাঁজাও খেত না। শুধু একটা ত্রিশূল সাধুবাবার সামনে মাটিতে পোঁতা থাকত। সাধুবাবার সঙ্গী বলতে একটা জংলি কুকুর। সাধুবাবার খবর কিছুদিনের মধ্যে সর্বত্র রটে যাবার পর অনেকেই বাবাকে দেখতে যেত। অসুখ-বিসুখের ওষুধ চাইত, ভাগ্যে কী আছে জানতে চাইত। সাধুবাবা কথাবার্তা বড় বলত না, ওষুধ-বিষুধও দিত না। তবে খেয়ালের মাথায়-দু একজনকে গাছ-গাছড়ার কথা বলে দিয়েছে। বিশুর এক বন্ধু আছে কাছাকাছি এক কোলিয়ারিতে। ম্যানেজারের ছেলে। সে-বেচারির মা অসুখে খুব ভুগছিল। ছেলেটার বাবা সাধুবাবার কাছে গিয়েছিল দৈব কোনো ওষুধ চাইতে। বন্ধুর মুখ থেকে সাধুবাবার কথা শুনে বিশু সাধুর কাছে গিয়েছিল। সাধুবাবা বিশুকে পরের দিন একা দেখা করতে বলে। বিশু জিজ্ঞেস করেছিল, কেন সে দেখা করবে? সাধুবাবা কথার কোনো স্পষ্ট জবাব দেয়নি; শুধু বলেছিল "তোর মঙ্গল হবে।"

পরের দিন যাব কি যাবনা করে বিশু সাধুবাবার কাছে যায়। বাড়িতে কাউকে কিছু বলেনি। বিকেলের পর সাধুবাবা বিশুকে যেতে বলেছিল। বিশু সেই সময়েই যায়। বিকেল শেষ হয়ে আসার পর সাধুবাবা অন্য যে দু-পাঁচজন ছিল তাদের সরিয়ে দিয়ে বিশুকে নিয়ে ঘোড়া-সাহেবের কুঠির মধ্যে ঢোকে। সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। শুধু কুকুরটা ছিল। কুঠির মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ ঘঘারাঘুরি করে শেষে সাধুবাবা তাকে দোতলার বড় একটা ঘরে নিয়ে যায়। সেই ঘরে বিশু আরও দুজনকে দেখতে পায় একজন চরণমামা, মানে অমূল্যর শালা, অন্য একজন চরণের সঙ্গী, বিশু তাকে চেনে না।

সাধুবাবার সঙ্গে চরণমামার কথা কাটাকাটি বেধে যায়, কুকুরটা চেঁচাতে থাকে, আর হঠাৎ চরণমামার সঙ্গী সাধুবাবার কুকুরটাকে বন্দুকের বাট দিয়ে মারে। প্রচণ্ড জোরে। এত আচমকা ঘটনাটা ঘটে যায় যে, বিশু প্রথমটায় ভয় পেয়ে পালাতে যাচ্ছিল। পালাতে গিয়ে তার সঙ্গে চরণের সঙ্গীর ধাক্কা লাগে। বন্দুক পড়ে যায় সঙ্গীর হাত থেকে। বিশু সেটা কুড়িয়ে নিতে যায়। বন্দুকটা সে তুলেই নিচ্ছিল। চরণমামা তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেয়। তখনই সাধুবাবাকে গুলি করা হয়। সাধুবাবা জানলা দিয়ে লাফ মারছে–বিশু দেখেছে। তারপর কী হয়েছে, তার খেয়াল নেই। শুধু সে যে পালাতে পেরেছিল, এইটুকু তার মনে আছে।

যা শুনেছে তারাপদ সেই ঘটনা থেকে স্পষ্ট করে কিছুই ধরা যায় না। তবু একবার ঘটনাটা ভেবে নিল।

তারাপদ বলল, "সাধুবাবা বোধ হয় বিশুকে কোনো গোপন খবর দিতে চাইছিল। দেখাতে চাইছিল কিছু।"

কিকিরা বললেন, "হতে পারে। নাও হতে পারে। সেই খবর শোনার জন্যে বিশু গিয়েছিল? না, এমনিই গিয়েছিল? মনে রেখো, বিশু ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষের মনে নেহাতই একটা কৌতূহল থাকতে পারে। কিংবা ধরো, বিশু খানিকটা ভয়ও পেয়েছিল। সাধুবাবার কথা না শুনলে পাছে অমঙ্গল হয়।"

"সেই সাধুবাবাই বা কোথায় গেল?"

"সেটাও একটা রহস্য।...রহস্য অনেক। কে এই সাধুবাবা? কোথায় গেল সে? কেন ওই কুঠিবাড়িতে চরণ গিয়েছিল, তার সঙ্গীই বা কে? বন্দুক কেন ছিল চরণদের সঙ্গে? এতগুলো কেনর কোনো জবাবই পাচ্ছি না, তারাপদ।"

তারাপদ বলল, "আপনার একার পক্ষে কি এতগুলো কেন র জবাব খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কিকিরা? আমার মনে হয়, ফকিরবাবুর উচিত ছিল পুলিশের কাছে যাওয়া।"

মাথা নাড়লেন কিকিরা।"তাতে লাভ হত না।"

"কেন?"

সাধুবাবাই যেখানে বেপাত্তা, সেখানে বিশু কেমন করে প্রমাণ করত যে, সাধুবাবা তাকে কুঠিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? তা ছাড়া, চরণ আর চরণের সঙ্গী কুঠিতে ছিল, এটাও সে প্রমাণ করতে পারত না। কেননা, চরণরা অস্বীকার করত।"

"তা হল চরণরাই বা কেমন করে বিশুকে ফাঁসাতে পারে?"

"পারে না। পারছে না বলেই চুপ করে আছে। তবে ওরা একেবারে চুপ করে নেই। বাইরে চুপ। ভেতরে-ভেতরে ফকিরকে অস্থির করে তুলেছে।"

তারাপদ চুপ করে থাকল। তার মাথায় কিছু আসছিল না।

বৃষ্টি থামেনি। তোড় অনেকটা কমে এসেছে। কালচে আলো অল্প পরিষ্কার হয়েছে।

মাথার চুল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে কিকিরা বললেন, "কাল আমরা ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে যাব।

তন্ন-তন্ন করে সব দেখব। চরণরা মিছেমিছি কুঠিতে যাবে না। তারা কেন যেত? কী তাদের উদ্দেশ্য? আর ওই সাধুবাবাই বা কে?”

তারাপদ বলল, “চরণ নিশ্চয় অমূল্যর কথা-মতন কাজ করত? তাই না?”

“নিশ্চয়। তা ছাড়া চরণ লোক ভাল নয়। পাকা শয়তান বলে আমি শুনেছি।”

তারাপদ আর কোনো কথা বলল না।

০৭.

পরের দিন ফকিরের যাওয়া হল না। আগের দিন রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পা হড়কে পড়ে গোড়ালি মচকে ফেলেছেন। বাঁ পায়ের গোড়ালি গোদের মতন ফুলে গিয়েছে; ব্যথা প্রচণ্ড। বসার ঘরে বসে গুলাব লোশান লাগাচ্ছেন।

ফকির যেতে পারলেন না, কিন্তু তিনি নকুলকে সঙ্গে দিলেন। বললেন, "গাড়ি নিয়ে যাও, নকুলও সঙ্গে থাক।"

জিপের রাস্তা সরাসরি নয়, খানিকটা ঘোরা পথে যেতে হয়। রাস্তাও পাকা নয়, কোথাও মাটি আর নুড়ি-ছড়ানো রাস্তা, কোথাও ঘেঁষ ছড়ানো, কোথাও বা একেবারে মেঠো পথ।

সঙ্গে লোচনও ছিল।

যেতে-যেতে সাধারণ কিছু কথার পর কিকিরা লোচনকে বললেন, "সেই শশিপদর খবর পেলে, লোচন?"

"আজ্ঞা না। দামড়া গাঁয়েও লাই।" লোচন বলল।

"নেই তো গেল কোথায়? ওর বাড়ি দামড়া গাঁয়ে।"

লোচন বলল, "উ মস্ত খেপা, বাবু! আজ হেথায়, কাল হোথায়, কুথায় যে থাকে খেপা, কেউ বলতে লারে। তবে গাঁয়ের লোকে বলল বটে, খেপা গাঁয়ে ঘোরাফেরা করছিল।"

নকুল গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, "শশিপদ বড় একটা ওঝা বটে, বাবু। চিতি সাপেরও বিষ নামায়।"

কিকিরা আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "তাই নাকি! শশী তো গুণী লোক হে। শুনি, কিছু বলো বটে উর কথা।"

তারাপদ মুচকি হাসল। কিকিরার কথা শুনেই।

লোচন শশিপদর বৃত্তান্ত বলতে লাগল, মাঝে-মাঝে নকুলও বলছিল দু চার কথা।

শশিপদ দামড়া গ্রামের লোক। বরাবরই খেপাটে ধরনের। একটা কুঁড়ে ঘর আর একফালি সবজি বাগানের বেশি ওর কিছু ছিল বলে কেউ জানে না। গানটান গাইতে পারত শশী। গ্রামের যাত্রাদলে গানটান গাইত। শশীর মাসি মারা যাবার পর অনেকদিন ও আর নিজের গ্রামে ছিল না। কোথায় চলে গিয়েছিল কে জানে। আবার ফিরে এল। একেবারে বোষ্টম বৈরাগীর বেশ। ফিরে আসার পর জানা গেল, শশী ওঝাগিরি শিখেছে। গাছ-গাছড়ার ওষুধ দিতে পারত, কাউকে সাপে কামড়ালে বিষ নামাত। শশিপদর হাতে সাপে কামড়ানো লোক অনেক বেঁচে গিয়েছে। যারা মারা গিয়েছে, তাদের জন্যে শশী অনেক করেছিল, বাঁচাতে পারেনি। সদর হাসপাতালে পাঠিয়েও তো সাপেকামড়ানো রোগী মরে। মোট কথা, শশিপদ খেপা হলেও তার কতক গুণ রয়েছে।

কিকিরা আর-কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, শুধু তারাপদকে বললেন, "এদিকে সাপের উৎপাত

বেশ, বুঝলে তারাপদ। মাঝে-মাঝেই সাপের কামড়ে লোক মারা যায়।”

তারাপদ প্রথমটা ধরতে পারেনি, পরে কিকিরার চোখের দিকে তাকিয়ে ধরতে পারল। কিকিরা বোধ হয় ফকিরের ছোটকাকার ব্যাপারটা ইঙ্গিত করলেন। অবশ্য, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তারাপদ খুঁজে পেল না। ফকিরের ছোটকাকা সাপের কামড়ে মারা গিয়েছেন, আর শশিপদ সাপের ওঝা। এই দুয়ের সম্পর্ক কী?

তারাপদ কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

ঘোড়া-সাহেবের কুঠির পেছন দিকে একটা গাছতলায় জিপ রেখে চারজন কুঠির ভাঙা পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকল।

তারাপদ চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার। মাথার ওপর সূর্য দেখা যাচ্ছে না, গাছে আড়াল পড়েছে, রোদও তেমন গায়ে লাগে না বড় বড় গাছপালার জন্যে। পাখির ডাক ছাড়াও কোথাও কোনো শব্দ নেই। নির্জন, নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে কুঠিটা। আলোয় স্পষ্ট।

আগের বার বিকেলের দিকে এসেছিল বলে, কিংবা প্রথম এসেছিল বলেই তারাপদর ভয়-ভয় লেগেছিল। আজ আর লাগছে না। তা ছাড়া তারা চারজন রয়েছে। নকুল আর লোচন কি কিছু কম!

বাইরে ঘোরাঘুরি না করে কিকিরা প্রথমেই বললেন, “লোচন, সোজা ভেতরে ঢুকব। নকুল, তুমি সবার পেছনে থাকবে। তোমার হাতের ওই লোহার রড়ে শব্দ করো না।”

নকুল গাড়িতে একটা হাত তিনেক লম্বা লোহার রড় সব-সময় রেখে দেয়। সেটা হাতে নিয়ে এসেছে। লোচনের হাতে কিছু নেই। তারাপদরও খালি হাত। কিকিরার হাতে সেই সরু ছড়ি। আলখাল্লা ধরনের ঢিলেঢালা জামার পকেটে কী আছে কে জানে।

কুঠিবাড়ির সামনের দিকে ঢাকা বারান্দা। বারান্দাটা চাঁদের কলার মতন বাঁকানো। বিশাল বারান্দা চওড়াও কম নয়। সাত-আট ধাপ সিঁড়ি উঠে বারান্দা। মাঝের দরজাটা যেন পাহাড়। খোলার উপায় নেই। পাশাপাশি ঘর অনেক। দরজাও রয়েছে পর-পর। একটা দরজার জানলা ভাঙা। লোচন কিকিরাকে ডাকল।

সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল চারজনেই।

ভেতরে পা দিতেই তারাপদ বিশ্রী গন্ধ পেল। কতকালের ধুলোবালি, আবর্জনা জমে-জমে গন্ধ হয়েছে। বদ্ধ বাতাস। দরজার পাল্লা ভাঙা থাকার দরুন আলো আসছিল মোটামুটি। উলটো মুখের জানলাও আধ-খোলা। তারাপদ পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক চাপা দিল।

কিকিরা ঘরটা একবার দেখলেন। একেবারে ফাঁকা ঘর ভেতরের পলেস্তরা ভেঙে পড়েছে, একদিকে কিছু কাঠকুটো জড়ো করা, সাপের খোলস, মরা টিকটিকি, ঝুলে আর মাকড়শার জালের কোনো অভাব নেই। সাপ, ছুঁচো সবই থাকা সম্ভব এই ঘরে।

কিকিরা বললেন, “লোচন, প্রথমে নিচের ঘরগুলো দেখে নিই, পরে দোতলায় উঠব।”

বাড়িটার সুবিধে এই, পাশাপাশি ঘরের মধ্যে আসা-যাওয়া করার জন্যে দরজা রয়েছে,

দরজার পাল্লাগুলো ভাঙাচোরা, একটা হয়ত আছে, অন্যটা নেই; কোথাও কোথাও একেবারেই নেই। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে অসুবিধে হয় না। ঘরগুলো বড়বড়, বেশ বড়, মাথার ছাদ ধরতে হলে লম্বা সিঁড়ি চাই, লোহার কড়ি বরগা, জানলাগুলো বেশির ভাগই বন্ধ, রোদে-জলে কাঠের এমন অবস্থা হয়েছে যে, সেই বন্ধ জানলা আর খোলার উপায় নেই। সমস্ত ঘরেই দুর্গন্ধ। আসবাবপত্রের মধ্যে কদাচিৎ কোনো ভাঙাচোরা চেয়ার কিংবা টেবিল চোখে পড়ে।

কিকিরা তারাপদকে বললেন, "নিচের তলাটা ছিল ঘোড়া-সাহেবের অফিসঘর। এজেন্টেস অফিস।"

তারাপদর মনে হল, অফিসঘর বলেই হয়ত পাশাপাশি ঘরে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা। অফিসের অংশটা মোটামুটি দেখে নিয়ে কিকিরা ভেতর-দরজা দিয়ে সরু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। এটা ভেতর দিকের বারান্দা। প্যাসেজ বলা যায়। প্যাসেজের ওদিকে আরও কতকগুলো ঘর। প্যাসেজের গা দিয়ে চওড়া সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। কাঠের সিঁড়ি।

তারাপদ বুঝতে পারল, নিচের তলায় দুটো অংশ। সামনের দিকে অফিস ছিল। পেছনের দিকে কী ছিল? কিকিরা বললেন, "চাপরাশি, পিয়ন, বয়বাবুর্চিরা থাকত।"

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে কিকিরা বললেন, "লোচন, ও-পাশে বারান্দায় গিয়ে একবার দেখো তো কোনো দরজা খোলা পাও কি না?"

লোচন বারান্দার দিকে চলে গেল।

তারাপদ বলল, "কিকিস্যার, এটা দেখছি একেবারে ভুতের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। এখানে ঢুকলে মানুষ এমনিতেই মরে যাবে।" বলতে বলতে তারাপদ হাঁচল। বদ্ধঘর, ধুলো ময়লা আর দুর্গন্ধে তার মাথা ধরে উঠছিল।

কিকিরা বললেন, "তা ঠিক। তবে ভূতের একটু-আধটু চিহ্ন দেখতে পেলে ভাল হত, তাই না? চলো, দোতলায় চলো, সেখানে যদি দেখতে পাই।"

লোচন ফিরে এল। বলল, দরজা দিয়ে ঢাকার কোনো উপায় নেই। সবই বন্ধ। শুধু বন্ধ নয়, এমনভাবে আটকে আছে যে, একটু নড়ানোও যায় না। তবে ভাঙা জানলা দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়।

কিকিরা একটু ভেবে বললেন, "আগে দোতলাটা ঘুরে আসি। পরে ওদিকটা দেখব, লোচন।"

নকুল হাতের রডটা কাঁধে তুলে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। কথাবার্তা বলছিল না। কিন্তু তার চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে খুব সতর্ক, বাইরে গাছপালার শব্দ হলেও কান খাড়া করে শুনেছে।

কিকিরা সিঁড়ি উঠতে লাগলেন। পেছনে তারাপদরা। কাঠের সিঁড়ি। শব্দ হচ্ছিল। পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে সিঁড়িতে। ধুলো, পাখির পালক, ঘেঁড়া-খোঁড়া কাগজ, আরও নানান আবর্জনা। সিঁড়ির ধাপ কোনো-কোনোটা নড়বড়ে, কোনোটা আধভাঙা। পায়ের দাগ স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই, কাঠের রঙ কালচে হয়ে গিয়েছে, ধুলো আর কাঠের রঙ প্রায় এক।

বাইরের আলো থাকায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কোনো অসুবিধে হল না।

দোতলায় আসতেই বাইরের আলোয় চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। অজস্র গাছপালার মাথায় গায়ে শরতের রোদ মাখানো। কাল বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ঘোওয়া-মোছা গাছপালা যেন সকালের উজ্জ্বল রোদে আরও সবুজ হয়ে গিয়েছে। বাতাসও রয়েছে এলোমেলো।

তারাপদ বেশ কয়েকবার হাঁটার পর রুমালে নাক-মুখ মুছে নিয়ে আলোর দিকে তাকাল।

নিচের তলার মতন দোতলাতেও টানা বারান্দা। বারান্দার ধার ঘেঁষে মোটা মোটা থাম। কোনো কোনো থাম খসে যাচ্ছে। মেঝে ধুলোয় ভরতি, গাছের শুকনো পাতা জমে রয়েছে, আরও নানান রকম আবর্জনা।

কিকিরা প্রথমে বাঁদিকেই পা বাড়ালেন। নিচের তুলনায় ঘরের সংখ্যা কম লাগছিল চোখে। নিচের তলায় পর-পর দরজা ছিল। ওপরে পাশাপাশি দরজা কম। বিশাল-বিশাল দরজা-জানলা। দরজা বন্ধ, জানলা কোথাও-কোথাও খোলা, কাচের শার্সি ভাঙা। সামনের ঘরটারই জানলা খোলা ছিল।

জানলা টপকেই ঘরে ঢুকলেন কিকিরা। তারাপদরাও সাবধানে জানলা টপকাল।

রোদ বা আলো কোনোটাই ঘরে ঢোকার উপায় নেই। জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসছিল।

কিকিরা হাতের টর্চ জ্বাললেন।

তারাপদ টর্চের আলোয় ঘরটা অনুমান করার চেষ্টা করল। এত বড় ঘরে টর্চের আলো কিছুই নয়। ঘরের চারটে দেওয়াল যেন চারপ্রান্তে। বিরাট একটা ভাঙা টেবিল পড়ে আছে একদিকে। কোনো বড়সড় ছবির ভাঙা ফ্রেম। একটা পা মচকানো আর্ম চেয়ার।

কিকিরা টর্চের আলোয় মেঝে দেখালেন। তারাপদর মনে হল, দাবার ছকের মতন দেখতে মেঝেটা। পা দিয়ে ধুলো সরাল।"কিসের মেঝে? কাঠের?"

"সিমেন্টের," কিকিরা বললেন, "লাল আর কালো রঙ দিয়ে চৌকো ডিজাইন করা।"

লোচন বলল, "মাথার উপর শিকলি ঝুলছে বটে, বাবু।"

কিকিরা টর্চের আলো ফেললেন ছাদের দিকে। একসময় বোধহয় ঝাড়বাতি গোছের কিছু ঝোলাতেন ঘোড়াসাহেব। ঝাড় নেই, কিন্তু গোটা দুয়েক শেকল ঝোলানো রয়েছে। কিকিরা বললেন, "সাহেবের বাতি ঝুলত গো! লাও, চলো।"

জানলা টপকেই বাইরে আসতে হল।

পর-পর তিনটে ঘর দেখলেন কিকিরা। কোনটা কিসের ঘর ছিল বোঝা দায়। কোনোটা হয়ত খাবার, কোনোটা বসার কোনোটা বা শোবার।

বাঁদিকের ঘরগুলো দেখা হয়ে যাবার পর ডান দিকে এগুলেন কিকিরা।

ডানদিকের প্রথম ঘরটার জানলার সবই রয়েছে। কাঁচই যা ভাঙা। দরজা খোলা ছিল।

দরজা দিয়েই ভেতরে এলেন কিকিরা। ফাঁকা ঘর। দুপাটি পুরনো দোমড়ানো জুতো মাত্র পড়ে আছে। বুট জুতো।

কিছুই পাওয়া গেল না। কিকিরা যেন হতাশই হলেন।

আবার বারান্দায় এসে পা বাড়াতেই তারাপদ হঠাৎ বলল, "কিকিরা?"

"কী?"

"পায়ের দিকে তাকান", তারাপদ বলল।

মেঝের দিকে তাকালেন কিকিরা। তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত দিয়ে ইশারায় নোচন আর নকুলকে দাঁড়াতে বললেন।

"কিসের দাগ কিকিরা?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

মাটিতে বসে কিকিরা ভাল করে নজর করলেন। বললেন, "কোনো ভারী জিনিস টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেন। ধুলোটুলোর ঘষটানো দাগ।" বলে সামনের ঘরের দিকে তাকালেন, দাগটা ঘর পর্যন্ত গিয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ। জানলাও। এতক্ষণে একটিমাত্র জানলা চোখে পড়ল, যা অটুট।

কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন।"দরজাটা খোলা যায় কি না দেখ তো, নকুল?"

নকুল প্রথমে ধাক্কা মারল, শেষে লোহার রড গলাবার চেষ্টা করল দরজার ফাঁকে, পারল না।

জানলাটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত খোলা গেল।

কিকিরা জানলা টপকে ভেতরে ঢুকলেন।

টর্চের আলোয় এই ঘর একেবারে অন্যরকম দেখাল। ঘরটার অনেকটা পরিষ্কার। একপাশে লোহার স্প্রিং দেওয়া খাট, ছোবড়ার গদি রয়েছে খাটের ওপর, যদিও পুরনো গদি। কোণের দিকে মাটির কলসি আর কলাইয়ের অগ রাখা। দু চারটে শুকনোশালপাতা পড়ে আছে ঘরের পাশে। লণ্ঠনও চোখে পড়ল। শিসওঠা কাঁচ। মাদুর গুটিয়ে রেখেছে কেউ।

বাইরের দিকের জানলা বন্ধ ছিল। বড় বড় দুই জানলা। হাত আট-দশ অন্তর। কিকিরা নকুলকে জানলা দুটো খুলে দিতে বললেন, "সাবধানে খুলো হে।"

লোচন আর নকুল জানলা দুটো খুলে দিল। খুলে দিয়েই লোচন যেন কী লল। আলো এল জানলা দিয়ে, ঘর স্পষ্ট হল।

তারাপদ ঘরটা দেখতে লাগল। বিশাল ঘর, সেই একই রকমের লাল কালোর চৌকো-ঘর কাটা সিমেন্টের মেঝে। মাথার ওপর এক জোড়া শেকল ঝুলছে। ঘরের এক কোণে একটা বা দাঁড় করানো।

কিকিরা ডানদিকের জানলার কাছে গিয়ে একমনে কখনো জানলা, কখনো বাইরেটা দেখছিলেন। একবার ডানদিকের জানলাটা দেখেন, আবার গিয়ে বাঁদিকেরটা। জানলার কাঠের ওপর হাত বোলান। বেশ কিছুক্ষণ জানলা দেখার পর তারাপদকে ডাকলেন।

কাছে গেল তারাপদ।

ডানদিকের জানলাটা দেখালেন কিকিরা। তারাপদ অবাক হয়ে দেখল, পর-পর প্রায় গায়ে-গায়ে দুটো জানলা। একই মাপ।

কিকি বাইরের দিকটাও দেখালেন। ”দেখো, নিচেও দেখো।”

তারাপদ অবাক হয়ে দেখল, লোহার একটা ঘোরানো সিঁড়ি নিচে নেমে গিয়েছে। সিঁড়িটা বাড়ির বাইরে থেকে দেখার উপায় নেই, কেননা সিঁড়ির বাইরের তিনটে দিকই ইটের গাঁথনি দিয়ে গোল করে ঘেরা। সেই গাঁথনির জায়গায়-জায়গায় ইট খসে যাওয়ায় আলো ঢুকছে সিঁড়িতে। সুড়ঙ্গর মতন দেখায় সিঁড়িটা।

তাারাপদ সরে গিয়ে বাঁদিকের জানলা দেখল। কিছু বুঝতে পারল না।

কিকিরা বললেন, “বাঁদিকের ওই জানলা আর এই ডান দিকের জানলাটায় তফাত বুঝতে পারছ? আসলে, ডানদিকেরটা ডবল জানলা। দু আড়াই ফুট তফাত দুটো জানলার মধ্যে। মাঝখানে ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে গলে গেলেই ওই সিঁড়ি। তুমি লক্ষ করে দেখো, সিঁড়িটা ওপরের দিকে একেবারে জানলা পর্যন্ত উঠে আসেনি। খানিকটা নিচুতে শেষ হয়েছে। তার মানে, এই সামনের দিকের জানলাটা টপকে ফাঁকের মধ্যে দিয়ে গলে গেলেই সিঁড়িটা ধরতে পারা যাবে। আমি যতটা জানি, এই রকম ডবল জানলা একসময় য়ুরোপে দেখা। যেত যুদ্ধবাজ রাজ-রাজড়াদের প্রাসাদে। কেন জানো? তখন কথায় কথায় কাটাকাটি রক্তারক্তি চলত। কে যেন শত্রু হবে কখন, কেউ জানত না। কাজেই, ঘরের মধ্যে আচমকা শত্রুর মুখোমুখি হলে বাঁচবার এই একটা পথ খোলা থাকত। ঘোড়া-সাহেব কেন এমন জানলা বানিয়েছিলেন জানি না। শখ করে কিংবা আভিজাত্যের জন্যে হতে পারে। অন্য কারণও থাকতে পারে।”

তারাপদ বলল, “সাধুবাবা তা হলে এই পথ দিয়েই হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন?

কিকিরা মাথা নাড়লেন, “অবশ্যই।”

“তা হলে এই ঘরেই সেই কাণ্ড ঘটেছিল?”

“এই ঘরে।” বলে কিকিরা নিশ্চিন্তভাবে নিজেই জানলার চারদিক পরীক্ষা করতে লাগলেন।

০৮.

ঘোড়া-সাহেবের কুঠি থেকে ঘুরে আসার পর তিন-চারটে দিন দেখতে-দেখতে কেটে গেল। এই কদিনে কিকিরা যেন সামান্য কাহিল হয়ে পড়েছেন। আপন খেয়ালে যে তিনি কী করছেন, তারাপদ বুঝতে পারত না। অর্ধেক সময় ঘরে বসে কিছু ভাবছেন, না হয় কাগজ পেন্সিল নিয়ে কুঠিবাড়ির নকশা করছেন, কিংবা ফকিরের সঙ্গে কথা বলছেন। কিকিরা ফাঁকে ফাঁকে কুঠিবাড়ির বাইরে বাইরেও ঘুরে আসছিলেন লোচনকে নিয়ে। তারাপদকে একরকম ছুটিই দিয়েছেন, বলেছেন তামাশা করে, "নাও হে তারাপদবাবু, খেয়ে আর ঘুমিয়ে গায়ে গত্তি লাগিয়ে নাও ক'দিন, তারপর তোমার এলেম দেখা যাবে। আসুক চন্দন।"

তারাপদর বাস্তবিক কিছু করার ছিল না। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া করার কীই বা আছে। ফকিরদের বাড়িতে পুরনো বইপত্তর ছিল, কিছু সেকেলে বই। সেই বই পড়ে সময় কাটাত। আর বিকেলের দিকে ঘুরে বেড়াত এদিক-ওদিক। একদিন কিকিরার সঙ্গী হয়ে কুঠিবাড়ির বাইরেও ঘুরে এসেছে আবার।

কিকিরা যে একটা মতলব আঁটছেন, তারাপদ সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছিল। কিন্তু মতলবটা কী তা ধরতে পারছিল না।

.

এমন সময় চন্দন চলে এল। এয়োদশীর দিন। স্টেশনে জিপ নিয়ে গিয়েছিল নকুল, সঙ্গে তারাপদ।

জিপ গাড়িতে আসতে-আসতে দু-পাঁচটা কথার পর চন্দন বলল, "কতদূর এগুল ব্যাপারটা?"

তারাপদই বলল, "কিকিরাই জানেন।"

"তুই কিছু জানিস না? তা হলে করছিস কী?"

"আমি কিছুই করছি না। খাচ্ছিাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি। আর মাঝে-মাঝে কিকিরার হেঁয়ালি শুনছি।"

"তোর দ্বারা কিছু হবে না, তারা। এত অলস হয়ে গিয়েছিস। ক'দিনে চেহারাটাও তো নাড়ুর মতন গোল করে ফেলেছিস। গালে চর্বি জমে গিয়েছে।"

তারাপদ হাসল। বলল, "টাটকা দুধ ঘি মাছের ব্যাপার, বুঝলি না?"

চন্দন বন্ধুর পিঠে থাপ্পড় মারল। হাসল। তারপর বলল, "ঘোড়া-সাহেবের কুঠিটা কী বস্তু রে?" কলকাতাতেই কিকিরার মুখে চন্দন ব্যাপারটা মোটামুটি শুনেছিল। বাড়িতে একটা চিঠিও পেয়েছিল তারাপদর।

তারাপদ বলল, "বস্তুটা একটা পুরনো ভাঙাচোরা কেল্লা বলতে পারিস। সেকেলে সাহেবসুবোর ব্যাপার, দু'হাতে টাকা উড়িয়ে বাড়ি বানিয়েছিল।"

চন্দন বলল, "সেখানে কিছু পাওয়া গেল?"

"না। তবে একটা ব্যাপার জানা গিয়েছে। আমি নিজেও দেখেছি প্রমাণ, কেউ একজন

ওখানে আস্তানা গেড়েছিল হালে। হয়ত এখনও গেড়ে আছে।”

“লোকটা কে?”

“বলতে পারব না।”

নকুল জিপটাকে থামিয়ে নিয়ে রাস্তার নামল। বনেট খুলে কী যেন করে আবার বন্ধ করল। ফিরে এসে গাড়িতে উঠল।

“কী হয়েছিল, নকুল?” তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

”হরনের তারটা খুলে গিয়েছিল বাবু। লাগাই দিলাম।”

আবার গাড়ি চলতে শুরু করলে চন্দন বলল, “কিকিরার বন্ধুর ছেলে কেমন আছে?”

“এখন একটু ভাল শুনেছি। আমি ছেলেটিকে সামনাসামনি দেখিনি। তফাত থেকে দেখেছি।”

অবাক হয়ে চন্দন বলল, “সে কী! তুই আজ হপ্তাখানেক হল এখানে রয়েছিস–ছেলেটাকেই দেখিসনি?”

“কেমন করে দেখব। ও নিচে আসে না। ওকে আসতে দেওয়া হয় না। দোতলায় নিজের ঘরেই থাকে, বেশির ভাগ সময়। কিকিরাও দু-একদিন মাত্র ওপরে গিয়ে ওকে দেখে এসেছেন।”

চন্দন আর কিছু বলল না। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। নকুল গ্রামের পথ ধরল এবার।

.

দুপুর আর বিকেলটা চন্দন আয়েস করে কাটাল। খেল, ঘুম দিল, তারাপদ আর কিকিরার সঙ্গে বকবক করল। এই একটা হপ্তা কেমন করে কেটেছে তার বৃত্তান্ত শোনাল তারাপদ বন্ধুকে। কিকিরা যতটা পারলেন ফকির, অমূল্য, ঘোড়া-সাহেবের কুঠি এ-সবের ইতিহাস শোনালেন চন্দনকে। তারপর বললেন, “আজ রাত্রে আমরা একটা কনফারেন্স করব, স্যান্ডেলউড তুমি, আমি আর তারাপদ। তার আগে তোমায় একটা-দুটো খুচরো কাজ করতে হবে।”

“কী কাজ?”

“ফকিরের ছেলে বিশুকে একবার দেখবে। আমি ফকিরকে বলে রেখেছি। সেই সঙ্গে ফকিরের পায়ের চোটটা।”

“ফকিরবাবুকে তো সকালে দেখলাম। ও দেখার কিছু নেই। গোড়ালি মচকালে সারতে সময় লাগে।”

“তবু একবার দেখো।”

“বেশ, দেখব।” বলেই চন্দনের কিছু মনে হল, বলল, “বিশু নিচে নামবে, না আমাকে

ওপরে যেতে হবে?”

“দেখি কী হয়!...তবে সন্ধের পর আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না, আমরা তিনজনে বসব। বুঝলে?”

মাথা নাড়ল চন্দন। যা বলেছেন কিকিরা, তা-ই হবে।

সন্ধের মুখে চা খাওয়ার সময় ফকির নিজেই বিশুকে নিয়ে নিচে এলেন। ভবানীও সঙ্গে ছিল।

ফকির অল্প খোঁড়াচ্ছিলেন। সকালের মতনই।

কিকিরা বললেন, “তুমি যতটা কম সিঁড়ি-ভাঙাভাঙি করলেই পারো, ফকির। আমরাই ওপরে যেতাম।”

ফকির হাসলেন। বললেন, “চেয়ারে পা তুলে বসে থাকা কি আমাদের পোষায়, কিঙ্কর। আগে এসব চোট গায়ে মাখতাম না। এখন ভাই বয়েস হচ্ছে।” বলে চন্দন আর তারাপদর দিকে তাকালেন।”আমার ছেলেকে আনলাম–” বলে বিশুকে দেখালেন। তারপর ভবানীকে দেখিয়ে বললেন, “আমার ভাগ্নে বিশুর খুব বন্ধু।”

কিকিরা বিশুকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বসালেন। ভবানীকে বসতে বললেন।

তারাপদ বিশুকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। ফকির সুপুরুষ ঠিকই, কিন্তু বিশু তার বাবার চেয়েও সুন্দর। বিশুর ভাই অংশুকে আগেই দেখেছে তারাপদ, গল্পটল্পও করেছে। ছেলেমানুষ। স্কুলে পড়ে। অংশুও দেখতে ভাল। তবে বিশুর মতন নয়। ওদের বোন পূর্ণিমাকেও দেখেছে তারাপদ। বাচ্চা মেয়ে। খানিকটা দুরন্ত। সেও চমৎকার দেখতে। মাঝে-মাঝে নিচে এসে কিকিরার ওপর হামলা করে যায়, তারাপদকে বেসমের লাড্ড খাইয়েছিল। বেশ মেয়ে। তবু ভাইবোনদের মধ্যে বিশু সেরা। ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রঙ খুবই ফরসা, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, কাটাকাটা মুখ-চোখ, ঠোঁট দুটো পাতলা। সবই সুন্দর। কিন্তু বিশুর মুখে কেমন যেন একটা ভয়ের ছাপ, চোখ দুটোয় ঘুম-ঘুম ভাব।

ভবানীকেও দেখল তারাপদ। সাধারণ চেহারা। তবে চালাক-চতুর বলেই মনে হয়। চন্দন বিশুকে দেখছিল। ফকিরকে বলল, “এখানে দেখা হবে না। আপনি ওকে নিয়ে পাশের ঘরে চলুন।” বলেই একটু থেমে হঠাৎ বলল, “আচ্ছা, ওকে কি কোনো ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়?”

“হ্যাঁ। ডাক্তারবাবু যা দিয়েছে, তাই খায়।”

“কবার খায়?”

“দু-তিন বার বোধহয়।”

“এতবার?...আশ্চর্য! চলুন–পাশের ঘরে যাই।”

চন্দন উঠল।

ফকির বিশুকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

কিকিরা ভবানীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তারাপদ একটা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে বিশুর কথা ভাবতে লাগল।

হঠাৎ কিকিরার একটা কথা কানে গেল। কিকিরা ভবানীকে বলছেন "তুমি এখন এখানেই থাকবে কিছুদিন, না ফিরবে?"

ভবানী বলল, "কালীপুজো পর্যন্ত থাকব।"

তারাপদ অন্যমনস্কভাবে ভবানীর দিকে তাকাল। কেন তাকাল সে, বুঝতে পারল না। চোখের দিকে তাকাল। কটা চোখ। জোড়া ভুরু। তারাপদর কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

ভবানী উঠে দাঁড়াল।"আমি যাই, মামা। বড়মামুর দেরি হবে।"

"যাবে? এসো!"

ভবানী চলে গেল।

তারাপদ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে নিঃশব্দে দরজার কাছে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখল বাইরেটা।

ফিরে এসে নিচু গলায় বলল, "কিকিরা, ভবানী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

কিকিরা বললেন, "তুমি বোসো।"

ফকির আর বিশু আরও খানিকটা পরে এ-ঘরে এল। চন্দনও পেছনে-পেছনে।. ফকির অবশ্য আর বসলেন না, বললেন, "কিঙ্কর, আমরা যাই। সকালে দেখা হবে। ...ভাল কথা, কাল একবার অমূল্যদের বাড়ি যাব। খুড়িমাকে প্রণাম করে আসা হয়নি বিজয়ার পর। যাব তো, কিন্তু...তুমি কী বলো?"

কিকিরা একটু ভেবে বললেন, "নিশ্চয় যাবে। একশো বার যাবে। আমি বলি কি, তুমিও একদিন অমূল্যকে কোনো ছুতোয় এ-বাড়িতে ডেকে আনো।"

"ওকে ডেকে আনব? কেন?"

"সে না হয় পরে বলব। ভেবে দেখো ডাকতে পারবে কি না? এখন। যাও–ছেলেটাকে আর দাঁড় করিয়ে রেখো না।"

"আচ্ছা, চলি।" ফকির তিনজনের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন। তারপর ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন।

সামান্য চুপচাপ। চন্দন চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

কিকিরা বললেন, "বিশুকে কেমন দেখলে, চন্দন?"

চন্দন তারাপদর কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল, বলল, "আপা। যেমন বলেছিলেন, তেমন তো মনে হল না।"।

কিকিরা আর তারাপদ দুজনেই যেন অবাক হয়ে চন্দনের দিকে তাকালেন।

চন্দন নিজের থেকেই বলল, “আমার মনে হল, এমনিতে ওর কোনো অসুখ নেই। তবে খানিকটা নাভার্স হয়ে রয়েছে। আর-একটা জিনিস দেখলাম, ওকে ঘুমের ওষুধ একটু বেশিই খাওয়ানো হয়েছে। দেখলেন না, কেমন ঝিমোনো ভাব!”

কী ভেবে কিকিরা বললেন, “শরীর-মনের কোনো ক্ষতি হয়েছে?”

“না। তা আমার মনে হল না।”

“সেরে যাবে?”

“না-সারার কী আছে, কিকিরা? একটা আচমকা শক হয়ত পেয়েছে। কিন্তু সেটা মানুষ নিজের থেকেই ধীরে-ধীরে সামলে নেয়। বিশু, পাগলও হয়নি, উন্মাদও নয়। ভাববার মতন কিছু দেখলাম না। বরং বলতে পারেন, ওকে নিজের থেকে ধাক্কাটা সামলাতে না দিয়ে গাদাগুচ্ছের ওষুধ খাইয়ে আর চারপাশ থেকে বেঁধে রেখে “সিক করে দেওয়া হয়েছে।”

কিকিরা যেন খুশি হলেন। বললেন, “তুমি যা বলছ, তা যেন সত্যি হয়।”

চন্দন ঠাট্টা করে বলল, “আমি ঘোড়ার ডাক্তার নই, কিকিরা স্যার।”

তারাপদ জোরে হেসে উঠল।

কিকিরাও পালটা ঠাট্টা করে বললেন, “অবোলা জীবের ডাক্তারি করা আরও কঠিন হে স্যান্ডেলউড়। পেটে ব্যথা হলেও সে বলতে পারবে না, মাথা ধরলেও নয়। বুঝলে?”

আরও দু চারটে হাসি-তামাশার কথা হল। তারপর কিকিরা বললেন, “এবার কাজের কথা হোক, কী বলো তারাপদ?”

মাথা নাড়ল তারাপদ।

একটু চুপচাপ বসে থেকে কিকিরা বললেন, “চন্দন, তুমি তো মোটামুটি সবই শুনেছ। ঘোড়া-সাহেবের কুঠিটাই যা তোমার দেখা হয়নি। তা সেটাও কাল-পরশু দেখিয়ে আনব। এখন কাজের কথা শুরু করি।”

চন্দন আর তারাপদ তাকিয়ে থাকল। কিকিরার দিকে।

কিকিরা বললেন, “আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছি, ঘোড়া-সাহেবের কুঠি নিয়ে যে ঝাট বেধেছে, সেটা নেহাত ওই বাড়িটা নিয়ে নয়। তোমরা বলবে, কেন–বাড়ি নিয়ে নয় কেন? তার জবাবে আমি তারাপদর কথাটাই বলব, বাড়ি নিয়ে ঝঞ্ঝাট হলে সেটা আইন-আদালত করে ফয়সালা হতে পারত। তা কেন হচ্ছে না? কেন অমূল্য আর ফকির দু’জনেই ওই বাড়ির ওপর ঝুঁকে পড়েছে? ঠিক কি না বলো? তা ছাড়া, ঘোড়া-সাহেবের কুঠি এতকাল পড়ে থাকল–কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাল না, হঠাৎ আজ মাস-দুই ধরে দু-তরফের টনক ওঠার কারণ কী?”

চন্দন বলল, “ফকিরবাবু আপনাকে কী বলছেন?”

"কিছুই তো বলছে না। ওর কথাবার্তা থেকে বরং মনে হয়, বিশুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কুঠিতে নিয়ে গিয়ে অমূল্যরা একটা ভয়ঙ্কর কিছু করবার মতলব এঁটেছিল। পারেনি। এখন ফকিরের রোখ চেপে গিয়েছে।"

তারাপদ বলল, "ভয়ঙ্কর কী করত, কিকিরা?"

"লুকিয়ে রাখতে পারত, গুম করত, মেরে ফেলতেও পারত।"

"কেন? নিজের ভাইপোকে কেউ মেরে ফেলে?"

"টাকা-পয়সা-সম্পত্তির লোভে খুন-খারাপি তো হয়েই থাকে।"

চন্দন বলল, "তা ঠিক। কথায় বলে, অর্থই অনর্থের মূল। রাজবাড়ির সেই কেস না, কিকিরা? কিন্তু আমি ভাবছি, বিশু একজন অচেনা সাধুবাবার কথায় বিশ্বাস করে তার পেছন-পেছন কুঠিবাড়িতে গেল কেন?"

কিকিরা হাতের আঙুল মটকাতে-মটকাতে বললেন, "তুমি ঠিকই ভাবছ। নেহাত কৌতূহলের জন্যে যেতে পারে, কিংবা ভয়ে। আমি ভাবছি এ-ছাড়া অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে কি না?"

তারাপদ বলল, "তা কেন ভাবছেন?"

"ভাবছি এই জন্যে যে, বিশু সাধুবাবার কথায় ভুলে না হয় কুঠিবাড়িতে গেল, কিন্তু সেই সময় অমূল্যর শালা চরণ তার লোক নিয়ে সেখানে হাজির থাকবে কেন? কেন চরণরা গিয়েছিল? কে তাদের নিয়ে গিয়েছিল?"

চন্দন কান চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "আপনি কি বলতে চান, ওই সাধুবাবাই বিশুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে অমূল্যর শালার হাতে তুলে দিয়েছিল?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা।"না, অতটা বলতে পারছি না। তা যদি হত, তবে বিশুকে চরণদের হাতে তুলে দিয়ে সাধুবাবু পালাত। কিন্তু তা তো হয়নি। উলখে সাধুবাবার সঙ্গে চরণদের কথা-কাটাকাটি হয়েছে। সাধুবাবাকে গুলি করা হয়েছে।"

"গুলি খেয়ে সাধুবাবা পালিয়েছে, তারাপদ বলল, "ম্যাজিক দেখিয়ে উধাও।"

কিকিরা বললেন, "গুলি খেয়েছে কি না, তা বলতে পারব না; তবে বিশুর মুখে আমি যা শুনেছি, তাতে বুঝতে পারলাম, চরণদের সঙ্গে সাধুবাবার কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া থেকে বিশু বুঝতে পারছিল, চরণরা সাধুবাবার কাছে কিছু জানতে চাইছিল; সাধুবাবা বলছিল না।"

"সেই রাগেই কি বন্দুক চালায় চরণরা?"

"তাই তো মনে হয়।"

সামান্য চুপচাপ থেকে তারাপদ চন্দনকে বলল, "আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না, চাঁদু। সাধুবাবাও একটা মিস্ট্রি। বিশুকে কেনই বা ডেকে নিয়ে যাবে, আর কেনই বা উধাও হয়ে যাবে। লোকটার কোনো ট্রেসই আর পাওয়া গেল না।"

কিকিরা বললেন, “আমার কাছে এখন দুটো প্রশ্নই আসল।”

“প্রশ্ন দুটো কী?” চন্দন বলল।

“ওই সাধুবাবা লোকটি কে? কেন সে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিল এখানে। মজার ব্যাপার কী জানো, সাধুবাবা এখানে আসার সময় থেকেই ওই কুঠিবাড়ি নিয়ে গণ্ডগোল কেন?”

“আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?”

“দ্বিতীয় প্রশ্ন, কী জন্যে সাধুবাবা বিশুকে নিয়ে কুঠিবাড়িতে গিয়েছিল। কেন বলেছিল বিশুকে যে, কুঠিবাড়িতে গেলে তার ভাল হবে। আর কেনই বা চরণ সাধুবাবার সঙ্গে ঝগড়া চেঁচামেচি করছিল? কী জানতে চাইছিল? কেন তারা সাধুবাবার পিছু ধরেছিল?”

তারাপদ বলল, “আপনি বলতে চাইছেন, সাধুবাবাই সব গণ্ডগোলের মূল?”

“নিশ্চয়।”

চন্দন বলল, “সাধুবাবার হাওয়া হয়ে যাবার ব্যাপারটা..?”।

“ওটা স্রেফ চালাকি! এক ধরনের ম্যাজিক। সেই ঘর, জানলা, সিঁড়ি তোমায় দেখাব। দেখলেই বুঝতে পারবে। আমিও ওখান থেকে ভ্যানিশ হতে পারি। ওটা কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, কুঠিবাড়ির একটা ঘরে “ডবল উইনডো’ আছে এটা সাধুবাবা কেমন করে জানল? আর কেনই বা সে ওই ঘরটাই বেছে নিয়েছিল, নিয়ে বিশুকে নিয়ে গিয়েছিল?” বলে একটু থেমে আবার বললেন কিকিরা, “প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, ম্যাজিকে যেরকম ভ্যানিশিং ট্রিক দেখানো হয়—এখানেও তাই হয়েছে। জানলাটা দেখার পর বুঝতে পারছি—ওটা একটু অন্যরকম। সাধুবাবা সব জেনেই ঘর বেছেছিল। মানে জানলার ব্যাপারটা সে জানত।”

চন্দন আর তারাপদ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

চন্দন বলল, “তারা বলছিল, ওই ঘরে কেউ একজন এখন থাকে।”

“থাকার চিহ্ন দেখেছি। লোক দেখিনি। হয়ত কেউ একজন ঘরে থাকত, পাহারা দিত। খুব সম্ভব সাধুবাবারই আস্তানায় ছিল ওটা। কিন্তু কেন? ওই ঘরে কী আছে?”

কেউ কোনো কথা বলল না।

অনেকক্ষণ পরে চন্দন বলল, “সাধুবাবাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না?”

কিকিরা বললেন, “চেষ্টা করছি। লোক লাগিয়েছি।” বলে তারাপদর দিকে তাকালেন। বললেন, “তোমায় একটা কথা বলা হয়নি, তারাপদ। লোচন আজ বিকেলে বলছিল, যে শশিপদকে আবার তার গ্রামে দেখা গিয়েছে।”

“শশিপদ কে?” চন্দন জিজ্ঞেস করল।

“সাপের ওঝা, কিকিরা যেন কেমন করে হাসলেন, “ওই ওঝাটিকে ধরতে হবে হে। নকুলকে আমি বলেছি। ...নাও, ওঠো রাত হল। আর নয়।”

০৯.

পরের দিন সন্ধের মুখে লোচন এসে কানে-কানে কথা বলার মতন করে কিছু বলল কিকিরাকে। কিকিরা তারাপদদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। খানিকটা আগে চন্দন আর তারাপদকে নিয়ে ঘোড়া-সাহেবের কুঠি ঘুরে এসেছেন। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন খানিকটা। লোচনের কথায় ব্যগ্র হয়ে বললেন, "কই, কোথায়? তাকে নিয়ে এসো।"

লোচন মাথা নেড়ে বলল, "ইখানে আসবেক নাই, বাবু। খেপাকে নকুল ধরে রেখেছে।"

কিকিরা বললেন, "বেশ, চলো।" বলে তারাপদর দিকে তাকালেন, "তোমার শশিপদ। চলো, দেখে আসবে চলো।"

বাড়ির বাইরে ঠাকুর-দালানের পেছন দিকে একটা ঘরে নকুল শশিপদকে ধরে বেঁধে বসিয়ে রেখেছে। ঘরে আলো নেই। চারদিকে গাছপালা, ডোবা; মস্ত একটা তেঁতুল গাছ সামনে।

কিকিরা আসতেই নকুল দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

"পেলে কোথায়, নকুল?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"কাছকেই ছিল। সাহানা ঠাকুরের বাড়ির কাছে খেপা ঘুরঘুর করছিল।" কিকিরা ঘরের মধ্যে তাকালেন। অন্ধকার। ঘুপচি ঘর। বাইরে চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। কাল কোজাগরী পূর্ণিমা।

কিকিরা বললেন, "অন্ধকারে তো ঠাওর করতে পারছি না। বাইরে আনো হে, নকুল। শশি-ওঝাকে দেখি।"

"আজ্ঞা, যদি ছুট দেয়?"

"দেবে না। তুমি আছ না?" বলে কিকিরা শশিপদকে বাইরে ডাকলেন।

শশিপদ বাইরে এল। বাইরে এসে দেখল সবাইকে। তারাপদকেও। তারপর হাত জোড় করে নমস্কার করল।

কিকিরা চাঁদের আলোয় যতটা পারেন খুঁটিয়ে দেখলেন শশিপদকে। তারপর বললেন, "দাওয়ায় দু-দণ্ড বসা যাক, শশিপদ; কী বলো?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়ল শশিপদ। ওর চোখে কেমন যেন ঝিমুনিভাব।

কিকিরাও বসলেন। তারাপদ আর চন্দন দাঁড়িয়ে থাকল। লোচন সামান্য তফাতে। নকুল একপাশে দাঁড়িয়ে।

কিকিরা যেন শশিপদকে খানিকটা ভরসা দেবার জন্যে বলেন, "তোমার কথা অনেক শুনেছি, শশিপদ। আমি তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম। দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে।"

শশিপদ কথার জবার দিল না, হাত জোড় করে আবার নমস্কার করল কিকিরাকে। তারাপদ আর চন্দন হাসল।

সন্দেহ হল কিকিরার।”তুমি কি কিছু খেয়েছ?”

“আজ্ঞা। আফিম।”

“তা বেশ করেছ।...আচ্ছা শশিপদ, তুমি নাকি সাপের মস্ত ওঝা?”।

“আমি লিজে কী বুলব?” শশিপদ নিজের কান মলে আবার নমস্কার করল।

“তা অবশ্য ঠিক। নিজের গুণ গাইতে নেই। ...তা শশিপদ, তোমায় দু-একটা পুরনো কথা জিজ্ঞেস করব। বলবে?”

শশিপদ ঘাড় তুলে দেখল চারপাশ। তারপর আঙুল তুলে নকুলদের দেখাল। বলল, “উয়াদের কাছে রা কাড়ব না। বড় নিরদয়, যেতে বলুন কেনে উদের।”

কিকিরা নকুল-লোচনদের চলে যেতে বললেন। শশিপদ বায়না ধরল, তারাপদরাও সরে যাক।

অগত্যা ওরা সরে গেল।

কিকিরা বললেন, “এবার বলো?”

“আজ্ঞা করুন।”

“আমি করব? বেশ, তাহলে আমার প্রথম কথা, তুমি আমায় সত্যি করে বলো, ফকিরবাবুর ছোটকাকাকে তুমি চিনতে?”

শশিপদ মুখ তুলে তাকাল। বলল, “বিলক্ষণ চিনতাম।” শশিপদর ঝিমনো গলা যেন হঠাৎ ধাতে এল। অবাক হলেন কিকিরা।

“তিনি কি সাপের কামড়ে মারা গিয়েছেন?”

“না আজ্ঞা,” মাথা নাড়ল শশিপদ।

”তুমি কি তাঁর ওঝাগিরি করেছিলে?”

কপালে দুহাত জোড় করে ঠেকাল শশিপদ।”ভগবান যাঁকে বাঁচান কর্তা, তাঁর আয়ু লয় হয় না। আমি ছোটবাবুর কাছে ছিলাম। বিষধর তাঁকে কামড়াইছিল বটে, কিন্তু তিনি বিষ খেয়ে লিলেন।”

কিকিরা অকারণ তর্ক করলেন না। ফকিরের ছোটকাকার বিষ হজম করার ক্ষমতা থাক বা না থাক, তাতে কিছু আসে-যায় না। আসল কথা, ফকিরের কাকা সাপের কামড়ে মারা যায়নি।

কিকিরা বললেন, “তবে যে এরা জানে, ছোটকাকা মারা গেছেন সাপের কামড়ে?”

শশিপদ এবার সোজা হয়ে বসল। তাকাল কিকিরার দিকে। বলল, “ছোট মুখে বড় কথা হয় কর্তা। যদি শোনেন তো বলি।”

“শুনব বলেই তো তোমায় খুঁজছি, শশিপদ।”

সামান্য চুপ করে থেকে শশিপদ বলল, “ই সংসার বড় পাপের জায়গা। কর্তা। ধন-দৌলত হল গিয়ে সব্বনেশে। ছোটবাবু মারা যান নাই, বাবু। উ সব হল গিয়ে রটনা।”

কিকিরা বললেন, “আমার তাই মনে হয়েছিল শশিপদ। ছোটবাবু যদি সত্যিই মারা যেতেন, তবে কেউ-না-কেউ তাঁকে দেখত। অত বড় ঘরের ছেলে, করুন না কেন ধর্মকর্ম, সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ান না যেখানে খুশি, তা বলে তিনি মারা যাবার পর কেউ কোনো খবর দেবে না, দেখবে না মানুষটাকে–এ হয় নাকি?”

শশিপদ বলল, “ভাইদের হাত থেকে বাঁচতে বাবু রটনা করেছিলেন।”

“এত বড় মিথ্যে রটনা কেউ করে? অকারণে?”

“জানি না, কর্তা!”

“বেশ, তোমায় জানতে হবে না। জানলেও তুমি বলবে না। একটা কথা বলল, ছোটবাবু এখনো বেঁচে?”

শশিপদ ঘাড় হেলাল। ”কোথায় আছেন তিনি?”

“জানি না। “

“তুমি আবার মিথ্যে কথা বলছ! ...আমি বলছি, ওই যে, সাধুবাবু এই গাঁয়ে এসেছিলেন, তিনিই ছোটবাবু!”

শশিপদ কিকিরাকে দেখল। হাসল যেন, বলল, “যা ভাবেন। আমি জানি না।”

কিকিরা বুঝতে পারলেন, আফিংখোর শশিপদ খুব সহজ মানুষ নয়। বললেন, “তুমি আমায় ভুল বুঝছ, শশিপদ। আমার কোনো স্বার্থ নেই। ফকিরবাবু আমার বন্ধু। আমি বিশুর জন্যে এসেছি। ফকিরবাবু বড় কষ্টে আছেন।”

শশিপদ যেন হাসিখুশি মুখ করল; বলল, “তা জানি বাবু। ...একটা কথা বুঝতে লারি। ফকিরবাবু আপনার বন্ধু, কিন্তুক উ মিছা কথা বলে কেন?”

কিকিরা অবাক হবার ভান করে বললেন, “মিছে কথা? কিসের মিছে কথা?”

“আপনি জানেন বটে।”

“না শশিপদ, আমি জানি না।”

একটু ভাবল শশিপদ, বলল, “ফকিরের বেটাকে সে লিজে সাধুবাবার কাছে পাঠাইছিল!”

“নিজে গিয়েছিল, শুনেছি।”

“সব্বেব মিছা, সব্বেব মিছা”–শশিপদ জোরে জোরে মাথা নাড়ল, “ফকির লিজে তার বেটাকে পাঠাইছিল। সাধুবাবার কাছে পাঠাইছিল, কত। কেন পাঠাইছিল?”

"কেন?"

"আপনি জেনে লেবেন। ফকির আপনার বন্ধু বটে।"

"তুমি বলবে না?"

"না।"

কিকিরা কিছু যেন ভাবলেন। পরে বললেন, "তুমি অমূল্যের লোক?"

"সে আপনি যা ভাবেন, কতা।"

কিকিরা এবার অধৈর্য, বিরক্ত হলেন। শশিপদ বড় একগুঁয়ে, জেদি। ভয় দেখিয়ে ওকে বাগে আনা যাবে না। লোভ দেখিয়েও নয়।

কিকিরা বললেন, "তা হলে তোমায় একটা কথা বলি, শশিপদ! তোমার সাধুবাবা কোথায় আছেন আমি জানি না। কিন্তু কেন তিনি এখানে এসেছিলেন, আমি জানি। যে-ঘর থেকে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ঘরের সব খবর আমি জেনেছি। একটা কথা তুমি জেনে রেখো, কুঠিবাড়ির মধ্যে যা আছে, আমি কাল-পরশুর মধ্যে তা বার করে আনব। আমার সঙ্গে যে নতুন বাবুটিকে দেখলে, উনি কলকাতার পুলিশের লোক। ওঁকে আনিয়েছি। অমূল্যকে বলো, ওর যদি ক্ষমতা থাকে–আমাদের সঙ্গে কুঠিবাড়িতে দেখা করতে। ফয়সালা সেখানেই হবে। ...যাও, তুমি যাও।"

শশিপদ এবার কেমন হতভম্ব হয়ে বসে থাকল খানিক। কিকিরাকে দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল কিকিরাকে। কোনো কথা না বলে চলে গেল।

ঘরে এসে কিকিরা সব বললেন তারাপদদের।

চন্দন বলল, "এই কাঁচা কাজটা করলেন কেন, কিকিরা? একেবারে আলটিমেটাম দিয়ে দিলেন?"

"উপায় ছিল না।"

"কিন্তু কুঠিবাড়িতে কী আছে, আপনি জানেন না।"

"জানি না বলেই তো ধাপ্পা দিলাম।"

"ধাপ্পায় যদি কাজ না হয়?"

"না হলে আর কী করব! ...তবে আমি যা যা সন্দেহ করেছিলাম, তার অনেকগুলোই মিলে গেল।"

"যেমন?"

"যেমন ধরো প্রথম হল, ফকির সব কথা বলছে না। দুই হল, ফকিরের ছোটকাকা বেঁচে আছেন। তিন হল, কুঠিবাড়ি নিয়ে সমস্ত গণ্ডগোল বেধেছে। সাধুবাবা এখানে আসার পর,

কাজেই ওই কুঠিতে এমন-কিছু আছে, যার কথা সাধুবাবা ছাড়া অন্য কেউ জানে না…।”

কথার মধ্যে তারাপদ বলল, “আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, ফকির আর অমূল্য দুই তরফই সাধুবাবাকে চোখে-চোখে রেখেছিল।”

“হ্যাঁ।”

“কেন?”

“চিনতে পেরেছিল বলে।”

“কাকা বলে চিনতে পেরেছিল?”

“অবশ্যই।”

“তা হলে বাড়িতে আনল না কেন?”

“জানি না। হয়ত আনতে চায়নি।”

চন্দন বলল, “আপনার বন্ধু ফকিরই আপনাকে ঠকাল, কিকিরা।”

কিকিরা বললেন, “আমি এই ব্যাপারটায় বড় অবাক হয়ে গিয়েছি, চন্দন। ফকির কেন এমন করবে? …যাক গে, কালই এর একটা হেস্তনেস্ত করব, না হয় পরশু।“

১০.

পূর্ণিমার পরের দিন কিকিরা দলবল নিয়ে ঘোড়া-সাহেবের কুঠিতে হাজির হলেন। তখন সন্ধে হয়-হয়। কুঠির বাইরে জিপগাড়িতে লোচন আর নকুল। চারদিকে নজর রেখে বসে থাকার কথা, কিন্তু এই বিশাল কুঠিবাড়ির চারদিক তাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। যতটা চোখ যায়, দেখছিল। কাল কোজাগরী গিয়েছে, আজও ফুটফুটে জ্যোৎস্না, আকাশ মাঠ ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়।

কিকিরা আজ ফকিরকে সঙ্গে নিয়েছেন। ফকির প্রথমটায় আসতে চাননি, কিকিরা তাকে বুঝিয়ে বলেছেন, "তোমার যাওয়া দরকার। তুমি না গেলে আমার কাজের কাজ কিছুই হবে না। কাজেই, ফকিরও এসেছেন। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।

নিচের তলায় ঘোরাঘুরির কোনো দরকার ছিল না; সোজা দোতলায় উঠে এসে কিকিরা বারান্দায় দাঁড়ালেন। সন্ধে যত ঘন হয়ে আসছে, জ্যোৎস্না তত উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। গাছপালার মাথায় জ্যোৎস্না, অর্ধেকটা বারান্দায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। চারদিক নিঝুম। বাতাস দিচ্ছিল। অনেকটা তফাতে রাশি-রাশি জোনাকি উড়ছে।

কিকিরার হাতে বড় টর্চ, আর সেই সরু ছড়ি। ফকিরের হাতেও রড় টর্চ। তারাপদর এক হাতে লণ্ঠন বাড়ি থেকে বয়ে আনতে হয়েছে; কেননা, কুঠিবাড়ির ঘরে যে-লণ্ঠনটা আছে, সেটা জ্বলবে কি না কে জানে। এসব কিকিরার পরামর্শ। তারাপদর অন্য হাতে একটা ঝোলানো ব্যাগ, তার মধ্যে খুচরো কতক জিনিস, চন্দনের কাঁধে বন্দুক। ফকির বন্দুকটা সঙ্গে করে এনেছেন। চন্দন বন্দুক বইছিল।

বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কিকিরা ফকিরকে বললেন, "চলো, ঘরে যাই।"

দোতলায় সেই ঘর যেমন ছিল, সেই রকমই পড়ে আছে। তারাপদ লণ্ঠনটা জ্বালাল। কিকিরা জানলা দুটো খুলে দিলেন।

চারজনে বসে-বসে সিগারেট শেষ করলেন। তারাপদ একবার বারান্দায় গেল, ফিরে এল।

ফকির বললেন, "তুমি কি সত্যিই মনে করো, অমূল্য আসবে?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "আসবে। আসা উচিত।"

চন্দন বলল, "যদি না আসে?"

"তা হলে বুঝব, আমার চালাকি খাটল না।"

ফকির আর কিছু বললেন না। চন্দন তারাপদকে নিয়ে আবার বারান্দায় চলে গেল।

সময় যেন আর কাটছিল না। চুপচাপ বসে থাকাও যায় না। কিকিরা ফকিরের সঙ্গে মাঝে-মাঝে কথা বলছিলেন। তারাপদ আর চন্দন ঘরে এল।

তারাপদ বলল, "কোথাও কোনো ট্রেস পাচ্ছি না কিকিরা, অমূল্য বোধহয় এলেন না।"

কিকিরা বললেন, "দেখো, শেষ পর্যন্ত কী হয়।"

আরও খানিকটা সময় কাটল। কিকিরা উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন। ফকিরকে মাঝে-মাঝে এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আবার একসময় ফিরে এসে লোহার খাটটায় বসলেন।

ফকির ক্লান্ত হয়ে হাই তুললেন। চন্দন হতাশ হয়ে নিশ্বাস ফেলল। বলল কিছু।

কিকিরাও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ একেবার আচমকা ঘর কাঁপানো শব্দ হল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে গেল লণ্ঠনটা, কাঁচ ভাঙল, মাটিতে পড়ে দপদপ করে জ্বলতে জ্বলতে নিবে গেল। ঘরের মধ্যে কেমন ধোঁয়াটে ভাব, কেরোসিম আর গন্ধকের গন্ধ।

কিকিরা আর ফকির প্রায় লাফ মেরে খাটের তলায় বসে পড়েছেন ততক্ষণে, তারাপদ আর চন্দন দেওয়ালের দিকে সরে গেছে।

জানলার দিকে তাকালেন কিকিরা। জানলা দিয়ে এসেছে গুলিটা। ঘর অন্ধকার। টর্চ জ্বালানো উচিত নয়, জ্বালালেই বিপদ। কিকিরা ফকিরের হাতে। চাপ দিলেন, ফিসফিস করে বললেন, “টর্চ জ্বেলো না।”

ঘর থমথম করতে লাগল।

জানলা দিয়ে কেউ ভেতরে আসছিল। বাইরের জ্যোৎস্নার দরুন তাকে অস্পষ্ট, ভুতুড়ে ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল।

“কে, অমূল্য?” ফকির অস্ফুট গলায় আচমকা বললেন।

মূর্তি ততক্ষণে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, জানলার কাছে। বলল, “হ্যাঁ।”

“তুমি আমাদের ওপর বন্দুক চালালে?”।

“বন্দুক চালাইনি। পটকা চালিয়েছি। বাতিটা নিবিয়ে দিলাম। টর্চ। জ্বালাবার চেষ্টা করো না। তোমার সেই পুরনো বন্ধু কোথায়?”

ফকির চুপ করে থাকলেন। কিকিরা জবাব দিলেন, “আমি হাজির। রয়েছি।”

“হাজির রয়েছেন, তা জানি। আমিও হাজির। আপনি আমায় আসতে বলেছিলেন?”

“শশিপদ বলেছে?”

“হ্যাঁ।”

“হ্যাঁ, বলেছিলাম।”

“কেন?”

“কথা বলব বলে।”

“কিসের কথা?”

“তোমাকে তুমিই বলছি, রাগ করো না, তুমি ফকিরের ছোট ভাই।”

“বেশ বলুন।”

কিকিরা যে অন্ধকারে সন্তর্পণে কী করছিলেন, ফকিরও জানতে পারছিল না। কিকিরা বললেন, “এই কুঠিবাড়ি নিয়ে তোমাদের দুই ভাইয়ের ঝগড়ার মিটমাট হয় না?”

অমূল্য রাগল না, তবু গলার স্বর অন্যরকম শোনাল। “আপনি আমাদের মধ্যে নাক গলাতে কেন এসেছেন? বাড়ির ব্যাপার বাড়ির মধ্যেই মিটে যাওয়া ভাল।“

“তুমি আমায় ভুল বুঝছ! আমি নাক গলাতে আসিনি। তা ছাড়া আমি এসে খারাপ তো কিছু করিনি। ধরো, এই বাড়ির মধ্যে যে-জিনিসটা রয়েছে সেটার হদিস তো পেয়েছি।”

এবারে অমূল্য উপহাসের গলায় বলল, “আমার চোখে আপনি ধূলো দেবার চেষ্টা করবেন না। কলকাতা থেকে দুটো ছোকরার সঙ্গে করে এনেছেন। তার মধ্যে একটাকে আপনি পুলিসের নোক বলে চালাতে চাইছিলেন। সে ডাক্তার।”

কিকিরা ঘাবড়ালেন না। বললেন, “তোমার সব দিকে নজর আছে। লোকজনও জায়গা-মতন রেখে দিয়েছ, দেখছি। ফকিরের বাড়িও বাদ দাওনি। কিন্তু, এই ব্যাপারটায় ভুল করছ।”

“কোন ব্যাপারে?”

“এই বাড়ির মধ্যে কী আছে, তা আমি জানতে পেরেছি।”

“অসম্ভব। আপনি পারেন না।”

“বেশ, তা হলে তুমি আমার জানার একটা নমুনা দেখো। ...যেখান দিয়ে তুমি উঠে এসেছ, সেখানে যাও। ওই জানলাটার কাছে। প্রথম জানলার ডান দিকের কাঠের মাথার দিকে হাত দাও। একটা জায়গায় ছোট্ট গর্ত-মতন দেখবে। একটা আঙুল বড় জোর ঢুকতে পারে। সেখানে আস্তে-আস্তে চাপ দাও...। সোজা চাপ দেবে। যখন বুঝবে লোহার মতন কিছুতে আঙুল ঠেকছে–তখন জোরে চাপ দেবে। যাও, দেখো।”

অমূল্য সামান্য চুপ করে থাকল, ভাবল।”কী হবে চাপ দিলে?”

“যা হবে, দেখতেই পাবে। জানলার ডান দিকের কাঠ সরে ফোকর বেরুবে।”

“আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, তার প্রমাণ কী?”

“দেখতেই পাবে। সাধুবাবা ওই জিনিসটি হাতছাড়া করেননি।”

“তা হলে আপনিই বা করছেন কেন?”

“আমি যা বলেছি তুমি মন দিয়ে শোনোনি। আমি বলেছি, হদিস পেয়েছি, বলিনি সেটা আমার হাতে এসেছে।”

“আপনি হদিস পেয়েছেন অথচ হাতাননি? দাদা আপনাকে বৃথাই এনেছে?” অমূল্য বিদ্রূপ করল যেন।

“না, হাতাতে পারিনি। এক জায়গায় আটকে গিয়েছি।”

অমূল্য আর কোনো কথা বলল না, জানলার দিকেই ফিরে গেল।

কিকিরা তাঁর সেই ছড়ির মধ্যে থেকে লিকলিকে গুপ্তিটা আগেই বার করে নিয়েছিলেন। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে উঠলেন। ওঠার আগে ফকিরের হাতে। চাপ দিলেন সামান্য।

অমূল্য জানলার কাঠের ফ্রেমে হাত রেখে দাঁড়াল। বন্দুকটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে কাঠের চারদিক হাতড়াতে লাগল।

কিকিরা ছায়ার মতন অমূল্যর পিছনে গিয়ে গুপ্তির ডগাটা একেবারে তার ঘাড়ের কাছে ছোঁয়ালেন।

চমকে উঠে অমূল্য হাত নামাল।

কিকিরা শান্ত গলায় বললেন, “বন্দুক ধরার চেষ্টা আর কোরো না। আমার। গুপ্তি দিশি নয়, বিলিতি, উইনস্টন কোম্পনির, তোমার গলা ফুটো হয়ে যাবে।”

অমূল্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিকিরা ফকিরকে টর্চ জ্বালতে বললেন। টর্চ জ্বালালেন ফকির! আলোয় অমূল্যকে দেখা গেল। কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

কিকিরা তারাপদকে বন্দুকটা সরিয়ে নিতে বললেন। তারাপদ এগিয়ে এসে বন্দুক সরিয়ে নিল। একনলা বন্দুক।

ফকির কিকিরার পড়ে-থাকা টর্চটা মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়ে সেটাও জ্বেলে ফেললেন।

সামান্য চুপচাপ। কিকিরা অমূল্যকে ঘুরে দাঁড়াতে বললেন।

জোড়া টর্চের আলোয় অমুল্যকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কালো প্যান্ট, কালো জামা, পায়ে মোটা কেডস। স্বাস্থ্যবান চেহারা।

কিকিরা বললেন, “তুমি যথেষ্ট সাহসী; কিন্তু চালাক নও। আমি ম্যাজিশিয়ান, কথায় ভুলিয়ে দশ আনা কাজ হাসিল করি। যাক গে, তোমার সঙ্গে সরাসরি কয়েকটা কথা বলতে চাই। ফকির এখানে রয়েছে। কথা বলতে রাজি আছ?”

অমূল্য ভাবল কিছু। বলল, “রাজি। কিন্তু একটা কথা, আমি আপনাদের কাউকে গুলি করতে চাইনি। চাইলে করতে পারতাম। আমার গুলি ফসকায় না। তা ছাড়া, আমি কিন্তু একা আসিনি। আপনাদের মতন আমারও লোক আছে নিচে। আমার যদি কোনো ক্ষতি হয়, তা হলে..”

কিকিরা বললেন, “না, তোমার ক্ষতি হবে না। আমি জানি, তুমি আমাদের কারও ওপর গুলি চালাওনি।”

“বেশ, তা হলে বলুন।” কিকিরা গুপ্তিটা নামিয়ে নিলেন। বললেন, “তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে এই কুঠিবাড়ি নিয়ে রেষারেষি শুরু হল কেন হঠাৎ?”

অমূল্য কোনো জবাব দিল না।

কিকিরা বললেন, “সাধুবাবা এখানে আসার পর তোমাদের এই রেষারেষি। ওই সাধুবাবা যে তোমাদের ছোটকাকা, তা নিশ্চয় জানতে পেরেছিলে!”

“পেরেছিলাম। কাকা নিজেই লোক মারফত গোপনে খবর দিয়েছিল।”

“তাঁকে তোমরা বাড়িতে নিয়ে যাওনি কেন?”

অমূল্য একবার ফকিরের দিকে তাকাল।”সেটা অসম্ভব ছিল।”

“তোমাদের কাকা তা হলে এখানে এসেছিলেন কেন?”

“দাদাকে জিজ্ঞেস করুন।”

কিকিরা ফকিরের দিকে তাকলেন।

ফকির সামান্য চুপচাপ থাকার পর বড় করে নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, “আমি যা বলতে চাইনি, কিঙ্কর, এবার আর তা না বলে উপায় নেই। আমি যা বলছি, তা সত্যি। ...আমাদের ছোটকাকা আমাদের বংশের কুলাঙ্গার। অনেক কাল আগের কথা, আমার বাবা, মেজকাকা– মানে অমূল্যর বাবা–দুজনেই জীবিত। মেজকাকার নতুন বাড়িও তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমাদের তখন বয়েস কম, বাড়িতে প্রায়ই ছোটকাকাকে নিয়ে গণ্ডগোল হতে শুনতাম। দিন দিন অশান্তি বেড়েই চলল। শেষে একদিন ছোটকাকা উধাও হয়ে গেল। কিছুদিন পরে ফিরে এল গেরুয়া পরে। আবার একদিন উধাও। তারপর শুনলাম, কাকা আমাদের বংশের সমস্ত সৌভাগ্যের যা মূল সেটা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়িতে চার পুরুষের এক মনসামূর্তি ছিল, সোনার মুর্তি, অপরূপ দেখতে, মূর্তির চোখে হীরে। আরও কিছু দামি পাথর ছিল গায়ে। মূর্তির সঙ্গে ছিল একটা সোনার সাপ, তার দু চোখে দুটো লাল চুনি। এই মূর্তি কোনোদিন বাইরে থাকত না, থাকত সিন্দুকের চোরা-খোপের মধ্যে। মনসাপুজোর দিন তার পুজো হত বাড়িতে। ঠাকুরঘরে। আবার সেটা সিন্দুকে তুলে রাখা হত।” ফকির থামলেন, যেন একটু দম নিচ্ছিলেন।

কিকিরা বললেন, “নিশ্চয় খুব মূল্যবান মূর্তি?”

“তা তো হবেই–টাকায় শুধু মূল্যবান নয়, অমন মূর্তি ভূ-ভারতে খুঁজে পাবে কি না সন্দেহ! ...আমাদের বংশে ওই মূর্তির অন্য মূল্য। সে তোমরা বুঝবে না। ছোটকাকা ওই মূর্তি নিয়ে পালিয়ে যাবার পর কাকাকে আমরা ত্যাগ করলুম। বাবা আর মেজকাকা শপথ করিয়ে নিলেন, ভবিষ্যতে কোনোদিন ওই কুলাঙ্গার, আর এই বংশের কারও কাছে যেন একদিনের জন্যেও আশ্রয় না পায়। তাকে বিষয় সম্পত্তির এক কানাকড়িও যেন না দেওয়া হয়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি। কেমন করে ভাঙব?”

কিকিরা বললেন, “বেশ, প্রতিজ্ঞা না হয় না ভাঙলে কিন্তু তোমাদের ছোটকাকা যেন জীবিত, এটা জানতে?”

মাথা নাড়লেন ফকির।"না, আমরা জানতাম, কাকা মারা গিয়েছে। বিশেষ করে সাপের কামড়ে মারা যাবার খবর শুনে আমাদের মনে হয়েছিল, যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। মা মনসাই তাঁর শোধ নিয়েছেন।"

"কিন্তু ওই কাকা এখানে কেন এসেছিলেন? তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল?"

"উদ্দেশ্য কী ছিল, আগে বুঝিনি। যখন খবর পেলাম কাকা এসে ঘোড়া-সাহেবের কুঠির কাছাকাছি রয়েছে, গোপনে দেখা করতে বলেছে–তখন ভেবেছিলাম হয়ত কাকা বুড়ো বয়সে তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ জানাতে চায়। তারপর শুনলাম, কাকা আমাদের বংশের সেই মূর্তি আর সাপ নিজের কাছেই গচ্ছিত রেখেছিল, এখন তা ফেরত দিয়ে যেতে চায়।"

"কে তোমায় এ কথা বলেছে?"

"বিশু।"

"তুমি নিজে কেন কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাওনি?"

"রাগে, ঘেন্নায়। তা ছাড়া আমি গেলে কাকা কিছু বলত না। বিশুকেই যেতে বলেছিল।"

কিকিরা অমূল্যর দিকে তাকালেন। বললেন, "তুমিও কি নিজে যাওনি, অমূল্য?"

"আমি নিজেই একদিন গিয়েছিলাম। কাকা আমায় ওই একই কথা বলেছিল–দাদা যা বলল।"

"তারপর? সাধুবাবা যেদিন বিশুকে নিয়ে এই কুঠিবাড়িতে এল, সেদিন তুমি নিজে না এসে তোমার শালা চরণকে পাঠালে কেন?"

অমূল্য চুপ। তার মুখ কেমন শক্ত, কালো হয়ে আসছিল। দাঁতে দাঁত চাপল অমূল্য। হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।"আমি বলব না, বলতে পারব না।"

তারাপদ, চন্দন দুজনেই পাথরের মতন দাঁড়িয়ে।

কিকিরা বললেন, "আমি বলছি। জানি না, ঠিক বলছি কি না! ...তোমার কাকা তোমায় বলেছিলেন, তিনি বিশুকে ভুলিয়ে কুঠিবাড়ির এই ঘরে নিয়ে আসবেন। তোমার কাজ হবে, বিশুকে গুলি করে মারা। তাকে আগে মারব, তারপর তিনি তোমায় মনসা-মূর্তি দেবেন। তাই না?"

অমূল্য ছটফট করছিল। বলল, "হ্যাঁ। কাকা তাই বলেছিল। কিন্তু আমি অমূল্য রায়। মামলা-মোকদ্দমা, জমিজিরাত নিয়ে লাঠালাঠি ফৌজদারি করতে পারি; নিজের ভাইপোকে গুলি করতে পারি না।"

"নিজের হাতে পারবে না বলে চরণদের পাঠিয়েছিলে?"

অমূল্য রুক্ষভাবে কিকিরার দিকে তাকাল।"হ্যাঁ। ...কিন্তু আপনি যা বলছেন, তা নয়। আমি চরণকে বলেছিলাম, ওই শয়তানের কাছ থেকে আগে মূর্তির খবর জেনে নেবে, তারপর তাকে কুকুরের মতন গুলি করে মারবে। বিশুর গায়ে যেন আঁচড় না পড়ে।" কথা শেষ করার আগেই অমূল্য প্রায় কেঁদে ফেলল; জড়ানো গলায় বলল, "আমি ইতর নই, জন্তু নই;

বিশুকে চরণরাই যে পরে কুঠির বাইরে এনেছে, সে-খবর আপনি রাখেন?”

“না। তবে আমার সন্দেহ ছিল।”

“দাদা আপনাকে যা বলেছে, আপনি তাই বিশ্বাস করেছেন।”

কিকিরা সামান্য অপেক্ষা করে অমূল্যকে বললেন, “আমি তোমার সমস্ত কথা। বিশ্বাস করছি, অমূল্য। বিশুকে গুলি করার দরকার হলে চরণরা যে-কোনো সময়ে সেটা করতে পারত। সাধুবাবার সঙ্গে বচসা করত না।” বলে অমূল্যের কাঁধে হাত দিলেন, যেন সান্ত্বনা জানালেন।

অমূল্য ক্ষোভের গলায় বলল, “দাদা আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। বিশুর সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই।”

ফকির চুপ করে ছিলেন।

কিকিরা ফকিরকে বললেন, “ফকির, তুমি আমার কাছে অনেকগুলো বাজে কথা, মিথ্যে কথা বলেছ। শুধু মিথ্যে বলোনি, নিজের ছেলেটাকে তুমি লোকের চোখের আড়ালে রেখেছ, তাকে অনর্থক একগাদা ঘুমের ওষুধ খাইয়েছ, অ্যাবনরমাল করে রেখেছ! কেন? তোমার কি সবসময় ভয় হত, বিশু স্বাভাবিক থাকলে সব কথা সাফসুফ বলে দেবে?”

ফকির মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, “হ্যাঁ সে-ভয় ছিল। তবে তোমায় আমি আগেই বলেছি, আমাদের বংশের এমন কয়েকটা কথা আছে, যা আমরা বাইরে বলতে চাই না। বলতে পারি না। বলা নিষেধ। ছোটকাকার কথা, মনসার মূর্তির কথা আমি বাইরে প্রকাশ করতে চাইনি। আজ বাধ্য হয়ে বললাম তোমায়।”

“তা অবশ্য বললে, ফকির,” কিকিরা একটু ইতস্তত করে বললেন, “আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি আমার অমূল্য–দুজনেই আলাদা-আলাদা ভাবে তোমাদের কাকার কাছ থেকে মূর্তিটি পেতে চেয়েছিলে। তার জন্যেই এত!”

ফকির চুপ। অমূল্যও কথা বলল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কিকিরা বললেন, “ফকির, আমি যেদিন তারাপদকে নিয়ে তোমার বাড়িতে এলাম, দোতলা থেকে কে বন্দুক ছুঁড়েছিল? তুমি বলছ বিশু। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।”

“আমি ছুঁড়েছিলাম,” ফকির বললেন।

”কেন?”

“তোমায় ঠকাতে চেয়েছিলাম। না না, ঠকানোই বা কেন। আমি তোমায় বোঝাতে চেয়েছিলাম, বিশু কেমনকী বলব–পাগল-পাগল ব্যবহার করছে। …আমায় তুমি ক্ষমা করো, ভাই।”

কিকিরা কেমন ম্লান মুখ করে হাসলেন। বললেন, “আমায় তুমি সব কথা যদি খুলে বলতে ফকির, ভাল হত। তুমি অন্যায় করেছ! তা ছাড়া, আমার মনে হয় তুমি আমায় অন্যভাবে একটা কাজে লাগাতে চেয়েছিলে–সেই মনসামূর্তি যদি আমি খুঁজে বার করতে পারি এই কুঠিবাড়ি থেকে, তাই না?”।

মাথা নাড়লেন ফকির।”না কিঙ্কর আমি মোটেই তা চাইনি। তুমি কলকাতা থেকে হঠাৎ আমার কাছে সেবার বেড়াতে এলে! এসে দেখলে আমি ঝঞ্ঝাটে রয়েছি। আমি তোমায় সব কিছু খুলে বলতে পারছিলাম না। বিশু তখনো ধাক্কা সামলাতে পারেনি। আমি যে কী করব ঠিক করতে না পেরে বোকার মতন নিজের পায়ে কুড়ল মেরেছি। তোমায় মিথ্যে কথা বলেছি, ছেলেটাকেও জবুথবু করে রেখেছি। তুমি না এলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না বোধহয়। তবে সত্যি বলছি, পরে আমার মনে হয়েছিল, তুমি যদি কুঠিবাড়ি থেকে মনসামূর্তি উদ্ধার করতে পারো—ভালই হয়। অবশ্য সে-আশা আমার কমই ছিল।”

“কম ছিল, তবু তোমাদের বিশ্বাস ছিল মূর্তিটা এই বাড়িতেই আছে।”

“হ্যাঁ,” অমূল্য বলল, “কাকা যদি ও-ভাবে পালিয়ে যায় তবে মূর্তি কোথায় থাকবে?”

কিকিরা বললেন, “সে-মূর্তি উদ্ধার হবে কেমন করে! তোমাদের ছোটকাকা অনেক আগেই বেচেবুচে দিয়েছেন। বাইরে সন্ন্যাসী হলেও ভেতরে কি তিনি তাই ছিলেন? যে মানুষ বাড়ি থেকে লক্ষ টাকার জিনিস চুরি করে, সে-মানুষ সাধু?” অমূল্য বলল, “তাই যদি হবে, তবে কাকা এসেছিল কেন এখানে?”

“কেন এসেছিল বুঝতে পারো না?”

“না।”

“প্রতিশোধ নিতে। যাকে তোমরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ, বংশ থেকে বাদ দিয়েছ, এক কানাকড়ি সম্পত্তিও দাওনি, সে যে তোমাদের ক্ষমা করবে, একথা বিশ্বাস করা মুশকিল। তার হাতে যতকাল টাকা পয়সা ছিল, ফুর্তি ফাতা করে দিন কাটিয়েছে। তারপর হয়ত তার দুর্দিন গিয়েছে। শেষে যখন বুঝল, তোমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে ভাগাভাগি গণ্ডগোল রেষারেষি চলছে, তখন সে এল। এল মতলব নিয়ে। তোমাদের মধ্যে আরও রেষারেষি, খুনোখুনি বাধিয়ে এই বংশ প্রায় শেষ করে দিতে। ধরো, অমূল্য—তুমি যদি বিশুকে সত্যিই খুন করতে, ফকির তোমায় ছাড়ত না, সেও তোমায় খুন করত। দু’তরফে বিদ্বেষ, খুনোখুনি, রক্তারক্তি চলত। তারপর কোথায় গিয়ে এই শত্রুতার শেষ হত, ভগবানই জানেন।”

“কাকা এত নীচ?”

“নীচ, উন্মাদ। তার যদি অনুতাপ হত, সে গাছতলায় বসেই তোমাদের দুজনকে ডেকে মনসামূর্তি ফেরত দিত। কেন সে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যাবে?”

অমূল্য রাগে কাঁপছিল। বলল, “আমি সেদিন চরণকে বলেছিলাম, ওকে কুকুরের মতন গুলি করে মারতে। আর কোনোদিন যদি দেখতে পাই, আমি তাকে নিজের হাতে গুলি করে মারব।”

“আর কোনোদিন তাকে পাবে না। আর কি সে আসে? ...নাও চলো, রাত হয়ে যাচ্ছে।”

ঘরের বাইরে এসে কিকিরা অমূল্যকে বলল, “ওই ঘোরানো সিঁড়ি, ওই জানলার কথা তুমি আগে জানতে?”

মাথা নাড়ল অমূল্য।”না, কেমন করে জানব। এখানে কে আসে? যদি জানতাম, তা হলে কি

কাক পালাতে পারত! আমরা ভেবেছিলাম, গুলি খেয়ে জানলা দিয়ে লাফ মেরেছে। পরের দিন খোঁজ করতে গিয়ে সিঁড়িটা দেখি। সিঁড়িটা বড় অদ্ভুত, বাগানে গিয়ে শেষ হয়েছে। গাছপালার মধ্যে। কাকা ওখান থেকেই পালিয়েছে।”

কিকিরা বললেন, “শশিপদ বলেছে, তোমাদের কাকা এখনো বেঁচে আছে।”

“শশিপদ কাকার হয়ে খবরাখবর দিত। আমি তাকে পয়সা দিয়ে কাজে লাগিয়েছিলাম। আজ সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। ভয়ে। সহজে আর আসছে না।”

কুঠিবাড়ির নিচে এসে কিকিরা বললেন, “তোমার লোকজন কোথায়? ডাকো।”

অমূল্য একটু হাসল। তারপর শিস দেওয়ার মতন করে শব্দ করল। তীক্ষ্ণ শব্দ। বলল, “চলুন, ওরা আসবে। পেছনেই।”

হাঁটতে হাঁটতে কিঙ্কর বললেন, “একটা কথা তোমাদের দুজনকেই বলি। রক্তে যদি তোমাদের মামলা-মোকদ্দমা থাকে ভাই, সেটা আর কে রুখবে। তবে এই খুনোখুনি-রক্তারক্তিটা ভাইয়ে-ভাইয়ে না থাকাই ভাল। ...তা ছাড়া, যা গিয়েছে তা যখন আর ফিরে আসবে না, তখন তোমরা ও নিয়ে আর চিন্তা কোরো না। তোমাদের কাকা যা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছেন, সেটা তোমাদের বংশের সৌভাগ্যের লক্ষ্মী হতে পারে কিন্তু তিনি যা দিতে এসেছিলেন, সেটা দুভাগ্য। তোমরা বেঁচে গিয়েছ।”

ফকির চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন, কিকিরার হাত ধরে ফেললেন আবেগে। বললেন, “কিঙ্কর, আমি তোমার কাছে বড় ছোট হয়ে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি যা করেছি, তা দায়ে পড়ে। বোকার মতন কাজ করেছি। আমায় ক্ষমা করো।”

কিকিরা ফকিরের কাঁধে হাত রেখে হেসে বললেন, “আমি সবই বুঝেছি। নাও, চলো। চলো, অমূল্য।”

পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। মুখ ফিরিয়ে তাকালেন কিকিরা। তারপর হেসে অমূল্যকে বললেন, “তুমি দেখছি, অনেক সৈন্যসামন্ত এনেছিলে।”

অমূল্য লজ্জা পেয়ে হাসল।

তারাপদ আর চন্দন কিকিরার পেছনে। চাঁদের আলোয় অতগুলো মানুষ ঘোড়া-সাহেবের কুঠির বাগান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, যেতে-যেতে শুনল দমকা বাতাস এসে গাছপালার পাতায় কেমন এক শব্দ তুলেছে।

সেই অদৃশ্য লোকটি

০১.

বর্ষার পালা শেষ হয়ে আশ্বিন পড়েছিল। বৃষ্টি তবু বিদায় নেয়নি। মাঝে-মাঝেই এক-আধ পশলা জোর বৃষ্টি হচ্ছিল।

তারাপদ পর-পর দু দিন আটকে পড়ল বৃষ্টিতে। একেবারে বিকেলের শেষে এমন ঝমাঝম বৃষ্টি নেমে গেল দু দিনই যে, সে আর কিকিরার কাছে আসতেই পারল না।

আজ কোথাও কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। অফিস থেকে সোজা কিকিরার বাড়ি এসে হাজির তারাপদ।

এসে যা দেখল তাতে চমৎকৃত হল।

কিকিরা যথারীতি তাঁর বসার ঘরেই ছিলেন। এই ঘরটিকে তারাপদরা বলে জাদুঘর। এখানে না আছে কী। দেওয়াল জুড়ে নানান জিনিস, মাটিতেও পা রাখার জায়গা নেই।

নিজের সেই সিংহাসন-মাকা চেয়ারে কিকিরা বসে ছিলেন। সামনে এক মোড়া। মোড়ার ওপর তুলোর গদি। গদির ওপর কিকিরার বাঁ পা। পায়ের সঙ্গে দড়ির ফাঁস। অবশ্য কিকিরার বাঁ পায়ের পাতা থেকে গোড়ালির অনেকটা ওপর পর্যন্ত মোটা করে ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়ানো। দড়ির ফাঁসটা গোড়ালির ওপর দিকে বাঁধা। আলগা করে। সেই দড়ি এক বিচিত্র কায়দায় মাথার ওপর। ঝোলানো চাকার মধ্যে গলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গলিয়ে দড়ির অন্য প্রান্তটা ঝুলিয়ে একেবারে কিকিরার বাঁ হাতের সামনে। মানে, কিকিরা যখন দড়ি টানছেন, তাঁর বাঁ পা উঠে যাচ্ছে, যখন দড়ি আলগা করছেন, পা এসে মোড়ার ওপর পড়ছে।

কিকিরার ডান হাতে তাঁর পছন্দের চুরুট। দেখতে আঙুলের মতন সরু-সরু। চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধটা কিন্তু বিশ্রী।

তারাপদ যেন কতই বিমোহিত বাহবা দিয়ে বলল, "দারুণ স্যার। এ-জিনিস আপনিই পারেন।"

কিকিরা সাদামাটা গলায় বললেন, "পুলিসিস্টেম।"

"পাঙ্খা কুলি সিস্টেম?"

"পাঙ্খা কুলি দেখেছ?"

"চোখে দেখিনি, ছবিতে দেখেছি। ইলেকট্রিসিটির যুগে পাঙ্খ-কুলি আর কোথায় দেখতে পাব!"

"জ্ঞানের রাজা! ইলেকট্রিসিটির যুগ! এ-দেশে এখনো কেরাসিন তেলের যুগ চলছে। যাও না একবার ভেতর দিকের গাঁ-গ্রামে।"

“ভুল হয়েছে স্যার।” তারাপদ যেন চট করে অপরাধ স্বীকার করে নিল।

“বাঁশবেড়ের হিরুবাবুর নাম শুনেছ? মস্ত বড় শিকারি। এক সময় হাতি ধরে বেড়াতেন। বিরাট ওস্তাদ। হিরুবাবুর কথা হল, ইলেকট্রিক মানেই সর্বনাশ। ওতে চোখ খারাপ হয়, মাথা নষ্ট হয়।”

“তাই নাকি?”

“হিরুবাবু বলেন, রেড়ির তেলের যুগটাই ছিল বেস্ট। রেড়ির যুগ গিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মতন মানুষও গিয়েছেন।

তারাপদ হাসতে-হাসতে প্রায় মাটিতেই বসে পড়ে আর কী!

কিকিরা হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বার দুই পায়ের দড়ি টানাটানির খেলা খেলে নিলেন।

হাসি থামলে তারাপদ বলল, “স্যার, আপনার লেগ কেমন?”

“পুল করতে পারছি। চাঁদু ডাক্তার কী বলে হে?”

“তিন হপ্তা নড়াচড়া চলবে না। মানে বাইরে বেরোতে পারবেন না।”

“তি-ন হপ্তা! আজ তো মাত্র দশ দিন হল তারাপদ, আরও দশ বারো দিন! আমি পারব না।”

“পারব না বললে চলবে কেন, স্যার! কে আপনাকে খানা-খন্দে পাগলাতে বলেছিল! গোড়ালির হাড় ভাঙেনি–এই যথেষ্ট। পা মচকানোর ব্যথা সারতে। সময় লাগে!”

“চাঁদু জ্বরজ্বালা, আমাশার ডাক্তার, হাড়গোড়ের সে কী বোঝে?”

তারাপদ রগড় করে বলল, “বলব চাঁদুকে। বলব, তুই বোগাস! কিস্যু জানিস না।”

কিকিরা একটু হেসে কথা পালটে বললেন, “বোসো। চা-টা খাও।” বলে চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন। ধোঁয়া আসছিল না। জোরে-জোরে টান মেরে ধোঁয়া বার করলেন।

তারাপদ বসে পড়েছে ততক্ষণে। মুখ মুছে নিচ্ছিল রুমালে।

কিকিরা নিজেই বললেন, “চাঁদুকে কাল-পরশু একবার পাঠিয়ে দিয়ে। আমি তিরিশ হাজার টাকা লোকসান দিতে পারব না।”

খেয়াল করে কথাটা শোনেনি তারাপদ, তবে কানে গিয়েছিল। টাকার অঙ্কটা মাথায় থাকেনি। সে কিকিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

“থারটি থাউজেন্ড ইজ এনাফ।” কিকিরা আবার বললেন।

তারাপদ বোকার মতন বলল, “তিরিশ হাজার!”

“এখন তিরিশ, পরে হাজার পঞ্চাশও হতে পারে।”

তারপদ এবার যেন ধাতে এল। রসিকতা করে বলল, “আপনার লেগ-প্রাইস…? মানে

ইনসিওরেন্সের কোনো কমপেনসেশান...”

“দুঃ।” কিকিরা অদ্ভুতভাবে ‘দুঃ’ বললেন।

“লটারি পাচ্ছেন?”

“নো।”

“তা হলে ব্যাপারটা কী? তিরিশ হাজারের সঙ্গে আপনার পা মচকানোর সম্পর্কটা কোথায়?”

কিকিরা বললেন, “কাগজ-টাগজ পড়া হয় মশাইয়ের?”

“হয়। তবে পড়া না বলে চোখ বুলনো বলতে পারেন। কাগজে পাঠ্য বলতে তো মন্ত্রী-সংবাদ...!”

“বুঝেছি। তা একবার ওখানে যাও। ওই যে দেওয়ালে ঝোলানো বাস্কেট দেখছ, ওর মধ্যে তিনটে কাগজ আছে। নিয়ে এসো।”

তারাপদ উঠল।

কিকিরার এই ঘরে না আছে কী? চোরবাজারের দোকানও এমন বিচিত্র নয়। চন্দন কি সাধে বলে, ওল্ড কিউরিয়োসিটি শপ! সেকেলে গ্রামাফোন, পাদরিটুপি, দেওয়াল ঘড়ি, পায়রা-ওড়ানো বাক্স, ম্যাজিক পিস্তল, কালো আলখাল্লা, পুতুল, ভাঙা বেহালা, তরোয়াল, কাঁচের মস্ত বড় বল, আরও কত কী!

দেওয়ালে এক মাদুর কাঠির সরু টুকরি আটকানো ছিল। তারাপদ কাগজ নিয়ে ফিরে এল।

কিকিরা বললেন, “লাল পেনসিলে দাগ দেওয়া আছে। দেখো।”

তারাপদ খবরের কাগজগুলো দেখল। তিন দিনের কাগজ। তারিখ আলাদা। দু-তিন দিন বাদ-বাদ তারিখ। কাগজ একই। লাল পেনসিলের দাগ-দেওয়া জায়গাটা বার করে নিল সে।

“এটা কী স্যার?”

“পড়ো।”

“মনে-মনে, না, জোরে-জোরে?”

“জোরে-জোরে।”

তারাপদ পড়তে লাগল “আমি লোচন দত্ত, পুরা নাম ত্রিলোচন দত্ত, সাতাশের এক, যদু বড়াল লেন, কলকাতা বারোর নিবাসী, এই মর্মে জানাইতেছি যে–জনৈক প্রতারক আমার ছোট ভাই মোহন দত্ত সাজিয়া নানা জনের সঙ্গে প্রতারণা করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাইতেছি। আমার ভাই মোহন দত্ত উনিশশো পঁচাশি সালে একুশে অগস্ট মারা গিয়াছে। আমার অন্য কোনো ভাই নাই। আমাদের উক্ত নম্বরের বসতবাটী এবং দত্ত অ্যান্ড সন্স-এর একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি ও আমার দুই নাবালক পুত্র–বিশ্বনাথ ও যোগনাথ। মোহন দত্ত আর জীবিত নাই। ওই নামে কেহ যদি কোথাও আমাদের তরফ হইতে ব্যক্তিগত,

ব্যবসায়গত ও সম্পত্তিগত কোনো কাজকারবার করেন, আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না। উপরন্তু কেহ যদি প্রতারক মোহন দত্ত নামের মানুষটির বিস্তারিত খবরাখবর দেন ও তাহাকে ধরাইয়া দেন—আমাদের। পক্ষ হইতে তাঁহাকে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। যোগাযোগের ঠিকানা : সাতাশের এক, যদু বড়াল লেন, কলকাতা বারো। সময় সকাল আটটা হইতে বেলা দশটা।"

তারাপদ পড়া শেষ করেও যেন ভাল বুঝল না। মনে-মনে আবার পড়ে নিচ্ছিল।

শেষে তারাপদ বলল, "বাবা! বিরাট নোটিস। লিগ্যাল নোটিস স্যার।" কিকিরা বললেন, "লিগ্যাল নোটিস নয় বলেই মনে হচ্ছে। বয়ানটা উকিলের মতন। ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তি ওটা।"

"সব দিনেই কি একই বয়ান? মানে তিন দিনের কাগজে?"

"হ্যাঁ।"

"শুধু বাংলা কাগজেই?"

"ইংরিজি আমি দেখিনি। মনে হয়, অন্য বাংলা কাগজ আর ইংরিজি কাগজেও আছে। কোন কাগজ কার চোখে পড়বে-বলা তো যায় না।"

তারাপদ বলল, "তবে এই আপনার ত্রিশ হাজার?"

"ইয়েস স্যার।"

"আপনি স্বপ্ন দেখছেন কিকিরা। টাকা অত সস্তা নয়।"

কিকিরা বললেন, "নো সার, আমি ড্রিমিং করছি না। ড্রিলিং করছি। মানে রহস্যটা বোঝার জন্য জমি খুঁজছি। তুমি ঠিক বলেছ, অত সস্তা নয়। নয় বলেই তো ব্যাপারটা কঠিন। তুমি কি ভাবছ, লোচন দত্ত টাকার হরিলুঠ দেওয়ার জন্যে কেঁদে মরছে?"

"আমি কিছুই ভাবছি না। শুধু দেখছি, লোচন দত্ত এক আহাম্মক আর আপনিও পাগল!"

এমন সময় বগলা এল। চা আর হিঙের কচুরি, কুমড়ো-আলুর ছক্কা এসেছে।

অফিস থেকে ফিরছে তারাপদ। খিদে পেয়েছিল জোর। কচুরির ডিশটা তাড়াতাড়ি টেনে নিল। চলে গেল বগলা।

কিকিরা বললেন, "ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢোকেনি।

"একেবারেই নয়।"

"একটা মরা লোক চার-পাঁচ বছর পরে ফিরে আসে কেমন করে?"

"আসে না। মরা লোকের ভূত আসতে পারে।"

"তা ছাড়া—এই লেখাটা পড়ে বোঝা যাচ্ছে, কোনো জাল মোহন দত্ত নানান বান্ধা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধান্ধা বৈষয়িক হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। মোহন দত্ত সম্পর্কে তার খুব যে একটা আগ্রহ রয়েছে-মনে হল না।

চা খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, “একটা জিনিস নজর করেছ?”

“কী?”

“লোচন দত্ত এমনভাবে লিখেছে যেন সে এই মোহন দত্তকে–মানে প্রতারক জালিয়াত মোহনকে চোখে দেখেনি এখন পর্যন্ত, শুধু তার কথা শুনেছে।”

তারাপদ কচুরি খেতে-খেতে জড়ানো জিভে বলল, “হতেই পারে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে কিকিরা! আমার নাম করেই অন্য একটা লোক যদি মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়–বেড়াতেই পারে–তাকে আমি চোখে না দেখতেও পারি। অন্য কেউ এসে আমায় বলতে পারে কথাটা...।”

কিকিরা বললেন, “তোমার কথা হচ্ছে না, হচ্ছে লোচন দত্ত আর মোহন দত্তের কথা। তুমি ভুলে যেয়ো না, মরা মানুষ আবার জ্যান্ত হয়ে ফিরে এসে লোক ঠকিয়ে বেড়াবে–এটা খুব ইজি কাজ নয়। কথা হল, কাদের ঠকাচ্ছে? যাদের ঠকাচ্ছে তারা যদি লোচনদের জানাশোনা লোক হয়-তবে সেই বোকা, বুন্ধুগুলো কি জানে না যে, মোহন অনেক আগেই মারা গিয়েছে?”

তারাপদ বলল, “হয়ত লোচনের অপরিচিতদের ঠকাচ্ছে!”

“যুক্তি হিসাবে সেটাই হতে পারে। কিন্তু কথা হল, কেন ঠকাবে? যে-লোক অন্যকে ঠকাচ্ছে–তার উদ্দেশ্য কী? যে ঠকছে তারই বা কী দায় পড়েছে ঠকার! ধরো, রামবাবু বলে একটা লোককে জাল মোহন ঠকাবার চেষ্টা করছে। কেন করছে? আর রামবাবু কি এতই বোকা যে, ঠকাবার আগে একবার লোচনদের খোঁজ-খবর করবে না? বাড়ি, সম্পত্তি, দোকান-সংক্রান্ত যদি কিছু হয়–তবে এইসব জিনিস এমনই যে, লোকে এই ধরনের জিনিসের সঙ্গে কোনো কারবার করতে হলে ভাল করে খোঁজ-খবর নেয়। খোঁজ নিলেই মোহন ধরা পড়ে যাবে।”

“তাই তো যাচ্ছে।”

“যাচ্ছে কি না আমি জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কার কেউ এমনি-এমনি দেয় না। জাল লোক ধরতে নয়। তার জন্যে থানা-পুলিশ আছে। লোচন থানায় ডায়েরি করিয়েছে? কেন সে কাগজে সরাসরি লিগ্যাল নোটিস না দিয়ে এইরকম একটা ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তি ছাপল!”

চা খাওয়া শুরু করেছিল তারাপদ। বলল, “আপনিই বলুন, কেন?” কিকিরা বললেন, “আমি ভেবে দেখেছি, দুটো কারণে হতে পারে। প্রথম কারণ, বড়াল লেনের লোচনবাবুটি মোহনচাঁদকে ধরতে চাইছে। নিজেই সে জানিয়েছে, জালিয়াত মোহনকে ধরে দিতে হবে। দ্বিতীয় কারণ, মোহন লোকটাকে সে ভয় পাচ্ছে। “

“জাল মানুষকে ভয়?”

“যদি জাল না হয়।”

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "কী বলছেন আপনি! লোচন, সাল-সময় দিয়ে তার ভাইয়ের মরার খবর জানাচ্ছে, তবু বলছেন এ জাল মোহন নয়।"

কিকিরা চা খেতে-খেতে স্বাভাবিক গলায় বললেন, "তুমি জাল প্রতাপচাঁদ, ভাওয়াল মামলা–এ-সব শুনেছ? নিশ্চয় শোনোনি! শুনলে এত অবাক হতে না। দীনরাম মামলার কথাও শোনোনি। বম্বের মামলা। দীনরামকে পাক্কা আট বছর মামলা লড়তে হয়েছিল, সে আসল দীনরাম প্রমাণ করতে।"

"স্যার, ভাওয়াল মামলার কথা আমি শুনেছি। সে তো সাঙ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র ছিল।"

কিকিরা বললেন, "লোচনও যে সাঙ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র করেনি তুমি কেমন করে বুঝলে?"

তারাপদ চা খেতে শুরু করেছিল, বলল, "লোচনের কাছে নিশ্চয় ডেথ সার্টিফিকেটের প্রমাণ আছে...।"

"প্রমাণ থাকতে পারে, নাও পারে। আর ডেথ সার্টিফিকেট? টাকায় কী না হয়। তা ছাড়া, ছোটখাটো কোনো জায়গায় অজ গাঁ-গ্রামে মারা গেলে ডেথ। সার্টিফিকেট বড় একটা থাকে না। থানায় জানিয়ে দিলেই হয়। তা ছাড়া, কোথায় কখন কী অবস্থায় মোহন মারা গিয়েছে না জানলে কোনো কিছুই বলা যায় না। ধরো, ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে দশ-বিশটা লোক মারা গেল। তার মধ্যে অনেকের যা হাল হল–মাংসের খানিকটা তাল–মাথা নেই, হাত নেই, পা নেই–কোনোরকমেই ট্রেস করা গেল না তারা কারা। তাদেরই পুড়িয়ে ফেলা হল। শনাক্তকরণই তো হল না। কী করে তুমি তাদের যথার্থ সার্টিফিকেট পাবে! কে দেবে! থানাতেই বা কী লেখা থাকবে?"

তারপদ এসব কিছু জানে না, চুপ করে থাকল।

কিকিরা বললেন, "মোহনের মতন ঘটনা এ-দেশে কখনো-সখনো ঘটে। আমরা তার খবর পাই না। মানে, আমি বলছি মারা গেছে বলে সবাই যাকে জানে, সেই মরা-লোক আবার ফিরে এসেছে।"

তারাপদ এবার খানিকটা কৌতূহল বোধ করল। বলল, "আপনি বলতে চাইছেন, মোহন মারা যায়নি?"

"না, না, এত তাড়াতাড়ি তা কেমন করে বলা যাবে?"

"তা হলে বলা যাক, মোহন মারা না যেতেও পারে!"

"হতে পারে।"

"এখন তবে কী করতে চান?"

"মোহন অনুসন্ধান। লোচন দত্তর সঙ্গে আমাদের দেখা করতে হবে। ওই যে লিখেছে, যোগাযোগ–সেই যোগাযোগটা করতে হবে আগে। দেখতে হবে লোচন কার কার কাছ থেকে জেনেছে যে, এক জাল মোহন তাদের সঙ্গে দেখা করেছে। দেখা করলেও কোন উদ্দেশ্য নিয়ে? লোচন নিজে মোহনকে কোথাও আচমকা দেখেছে কি না? বা মোহনই কোনোভাবে লোচনকে নিজেই জানিয়েছে কি না যে, সে হাজির হয়েছে। লোচন এর মধ্যে

থানা-পুলিশ করেছে, কি করেনি!” চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন কিকিরা। হাতের পাশেই এক গোল টেবিল। পুরনো টেলিফোন থেকে টুকটাক অনেক কিছুই পড়ে আছে টেবিলে।

তারাপদ পেট ভরে কচুরি খেয়েছিল। চা খেতে-খেতে ঢেকুর তুলল। বলল, “আপনি এখন লোচনের সঙ্গে দেখা করতে চান?”

“ইয়েস স্যার।”

“কেমন করে?”

“লেম ম্যান, লিম্পিং লিম্পিং করে...।”

তারপর হেসে ফেলল, “খোঁড়া মানুষ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে?”

“উপায় কী?”

“চাঁদ শুনলে রাগ করবে স্যার।”

“চাঁদু ক্যান ওয়েট, তিরিশ হাজার যদি ওয়েট না করে? কে জানছে এরই মধ্যে কত লোক লোচনের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে! টাকার লোভ বড় লোভ।”

“লোচন কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভও তো লাগাতে পারে। কলকাতায় এখন ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস হয়েছে।”

“আমরাও তো এজেন্সি খুলেছি : কে-টি-সি–কিকিরা, তারাপদ, চন্দন। হেড অফিস আমার বাড়ি।”

তারাপদ হাসতে-হাসতে বলল, “স্যার, আমি কেটিসির নাম দিয়েছি কুটুস। দয়া করে একটা প্যাড ছাপিয়ে নিন এবার, আর শ’ খানেক ভিজিটিং কার্ড।” বলে তারাপদ চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। সিগারেটের প্যাকেট হাতড়াতে লাগল পকেটে।

কিকিরা বললেন, “হবে। শনৈঃ শনৈঃ। ধৈর্য ধরতি বালকঃ।...এবার কাজের কথা বলি।”

“বলুন”, তারাপদ সিগারেট ধরিয়ে নিল।

“আমি এর মধ্যে বাড়িতে বসে বসে দু একটা গোড়ার কাজ সেরে রেখেছি।”

“বাঃ। ফাস্ট কেলাস।”

“গলিটার খোঁজ নিতে বগলাকে পাঠিয়ে দিলাম। আমার কাছে কলকাতা কর্পোরেশনের স্ট্রিট ডাইরেক্টরি আছে।“

“গলিটা কোথায়?”

“বউবাজার থানার মধ্যে।”

“কেমন গলি?”

“পুরনো শহরের পুরনো গলি। লোচনদের বাড়িও পুরনো। তবে বেশ বড়। বনেদি বাড়ি ছিল বোধ হয়। এখন সামনের দিকে ভেঙেচুরে গিয়েছে।”

“লোচনকে দেখা গেল?”

“না। বগলা শুধু গলিটার খোঁজ নিয়ে বাড়ি দেখে চলে এসেছে।”

“আর কী সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, স্যার?”

“লোচনের ছেলে দুটি যমজ। তার মধ্যে একটিকে–কেউ বা কারা একবার চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। একবেলা আটকে রেখে আবার ফেরতও দিয়ে গিয়েছে। ঘটনাটা মাস-দুই আগেকার।”

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, “সে কী! ছেলে চুরি?”

“লোচনের বাড়িতে এখন মস্ত এক পালোয়ানকে আনা হয়েছে। সে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ওদের বাড়ির কুকুরটাও বাইরে ছাড়া থাকে। মানে, লোচন হালফিল খুব সাবধান হয়ে গিয়েছে।...তা কাল-পরশু নাগাদ চলো একবার, নিজের চোখে দেখে আসি।”

তারাপদ মাথা নাড়ল। সে রাজি।

০২.

তারাপদকে সঙ্গে করে কিকিরা রবিবার বেলা ন'টা নাগাদ যদু বড়াল লেনে হাজির।

শরৎকালের আকাশ। ঝকঝকে রোদ মাঝে-মাঝে সামান্য চাপা পড়ছে, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল মাঝে-মাঝে। তুলোর আঁশের মতন বৃষ্টি এই এল, এই গেল। আবার রোদ।

গলিটা পুরনো তো বটেই–কিন্তু সরু নয়, মোটামুটি চওড়া। গাড়ি ঘোড়া আসা-যাওয়া করতে কোনো অসুবিধে হয় না। বাড়িগুলোও দোতলা-তেতলা। কোনো-কোনোটা জীর্ণ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আবার কোনোটা বেশ পাকাঁপোক্ত। ওরই মধ্যে একটা বাড়ি নতুন করে সারিয়ে রংচঙ করা হচ্ছিল।

গলির মধ্যে রোদও ছিল, ছায়াও ছিল। রাস্তা সামান্য ভিজে ভিজে। দু-চারটে মামুলি দোকান। লন্ড্রি, চায়ের, মুদিখানার, তেলেভাজার দোকানও রয়েছে একটা।

কিকিরা ঠিকানা মতন বাড়িটার সামনে এসে রিকশা ছেড়ে দিলেন। বগলা যা বলেছিল, মোটামুটি ঠিক। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। অবশ্য পাঁচিলের দশ আনাই ভেঙে পড়েছে। ইট একেবারে শ্যাওলাধরা। বাড়ি ঢোকার মুখে এক ভাঙা ফটক। ফটকটা বন্ধ হয় না। ভোলাই থাকে ফটকের একপাশে থামের ওপর কোনোকালে আলোর ব্যবস্থা ছিল, এখন নিতান্তই একটা লোহার বাঁকানো পাইপ খাড়া হয়ে আছে।

ফটক দিয়ে ঢুকতেই খানিকটা মাঠ। একেবারে জংলা চেহারা। নিম আর কুলগাছ। একপাশে ফুলগাছের ঝোঁপ। শিউলিগাছ, করবী। মাঠে জলকাদা, ঘাস। ডান দিকে দারোয়ানের ঘর ছিল আগে। এখন ভাঙা ঝুপড়ি।

গজ চল্লিশ হয়ত হবে না, মাঠটুকু পেরিয়েই দোতলা বাড়ি। বাড়ি সেকেলে। চেহারাতেই সেটা বোঝা যায়। কাঠের খড়খড়ি, লোহার নকশাদারি রেলিং, বড়বড় থাম, কাঁচের শার্সি। বাড়ির নানান জায়গায় ভাঙা-চোরা। বাইরে থেকে বেশ বিবর্ণ দেখায়। মাঠের একপাশে একটা ভাঙা টালির শেড। জায়গাটা নোংরা হয়ে রয়েছে।

তারাপদকে নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বিশ-ত্রিশ পা এগোতে-না-এগোতেই কার গলা শোনা গেল।

"এ বাবু?"

কিকিরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাকালেন।

বাড়ির চওড়া থামের আড়াল থেকে একটা লোক এগিয়ে আসছিল। কুস্তিগিরের মতন চেহারা। পরনে মালকোঁচা-মারা ধুতি, খাটো বহরের। গায়ে হাক্কাটা গেঞ্জি। গেঞ্জিটা রং করা। মাথা প্রায় ন্যাড়া।

কাছে এলে বোঝা গেল, নোকটা পালোয়ানই বটে। বুকের ছাতি, পায়ের গোছ, হাতের পেশী দেখার মতনই। সেইসঙ্গে তার পইতেটাও। গলা থেকে পেট পর্যন্ত লম্বা। লোকটার কপালে চন্দন, কানের লতিতে চন্দন।

কাছে এসে লোকটা বলল, "কাঁহা যাইয়ে গা?"

কিকিরা বললেন, “বাবুসে ভেট করনা হ্যায়।”

“কোন বাবু?”

“বড়া বাবু! লোচনবাবু!” বুদ্ধি করেই বললেন কিকিরা।

“কেয়া নাম আপনোগা?”

কিকিরা বললেন, “কিকিরা!”

“কেয়া?”

“কি-কিরা!”

“কিক্কিরিয়া!” বলে লোকটা কেমন সন্দেহের চোখে দেখল কিকিরাদের। তারপর বলল, “ঠাহের যাইয়ে।”

কিকিরাদের দাঁড়াতে বলে লোকটা বাড়ির দিকে চলে গেল।

কিকিরা রঙ্গ করে বললেন, “কোন বাবু?” বলেই কৌতূহল হল। “এবাড়িতে আর ক’জন বাবু থাকে হে?”

এতক্ষণ পরে কুকুরের ডাক শোনা গেল। মনে হল, কুকুর এখন কাছাকাছি কোথাও নেই। হয়ত বাড়ির পেছন দিকে, বা দোতলায়।

কিকিরার সাজপোশাক যথারীতি খানিকটা বিচিত্র। আলখাল্লা ধরনের জামা, সরু প্যান্ট। মানুষটি যেমন রোগা তেমনই লম্বা। এই পোশাকে তাঁকে আরও লম্বা দেখায়। মাথায় একরাশ চুল, বড়বড়, প্রায় কাঁধ ছুঁয়েছে। কিকিরার হাতে বেতের লাঠি ছিল। পায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ। পায়ে চটি।

তারাপদ বলল, “কিকিরা, এই বাড়ি দেখে তো মনে হচ্ছে–ভেরি ওল্ড। কুইন ভিক্টোরিয়া আমলের নাকি?”

কিকিরা বললেন, “হতে পারে। অন্তত জর্জ দ্য ফিফথের আমলের তো হবেই।” বলে চারপাশ দেখিয়ে বললেন, “বাড়িটার সামনে কত জায়গা দেখেছ! পুরনো দিনের বাড়ি না হলে কলকাতা শহরে এত জায়গা ফেলে কেউ বাড়ি করে। এখন এই জমিরই কী দাম! লোচন দত্তরা ধনী লোক ছিল হে। ধনী আর বনেদি। আমার মনে হচ্ছে, একসময় এবাড়িতে নিজেদের ঘোড়া আর গাড়িও থাকত! ওই শেডটা বোধ হয় ঘোড়ার আস্তাবল ছিল এক সময়। “

“কী করে বুঝলেন?”

“এরকম আমি দেখেছি। তা ছাড়া একটা ভাঙা চাকা পড়ে আছে একপাশে।”

আরও দু-চারটে কথা শেষ না হতে-না-হতেই পালোয়ান ফিরে এল।

“আইয়ে।”

কিকিরা পা বাড়ালেন। সামনে পালোয়ানজি।

হাঁটতে হাঁটতে কিকিরা হঠাৎ বললেন, "এ পালহানজি! দেশ গাঁও কাঁহা। তুমহারা?"

"ছাপরা জিলা!... লাটোয়া গাঁও।"

"আচ্ছা! কলকাত্তামে নয়া মালুম!"

কিকিরা দু-চার কথা আরও জেনে নিলেন। পালোয়ানের নাম, হরিপ্রসাদ। আগে সেজানবাজারে থাকত। লখিয়াবাবুর বাড়িতে দারোয়ান ছিল।

সিঁড়ি কয়েক ধাপ। তারপর ঢাকা বারান্দা। বারান্দার গায়ে-গায়ে তিন-চারটে ঘর।

পালোয়ান হরিপ্রসাদ কিকিরাদের নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসাল।

কিকিরারা কাঠের চেয়ারে বসলেন।

ঘরটা বড়। জানলা-দরজাও বেশ বড় বড়। কড়ি কাঠ থেকে লোহার রড ঝুলছে। রডের সঙ্গে পাখা লাগানো। গুটি দুই বাতি ঝুলছিল উঁচু থেকে। ঘরে আসবাবপত্র বলতে এক জোড়া কাঠের আলমারি। রাজ্যের জঞ্জাল জমিয়ে রাখলে যেমন হয়—আলমারির মধ্যেটা সেইরকম দেখাচ্ছিল। পাল্লার কাঁচ অর্ধেক ভাঙা। গোটা কয়েক কাঠের চেয়ার, আর তক্তপোশের ওপর পাতা ময়লা ফরাস ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা দেখা যায় না। একটা ক্যারাম বোর্ড একপাশে রাখা। টিনের একটা কৌটোও রয়েছে বোর্ডের পাশে। দেওয়ালে এক মস্ত বড় ছবি। বোধ হয় দত্ত বাড়ির কোনো প্রাচীন কতার। দেওয়ালে এক কাগজ সাঁটা রয়েছে। সাদা কাগজের ওপর রং দিয়ে লেখা ক্যারাম প্রতিযোগিতা। গোটা দুয়েক ঘেঁড়া-ফাটা ক্যালেন্ডার। ঘরের চেহারা থেকে বেশ বোঝা যায়—এটা ঝড়তি-পড়তি ঘর। মামুলি লোকজনদেরই বসানো হয়।

লোচন দত্ত ঘরে এল। প্রথম নজরেই আন্দাজ হয় বয়েস বেশি নয় লোচনের।

কিকিরা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন।

লোচন দত্তর পরনে দামি চেককাটা লুঙ্গি। গায়ে ফতুয়া। এক হাতে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, অন্য হাতে চাবির গোছা। মনে হল, চাবির গোছা ছাড়া তিনি কোথাও নড়েন না।

লোচনের চেহারা দেখে কিকিরার ধারণা হল ওর বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ। স্বাস্থ্য মজবুত। গায়ের রং তামাটে। মুখটা চৌকোনো ধাঁচের, শক্ত। দুটো চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বড় বড় চোখ। খানিকটা রুক্ষ। চতুর বলেও মনে হচ্ছিল। মাথার চুল কোঁকড়ানো, মাঝখানে সিঁথি। গোঁফ রয়েছে। গলায় সোনার সরু হার।

ঘরে ঢুকে লোচন দত্ত একবার পাখার দিকে তাকাল। "আহা, পাখাটা খুলে দিয়ে যায়নি। যত্ত সব গাধা আহাম্মক।" বলতে বলতে নিজেই পাখার সুইচে হাত দিল।

পাখা চলতে শুরু করল।

লোচন এবার একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "আপনারা?"

কিকিরা বললেন, “আপনার কাছে এসেছি।”

“কী ব্যাপারে?”

“খবরের কাগজে আপনি একটা নোটিস দিয়েছিলেন।”

“হ্যাঁ-হ্যাঁ। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল।”

“অন্য কেউ এসেছিল আপনার সঙ্গে দেখা করতে?”

“দুজন। দু’দিনে দু’জন। দুজনের কাউকেই আমার পছন্দ হয়নি। একজন বোধ হয়– একসময় হোটেলে কাজ করত। সিকিউরিটির কাজ।”

“আমরা আপনার সঙ্গে ওই নোটিসের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।”

লোচন চাবির গোছাটা কোলের ওপর রাখল। দেখল কিকিরাকে। মনে হল না, খুশি হয়েছে।

“মিশাইয়ের নাম?”

“কিরকিশোর রায়।” বলে কিকিরা তারাপদকে দেখালেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর সরল গলায় বললেন, “লোকে আমাকে কিকিরা বলেই জানে।”

“কী? কিকিরা?” লোচন অবাক।

“কিঙ্কর-এর কি, কিশোর-এর কি, আর রায়-এর রা।” কিকিরা মজা-মজা মুখ করে হাসলেন।“আজকাল সবাই ঘোটর ভক্ত। ফ্যান্টাসটিক-কে বলে “ফ্যান্টা’, ওয়ান্ডারফুল-কে “ওয়ান্ডা। নামের বেলাতেও তাই। ডিপি, বিবি, কেজি। বড় নাম বারবার বলতে কষ্ট হয়।”

“আচ্ছা-আচ্ছা! তা মশাইয়ের কী করা হয়? কিকিরা অমায়িক মুখ করে হাসলেন। “আমার পেশা বলে কিছু নেই। একসময় ম্যাজিক দেখাতাম। লোকে বলত, “কিকিরা দ্য ওয়ান্ডার’। এখন আর ওসব বিদ্যে জাহির করি না। একটা বই লিখছি প্রাচীন ভারতের ইন্দ্রজাল বিদ্যা। ...সেকালে নানা শাস্ত্রে কাব্যে...”

কিকিরাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে লোচন বিরক্ত হয়ে বলল, “না না, প্রাচীন ইন্দ্রজাল-টিন্দ্রজাল আমি ছাপব না।” বলে বেশ কঠিনভাবে কিকিরার দিকে তাকাল। “আপনি বললেন, কাগজ দেখে এসেছেন। এখন বলছেন ইন্দ্রজাল...! আশ্চর্য ব্যাপার মশাই। আমি ইন্দ্রজাল দেখার জন্যে গাঁটের পয়সা খরচ করে কাগজে নোটিস ছাপিনি।”

কিকিরা হাসি-হাসি মুখেই বললেন, “আজ্ঞে না। আমি বই ছাপাবার জন্যে আপনার কাছে আসিনি! আমি জানি, আপনি ছাপাখানার ব্যবসা করেন।”

“হ্যাঁ। আমাদের সত্তর বছরের ব্যবসা। দত্ত অ্যান্ড সন্স।”

“বিখ্যাত ছাপাখানা। ফেমাস! ধর্মতলায় আপনাদের বিরাট প্রেস। আপনারা বিশাল বিশাল কাজ করতেন। সরকারি, বেসরকারি। একবার সি আর দাশের স্পিচ ছেপেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অভিভাষণ...”

লোচন কেমন অবাক হয়ে গেল। হ্যাঁ করে কিকিরাকে দেখছিল। ও

তারাপদ মনে-মনে হাসছিল। কিকিরা অতি চতুর। আসার আগে লোচন দত্তর কাজ কারবারের খোঁজ করে নিয়েছেন তবে। অবশ্য যত না খোঁজ করছেন তার চেয়ে বেশি গুল-গাপ্পা ঝাড়ছেন লোচন দত্তর কাছে। সি আর দাশ, শ্যামাপ্রসাদ-বোধ হয় বাজে কথা।

লোচন বলল, "সি আর দাশের কথা আপনি জানলেন কেমন করে?"

"আপনি জানেন না?" কিকিরা যেন কতই অবাক।

"আমার বাবা জানতে পারতেন। আমি কেমন করে জানব। ..তবে হ্যাঁ আমাদের প্রেসের অফিসঘরে কয়েকটা সার্টিফিকেট টাঙানো আছে। বড় বড় কাজকারবার যখন করেছি, সার্টিফিকেট পেয়েছি। দু-একটা ফোটোও আছে। নেতাজি একবার আমাদের প্রেসে এসেছিলেন। ইয়ে–কী নাম যে, অ্যাক্টর-ওই যে, আহা কী যেন নামটা.."

"শিশিরকুমার!"

"না না, শিশির ভাদুড়ী নন, মিত্তির, মিত্তির।"

"নরেশ মিত্তির।"

"তাঁরও ফোটো আছে। জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধু ছিলেন।"

কিকিরা আড়চোখে তারাপদকে দেখলেন।

লোচন বলল, ছাপাখানার কথা থাক। ছাপাখানার জন্যে আমি কাউকে ডাকিনি।"

"জানি স্যার। আপনি মোহনবাবু সম্পর্কে খোঁজ-খবর চান।"

"হ্যাঁ।"

"আমি আদতে ম্যাজিশিয়ান হলেও মাঝেসাঝে এই ধরনের খোঁজখবর রাখার কাজও করি।"

"গোয়েন্দা?"

"না স্যার। আসল গোয়েন্দা নই।"

"তবে?"

"পাতি গোয়েন্দা।" কিকিরা হাসলেন মজার মুখ করে। "আপনি আমায় ওয়ার্থলেস মনে করবেন না। আমি কাপালিক ধরেছি, রাজবাড়ির কাজও করেছি। সত্যি বলতে কি, আপনি আমায় একটু লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছেন।"

"লোভ?" লোচন সিগারেটের প্যাকেটটা খুলতে-খুলতে বলল।

"তিরিশ হাজার টাকার লোভ!"

"ও!"

"মোহন দত্তকে, মানে জাল মোহন দত্তকে আমি খুঁজে বের করতে চাই।"

লোচন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে যেন বিদ্রূপ করে হাসল। "আপনি জাল মোহনকে খুঁজে বের করবেন! বলেন কী মশাই! আপনি তো বললেন পাতি গোয়েন্দা। আমি ভাবছি একটা আসল গোয়েন্দা ভাড়া করব।"

কিকিরা হাসিমুখেই জবাব দিলেন, "তা করতে পারেন। শাঁটুলদাকেই করুন।"

"শাঁটুল! কে শাঁটুল?"

"শার্লকদাকে আমি শাঁটুলদা বলি!"

লোচন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত-মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না না, ওসব শটুল-মাটুল আমার চাই না।"

কিকিরা হঠাৎ হাত বাড়ালেন। "স্যার, একবার আপনার দেশলাইটা দেবেন?"

"দেশলাই!"

"মানে, আমি একটা বিড়ি ধরাব।"

"বিড়ি!"

"চুরুট!"

লোচন যেন বিরক্ত হয়েই দেশলাইটা ছুঁড়ে দিল।

কিকিরা ততক্ষণে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন। চুরুট বের করছেন। দেশলাইটা এসে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল। তারাপদ কুড়িয়ে নিল দেশলাই।

কিকিরা কোটের পকেট থেকে হাত বের করলেন। দেশলাই দিল তারাপদ। চুরুট ধরিয়ে কিকিরা বললেন, "কাগজে যা ছেপেছেন তাতে তো বলেছিলেন–যে-কোনো লোকই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। বিশেষ করে কাউকে তো আসতে বলেননি। তা হলে এই খোঁড়া পা নিয়ে আসতাম না। কাজটা ঠিক করেননি, দত্তবাবু! কথায় কাজে মিল থাকা দরকার! ...তা ঠিক আছে। চলি। এই নিন আপনার দেশলাই!" বলে কিকিরা উঠে দাঁড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে ছুঁড়ে দিলেন দেশলাই।

লোচন দেশলাইয়ের বাক্সটা লোফার জন্যে হাত বাড়াল। কোথায় দেশলাই! পায়ের কাছে ঠং করে কী যেন একটা পড়ল।

নিচু হয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করে লোচন জিনিসটা তুলে নিল। তুলে নিয়েই। অবাক। চকচক করছে। সোনা নাকি? "কী এটা?"

"সোনার মেডেল...!"

“মে-ডে-ল?”

“আরও দেখবেন! এই দেখুন আমার ডান হাত। ফাঁকা। দেখছেন? ভাল করেই দেখুন স্যার! ...নিন, আরও একটা মেডেল।” এবারের জিনিসটা লোচনের কোলে গিয়ে পড়ল। “আরও চাই? আচ্ছা–এই নিন আরও একটা। এটা স্বয়ং গভর্নর সাহেব দিয়েছিলেন। ছ’আনা সোনা আছে–গিনি গোল্ড!”

লোচন রীতিমতন ঘাবড়ে গিয়েছিল। বলল, “থাক থাক...।”

“না স্যার, কিকিরা হল জেনুইন। ফাঁকিবাজি পাবেন না। আরও কিছু শো করব? দেখবেন? দিন না আপনার চাবির গোছাটা। হাওয়া করে দেব।”

লোচন তার চাবির গোছা মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলল। “না না, চাবির গোছ থাক। আপনি...”

“আমি কিকিরা দ্য গ্রেট। ম্যাগনিফিসিয়ান্ট ম্যাজিশিয়ান। ডাক ডিটেকটিভ–মানে পাতি গোয়েন্দা।”

লোচন বেশ বিমূঢ়।

কিকিরা বললেন, “দিন দত্তমশাই, মেডেলগুলো ফেরত দিন। ...তারাপদ, ওগুলো নিয়ে নাও।”

তারাপদ এগিয়ে গিয়ে মেডেলগুলো নিয়ে নিল।

“তা হলে চলি সার!”

লোচন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। বলল, “আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনারা কি সত্যিই জাল মোহনকে ধরে দেওয়ার জন্যে এসেছেন?”

“ভদ্রলোকের এক কথা। কাগজ দেখে এসেছি। কাজ করতে পারলে তিরিশ হাজার টাকা, নয়ত তিরিশ পয়সাও নয়।”

লোচন যেন কী ভাবল। “পারবেন?”

“চেষ্টা করব।”

“বসুন।”

কিকিরা বসলেন, ইশারায় বসতে বললেন তারাপদকে।

লোচন খানিকক্ষণ যেন কিছু ভাবল। তারপর বলল, “মোহন আমার ছোট ভাই। সহোদর ভাই নয়। জ্যাঠামশাই ওকে পোষ্য নিয়েছিলেন। মানে জ্যাঠার ছেলেমেয়ে ছিল না। আমরা জন্মের বছর দশ পরে পরে এক বন্ধুর ছেলেকে পোষ্য নেন। বন্ধু মারা যান। ...তা মোহন আমার ভাই-ই। আমরা দুটি ভাই ছিলাম। মোহন আজ পাঁচ বছর হল মারা গিয়েছে। নাইনটিন এইট্টি ফাইভে। “

“অগস্ট মাসে?”

“হ্যাঁ।”

“কোথায়?”

“সে সব কথা পরে। এখন যা বলছি শুনুন। ...আজ মাস দেড়-দুই হল একটা লোক আমার ছোট ভাই মোহন সেজে নানা জায়গায় ঝঞ্ঝাট করে বেড়াচ্ছে।”

“আপনি তাকে চোখে দেখেছেন? মানে, যে-লোকটি ঝঞ্ঝাট করে বেড়াচ্ছে, তাকে দেখেছেন?”

“না, আমি দেখিনি।”

“তা হলে?”

লোচন অন্যমনস্কভাবে আরও একটা সিগারেট ধরাল। বলল, “আমি খবর পাচ্ছি।”

“কোত্থেকে খবর পাচ্ছেন?”

“এর-ওর কাছ থেকে।”

“যেমন? নাম বলুন? ঠিকানা?”

ধোঁয়া গিলে লোচন বলল, “মাস দেড়েক আগে একদিন আমার এক আত্মীয়, সম্পর্কে মাসতুতো দাদা, রাত্তিরে ফোন করে প্রথম খবরটা দিল।”

লোচনের কথা শেষ হয়নি, আচমকা এক ছোকরা ঘরে ঢুকল। ঘন মেরুন। রঙের গেঞ্জি গায়ে–স্পোর্টস গেঞ্জি, পরনে সাদা প্যান্ট। চোখে বাহারি গগলস। হাতে একটা লম্বা মতন বাক্স। বাজনার। বলল, “জামাইবাবু, দিদি আপনাকে ডাকছে। ফোন এসেছে। তাড়াতাড়ি যান।” বলে ডোকরা। কিকিরাদের দেখল কৌতূহলের সঙ্গে, তারপর চলে গেল।

লোচন নিজেই বলল, “আমার ছোট শ্যালক, জ্যোতি। ভাল গিটার বাজায়। কোথাও চলল। বাজাতে বোধ হয়। ..আপনারা বসুন। আমি আসছি।”

লোচন চলে গেল।

০৩.

লোচন দত্ত ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তারাপদ সামান্য অপেক্ষা করল, তারপর দুহাত জোড় করে নিচু গলায় বলল, "স্যার, আপনি সত্যিই গ্রেট, আমাকেও হাঁ করে দিয়েছেন। এত কথা জানলেন কেমন করে?"

কিকিরা মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। বললেন, "তোমরা অল্পেতেই হাঁ হও। হাঁ হওয়ার কিছু নেই। বগলাকে পাঠিয়েছিলাম বড়াল গলি আর লোচনের খবর নিতে। বগলা যা খবর দিল আগেই বলেছি। একটা কথা বোধ হয় বলতে ভুলে গিয়েছি। ও শুনেছিল, বাবুদের ছাপাখানা আছে ধর্মতলায়। তা আমার কাছে গোটা দুয়েক পুরনো টেলিফোন-পাঁজি আছে, যাকে তোমরা বলো ডাইরেক্টরি। দুটোই বছর কয়েকের পুরনো। খুব ইউসফুল জিনিস হে তারাবাবু, তুমি ওটা ঘাঁটাঘাঁটি করলে অনেক কিছু পেয়ে যাবে। সেই জন্যেই রেখেছি।"

"আপনি পেলেন?"

"পেলাম। দেখলাম লেখা আছে দত্ত অ্যান্ড সন্স। প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। ধর্মতলা স্ট্রিট...। ছাপাখানার ফোন নম্বর। পরের লাইনে লেখা ডিরেক্টর এল, দত্ত। রেসিডেন্স ফোন নম্বর... এত এত। ব্যস–সহজ জিনিসটা বেরিয়ে গেল। লোচন দত্ত ছাপাখানার ডিরেক্টর। তার বাড়ির ফোন নম্বর সো অ্যান্ড সো।"

"সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি দত্তদের ছাপাখানা সম্পর্কে যেসব গল্প ঝাড়ছিলেন.."

"সেরেফ গল্পই। লোচন দত্ত নিজেই বলল, তাদের ছাপাখানা সত্তর বছরের। মানে বেশ পুরনো। মামুলি ছাপাখানা সত্তর বছর টিকে থাকে না তারাপদ। তা ছাড়া চোখ বুজে ডাউন দ্য মেমারি লেন করলাম। ধর্মতলা স্ট্রিট আমার খুব চেনা রাস্তা। মনে হল, এরকম একটা নামের সাইনবোর্ড যেন দেখেছি। মৌলালির কাছাকাছি হবে।"

তারাপদ ঠাট্টা করে বলল, "সি আর দাশকেও দেখেছেন নাকি?"

কিকিরা হাসলে লাগলেন। "ছবি দেখেছি। দেশবন্ধু মারা যান–উনিশশো পঁচিশ-টচিশ হবে। তখন আমি কোথায়, লোচনই বা কোথায়? আর কোথায় বা তাদের প্রেস।"

তারাপদ যেন মজাটা উপভোগ করছিল। কিকিরা লোককে বোকা বানাতে ওস্তাদ। ম্যাজিশিয়ান বলে কথা!

"আপনি কি খেলা দেখাবার জন্যে ওইসব মেডেল পকেটে পুরে এনেছিলেন?"

"রাইট! ম্যাজিশিয়ানদের পকেট কখনও ফাঁকা থাকে না। হুডিনি সাহেব বলতেন, আমাদের ফাঁকা পকেটে ঘুরতে নেই, জাদুকরের জাত যায়। অন্তত একটা রুমাল বা তাসের প্যাকেটও রেখ।"

"পকেটে আর কী কী আছে?"

"তেমন কিছু না। রুমাল আর আই-পিন।"

“আপনি ভাগ্যবান। ম্যাজিকটা কাজে লেগে গেল।”

“লেগে যেত। সাধারণ মানুষের কাছে দুটো জিনিস লেগে যাওয়ার নাইনটি পার্সেন্ট চান্স। হাত দেখা আর ম্যাজিক।” বলে কিকিরা হাসতে লাগলেন। “আমার কাছে আরও একটা তুরুপের তাস ছিল। দরকার হল না।”

পায়ের শব্দ শোনা গেল।

পালোয়ান হরিপ্রসাদ এসে হাজির। বলল, “আইয়ে...!”

তারাপদ অবাক হল। আইয়ে মানে? লোচন কি তাদের পালোয়ান দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে? বলল, “কাঁহা?”

“দপ্তরমে। দুসরা কামরা।”

কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। “চলো, অফিস ঘরে ডাক পড়েছে।”

তারাপদও উঠে পড়ল।

.

ঢাকা বারান্দায় খানিকটা এগোলেই দোতলার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশ দিয়ে দশ পা হাঁটলেই অফিস ঘর।

কিকিরাদের অফিস ঘরে পৌঁছে দিয়ে পালোয়ানজি চলে গেল।

অফিস ঘরে লোচন দত্ত বসে ছিল। বলল, “আসুন। এই ঘরে বসেই আমি কাজের কথাবার্তা বলি। এটা আমার বসার ঘর অফিস ঘর দুইই। বসুন। আপনারা। আগের ঘরটায় এখন আমার ছেলেরা পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে ক্যারাম খেলতে বসবে। ওদের নাকি ক্যারাম কম্পিটিশন চলছে। ছেলেপুলের কাণ্ড। বসুন আপনারা। চা খান।”

ছেলের কথা উঠলেও কিকিরা লোচনের ছেলে চুরি যাওয়ার কথা তুললেন না।

এই ঘরটা মাঝারি। মোটামুটি সাজানো-গোছানো। সোফা-সেটি চেয়ার। একপাশে লোচন দত্তর কাজকর্মের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদিআঁটা চেয়ার। দেওয়াল-আলমারিতে নানান জিনিস। ফোনও রয়েছে ঘরে। দেওয়ালে গান্ধীজি আর রামকৃষ্ণের ছবি। চমৎকার একটা ক্যালেন্ডার।

কিকিরারা সোফায় বসলেন। টিপয়ের ওপর দু কাপ চা আর প্লেটে কিছু বিস্কুট।

“নিন, চা খান।”

লোচন দত্তর ব্যবহারও খানিকটা পালটে গিয়েছিল। আগের মতন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিল না কিকিরাদের। খাতির করে চা খাওয়াচ্ছে।

কিকিরা চায়ের কাপ তুলে নিলেন। “কাজের কথা আগে সেরে নিই দত্তমশাই?”

“হ্যাঁ, সেরে নিন। আমার আবার তাড়া আছে। রবিবার হলেও একবার বেরোতে হবে।”

“আপনি বলছিলেন, আপনার এক আত্মীয় প্রথমে মোহনের খবরটা দেয়।”

“হ্যাঁ। আমার এক ডিসট্যান্ট রিলেশান। মাসতুতো ভাই হয় সম্পর্কে।”

“মাস দেড়েক আগের ঘটনা বলছিলেন…”

“ওইরকমই। রাতের দিকে ফোন করে বলল ব্যাপারটা।”

“আত্মীয়ের নাম-ঠিকানা? প্লিজ, স্যার এক টুকরো কাগজ যদি দেন।”

টেবিলের ওপর কাগজ ছিল। কিকিরার ইশারায় তারাপদ উঠে গিয়ে কাগজ নিল। ডট পেন তার পকেটেই ছিল।

ফিরে এসে বসল তারাপদ।

লোচন বলল, “নাম অনিল। অনিলচন্দ্র দেব। ঠিকানা দিনেন্দ্র স্ট্রিট। বাড়ির নম্বর একশো বত্রিশ বাই ওয়ান বোধ হয়।”

“নম্বরটা ঠিক মনে পড়ছে না?”

“ওইরকমই। শ্যামবাজারের দিকে। “

“কী করেন ভদ্রলোক?”

“মেশিনারির ডিলার। অফিস মিশন রো-তে।”

“কী বললেন উনি?”

লোচন সিগারেট ধরিয়ে নিল। বলল, “অনিলদা বলল, একটা লোক দু’দিন ধরে বাড়িতে তাকে ফোন করে বলছে যে, সে মোহন।”

“মাত্র ওইটুকু?”

“না। বলছে যে, সে মরেনি। বেঁচে আছে। তার মরার খবর মিথ্যে।”

“একথা কেন বলছে?”

“আমি জানি না। তবে সে বলতে চাইছে, আমি মিথ্যে করে তার মরার বির রটিয়েছি। সে বেঁচে আছে।”

কিকিরা তাপাপদর দিকে তাকালেন। তারাপদ অনিলচন্দ্রের নাম-ঠিকানা কে নিয়েছিল আগেই। চা খাচ্ছিল। কিকিরা বললেন, “আর কিছু?”

“না।”

একটু থেমে কিকিরা এবার বললেন, “অনিলবাবুর সঙ্গে আপনি দেখা করেননি?”

"করেছিলাম। আলাদা কিছু জানতে পারিনি।"

"অনিলবাবুর কী মনে হয়েছে?"

"অনিলদা বলল, পাঁচ-ছ বছর পরে তো গলার স্বর মনে থাকার কথা নয়। তবে লোকটা আমাদের বাড়ি সম্পর্কে যা-যা খবর দিল দু-পাঁচটা, তা ঠিকই। "

কিকিরা চা শেষ করলেন। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "এর পর? মানে অন্য আর কাদের সঙ্গে মোহন যোগাযোগ করেছে?"

নোচন বললেন, "আমাদের এক মামা আছেন.। মায়ের খুড়তুতো ভাই। বয়েস হয়েছে। ডাক্তারি করতেন। মানে চাকরি করতেন করপোরেশনে। রিটায়ার্ড। তাঁকেও লোকটা ফোন করেছিল।"

"মামার নাম? ঠিকানা?"

"পি সি সেন। প্রফুল্ল সেন। ঠিকানা শোভাবাজার।" লোচন ঠিকানা দিল।

"মামাকেও সেই একই কথা", লোচন বলল, "সে বেঁচে আছে। আমি নাকি মিথ্যে করে তার মরার খবর রটনা করেছি।"

"আপনার মামা তাকে আসতে বললেন না বাড়িতে?"

"মামা বলেছিলেন। ও আসবে না।"

"কেন?"

"বলল, আসার বিপদ আছে।"

"আপনার মামার কী মনে হল লোকটার কথা শুনে?"

লোচন একটা পেনসিল তুলে নিয়ে ঘাড়ের কাছটায় চুলতে নিতে-নিতে বলল, "মামার ধারণা হল, লোকটা চিট, তবে আমাদের বাড়ির খবরাখবর রাখে।"

কিকিরা বললেন, "এর পর? মানে আর কার কার সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছে?"

লোচন খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, "আরও তিন-চারজনের সঙ্গে। তার মধ্যে রয়েছে আমার বন্ধু ভবানী; আমার শ্বশুরবাড়ির তরফের বলতে বড় শ্যালক; আমাদের প্রেসের পুরনো ম্যানেজার তুলসীবাবু, এই পাড়ার মিহিরকাকা।"

"পুরো নাম-ঠিকানাগুলো বলবেন দয়া করে?"

লোচন তার বন্ধু ভবানীর কথা বলল। ভবানী সরকারি চাকরি করে, থাকে ক্রিক রো-তে। শ্বশুরবাড়ির বড় শ্যালকের নাম সতীশ চন্দ্র। সে থাকে বাগবাজারে। আলাদাই থাকে সতীশদা।

কথার মাঝখানে ফোন এল।

লোচন ফোন তুলল, সাড়া দিল, তারপর বলল, “ধরো, ওপরে তোমার মেজদিকে দিচ্ছি।” বলে নিচের ফোনের লাইন ওপরে জুড়ে দিল। দিয়ে নিচের ফোন নামিয়ে রাখল।

তারাপদ নাম-ঠিকানা টুকে নিচ্ছিল।

“আপনাদের প্রেসের ম্যানেজার?” কিকিরা বলল।

“তুলসীবাবু। তুলসী সিংহ। আমারা “তুলসীকাকা বলতাম। কাকা বছর চার-পাঁচ হল বাড়িতেই বসে আছেন। বয়েস হয়েছে। তা পঁয়ষট্টির বেশিই হবে। উনি শেষের দিকে বার কয়েক বড় বড় অসুখে পড়েন। শেষে হার্টের গোলমাল। তার ওপর চোখে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। ছানি কাটানো হল একটা। কাজ হল না। কাকা রিটায়ার করলেন।”

“কোথায় থাকেন?”

“পটুয়াটোলা লেনে। ...কাকা বাড়িতে একাই থাকেন। বিধবা এক ভাইঝি দেখাশোনা করে। কাকা বিয়ে-থা করেননি। নিজের বলতে কেউ নেই। মানুষটি খুব ভাল। ধার্মিক। একমাত্র কাকার কাছেই লোকটা একদিন হাজির হয়েছিল।”

“সামনাসামনি?”

“হ্যাঁ। বৃষ্টির মধ্যে সন্ধের পর।”

“তুলসীবাবু তাকে দেখেছেন?”

“সামান্য দেখেছেন। যে-মানুষের চোখ নেই বললেই চলে–তার দেখা আর না-দেখা সমান।”

“তবু তিনি কী বললেন?”

“মোহনের মতনই লেগেছে তাঁর।”

“ও!... তা সেই লোকটা সরাসরি দেখা বলতে এই যা তুলসীবাবুর সঙ্গেই করেছেন? অন্যদের বেলায়...”

“ফোন। চিঠি।”

“চিঠি?”

“চিঠিও লিখেছে দু-একজনকে। সেই চিঠি আমি দেখেছি। হাতের লেখা খানিকটা মিলে যায়।”

কিকিরা অবাক হলেন। তারাপদর দিকে তাকালেন।

তারাপদ বলল, “দু-চার বছর পরেও কারও হাতের লেখা দেখলে তার পুরনো হাতের লেখার সঙ্গে মেলাতে গেলে মুশকিল হয়ে পড়ে। অবশ্য খুব চেনা হাতের লেখা হলে অন্য কথা।”

“হাতের লেখা নকল করাও কঠিন নয়। সই জাল, হাতের লেখা জাল-এ তো আকছার হয়। “ লোচন বলল।

কিকিরা কথা পালটে নিলেন। "আর-একজনের কথা বলছিলেন আপনি, পাড়ার লোক।"

"মিহিরকাকা। উনি এই পাড়াতেই থাকেন। একটা ছোট পার্ক আছে ওদিকে। বাচ্চাদের পার্ক। পার্কের গায়েই ওঁর বাড়ি। মিহিরকাকা উকিল মানুষ। বাবার বন্ধু ছিলেন। ওকালতি মন্দ করতেন না, তবে ওঁর শখ হল নাটক করার। এখানে একটা পুরনো ক্লাব আছে নাটকের, ইভনিং ক্লাব। মিহিরকাকা আজ বছর দশ-পনেরো ক্লাব নিয়ে মেতে আছেন। পয়সাওলা বাড়ির ছেলে। চিন্তা-ভাবনা নেই। তবু মিহিরকাকা একসময় যাও বা কোর্টে আসা-যাওয়া করতেন, বছর কয়েক তাও করেন না।"

"কেন?"

"ওঁর ডান হাত অ্যামপুট করতে হয়েছে। গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।"

"ইস!"

"ওকালতি প্রায় ছেড়ে দিলেও ক্লাব ছাড়েননি। ক্লাবই এখন ধ্যান-জ্ঞান।"

"জাল মোহন কি ওঁর কাছে গিয়েছিল?"

"না। ফোনে কথা বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"সে বেঁচে আছে। এখন কলকাতায় রয়েছে।"

"লোকটার উদ্দেশ্য কী?"

"জানি না। সে-ই জানে। তবে আমার মনে হচ্ছে, লোকটা ভয় দেখিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়।"

কিকিরা ভেবেছিলেন লোচন ছেলে-চুরির কথা তুলবে। তুলল না। সামান্য অবাকই হলেন তিনি। খানিকক্ষণ কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "মোহন কোথায় কীভাবে মারা যায়?"।

লোচন যেন সামান্য ইতস্তত করল। বার কয়েক দেখল কিকিরাকে। হতাশ, করুণ মুখ করল কেমন। আবার সিগারেট ধরাল। বলল, "ঘটনার কথা ভাবতে গেলে আমার কী যে হয়ে যায় মশাই, সারা গা ভয়ে শিউরে ওঠে। মনে হয়, কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি।" লোচন চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। আবার বলল, "আমাদের দুই ভাইয়েরই বেড়াবার শখ ছিল। ছুটিছাটায় তো বটেই–এমনিতেও হুট করে বেরিয়ে পড়তাম কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে। সেবার আমরা চারজন একটা জায়গায় বেড়াতে যাই। জায়গাটা আপনারা চিনবেন না। বালিয়া জেলার ছোট্ট এক জায়গায়। জঙ্গল আর ছোট-ছোট পাহাড়। গাছপালা, পাখি তো কতই! তার সঙ্গে ছিল এক ঝরনা, ছোট ঝরনা, ঝরনার শেষে একটা লেক। ওখানকার ভাষায় বলে 'তাল'। বোধ হয় 'তালাও' শব্দ থেকে। বর্ষার শেষ সময় গিয়েছিলাম আমরা। অগস্ট মাসে। ...যা বলছিলাম, 'সারাও তাল' বলে যে লেকটা আছে–তার কাছাকাছি এক মামুলি সরকারি ডাকবাংলোয় আমরা উঠেছিলাম। দিন পাঁচ-সাত থাকার কথা।"

"আপনারা চারজন কে-কে ছিলেন?"

“আমি, মোহন, আমার মেজো শ্যালক, আর মোহনের এক বন্ধু।”

“তারপর?”

“একদিন আমরা ঝরনা দেখতে পাহাড়ের ওপরে গেলাম। পাহাড় যে খুব উঁচু তা নয়। তবে বড় রাফ। খাড়াই পাহাড়। পাথরে ভরতি। ওপরে গাছপালার ঝোঁপ। বেশিরভাগ গাছই ঝোঁপ ধরনের।”

“আপনারা চারজনেই গিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ। চারজনেই। ...পাহাড়ের মাথার কাছে এক জায়গায় যেখান থেকে ঝরনার জল নামছে, সেখানে পা রাখাই কষ্টের। পাথর, ঝোঁপ, শ্যাওলা, জংলা। গাছ। ...আমি মোহনকে বারণ করেছিলাম আর না-এগোতে। আমার কথা শুনল না। সে এগিয়ে গেল। আমার মেজো শ্যালক আর মোহনের বন্ধু খানিকটা পেছনেই ছিল। মোহন এগিয়ে যাচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে আমিও গেলাম। হঠাৎ একেবারে ঝরনার মুখের কাছে গিয়ে মোহনের পা পিছলে গেল।” লোচন যেন শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল, দৃশ্যটা সে দেখতে পাচ্ছে এখনো।

কিকিরা আর তারাপদ কোনো কথা বললেন না।

নিজেকে সামলে নিয়ে শেষে লোচন বলল, “ঝরনার জলের সঙ্গে পড়তে-পড়তে সে কোথায় যে আটকে গেল পাথরে, ঝোঁপঝাড়ে–তা আর আমরা দেখতে পেলাম না।”

“আপনারা কী করলেন?”

“নিচে নেমে লোকজন জুটিয়ে আনলাম। মোহনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পুরো একটা দিন কেটে গেল। দেড় দিনের মাথায় তাকে উদ্ধার করা গেল। পাথর আর জলের মধ্যে ঘন শ্যাওলার তলায় আটকে রয়েছে। পড়ার সময় তার যা জখম হয়েছিল–তা তো হয়েই ছিল, তার ওপর জলের স্রোতে এখানে-ওখানে ধাক্কা খেতে-খেতে মোহনের চোখমুখ মাথা বলতে কিছুই প্রায় ছিল না। রক্তমাংসের একটা তাল। জলের মধ্যে পড়ে ছিল বলে পোকামাকড় তার গা ঘেঁকে ধরেছে। সারা শরীর ভাঙাচোরা, মাংস খাবলে নিয়েছে যেন কোনও জন্তুজানোয়ারে। সে দৃশ্য বীভৎস!”

“মোহনকে চেনা যাচ্ছিল?”

“কষ্ট হচ্ছিল। তবে আমি চিনতে পেরেছিলাম।”

“আপনার শ্যালক আর মোহনের বন্ধু?”

“তারাও চিনেছিল।”

“মোহনকে আপনারা ওখানেই দাহ করেন?”

“হ্যাঁ। কাছেই। এক ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল মাইল তিনেক তফাতে। পুলিশ-থানাতেও খবর দেওয়া হয়।”

“কাগজপত্র আছে?”

“না। ডাক্তারের সার্টিফিকেট থানায় জমা নিয়ে নেয়। তার একটা কপি পরে আমি আনিয়েছি।”

“আপনার মেজো শ্যালক এখন কোথায়?”

“ডুয়ার্সে? চা বাগানে। সেখানে চাকরি করে।”

“মোহনের বন্ধু?”

“সে চলে গিয়েছিল দিল্লিতে। সেখানে চাকরি করত। তারপর কোথায় আছে আমি জানি না।”

“আপনি কি এদের কোনো খবর দিয়েছেন?”

“মেজো শ্যালককে চিঠি লিখেছি। মোহনের বন্ধুর ঠিকানা আমি জানি না। ...কলকাতায় তাদের কেউ নেই।”

কিকিরা খানিকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “মোহনের কোনো ফোটো হাতের কাছে আছে?”

“না, হাতের কাছে নেই। তবে ওই দেওয়ালে-ওই ছবিটা দেখতে পারেন। আমরা দুই ভাই-ই রয়েছি ফোটোতে।”

কিকিরা এগিয়ে দেওয়ালের কাছে গেলেন। ফোটোটা দেখলেন কিছুক্ষণ।

“আজ আমরা যাই। পরে আপনার কাছে আবার আসছি।” বলে কিকিরা ইশারায় তারাপদকে উঠতে বললেন।

০৪.

চন্দন ঘরে আসতেই কিকিরা বললেন, “কী ব্যাপার হে, নাটকের মাঝখানে তোমার আবিভাব। বলি এটা কি দাশরথি পার্টির যাত্রা।” বলে রঙ্গ করে চোখ এলে তাকিয়ে থাকলেন চন্দনের দিকে। কে যে দাশরথি তিনি বললেন না।

চন্দন মাথা মুছতে লাগল। ইলশেগুঁড়ির মতন বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। দু-দশ ফোঁটা জল গায়ে-মাথায় লেগেছে তার। মাথা মুছতে মুছতে চন্দন বলল, “ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন আপনারা, আমার তো সে আহ্লাদ করার সময় নেই। ডিউটি ডিউটি ডিউটি। লাইফ হেল করে ছেড়ে দিল। ওপরঅলা গিয়েছেন দিল্লি, সেমিনার করতে, যত ঝঞ্ঝাট আমার। আসছে জন্মে যেন আর ডাক্তার না হই।”

“কী হতে চাও?” কিকিরা মজা করে বললেন, “কম্পাউন্ডার?”

“আজ্ঞে না, বরং ম্যাজিশিয়ান হব। ভড়কি মেরে বাজিমাত। কত হাততালি। কাগজে ছবি।”

“তাই হবে। এখন বোসো। চা-টা খাও।”

কিকিরার ঘরে তিনি আর তারাপদ। সন্ধে হয়েছে সবে। আজকের দিনটায় মোটামুটি আরাম লাগছিল। গরম নেই, ঘাম নেই, বাদলাও না থাকার মতন। শরকাল যেন পুরোপুরি দেখা দিচ্ছে।

“আপনার পা কেমন?”

“ও-কে।”

“আপনি বাইরে বেরোতে শুরু করেছেন শুনলাম?”

“এই মাঝে-মাঝে!”

“চালাকি করবেন না কিকিরা। আমি সব জানি। রবিবারে আপনি সফর করতে বেরিয়েছিলেন। গতকালও টহল মেরে এসেছেন।”

কিকিরা অমায়িক হাসি হেসে বললেন, “যাচ্চলে, আমার তো খেয়ালই থাকে না। বুড়ো হয়ে ভীমরতি হয়েছে আমার। ...তা স্যান্ডেলউড, ইয়ে মানে–তিরিশ হাজার টাকার ব্যাপারটা তোমায় বলেনি তারাপদ?” কিকিরা বললেন বটে বোকা সেজে, কিন্তু তিনি জানেন, তারাপদর কাছ থেকে সব খবরই পেয়েছে চন্দন।

তারাপদ চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

চন্দন বলল, “যা ইচ্ছে আপনি করুন, স্যার। কিন্তু আপনার পায়ের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি না। পরে যখন ব্যথায় কাতরাবেন, আমি নেই।”

কিকিরা হেসে-হেসে জবাব দিলেন, “পাগল নাকি! আমি তোমার অ্যাডভাইস ছাড়া কিছু করি নাকি? তবে কী জানো, তিরিশ হাজারের লোভটা সামলাতে পারিনি বলে দু’দিন বাড়ির বাইরে বেরিয়েছি। খুব সাবধানে। ওয়াকিং করিনি বললেই হয়, সঙ্গে ছড়ি রেখেছি। প্রথমদিন

তারাপদ ছিল। ...তুমি সব শুনেছ তো?”

“লোচন দত্ত শুনেছি। “

“কাল একবার উত্তরে গিয়েছিলাম। বাগবাজার আর দিনেন্দ্র স্ট্রিট।”

চন্দন বসল। বসে হাত বাড়িয়ে তারাপদর সামনে রাখা প্লেট থেকে একটা শিঙাড়া তুলে নিল।

কিকিরা নিজেই বললেন, “দিনেন্দ্র স্ট্রিটে থাকেন লোচনের মাসতুতো দাদা। অনিলচন্দ্র দেব, অনিলদা। মাসতুতো হলেও ঠিক নিজের মাসির নয়। মায়ের খুড়তুতো দিদির ছেলে। বয়েস হয়েছে। পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে। অনিলচন্দ্র সেরে একবার সতীশবাবুর কাছে গেলাম। সতীশবাবু নোচনের বড় শ্যালক। থাকেন বাগবাজারে। আলাদাভাবেই থাকেন, মানে লোচনের নিজের শ্যালক হলেও, নিজেদের পৈতৃক বাড়িতে থাকেন না। ভাড়া বাড়িতে থাকেন।”

চন্দন বলল, “দেখুন কিকিরা, আমি তারার মুখের গোড়ার কথা সব শুনেছি। সব ব্যাপারে আপনি নাক গলাতে যান কেন?”

মজা করে কিকিরা বললেন, “নাক এখনো গলাইনি; শুধু গন্ধটা শুকছি। ...তা ছাড়া তিরিশ হাজার ফেলনা নয় আজকের দিনে। আমি গরিব মানুষ। যদি থার্টি থাউজেন্ড পেয়ে যাই...।

“কচু পাবেন। ওসব ধাপ্পাবাজি আমি অনেক দেখেছি।”

“তুমি আগে থেকেই সব মাটি করে দিচ্ছ! কথাগুলো যদি না শোনো, ব্যাপারটার মধ্যে কী আছে বুঝবে কেমন করে?”

চন্দন আর কথা বলল না।

কিকিরা সামান্য সময় চুপ করে থেকে বললেন, “ব্যাপারটা যা ভাবছ তা নয়। এর মধ্যে সামথিং হ্যাজ...!”

বগলা চা নিয়ে এসেছিল চন্দনের জন্য। তারাপদদের চা তখনও শেষ হয়নি।

চা নিতে নিতে কিকিরার দিকে তাকাল চন্দন। বলল, “সামথিং তো সব ব্যাপারেই থাকে। তা বলে আপনি খোঁড়া পায়ে নেচে বেড়াবেন!”

কিকিরা কথাটা শুনলেন, পাত্তা দিলেন না।

চন্দন নিজের ঝোঁকেই বলল, “আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, আপনার উচিত ছিল ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিসে নেমে পড়া। বিস্তর পয়সা কামাতেন। আজকাল ও-লাইনে অনেক কদর।”

কিকিরা বললেন, “নেক্সট লাইফ, মানে পরের জন্মে চেষ্টা করব। এখন আমার কথাটা শোনো।”

চন্দন আর কিছু বলল না। কিকিরা বললেন, “বলছিলাম অনিলবাবুর কথা। বাড়িতে গিয়েই ধরলাম তাঁকে। বললাম, আমি লোচনবাবুর হয়ে কাজ করছি। ভদ্রলোক আমাকে পাত্তাই

দিতে চান না। পরে ফোন করলেন লোচনকে। জেনুইন পার্টি আমি। শেষে কথা বললেন।”

“কী বললেন?” তারাপদ বলল।

“বললেন টেলিফোন কল বার-দুই হয়েছে। টেলিফোনে গলা শুনে তিনি আন্দাজ করতে পারেননি ওটা মোহনের গলা কি না! এত বছর পর কারও গলার স্বর মনে রাখা অসম্ভব। তার ওপর লাইনে শব্দ হচ্ছিল। পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছিল বোধ হয় কেউ। “

“অনিলবাবুর মোট কথাটা কী?

“বললেন, মোহন কি না তা তিনি জানেন না, তবে লোকটা লোচনদের ঘরবাড়ি পরিবার ছাপাখানা সম্পর্কে যা-যা বলল, দু-দশটা কথা, তা ঠিকই। মানে অনিলবাবু যতটা জানেন।”

চন্দন তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, “এটা কোনো কথা হল কিকিরা? ইনফরমেশান জোগাড় করা কঠিন নাকি?”

কিকিরা বললেন, “কোনো কোনো জিনিস খুঁজে বের করা কঠিন। মানে, আমি বলছি–কোনো লোক বা বাড়ির সম্পর্কে আমরা যখন খোঁজখবর করি, ওপর-ওপরই করি। হয়ত খানিকটা খুঁটিয়েও করলাম কিন্তু সেটা কতটা হতে পারে। তোমার মা-বাবা-ভাই-বোন ঘরবাড়ি সম্পর্কে তুমি যা জানো, যতটা জানো, দেখেছ ছেলেবেলা থেকে–আমি বা তারাপদ ততটা কি জানতে পারি? পারি না।”

চন্দন বলল, “জাল মোহন কি সব কথা বলতে পেরেছে?”

“সব কথা নয়। সে-অবস্থাও ছিল না। মোহন দত্ত-পরিবার সম্পর্কে, নিজের বাবা আর কাকা, মানে লোচনের বাবা সম্বন্ধে দু-চার কথা যা বলেছে, তা ঠিক।”

“একটু শুনি?”

“যেমন ধরো সে বলেছে, তার বছর দশ বয়েসে তাকে দত্তক নেন রামকৃষ্ণ দত্ত, মানে লোচনের জ্যাঠামশাই। লোচনের বয়েস তখন দশ-এগারো। মোহন নামটা রামকৃষ্ণরই দেওয়া। আগে তার নাম ছিল গোপাল। নিজের বাবার সম্পর্কে এইটুকু তার ভাসা-ভাসা মনে আছে যে, ভদ্রলোক বড় গরিব ছিলেন, সামান্য একটা কাজ করতেন। স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। ...তা রামকৃষ্ণর বন্ধু ছিলেন ভদ্রলোক। গোপালের নিজের বাবার টিবি রোগ হয়। বাড়াবাড়ি। উনি মারাও যান। মারা যাওয়ার আগে রামকৃষ্ণকে বলেন, গোপালকে দত্তক নিয়ে নিতে। রামকৃষ্ণর ছেলেপুলে ছিল না। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী গোপালকে দত্তক নিয়ে নেন। পোষ্যও বলতে পারো।”

তারপদ বলল, “অনিলবাবু এ-সব জানেন?”

“জানেন। শুনেছেন।”

“আর কী বলল মোহন?”

“লোচনের বাবার অসুখের কথা। দু-দুবার এমন অসুখ হয়েছিল যে, মারা যেতে বসেছিলেন। নোচনের মা দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে পা হড়কে হাত-পা ভেঙেছিলেন–সে কথাও বলেছে।”

চন্দন আর তারাপদ সিগারেট ধরাল। কিকিরাও একটা চেয়ে নিলেন।

“অনিলবাবুর কী ধারণা, এই লোকটা আসল মোহন?”

মাথা নাড়তে নাড়তে কিকিরা বললেন, “না। তাঁর ধারণা লোকটা জাল।”

“আসল বলে তিনি মানতে চাইছেন না কেন?”

“যে জন্যে তোমারাও মানতে চাইছ না। মরা মানুষ কেমন করে ফিরে আসবে? মোহন যে মারা গেছে তার প্রমাণ রয়েছে হাতেনাতে। লোচন ছাড়াও বাকি দুজন তাকে মারতে দেখেছে, লোচনের মেজো শ্যালক আর মোহনের বন্ধু।”

তারাপদ বলল, “অনিলবাবু শেষ পর্যন্ত কী বলতে চাইলেন?”

“তিনি অবাক হয়েছেন ঠিকই, তবে এই ফোন করা মোহনকে ভদ্রলোক জালিয়াত জোচ্চোর ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজি না।”

চন্দন কোনো কথা বলল না। তারাপদও চুপচাপ।

কিকিরা নিজের থেকেই বললেন, “অনিলবাবু সেরে গেলাম সতীশবাবুর কাছে। উনি থাকেন বাগবাজারে। পৈতৃক বাড়িতে থাকেন না। বাগবাজারে একটা বাড়ির দোতলা ভাড়া নিয়ে থাকেন।”

“পৈতৃক বাড়ি কী দোষ করল?”

“সেটা কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি? নিজেদের ফ্যামিলির ব্যাপার। ..সতীশবাবু মানুষটি কিন্তু সজ্জন। ভাল। বছর পঞ্চান্ন বয়েস হয়েছে। একটা ওষুধ কোম্পানিতে কেমিস্ট। পরিবার বলতে স্ত্রী আর ছেলে। ছেলে কলেজে পড়ায়। বিয়ে-থা এখনো হয়নি।”

“সতীশবাবু কী বললেন?”

“বললেন অনেক কথাই। মোহনের গলার স্বর তিনি ধরতে পারেননি ঠিকই তবে দু-পাঁচটা কথা প্রমাণ হিসাবে যা বললেন, তা ঠিকই। সতীশবাবু বেশ আশ্চর্যই হলেন। উনি বললেন, দেখুন, ও-বাড়ির সব খোঁজখবর আমি রাখি না, কুটুমবাড়ির নাড়ির খবর, হাঁড়ির খবর রেখে আমার কী লাভ! তবে হ্যাঁ, আমাদের জামাইয়ের বাবা যেদিন মারা গেলেন সেদিন কলকাতা যে জলে ডুবে ছিল, তা আমার মনে আছে। ওদের ছাপাখানায় আগুন লেগে অনেক ক্ষতি হয়েছিল সেটাও আমি জানি। ...এইরকম কয়েকটা কথা মোহন যা বলেছে–সতীশবাবু স্বীকার করে নিলেন সত্যি বলেই।”

“সতীশবাবুর ধারণা, এ-মোহন তবে আসল?”

“না, সে কথা তিনি কেমন করে বলবেন।”

“তবে?”

“তবে এটা তিনি স্পষ্টই বললেন, মোহন ছেলেটিকে তাঁর খুবই ভাল লাগত। হাসিখুশি ছেলে, আচার-ব্যবহার সুন্দর। চট করে নজর কেড়ে নিত। মোহন কিন্তু স্বভাবে খুব ভিতু ছিল।

সাবধানী ছিল। বেপরোয়া ধরনের ছেলে সে একেবারেই ছিল না। চলন্ত ট্রামে বাসে সে লাফিয়ে উঠত কি না সন্দেহ। ময়দানে বড় খেলা থাকলে গণ্ডগোলের ভয়ে সে মাঠে যেত না। রেডিয়ো শুনত, টিভি দেখত। এই ছেলে যে কেমন করে ঝরনা-নামা দেখতে পাহাড়ের মাথায় উঠবে, উঠে অমন বিপজ্জনক জায়গায় যাবে–সতীশবাবুর তা মাথায় ঢোকেনি। বললেন, একেই বলে নিয়তির টান মশাই, নিয়তি তাকে টান ছিল…।"

চন্দন হঠাৎ বলল, "ওর কি ভারটিগো রোগ ছিল? তা থাকলে মাথা ঘুরে যেতে পারে।"

কিকিরা বললেন, "সে-খবর নিইনি।"

তারাপদ বলল, "সতীশবাবুর কথা থেকে কি আপনার মনে হল, ওঁর মনে কোনো সন্দেহ আছে?"

"সন্দেহের কথা কেমন করে বলবেন! তবে আমার মনে হল, ব্যাপারটা এমনই যে, সতীশবাবু মনে-মনে মেনে নিতে পারেননি।"

"লোচন সম্পর্কে বললেন কিছু?"

"না। নিজের ভগিনীপতি সম্পর্কে চুপচাপ দেখলাম। বেশি কিছু বললেন। হয়ত এড়িয়ে গেলেন।"

চন্দন বলল, "আপনার কী মনে হচ্ছে?"

"ভাবছি। এখনো অনেকের সঙ্গে দেখা করা বাকি। দেখি কোথাকার জল। কোথায় গড়ায়। মুশকিল কী জানো চাঁদু, যে দু'জন বড় সাক্ষী ছিল, তাদের একজন এখন চা বাগানে, অন্যজন বেপাত্তা। ঘটনা যে সময় ঘটেছে তখন ওরা ওখানে ছিল। ওরাই বলতে পারে।"

বাধা দিয়ে তারাপদ বলল, "স্যার, অন্য দু'জন কাছে ছিল কিন্তু পাশে বা গায়ের কাছে ছিল না। আমার যতদূর মনে হচ্ছে লোচন সেই রকমই। বলেছিল।"

চন্দন বলল, "সতীশবাবুর কী ধারণা, এই লোকটা মোহন হলেও হতে পারে?"

"না। তা নয়; তবে তিনি ধোঁকা খেয়েছেন। …মরা মানুষ ফিরে আসে না–এটা সবাই বোঝে। কথা হল, মোহন সত্যিই মারা গিয়েছে কি না?"

"সতীশবাবুরও সন্দেহ রয়েছে?"

"বাইরে প্রকাশ করলেন না, ভেতরে মনে হল, কোনো একটা সন্দেহ আছে।"

চন্দন আর তারাপদ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

কিকিরা তাঁর মচকানো পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন নিজে। দেখালেন চন্দনকে, "হাঁটতে পারি। ব্যথা কম। বেশি হাঁটাচলা করলে ব্যথা বাড়ে।"

"আপনি তা হলে বেশি হাঁটাচলা করছেন?"

হাসলেন কিকিরা, ছেলেমানুষ যেমন করে মিথ্যে গল্প সাজায়, অবিকল সেইভাবে বললেন,

“না, কোথায়? রিকশায়-রিকশায় ঘুরি। আজকাল আবার অটো বেরিয়েছে।” বলে অন্য কথায় চলে গেলেন। “কাল আমি তুলসীবাবুর কাছে যাব। পটুয়াটোলা লেন। উনি ম্যানেজার ছিলেন দত্ত কোম্পানির ছাপাখানার। তুলসীবাবুই একমাত্র লোক যিনি জাল মোহনকে সামনাসামনি দেখেছেন। দেখি তিনি কী বলেন?”

“আরও তো আছে।”

“হ্যাঁ, ভবানী আর সেই উকিল মিহিরবাবু, থিয়েটার পাগলা।”

“সবই কি একদিনে সারবেন?”

“তা বোধ হয় হবে না। দেখি! একটা কথা আমায় বড় ভাবাচ্ছে হে! তোমরা নিশ্চয় লক্ষ করেছ, যে দু’জন লোক লোচনদের সঙ্গে ছিল তখন-মানে ঘটনার সময়, তাদের কেউ আর কলকাতায় নেই। একজন চলে গিয়েছে চা বাগানে, অন্যজন কোথায় কেউ জানে না। তার চেয়েও যা আশ্চর্যের ব্যাপার, লোচনের মেজো শ্যালক আগে কলকাতাতেই থাকত। ঘটনার পর সে চা বাগানে চলে গিয়েছে চাকরি নিয়ে। সতীশবাবুই আমাকে বললেন। মোহনের বন্ধু সম্পর্কে অবশ্য তিনি কিছু জানেন না। আমি ভাবছি, এই দুটো লোককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, না, তারা নিজেরাই সরে গেছে। লাখ টাকার প্রশ্ন হে! জবাবটা কে দেবে?”

.

০৫.

পরের দিন কিকিরা এলেন তুলসীবাবুর বাড়ি। সঙ্গে তারাপদ। বিকেল শেষ করেই এসেছেন।

পটুয়াটোলা গলির যে বাড়িতে তুলসীবাবু থাকেন–তার চেহারা দেখলে মনে হয়, বাড়িটা এই বুঝি ভেঙে পড়বে। ওই বাড়িতেই তিন-চার ঘর ভাড়াটে। তুলসীবাবু থাকেন দোতলার একপাশে।

তুলসীবাবু যে-ঘরে থাকেন সেই ঘরেই কিকিরাদের বসতে হল। একটা খাট, টেবিল, চেয়ার আর বেতের মোড়া। কাঠের এক আলমারি একপাশে। ঘর ছোট, জানলা মাঝারি। দরজা-জানলার পাল্লায় রং বলে কিছু নেই আর। দেওয়ালে চুনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

তুলসীবাবু কলঘরে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন।

মানুষটির যত না বয়েস হয়েছে তার চেয়েও বুড়োটে দেখায়। রোগা চেহারা, মাথার চুল সাদা, চোখে গোল-গোল চশমা। পরনে ধুতি আর গায়ে ফতুয়া।

পাখা চলছিল, আলোও জ্বালা ছিল।

কিকিরারা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন।

তুলসীবাবু ভাল দেখতে পান না। ছানিকাটানো চোখটা প্রায় অন্ধ। ঠাওর করে দেখতে-দেখতে বললেন, "কে আপনারা?"

কিকিরা নিজেদের পরিচয় দিলেন। বললেন, লোচনবাবুর মুখ থেকে ওঁর কথা শুনে তাঁরা আসছেন।

তুলসীবাবু সরল মানুষ, ঘোর-পাঁচ বড় বোঝেন না। বললেন, "বড়দা পাঠিয়েছে?"

কিকিরা বললেন, "না, তিনি পাঠাননি। তাঁর মুখে আপনার কথা শুনে আসছি।"

"ও! তা আমি কী করতে পারি?"

"আপনি খবরের কাগজ দেখেন?"

"দেখি। পড়তে কষ্ট হয়। আতস কাঁচ চোখে লাগিয়ে পড়ি খানিকটা।"

কিকিরা কাগজের নাম বললেন। পকেটে ছিল একটা পুরনো কাগজ। বললেন, "লোচনবাবু কাগজে একটা নোটিস ছেপেছেন। জানেন আপনি? না, পড়ব! কাগজ সঙ্গে করে এনেছি।"

তুলসীবাবু মাথা নাড়লেন। "আমি দেখেছি। প্রাণকেষ্টও আমাকে বলেছে। "

"প্রাণকেষ্ট কে?"

"ছাপাখানায় কাজ করে। পিয়ন। সে কাছাকাছি থাকে। প্রায়ই আসে আমার কাছে। সে বলছিল।"

“তা হলে তো আপনি সবই জানেন।”

“ওটা জানি।”

“লোচনবাবু বলছিলেন, মোহন নাম নিয়ে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

মাথা নাড়লেন তুলসীবাবু, “এসেছিল। আমি তো একটা চিঠি লিখে প্রাণকেষ্টর হাত দিয়ে বড়দাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।”

“যে এসেছিল সে কি মোহন?”

তুলসীবাবু খাটের ওপর বসেছেন ততক্ষণে। ভদ্রলোকে অভ্যেস হল হাঁটু মুড়ে আসন করে বসা। সেইভাবেই বসেছেন। হাতে গামছা। ছোট। বোধ হয় ভিজে। পায়ের চেটো মোছাও তাঁর অভ্যাস। পা মুছতে মুছতে বললেন, “চোখে ভাল দেখি না। ঘরের বাতিটাও জোরালো নয়। যে-ছেলেটি এসেছিল তাকে দেখে ছোড়দা বলেই মনে হচ্ছিল। বুঝতে অসুবিধেই হয়। গালে দাড়ি রেখেছে। চোখে চশমা। ক' বছর পরে আচমকা দেখা। ছোঁড়া নেই জানি, হঠাৎ তাকে দেখবই বা কেমন করে? ভূত বলে চমকে উঠতে হয়। যথার্থ কথা বলতে কী–আমি এমনই হকচকিয়ে গিগেছিলাম যে, ভাল করে কিছু বুঝিনি।”

তারাপদ কিকিরার মুখের দিকে তাকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে তুলসীবাবুর দিকে। “আপনার ভাইঝিও তো দেখেছেন।” তারাপদ বলল।

“মায়া! হ্যাঁ, মায়াও দেখেছে।”

“উনি কী বললেন?”

“ও বলল, মোহন।”

“উনি চিনলেন?”

তুলসীবাবু বললেন, “এসেছিল আমার কাছে, আসা-যাওয়ার পথে মায়ার সঙ্গে দেখা। দেখেছে ঠিকই। তবে ভুল না ঠিক–আমি তো বলতে পারব না।”

তারাপদ ঘরের বাতিটা দেখছিল, সত্যিই বড় টিমটিমে, ষাট পাওয়ারের বা হবে বড়জোর। তার ওপর পুরনো। হলুদহলুদ দেখায়। বাইরের একফালি বারান্দায় যা আলো তা আরও কম। তুলসীবাবুর ভাইঝি ঠিক দেখেছে কি না কে জানে!

কিকিরা তুলসীবাবুকে দেখছিলেন। বললেন, “আপনার কি মনে হল, এখানে যে-লোকটি এসেছিল–সে মোহন হলেও হতে পারে?”

তুলসীবাবু যেন কিছু ভাবছিলেন; বললেন, “দেখুন, মরা মানুষ আর তো ফিরে আসে না। ছোড়দা ফিরে আসবে কে ভাবতে পারে! তবু ওরই মধ্যে যে-সময়টুকু ও ছিল–আমার মনে হচ্ছিল ছোড়দা হলেও হতে পারে।”

“কেন মনে হচ্ছিল?”

“কথা শুনে। আমাকে ওরা “কাকা বলে ডাকে। ছোড়দা বরাবর কাকাবাবু। বলত, বড়দা

"কাকা' বা "তুলসীকাকা বলে। দেখলাম ও আমাকে কাকাবাবুই বলছে। গলার স্বর আমি ঠিক বুঝিনি। ছেলেটি বড় কাশছিল। তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে গলা বসে গিয়েছে।"

কিকিরা বললেন, "মাত্র এই, না আর কিছু আছে?"

"আছে।" তুলসীবাবু মাথা হেলিয়ে বললেন, "ছোড়দা থাকতে প্রেসে যারা কাজকর্ম করত তাদের সকলের নাম বলল ছেলেটি। কে কোথায় কাজ করত তাও বলল। ওদের কথা জিজ্ঞেস করল। "

"তারা সবাই এখনো আছে প্রেসে?"

না। একজন নিজেই চলে গিয়ে একটা ছোট ছাপাখানা খুলেছে। আর-একজন মারা গেছে।"

"অন্য কথা কী বলল!"

"রং-এর কাজের জন্যে একটা সেকেণ্ডহ্যান্ড মেশিন কেনা হয়েছিল। ছোড়দা মারা যাওয়ার আগে সেটা চালু করা যাচ্ছিল না। সেই মেশিনের কথা জিজ্ঞেস করল। "

"সবই ছাপাখানার কথা?"

"বাড়ির কথাও বলছিল।"

"কী কথা?"

"ছোড়দার শখ ছিল পাখি পোর। বাড়িতে মস্ত খাঁচা ছিল দুটো। পাখি রাখত। তা ছাড়া, ওর ঘর–যে-ঘরে ও থাকত–তার কথাও বলল।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "ও কি এ-ঘরে বসেনি?"

"না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।"

"আপনি বসতে বলেননি?"

"না বোধ হয়। আমি তখন নিজের হুঁশে ছিলাম না। কী দেখছি, কী শুনছি ভাল করে বুঝতেই পারছিলাম না। বিশ্বাসও হচ্ছিল না।"

তুলসীবাবু যে রীতিমতন বিভ্রমে পড়েছিলেন, তাঁর কথা থেকে বোঝাই যাচ্ছিল।

কিকিরা বললেন, "মোহনের এমন কোনো চিহ্ন ছিল শরীরে, ধরুন মুখে, কপালে, গলায় বা অন্য কোথাও, যা চোখে দেখা যায়? আপনি কি সেরকম কিছু দেখেছিলেন?"

তুলসীবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "তখন এসব কথা মনে হয়নি। তবে মনে হচ্ছে, কপালের ডান পাশে বড় আঁচিলটা চোখে পড়েছিল। সঠিক করে কিছু বলতে পারব না মশাই।"

গামছাটা খাটের মাথায় রেখে দিলেন তুলসীবাবু। চোখের চশমার কাঁচ মুছলেন। ছানিকাটা চোখটার জন্য চশমার যে কাঁচ রয়েছে–সেটা যেমন মোটা তেমনই ঘোলাটে রঙের। চশমা

চোখে দিলেন উনি।

কিকিরা বললেন, "আপনি দত্তদের প্রেসে কতদিন কাজ করেছেন?"

আঙুল দিয়ে মাথার সাদা চুল গুছিয়ে নিতে-নিতে তুলসীবাবু বললেন, "আটত্রিশ বছর'।"

"আটত্রিশ...।"

"যখন ঢুকছিলাম তখন ছেলে-ছোকরা ছিলাম। যখন চলে এলাম তখন বুড়ো। আমি ছাপাখানায় ঢুকেছিলাম বিল-কেরানি হয়ে। হিসাবপত্র লিখতাম খাতায়, বিল তৈরি করতাম, আদায় দেখতাম। ওইভাবেই ধীরে-ধীরে ছাপখানায় কাজকর্মের অনেক কিছু শিখলাম। বড়বাবু বেঁচে থাকতেই আমি ছোট ম্যানেজার। তখন বড় ম্যানেজার ছিলেন শচীনবাবু।"

"বড়বাবু মানে রামকৃষ্ণ দত্ত?"

"হ্যাঁ। বড় ভাই রামকৃষ্ণ, ছোট ভাই শ্যামকৃষ্ণ।"

"রামকৃষ্ণ কেমন মানুষ ছিলেন?"

"খুব ভাল মানুষ। সদাশিব। শ্যামকৃষ্ণ ছিলেন কাজের মানুষ। তাঁর কথামতনই প্রেস চলত। কাজ বুঝতেন। বড়বাবুর ছিল নানা জায়গায় জানাশোনা। তাঁর খাতির ছিল। সেই খাতিরে আমরা বড় বড় কাজ ধরতাম। মোদ্দা কথাটা কি জানেন বাবু, ছাপাখানা শুরু করেন বড়বাবুর বাবা তখন যা ছিল, ছেলেদের হাতে পড়ে তার দশগুণ বেড়ে যায়।"

কিকিরা বললেন, "রামকৃষ্ণ যে মোহনকে পোষ্য নিয়েছিলেন এ-কথা নিশ্চয়ই জানেন?"

"সে আর জানব না!"

"ভাইয়ে-ভাইয়ে সদ্ভাব ছিল?"

"ভালই ছিল। ...তবে কী জানেন, নদীর ওপর দেখে তল বোঝা যায় না।"

"লোচনবাবু আর মোহনবাবুর মধ্যে...?"

কিকিরা তাকিয়ে থাকলেন তুলসীবাবুর মুখের দিকে। লক্ষ করছিলেন।

তুলসীবাবু বললেন, "এঁদের মধ্যেও ভাব ছিল। অন্তত বাইরের কথা বলতে পারি। ভেতরের কথা কেমন করে বলব? ...দুজনে দু ধাতের। বড়দা ব্যবসা বুঝতেন, ছোড়দা ছিল খামখেয়ালি।"

কিকিরা বুঝতে পারলেন, তুলসীবাবু ভেতরের কথা গোপন করতে চাইছেন। এসময় ওঁকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

কিকিরা বললেন, "মোহনকে আপনি পছন্দ করতেন না?"

"সে কি! মালিক বলে কথা। ছোটবাবু খানিকটা ছেলেমানুষ ছিলেন। তবে ভালমানুষ।"

কিকিরা আবার কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তা আপনি কী মনে করেন? মোহন নামে যে-লোকটি এসেছিল সে জাল জোচ্চোর? কোনো মতলব নিয়ে এসেছিল?”

তুলসীবাবু সঙ্গে-সঙ্গে কথার জবাব দিলেন না, পরে মাথা নেড়ে-নেড়ে বললেন, “মরা মানুষ কেমন করে ফিরে আসে?”

“তা হলে এই লোকটা জাল?”

তুলসীবাবু কিছুই বললেন না।

কিকিরাই আবার বললেন, “আপনার কি মনে হয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা এসেছিল? কিছু বলল সে?”

“না। সে আমায় একটা কথাই বারবার বলেছে। সে মোহন।”

কিকিরা কথা ঘোরালেন। বললেন, “আচ্ছা তুলসীবাবু, একটা কথা। মোহনের বয়েস হয়েছিল। সে যদি বছর পাঁচেক আগে মারা গিয়ে থাকে, তার বয়েস তখন তিরিশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। দত্ত-পরিবারে এতদিন পর্যন্ত কোনো ছেলে কি আইবুড়ো থাকে? মোহনের বিয়ে হয়নি কেন?”

তুলসীবাবু বললেন, “কথাবার্তা হচ্ছিল। বড়দার ঠিক পছন্দ মতন মেয়ে জুটছিল না।”

কিকিরা এবার একটু হাসলেন। ইশারা করলেন তারাপদকে। উঠতে বললেন। নিজেও উঠে পড়েছিলেন। বললেন, “দত্তদের ছাপাখানার আয় কেমন?”

তুলসীবাবু বলব কি বলব-না করে বললেন, “কাজ ভালই হয়। হালে বছর কয়েক খানিকটা মন্দা যাচ্ছে। আজকাল সব পালটে যাচ্ছে মশাই। ছাপাখানাও ভাল-ভাল হচ্ছে। তা যাই হোক, পুরনোর খানিকটা কদর তো থাকেই। আমার মনে হয়, বছরে লাখখানেক টাকার বেশি বই কম আয় ছিল না। ছাপাখানা থেকে।”

“আয় তবে মন্দ কী!..আচ্ছা, ছাপাখানার ওপর-ওপর ভ্যালুয়েশন কত হবে?”

তুলসীবাবু মাথা নাড়লেন। “আমি বলতে পারব না।”

“মোহনের অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তির মালিক তো লোচনবাবুরা?”

মাথা নোয়ালেন তুলসীবাবু। “হ্যাঁ।”

“মোহন না থাকলে ষোলোআনা লাভটা তবে লোচনবাবুর?”

তুলসীবাবু কিছু বললেন না।

কিকিরাও আর দাঁড়ালেন না ঘরে। তারাপদকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

.

০৬.

কয়েকটা দিন কিকিরা যে কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়ালেন তিনিই জানেন। সকাল-বিকেল দু'বেলাতেই তাঁর টহল চলছিল।

সেদিন তারাপদ আর চন্দন এল বিকেলের দিকে, এসে দেখল, কিকিরা নিজের মনে পেশেন্স খেলছেন। আসলে অভ্যাসবশে খেলছেন, মনে-মনে কিন্তু ভাবছেন কিছু। এটা তাঁর অভ্যাস। ওদের দেখে তাস গুটিয়ে নিলেন কিকিরা।

চন্দন বলল, "কী ব্যাপার, আপনি ঘরে বসে আছেন? রাউন্ডে যাননি? মানে রোদে?"

ঠাট্টা করেই কথাটা বলেছিল চন্দন। তারাপদর মুখে সে শুনেছে, কিকিরা যেন জাল মোহন ধরার জন্য খেপে গিয়েছেন। হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাইরে। তারাপদ দুদিন এসে, দেখা পায়নি তাঁর, অপেক্ষা করে করে ফিরে গিয়েছে।

কিকিরা বললেন, "না, আজ বেরোইনি; ঘাড়ে রদ্দা খেয়েছি। ব্যথা।"

চন্দন বলল, "মানে? লোচন দত্তর পালোয়ান আপনাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে।"

"না না," কিকিরা বললেন, "লোচন কেন হবে, এক বেটা ভূত। ট্রাম থেকে নেমেছি, কোত্থেকে একটা ভূত ছুটতে ছুটতে এসে ঘাড়ে পড়ল। তারপর হতভাগা লাফ মেরে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ে চলে গেল।"

"সে কী? আপনি তো ট্রামের চাকার তলায় চলে যেতেন স্যার?"

"নাইন্টি পার্সেন্ট চান্স ছিল। কিন্তু লেগ ব্রেক দিলাম...।"

"লেগ ব্রেক", চন্দন অবাক-অবাক মুখ করে বলল, "ওটা তো ক্রিকেটের ব্যাপার। আপনি কি ক্রিকেটও খেলেছেন? বোলার ছিলেন?"

মাথা নাড়তে কষ্ট হল কিকিরার, তবু সামান্য মাথা নেড়ে বললেন, "নো সান্ডাল উড, নো। সাহেবদের ওই রাবিশ খেলা আমি কখনো খেলিনি। ওর চেয়ে আমাদের গুপো ডাংগুলি অনেক ভাল। ...আমি আমার পায়ের কথা বলছিলাম। লেগটায় ব্রেক মেরে নিজেকে সামলে নিলাম। হাতে লাঠিও ছিল। "

চন্দন হাসতে-হাসতে বলল, "মাঝে-মাঝে আপনার লেগের ব্রেক ফেল করে যায়, এই যা দুঃখ! খানাখন্দে গিয়ে পড়েন।"

কিকিরা বললেন, "ভগবানের রাজ্যে সবই মাঝে-মাঝে ফেল করে হে। লেগও করে হার্টও করে।"

তারাপদ জোরে হেসে উঠল। চন্দনও হেসে ফেলল।

হাসি-তামাশা শেষ হলে তারাপদ বলল, "স্যার, আপনার কথামতন আমি লোচনবাবুর বন্ধু ভবানীর খোঁজ লাগিয়েছিলাম। ক্রিক রোয়ে আমাদের অফিসের বিশ্বাসদা থাকেন। সিনিয়ার

লোক। উনি বললেন, ভবানী একটা জুয়াড়ি। চারদিকে দেনা করে বেড়ায়। ওর কথার কোনো দাম নেই। লোচনকেও চেনেন বিশ্বাসদা। দুই বন্ধুতে খুব ভাব। ভবানী বোধ হয় টাকা ধার নেয় লোচনের কাছ থেকে।”

কিকিরা বললেন, “লোচনের পার্টি বলছ! তা হতে পারে।”

“মোহন নামের ভেজাল লোকটা ভবানীকে কেন ধরল বলুন তো?”

“বোধ হয় বন্ধুকে দিয়ে বলালে লোচন আরও তটস্থ হবে–এই জন্যে। আর কী হতে পারে।”

চন্দন বলল, “আপনি কোথায়-কোথায় ঘুরছিলেন? পেলেন কিছু?”

কিকিরা যে এর মধ্যে লোচনের কাছে বার দুই গিয়েছেন–ওরা জানত। দত্তদের প্রেসেও কিকিরা উঁকিঝুঁকি মেরেছেন। মোহনের ফোটোও পেয়েছেন লোচনের কাছ থেকে। এই খবরগুলো তারাপদর জানা ছিল। তারাপদর মুখ। থেকে চন্দনও শুনেছে।

কিকিরা বললেন, “দুটো কাজ করেছি। একটাও অবশ্য পুরোপুরি সারা হয়নি, তবু হয়েছে খানিকটা।”

“যেমন?”

“উকিল এবং নাটক-পাগলা মিহিরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কথাও হয়েছে অল্পস্বল্প। আগামীকাল আমায় যেতে বলেছেন বাড়িতে। ...কাল ওঁর ক্লাবের ছুটি। কোনো কাজ নেই।”

“দ্বিতীয়টা কী?”

“মোহনের সেই বন্ধুর খবর জোগাড় করেছি।”

তারাপদ বলল, “খবর পেয়েছেন?”

“হ্যাঁ। ওর নাম অমলেন্দু। অমলেন্দু গুপ্ত। ডাকনাম–সিতু। লোচন পুরো নামটা বলতে পারেনি। বা চায়নি। বারবার বলেছে, মোহনের ওই বন্ধুটি নতুন। সে ভাল করে চেনে না। সেবারই প্রথম তাদের সঙ্গে গিয়েছিল।”

“আপনি খবর জোগাড় করলেন কেমন করে?”

“ঘুরে-ঘুরে। মোহনের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে। অমলেন্দুর বাড়ির ঠিকানা ছিল দমদম চিড়িয়ামোড়। সেখানে সে একাই একটা ঘর ভাড়া করে থাকত। তার মা ছিল বর্ধমানের মানকরে। অমলেন্দু পেশায় ছিল ফোটোগ্রাফার। চাকরিবাকরি করত না। একটা দোকানে মাঝে-মাঝে বসত, আর নিজের ভোলা ছবি বিক্রি করত কাগজে, ম্যাগাজিনে। একা মানুষ, চলে যেত।”

চন্দন বলল, “তা সে দিল্লি চলে গেল কেন?”

“চাকরি পেয়েছিল। একটা ম্যাগাজিনে। ইংরিজি ম্যাগাজিন।”

“এখনো দিল্লিতে?”

কিকিরা মাথা নাড়লেন সাবধানে। “না, দিল্লিতে নেই।”

“কোথায় সে?”

“দিল্লির ঠিকানা যে বন্ধু জানত, সে বলল–মাস কয়েক আগেও অমলেন্দু দিল্লিতে ছিল। চিঠি পেয়েছে তার। তারপর চিঠিপত্র আর পায়নি। খবর নিয়ে জেনেছে দিল্লিতে সে নেই।”

বগলা চা নিয়ে এল।

তারাপদদের চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। বলল, পরে খাবার আনছে।

কিকিরা বললেন, “মোহনের খুবই বন্ধু ছিল অমলেন্দু। সকলেই বলল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, লোচন দত্ত এই ছোকরার কথা অনেক কিছু চেপে গেল কেন? অমলেন্দুর কথা সে ভালো করেই জানত। জানে। অথচ এমন ভাব করল লোচন, যেন সে ভাল করে চেনেই না অমলেন্দুকে।”

চন্দন বলল, “অমলেন্দু যে দিল্লি চলে গেল–এটা কি সত্যি-সত্যি চাকরি পেয়ে? না, সে সরে গেল?”

“মানে? কী বলতে চাইছ?”

“বলছি, লোচন কি তাকে সরাবার ব্যবস্থা করল? ..যদি করে থাকে, কেন করল?”

কিকিরা বললেন, “সেটাই তো কথা হে! মোহন মারা যাওয়ার পর একজন গেল চা বাগানে, আর-একজন দিল্লিতে। এই দুজনেই বড় সাক্ষী। লোচন না হয় নিজের শ্যালকটিকে সরাল, অমলেন্দুকে সরাল কেমন করে?”।

তারাপদ বলল, “স্যার, লোচন এ-সব করবে কেন? করতে পারে, যদি সে দোষী হয়!”

“তা তো ঠিকই।”

“আপনি তবে বলছেন লোচন দোষী?”

কিকিরা বললেন, “মুখে বললে তো হবে না, প্রমাণ চাই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, লোচনের মেজো শ্যালক কাজকর্ম তেমন কিছু করত না। লোচন তাকে নিজেদের বাড়ির কাজকর্মে খাটাত। তা শ্যালককে না হয় সে সরিয়ে দিল চা বাগানে। দিতেই পারে। শ্যালক তো তার ভগিনীপতির স্বার্থ দেখবে। কিন্তু অমলেন্দু? এটা আমি বুঝতে পারছি না। সে নিজেই চলে গেল কাজ পেয়ে? না, লোচন তাকে টাকাপয়সা দিয়ে বশ করল?”

চন্দন বলল, “তা আপনার পুরো হিসাবটাই হল, আপনি লোচনকে কালপ্রিট ভাবছেন?”

“হ্যাঁ।”

“যদি সে দোষী না হয়?”

"বলতে পারছি না। লোচনকে আমি সন্দেহ করছি। সে অনেক মিথ্যে কথা বলেছে। বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানটা লোচনই করেছিল।"

"কে বলল?"

"লোচন নিজেই বলেছে। প্রথমে সে অন্য কথা বলছিল। কথায়-কথায় স্বীকার করে ফেলল, বেড়াতে যাওয়ার কথাটা তার মাথাতেই এসেছিল।"

"জায়গাটাও কি সে বেছে নিয়েছিল?"

"না বোধ হয়। তবে, যেখানেই যাক, তার একটা মতলব থাকতে পারে। সে শুধু সুযোগ খুঁজছিল। কোনোরকমে একটা সুযোগ পেলে সেটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে।"

"আপনি স্যার, লোচনকে বড় বেশি সন্দেহ করছেন।"

কিকিরা মাথা হেলালেন। বললেন, "করছি, কারণ–মোহন মারা গেলে একমাত্র লোচনেরই লাভ। পুরো বিষয়-সম্পত্তি, ছাপাখানার মালিকানা তার। স্বার্থ তার। সন্দেহ তাকে ছাড়া অন্য কাকে করব?"।

চন্দন বলল, "কিন্তু যদি এমন হয়–এটা সত্যিই দুর্ঘটনা, মোহন অসাবধানে ছিল, পা হড়কে পড়ে গিয়েছে! নিত্যদিন কত অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে, আমরা তার কিছু খোঁজ তো রাখি। সাধারণ ব্যাপার, তবু অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেল।" বলে চন্দন একটু থামল, চা খেল দু চুমুক, তারপর হঠাৎ বলল, "এই যে আপনি ট্রামের চাকার তলায় চলে যাচ্ছিলেন, বরাতজোরে বেঁচে গেলেন, যদি বরাত একটু মন্দ হত–কী অবস্থা দাঁড়াত, স্যার?"

কিকিরা একটু হাসলেন। পকেটে হাত ডুবিয়ে বললেন, "আমার বাড়িতে কে বা কেউ একটা ফ্লাইং লেটার ফেলে গিয়েছে।"

"ফ্লাইং লেটার...!" তারাপদ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

"উড়ো চিঠি।" বলতে বলতে পকেট থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিলেন তারাপদর দিকে।

তারাপদ হাত বাড়িয়ে খামটা নিল। সাদা খাম। মুখ ছেঁড়া। খামের ওপর কোনো নাম লেখা নেই। খামের মধ্যে একটুকরো কাগজ। তারাপদ কাগজটা বের করল। পড়ল।

"জোরে-জোরে পড়ো।"

তারপদ পড়ল "দাদু, আর নয়। নিজের চরকায় তেল দিন। বাড়াবাড়ি করলে বিপদে পড়বেন। পড়া শেষ করে সে অবাক হয়ে বলল, "এ কী! এ-চিঠি কেমন করে এল? কে দিয়ে গেল?" বলতে বলতে চিঠিটা চন্দনের দিকে এগিয়ে দিল।

কিকিরা বললেন, "আমার ফ্ল্যাটের সদর দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গিয়েছে।"

"কে, কবে?"

"কে, তা জানি না। চিঠিটা গতকাল পাওয়া গেছে।"

চন্দন রলল, “এ তো মনে হচ্ছে পাড়ার মস্তান টাইপের ছেলের কাজ। দাদু–আপনাকে দাদু বলেছে।”

কিকিরা মাথার সাদা চুল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বললেন, “আদর করে বলেছে হে! একমাথা সাদা চুল। তা বলুক। কথাটা হল, আমি কার চরকায় তেল দিচ্ছি–এ-কথা সে জানে কেমন করে? লোচন ছাড়া অন্য যারা জানে তাদের মধ্যে রয়েছেন, অনিলবাবু, সতীশবাবু, প্রফুল্ল-ডাক্তার, তুলসীবাবু। ভবানীকে দেখিনি। আর মিহিরবাবুর সঙ্গে আমার এখনো সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়নি।”

তারাপদ বলল, “আপনার ঠিকানা এরা সবাই জানে?”

“লোচন জানে। আর কাউকে তো ঠিকানা বলিনি।”

“এ কি তবে লোচনের কাজ? সে কোনো ভাড়াটে লোক লাগিয়েছে!” তারাপদ ধাঁধায় পড়ে গেল। তাকাল চন্দনের দিকে। বলল, “ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত তো! লোচন নিজেই খবরের কাগজে নোটিস ছাপছে, জাল মোহনকে ধরে দিলে তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলছে, আবার সেই লোকই। কিকিরাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে। ব্যাপারটা কী! আমি তো কিছুই বুঝছি না।”

চন্দনও বুঝতে পারছিল না। বলল, “যে-লোকটা ট্রাম লাইনের কাছে আপনাকে ধাক্কা মেরেছিল–সে কি এইসবের মধ্যে আছে, কিকিরা?

কিকিরা বললেন, “বলতে পারছি না। লোকটাকে আমি দেখেছি। বাঙালি। তবে উটকো ধরনের। চেহারা দেখে গুণ্ডা বদমাশ মনে হয় না। আহাম্মক মনে হয়।”

“ও বাঙালি, আপনি কেমন করে বুঝলেন?”

“ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল। আমি সামলে নেওয়ার পর ও নিজেও সামলে নিল নিজেকে। তারপর “সরি’ বলে ছুটে গিয়ে ট্রামে উঠে পড়ল। “

“সরি কি বাংলা শব্দ, স্যার?”

“আজকাল সবাই সরি বলে। বাজারের মাছঅলারাও। ওর “ছরি’ বলা শুনে বাঙালি মনে হল।”

তারাপদ বলল, “ছেড়ে দিন বাঙালি-অবাঙালি! আদত কথাটা কী তাই বলুন? কী মনে হয় আপনার? এই উড়ো চিঠির মানে কী? লোচন কি আপনাকে নিয়ে খেলা করছে?”

কিকিরা কিছু বললেন না।

চন্দন বলল, “স্যার, আমার পরামর্শ হল–আপনি আর একলা-একলা খোঁড়া পা নিয়ে ঘোরাফেরা করবেন না। সঙ্গে আমাদের রাখবেন। তারাকে সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যাবেন না। নেভার।”

কিকিরা বললেন, “কাল একবার মিহিরবাবুর কাছে যাব। তারাপদকে সঙ্গে নিয়েই।”

০৭.

মিহিরবাবু মানুষটিকে দেখলে খোলামেলাই মনে হয়। চেহারাটি ভালই, কিন্তু মাথায় সামান্য খাটো, একটু নধর গোছের। মাথার চুল পাকেনি। সামান্য টাক পড়তে শুরু হয়েছে। গোলগাল মুখ। চোখে চশমা। পান-জদা-সিগারেট–কোনোটাই বাদ যায় না। কথা বলেন অনর্গল। তবে তারই মধ্যে যা নজর করার করে নিতে পারেন। বাইরে বোঝা যায় না; ভেতরে তিনি কিন্তু বুদ্ধিমান এবং চতুর। গায়ে পাতলা একটা চাদর মতন থাকে। কাটা হাতটাকে ঢেকে রাখেন।

কিকিরা আর তারাপদকে তিনি খানিকটা বাজিয়ে নিলেন প্রথমে। কিকিরাও কম যান না। কথা বলার ভঙ্গিতে তিনি মিহিরবাবুকে হাসিয়ে ছাড়লেন। দু-একটা খুচরো ম্যাজিক দেখিয়ে দিলেন সামনে বসে। লাইটার উড়িয়ে দিলেন টেবিল থেকে, আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। মিহিরবাবুর লাইটারের শখ রয়েছে। দু-দুটো লাইটার সামনেই পড়ে ছিল। সিগারেটের প্যাকেটও।

মিহিরবাবু যে-ঘরে বসে ছিলেন, সেটি তাঁর নিজস্ব বৈঠকখানা। সাজানো-গোছানো। দেওয়ালে ‘ইভনিং ক্লাবে’র নাটকের ফোটো, একপাশে দুটো কাপ। শিশির ভাদুড়ীর বড় ছবি একটা। বইয়ের আলমারিতে ঠাসা বই আর বাঁধানো মাসিক পত্রিকা। আইনের বই একটাও নেই।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মিহিরবাবু পান বিলি করলেন কিকিরাদের। নিজেও পান-জদা মুখে পুরে এবার কাজের কথা পাড়লেন। বললেন, “তা মশাই, আপনি তো ম্যাজিক-মাস্টার। হঠাৎ এই গোয়েন্দাগিরিতে নামলেন কেন?”

কিকিরা অমায়িক হাসি হেসে বললেন, “ইচ্ছে করে নামিনি, স্যার। এই যে আমার লেজুড়টিকে দেখছেন, এর পাল্লায় পড়ে হেভেন থেকে ফল করতে হয়েছে।”

“ফল?”

“আজ্ঞে, ফ্রম ম্যাজিক টু গোয়েন্দা। জাদুবিদ্যা থেকে পাতি গোয়েন্দাগিরিতে পড়ে যেতে হল।”

মিহিরবাবু হেসে উঠলেন। “আচ্ছা। ফল ফ্রম ম্যাজিক। ..তা আমাদের ক্লাবের যে শো হচ্ছে–পুজোর পর। কালীপুজোতে। তাতে একটু খেলা দেখান না। ক্লাসিকাল ম্যাজিক। ধরুন ঘন্টাখানেক। বেশ জমে যাবে।”

কিকিরা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, “আমি আর খেলা দেখাই না। বাঁ হাতটা কমজোরি হয়ে গেছে। সুইফটনেস নেই। অন্য কাউকে ব্যবস্থা করে দেব, আপনি ভাববেন না।“

নিজেদের ক্লাবের খানিকটা গুণগান গেয়ে মিহিরবাবু বললেন, “আসবেন একদিন ক্লাবে। সোমবার বাদে। কাছেই আমাদের ইভনিং ক্লাব, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গায়েই।”

মিহিরবাবু এবার আসল কথা পাড়লেন। বললেন, “কাজের কথা শুরু করা যাক কিঙ্করবাবু। বলুন, আমি কী করতে পারি?”

কিকিরা হেসে বললেন, "স্যার, আমায় বাবুটাবু বলবেন না। স্রেফ কিকিরা।"

"অতি উত্তম। তাই হবে।"

"আপনার কাছে আমি কেন এসেছি, আগেই আপনাকে জানিয়েছি। লোচনবাবুর নোটিস, তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কার–সবই বলেছি...।"

"হ্যাঁ, কাগজে আমি দেখেছি।"

"নোটিসের বয়ানটা কি আপনি করে দিয়েছিলেন?"

"না। মনে হয় অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছে, নিজেও করতে পারে।"

"লোচনবাবু আপনার কাছে এর মধ্যে ক'বার এসেছেন?"

মিহিরবাবু পান চিবোতে-চিবোতে বললেন, "নিজে একবারও নয়ন আমিই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তখনই এসেছিল; তারপর আর নয়।

"মোহনের কথা বলতে ডেকে পাঠিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। চিঠি দেখালাম।"

তারাপদ চুপ করে বসে কথা শুনছিল। হঠাৎ বলল, "মোহনবাবু কেমন লোক?"

মিহিরবাবু পিঠ সামান্য সোজা করে বসলেন। বললেন, "খাসা ছেলে। চমৎকার। অতি চমৎকার। ভদ্র, বিনয়ী, হাসিখুশি। আমার ইভনিং ক্লাবের একজন ইম্পট্যান্ট মেম্বার। আমার এক চেলা। আমাদের রিলেশানটা ছিল বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মতন; যদিও সম্পর্কে খুড়ো-ভাইপো। ও আমাদের অনেক কাজ করত। থিয়েটারের আগে স্টেজ ভাড়া, সেট সেটিংয়ের ব্যবস্থা, সুভেনির ছাপা–অনেক কাজ রে ভাই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ।"

"নিজে কি অভিনয় করত?"

"না। একবার মাত্র করেছে," বলে দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখালেন। বললেন, "আমরা জুবিলি ইয়ারে একটা ড্রামা করেছিলাম। ডিটেকশান স্টোরি। গোয়েন্দা গল্পের নাটক। ইংরিজি নাটক থেকে গল্পটা নিয়েছিলাম। আমিই লিখেছিলাম নাটকটা। নাম ছিল "বিষের ধোঁয়া'। শরদিন্দু বাঁড়ুজ্যের একটা নভেল আছে ওই নামে। সেটা নয়। নামেই যা মিল। নাথিং এলস।...ইয়ে, কী বলছিলাম–সেই নাটকে মোহনকে দিয়ে জোর করে একটা পার্ট করিয়ে দিলাম। সামান্য পার্ট। যাও না ভাই, দেওয়ালে টাঙানো ছবিটা দেখো। গ্রুপ ফোটো।"

তারাপদ উঠে গেল ফোটো দেখতে। কিকিরার কাছে সে মোহনের ফোটো দেখেছে। সামান্য কৌতূহল হচ্ছিল অভিনেতা মোহনকে দেখতে।

কিকিরা কথা বলছিলেন মিহিরবাবুর সঙ্গে। বললেন, "ঘটনাটা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?"

মিহিরবাবু চুপ করে থাকলেন প্রথমে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। সামনের দিকে ঝুঁকে

পড়লেন খানিকটা। পরে বললেন, "দেখুন কিকিরামশাই, দত্ত-ফ্যামিলি আমাদের প্রতিবেশী। তিন-চারপুরুষ ধরে একই পাড়ায় আছি। খানিকটা তো ওদের কথা জানি। একসময় দত্তরা বেশ ধনী ছিল। পরে অবস্থা খানিকটা পড়ে যায়। রামকৃষ্ণদা আর শ্যামকৃষ্ণদা ছাপাখানার ব্যবসাটাকে বাড়িয়ে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল। একেবারে যে আনসাকসেসফুল, হয়েছিল তাও নয়। পরে যে কী হয়েছিল আমি বলতে পারব না, তবে রামদা শ্যামদা মারা যাওয়ার পর থেকেই ব্যবসা পড়ে যাচ্ছিল। শুনেছি, লোচন বিস্তর দেনা করেছে। ছাপাখানার মেশিনপত্রও সে বেচে দিয়েছে দু-একটা। ...ওদের ভেতরকার ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে যাইনি। আমার এক পুরনো মক্কেলের কাছে জানতে পারলাম, লোচন বেনামে জমি কিনেছে বেহালায়, সেখানে নাকি একটা সিনেমা হাউসও করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে।"

"লোচনবাবুর কি অনেক দেনা?"

"বলতে পারব না। খানিকটা দেনা তো আছেই।"

"সম্পত্তির ভাগীদার কি দুই ভাই?"

"হ্যাঁ। সমান-সমান।"

"মোহন তো পোষ্যপুত্র?"

"তা হোক। রামকৃষ্ণদা তাঁর স্বোপার্জিত সমস্ত কিছু মোহনকে দিয়ে গিয়েছেন।"

"আপনি জানেন?"

"জানি। ...আরও জানি, লোচন তাদের পৈতৃক বাড়ির সামনের জমিটুকু বেচে দেওয়ার জন্যে হালাল লাগিয়েছে।"

"কবে থেকে?"

"হালে।"

কিকিরা বললেন, "মোহনের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?"

মিহিরবাবু মাথা নাড়লেন। যেন বলতে চাইলেন, তিনি আর কী বলবেন?

"মোহন মারা গিয়েছে?" কিকিরা বললেন।

"তাই শুনেছি।"

"আপনি কি নিশ্চিত?"

"অফিসিয়ালি মৃত বলতে পারেন।"

"তবে এই লোকটা কে? এই যে ফোন করছে, চিঠি লিখছে, তুলসীবাবুর সঙ্গে দেখা করছে, এ কে?"

মিহিরবাবু কিছু বললেন না।

তারাপদ ডাকল, “একবার এদিকে আসবেন, স্যার?”

কিকিরা উঠে গেলেন।

তারাপদ বলল, “বিষের ধোঁয়া’ নাটকের গ্রুপ ফোটো। মোহনকে চিনতে পারেন? আমি তো পারলাম না।”

কিকিরা দেখলেন। নাটক শেষ হওয়ার পর পাত্রপাত্রীরা যে-যেমন সাজ পরেছিল, মেক-আপ নিয়েছিল—সেই পোশাক আর বেশবাস নিয়েই ফোটোটা তোলা। কিকিরা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন। চিনতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত এক দাড়িওয়ালা বুড়োটে গোছের লোক দেখে তাঁর সন্দেহ হল। কাঁধে কাপড়ের মস্ত ঝোলা নিয়ে যারা পাড়ায় পাড়ায় পুরনো খবরের কাগজ কিনে বেড়ায়—অবিকল সেই বেশ। মাথায় গামছা বাঁধা। অর্ধেকটা কপাল ঢাকা পড়েছে গামছায়।

কিকিরা বললেন, “এই কাগজঅলা।” বলে মিহিরবাবুর দিকে তাকালেন ঘুরে গিয়ে। “এই কাগজঅলা মোহন? বেশ মেক-আপ নিয়েছে তো?

মিহিরবাবু হাসছিলেন। মাথা নাড়লেন। বললেন, “না।আপনি ভুল করলেন। ম্যাজিক চলল না মশাই। ওই ফোটোর মধ্যে একজনকে দেখুন-ক্লাউন সেজে দাঁড়িয়ে আছে। ও-ই মোহন। ...ওকে দিয়ে সার্কাসের ক্লাউনের ছোট্ট পার্ট করিয়েছিলাম।”

কিকিরা আবার ছবি দেখলেন, বাঃ বললেন। “চেনা যায় না। ঠকে গেলাম।” বলে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। বসলেন। বললেন, “এই জাল মোহনের আবিভাব কেন স্যার বলতে পারেন?”

মিহিরবাবু হেসে বললেন, “গোয়েন্দা আপনি। আমি কী বলব?”

কিকিরা একদৃষ্টে মিহিরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, বোধ হয় লক্ষ করছিলেন কিছু। শেষে বললেন, “আমারও ধারণা মোহন মারা গিয়েছে। কিন্তু সে বোধ হয় পা পিছলে পড়ে যায়নি, তাকে পাহাড়ের বিশ্রী জায়গা থেকে ঝরনার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জলের স্রোতের সঙ্গে মোহন নিচে গড়িয়ে গিয়েছে।”

মিহিরবাবু কোনো কথা বললেন না। শুনলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল।

কিকিরা নিজেই বললেন, “এ কাজ লোচন ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না।

“কেন?”

“মোহন যখন পড়ে যায় তখন তার পাশে লোচন ছাড়া কেউ ছিল না। অন্য দু’জন—লোচনের মেজো শ্যালক আর মোহনের বন্ধু খানিকটা পেছনে ছিল। ঝোঁপঝাড় পাথরের আড়ালও থাকতে পারে। তারা কিছু দেখতে পায়নি।”

কিকিরার কথা শেষ হওয়ার আগেই মিহিরবাবু বললেন, “আপনার অনুমান ঠিক হতে পারে। তবে আইন অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য করে না। প্রমাণ কী যে, লোচন তার ছোট ভাইকে ঝরনার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।”

কিকিরা স্বীকার করে নিলেন, প্রমাণ কিন্তু নেই।

মিহিরবাবু বললেন, “প্রমাণ ছাড়া কাউকে খুনি হিসাবে ধরা যায় না। প্রমাণটাই আসল। লোচন যে খুনি একথা আপনি প্রমাণ করবেন কেমন করে?” বলে একটু থেমে আবার বললেন, “নিজের সব কাজ লোচন পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়েছে। দেহাতি ডাক্তারের সার্টিফিকেট, আইডেনটিফিকেশন, থানা–সবই সে গুছিয়ে সেরে রেখেছে। এখন আপনি কেমন করে লোচনকে খুনি বলে সাবাস্ত করবেন?”

কিকিরা মাথার চুল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বললেন, “পারছি কোথায়? পারছি না স্যার। এই জিনিসটাও আমার খুব অবাক লাগছে। চার-পাঁচ বছর পরে হঠাৎ জাল মোহনের আবিভাবই কেন ঘটল। কে ঘটাল? লোচন এত ভয়ই বা পেয়ে গেল কেন যে, ত্রিশ হাজার টাকা ঘর থেকে বের করে দিতে রাজি হল?”

মিহিরবাবু বললেন, “লোচন ভেবেচিন্তে কাজ করে, বোকা নয়।”

“সেটা বোঝা যাচ্ছে। আসলে লোচন চাইছে এই জাল মোহনের রহস্যটা উদ্ধার করতে।

“মানে সে বুঝতে পেরেছে, এমন কেউ তার সঙ্গে শত্রুতা করছে, যে আসল ঘটনাটা জানে। এই লোকটাকে সে ধরতে চায়।”

“আসল ঘটনা জানতে পারে মাত্র দু’জন। লোচনের মেজো শ্যালক, আর মোহনের বন্ধু। তাদের কাউকেই তো পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে লোচনের মেজো শ্যালক ভগ্নীপতির দলে বলে মনে হয়। আর মোহনের বন্ধুর তো কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।”

“আপনি খোঁজ করেছেন?”

“অনেক। নামটা জানতে পেরেছি। তার দেশ গ্রামের কথাও জানতে পেরেছি। সে দিল্লিতে ছিল তাও ঠিক। তারপর আর কিছু পারিনি।”

মিহিরবাবুর সামনে জলের গ্লাস ছিল। গ্লাসের ঢাকা সরিয়ে জল খেলেন। বললেন পরে, “কী নাম তার?”

“অমলেন্দু..”

“তার কোনো ফোটো দেখেছেন?”

“না।”

“দেখতে চান?...ওই গ্রুপ ফোটোটার কাছেই যান, আবার বিষের ধোঁয়া। মাঝখানে একজনকে দেখবেন, শিকারির পোশাক পরা, হাতে বন্দুক। ভাল চেহারা। ওই হল অমল– অমলেন্দু। মোহনের বন্ধু।”

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, “মোহনের বন্ধুও নাটক করত?”

“করত কী মশাই! ভাল করত। গুড অ্যাক্টর। গলা ভাল, ভয়েস পালটাতে পারত অদ্ভুতভাবে। ওকে যে-কোনো মেক-আপে মানিয়ে যেত।:যান, গিয়ে দেখে আসুন ছবিটা।”

কিকিরা উঠলেন। তারাপদ তখনও ফিরে এসে বসেনি। ছবি দেখছে, ঘর দেখছিল।

দু'জনেই যখন দেওয়ালে টাঙানো বিষের ধোঁয়ার গ্রুপ ফোটো দেখছে, মিহিরবাবু আচমকা বললেন, "আপনারা ওই ফোটোর মানুষটাকে দেখে নিন। তারপর আসল মানুষটাকে যদি একদিন দেখতে পান, অবাক হবেন না।"

কিকিরা আর তারাপদ ঘাড় ঘোরাল। দেখল, মিহিরবাবু চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। মুখের সেই হাসি নেই, সহজ ভাবটাও দেখা যাচ্ছে না। কেমন যেন গম্ভীর, শক্ত মুখ।

০৮.

বাড়ি ফিরে চন্দনকে পাওয়া গেল। সে অপেক্ষা করছিল।

সামান্য রাত হয়েছে।

কিকিরা বললেন, "বোসো, একেবারে খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরো।"

পোশাক পালটে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলেন কিকিরারা। চন্দন বলল, "কী সার? কতটা এগুলো?" চন্দনের বলার মধ্যে একটু ঠাট্টার ভাব ছিল।

কিকিরা প্রথমে জবাব দিলেন না। পরে বললেন, "অমলেন্দু!"

"কে অমলেন্দু? মোহনের বন্ধু?"

"হ্যাঁ। মোহনের বন্ধু।" বলে তারাপদর দিকে তাকালেন কিকিরা।

"তারাপদ, তুমি এতদিনে এমন একজনকে দেখলে–যিনি অনেক কিছুর খোঁজ রাখেন। মিহিরবাবুর কথা বলছি। পাকা লোক। উনি কিন্তু জানেন এই অমলেন্দু ছোকরা কোথায় আছে। ..তারাপদ, মিহিরবাবুর মতলবটা কী?"

তারাপদ মাথা নাড়ল। "বুঝতে পারছি না।"

চুপচাপ। কথা বলল না কেউ কিছুক্ষণ। শেষে চন্দন বলল, "অমলেন্দু তা হলে এখন কলকাতায়?"

কিকিরা বললেন, "তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অমলেন্দু "শুধু কলকাতায় নেই, এই ঘটনাগুলো সেই ঘটাচ্ছে।"

"আপনি ফোনের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ, সে ফোন করছে। তুলসীবাবুর কাছে সে-ই গিয়েছিল। মিহিরবাবুর কথা থেকে বোঝা গেল, ও শুধু ভাল অভিনেতা নয়, ভাল মেক-আপ নিতে, গলার স্বর পালটাতেও পারে।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "আর-একটা জিনিস লক্ষ করেছেন? জাল মোহন ফোন করেছে চার জায়গায়, নিজে গিয়ে হাজির হয়েছে এক জায়গায়, আর চিঠি লিখেছে মাত্র এক জায়গায়– ওই মিহিরবাবুর কাছে। কেন? ফোনে গলা শোনা যায় চোখে দেখা যায় না। জাল মোহন এমনই একজনের কাছে সশরীরে দেখা দিয়েছিল, যে প্রায় অন্ধ। ছানিকাটানো চোখ। তাও দেখা দিয়েছিল সন্ধেবেলায়, টিমটিমে আলোর মধ্যে। আর চিঠি লিখেছে ওই মিহিরবাবুর কাছে। শুধুমাত্র তাঁকেই চিঠি লিখতে গেল কেন?"

চন্দন খেতে-খেতে বলল, "তোরা চিঠি দেখতে চাসনি?"

"না। দেখতে চেয়ে লাভই বা কী হত? আমরা তো হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট নই। তা ছাড়া মোহনের আগের হাতের খেলাও চিনি না। সেই লেখা পাব কোথায়? তার চেয়ে লোচনের কথাই স্বীকার করে নেওয়া ভাল। লোচন বলেছে, দেখতে তো একইরকম। মিহিরবাবু ওকে

চিঠি দেখিয়েছেন।”

চন্দন যেন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। মিহিরবাবুর কাছে এই জাল মোহনের হাতের লেখা দেখে লোচন স্বীকার করে নিয়েছে লেখাটা মোহনের বলেই মনে হচ্ছে। আশ্চর্য কাণ্ড! এখানে তারাপদরা আর কী করতে পারে নতুন করে?

কিকিরা বললেন, “চাঁদু, এখন আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে মিহিরবাবু এর মধ্যে আছেন। তিনি কোনো প্যাঁচ খেলছেন।”

“কেমন?”

“কেমন!..তুমি পুতুলনাচ দেখেছ! একটা লোক পরদার আড়াল থেকে লুকিয়ে পুতুল খেলা দেখায়? দেখেছ নিশ্চয়। মিহিরবাবু বোধ হয় সেই লোক। তিনিই নাচাচ্ছেন জাল মোহনকে।”

“মিহিরবাবুর স্বার্থ?”

মাথা নাড়লেন কিকিরা। “বুঝতে পারছি না। লোচন আর মোহনের মধ্যে মিহিরবাবু কেন? তাঁর কিসের স্বার্থ? তিনি তো তৃতীয় ব্যক্তি।”

তারাপদ বলল, “মোহনকে উনি খুবই ভালবাসতেন।”

চন্দন বলল, “মিহিরবাবু মানুষটি কেমন? মানে আসল চেহারাটি কেমন?”

“খারাপ বলে তো মনে হল না,” কিকিরা বললেন খেতে-খেতে, “গুড ম্যান। নাটক-পাগল। কথাবার্তায় মাই ডিয়ার। মানুষটিকে ভালই লাগে। তা ছাড়া বড় ফ্যামিলির ছেলে। নিজেরাও বেশ সচ্ছল। পড়াশোনা করা মানুষ। ওঁর নিজের কোনো স্বার্থ থাকার কথা নয়।”

“তবে?”

“সেটাই বুঝতে পারছি না।”

তারাপদ হঠাৎ বলল, “মোহনের হয়ে উনি লড়ছেন না তো?”

“মানে?”

“আমি বলছিলাম, মোহনের পক্ষ নিয়ে উনি লড়ছেন না তো?

চন্দন বলল, “উকিলরা বরাবরই তাদের মক্কেলের পক্ষ নিয়ে লড়ে। কিন্তু এখানে মক্কেল কই? সে তো মারা গিয়েছে। মরা মানুষের পক্ষ নিয়ে লড়া। তাতে লাভ। মোহনের হয়ে যদি কেউ মিহিরবাবুকে লড়াতে চায় অন্য কথা। তেমন কেউ নেই। মোহনের স্ত্রী নয়, নিজের কেউ নয়..”।

কিকিরা হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, “তারাপদ, তুমি একটা জিনিস লক্ষ করেছ। মিহিরবাবু বারবার বলছিলেন, যদি ধরে নেওয়া যায় লোচনই খুনি–তবে তা প্রমাণ করা যাবে কেমন করে?...ওঁর কথা থেকে মনে হচ্ছিল, লোচনকে উনি পুরোপুরি সন্দেহ করলেও এমন কোনো প্রমাণ দেখতে পাচ্ছেন না-যা দিয়ে বলা যায়, লোচন খুনি।” খাওয়া শেষ হয়ে

গিয়েছিল কিকিরার। উঠে পড়লেন। বাইরে গেলেন হাত-মুখ ধুতে।

তারাপদ বলল, "চাঁদু, কেসটা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মিহিরবাবু জটটাকে আরও পাকিয়ে দিলেন।"

চন্দন বলল, "ওই অমলেন্দুকে ট্রেস করতে পারিস না? খোঁজ লাগা।"

"আমি পারব না। কোথায় খোঁজ করব?"

"চেষ্টা কর।"

তারাপদ কিছু বলল না। একাজ তার পক্ষে অসম্ভব। কোথায় খোঁজ করবে অমলেন্দুর?

কিকিরা হাত মুছতে মুছতে ফিরে এলেন। বললেন, "মিহিরবাবুই এখন এক নম্বর হল তারাপদ। ভদ্রলোকের ওপর নজর রাখা দরকার। উনিই যে কলকাঠি নাড়ছেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই। তবে কী উদ্দেশ্য, তা বুঝতে পারছি না।" বলেই কিকিরা কী ভেবে বললেন, "ইভনিং ক্লাবটা কোথায় যেন? ওই পাড়াতেই না!"

তারাপদ বলল, "হ্যাঁ। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছেই। "

"ওদের বোধ হয় রোজই রিহার্সাল হয়। সোমবার বাদে। আজ সোমবার ছিল। মিহিরবাবুর ছুটি। কাল থেকে দু-তিনদিন ইভনিং ক্লাবের ওপর নজরদারি লাগাও তো!"

"তাতে লাভ কী হবে?"

"কিছুই নয়। যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই বুঝলে কিনা! কে বলতে পারে, অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল..."

"আপনি কি পাগল? অমলেন্দু যাবে ইভনিং ক্লাবে?"

"যেতেও তো পারে। ধরো রাত্তিবেলায় দাড়ি, চশমা লাগিয়ে গা ঢাকা দিয়ে মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল?"

"সে তো বাড়িতেও যেতে পারে।"

"তা পারে। তবে আমার সামনে মনে হয়, বাড়ির চেয়ে ইভনিং ক্লাব সেফ।"

"কী বলছেন স্যার? অত লোকের মধ্যে..."

"না, অত লোক নয়। রিহার্সাল ভাঙার পর–সবাই যখন চলে যায়, মিহিরবাবু বাড়ি ফেরেন, তখন যদি দেখা হয়?"

চন্দন বলল, "আপনি বাঁকাপথে নাক দেখাচ্ছেন। অমলেন্দুর সঙ্গে মিহিরবাবু ওভাবে যোগাযোগ করেন বলে আমারও মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে, কাল একবার আমি আর তারা ইভনিং ক্লাবের দিকে ঘোরাফেরা করে আসব। আপনি বরং মিহিরবাবুকে আরও একটু জোন।"

ঘাড় হেলালেন কিকিরা। "জপাব। তবে দু-একটা দিন পরে। ওঁর একটা জিনিস আমি নিয়ে এসেছি, ফেরত দিতে যাব।"

"কী জিনিস?"

"ওঁর টেবিলের ওপর থেকে লাইটারটা নিয়ে চলে এসেছি। জাপানি লাইটার। ভেরি স্মল অ্যান্ড বিউটিফুল!" বলে কিকিরা হাসলেন।

চন্দন বলল, "নিয়ে এসেছেন মানে হাত সাফাই করেছেন?"

"ম্যাজিশিয়ানস হ্যাণ্ড!"

"আপনাকে চোর বলবে স্যার।"

"বলবে না। আমি আসল ফেরত দেব, তার সঙ্গে সুদ। মানে আরও একটা লাইটার, ভাল লাইটার হে, বেলজিয়ান, লাইটার জ্বললেই তার গায়ের রং খেলা করবে। নিভিয়ে দিলেই আবার যে কে সেই। কে, পি, সাহার দোকানে পাওয়া যায়। প্রায় দু'শো টাকা দাম। মিহিরবাবুকে প্রেজেন্ট করব। বলব স্যার, এ গিফট ফ্রম কিকিরা দ্য গ্রেট ম্যাজিশিয়ান।" বলে কিকিরা হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসির গুঢ় অর্থটা বোঝা গেল না।

.

০৯.

ইভনিং ক্লাবের ওপর দিন দুই নজর রাখার চেষ্টা করল তারাপদরা। পার্কের গায়েই বাড়ি। পুরনো আমলের। ভাঙা ফটক, বিশ-ত্রিশ হাত মাঠ, দু-চারটে মামুলি ফুলগাছ, সিঁড়ি–তারই এপাশে-ওপাশে নানান কারবার। কোথাও ফ্রিজ মেরামতি হয়, কোথাও বাঁধাইখানা, একপাশে এক ছোট ছাপাখানা, মায় সাইনবোর্ড লেখার দোকানও। ছাপোষা ভাড়াটেও আছে। ওই বাড়ির ভেতরে কোথায় কী আছে বোঝা অসম্ভব। বাড়িও বড়। দোতলা। দোতলার একপাশে হলঘরের মতন ঘরে ইভনিং ক্লাবের আসর। অন্যপাশে এক সিনেমা কোম্পানির অফিস। পেছন দিকে হয়ত ভাড়াটে, গুদাম সবই আছে।

তারাপদ দোতলায় যায়নি, নিচে ছিল। চন্দন গিয়ে দেখে এল ওপরটা। এসে বলল, "এ বাড়িতে কাউকে খুঁজে বের করা কঠিন। হরদম লোক আসছে-যাচ্ছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে সন্ধের পর লোকের আসা-যাওয়া কম। কাজ কারবারের জায়গাগুলো তখন বন্ধ হয়ে যায়। প্রেসটা খোলা থাকে রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত।

বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি না করে বাড়িটার মুখোমুখি পার্কে বসেই প্রথম দিন নজর রাখল তারাপদরা। কোনো লাভ হল না। বোঝাই যায় না, কারা ইভনিং ক্লাবে রিহার্সাল দিতে আসছে। তবে দোতলা থেকে ক্লাব ঘরের হল্লা মাঝে-মাঝে পার্ক পর্যন্ত ভেসে আসছিল।

প্রথম দিন মিহিরবাবু বেরোলেন পৌনে ন'টা নাগাদ। সঙ্গে আরও তিন-চারজন লোক। মিহিরবাবুর শাগরেদ। ক্লাবের লোক। খানিকটা গল্পগুজব সেরে মিহিরবাবু রিকশায় উঠলেন। দ্বিতীয় দিনে মিহিরবাবুর বেরোতে-বেরোতে নটা।

চন্দন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। বলল, "দুর, এ হয় নাকি? রোজ এ ভাবে পার্কে এসে বসে থাকা যায়?"।

তারাপদ গা এলিয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। ঠাট্টা করে বলল, "পার্কে লোকে হাওয়া খেতেই আসে। কত লোক বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বসে আছে দেখছিস না! আমরা তো লেটে আসি।"

চন্দন বলল, "পার্কে বসে হাওয়া খায় বুড়োরা, আর নিষ্কর্মারা। আমি নিষ্কর্মা নই। "

তারাপদ বলল, "কী করবি বল। কিকিরার খেয়াল। আর-একটা দিন দেখে নিই; তারপর আর নয়।"

তৃতীয় দিনে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল।

মিহিরবাবু যথারীতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে দু'জন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। ঘড়িতে তখন ন'টা বাজতে চলেছে। হঠাৎ একটা মোটরবাইক এসে থামল। থামামাত্র বিকট এক শব্দ। তারপর চোখের পলকে মোটর বাইক হাওয়া। খানিকটা ধোঁয়া। কেমন এক গন্ধ।

চন্দন আর তারাপদ ছুটল।

মিহিরবাবু তাঁর দুই সঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে। খানিকটা সরে গিয়েছেন।

তারাপদ দেখল, মিহিরবাবু আর তাঁর সঙ্গীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ধর্মতলা স্ট্রিটের দিকে তাকিয়ে আছেন। মোটরবাইকটা ওদিকেই পালিয়েছে।

মিহিরবাবু চোখ ফেরাতেই তারাপদকে দেখতে পেলেন।

তারাপদ বলল, "ব্যাপার কী? আপনার কোথাও লাগেনি তো?"

মিহিরবাবু তারাপদকে দেখলেন। চিনতে পারলেন। অবাকও হলেন, "তুমি এখানে?"

তারাপদ বলল, "আমরা এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। আমার বন্ধু চন্দন। ডাক্তার।"

"ও!" বলে মিহিরবাবু তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকালেন, "তাপস, কাল তুমি কোঠারিবাবুকে বলে দেবে, তাদের ঝগড়া তারা হয় ঘরে বসে, না হয় মাঠে গিয়ে মিটিয়ে আসুক। এভাবে বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি করে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল করলে ভাল হবে না। এটা পাঁচজনের রুজি-রোজগারের জায়গা। যখন-তখন দুমদাম এখানে চলবে না। আমি কিন্তু থানায় খবর দিয়ে দুটোকেই ধরিয়ে দেব।"

তারাপদ কিছুই বুঝল না।

মিহিরবাবুর এক সঙ্গী রিকশা ডাকতে কয়েক পা এগিয়ে গেল। অন্য সঙ্গী বলল, "মিহিরদা, কাল আমি আসতে পারব না। বাগনান যেতে হবে। মাকে নিয়ে। ছোট মামার অসুখ।"

"ঠিক আছে। কাল তোমার জায়গায় প্রক্সি চালিয়ে দেব। কী হয়েছে মামার?"

"হার্ট প্রবলেম?"

"কত বয়েস?"

"সিক্সটি ফাইভ।"।

"ঠিক আছে, তুমি দু-একদিন না আসতে পারো। তুমি না হয় এখন যাও।"

"সুকুমার আসুক।"

"রিকশা ওই তো একটা আসছে। ডাকো সুকুমারকে।" উলটো দিক থেকে একটা রিকশা আসছিল।

সুকুমারকে ডাকতে হল না, অন্য একটা রিকশা নিয়েই সে আসছিল।

মিহিরবাবু সামান্য অপেক্ষা করলেন।

সুকুমার সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "তোমরা তবে যাও। আমি এদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।"

সুকুমার চলে গেল।

রিকশা থাকল দাঁড়িয়ে, চেনা রিকশা বোধ হয়। অন্য রিকশাটা হাত সাত-দশ দূরে।

মিহিরবাবু তারাপদর দিকে তাকালেন। "তুমি এদিকে?"

"আমার বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। ও ডাক্তার। আমরা তালতলা থেকে ফিরছি। ...ব্যাপারটা কী হল বলুন তো?"

"ও কিছু নয়। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলা। এই বাড়িটায় কোঠারির একটা ছেলে থাকে– জলসা করে বেড়ায়। আর ওই মোটরবাইকের ছেলেটা হল মলঙ্গা লেনের। ওটা বাপের পয়সায় খায় আর ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দুজনের মধ্যে কোনো ঝগড়া আছে পুরনো। মাঝে-সাঝে পটকা ফাটিয়ে একে অন্যকে শাসিয়ে যায়।"

"পটকা?"

"ওই বোমা-পটকা!"

"তা বলে আপনাদের গায়ের সামনে বোমা ফাটিয়ে যাবে?"

"ফটকের কাছেই ফাটাতে গিয়েছিল। আমাদের বোধ হয় নজর করতে পারেনি।"

"আমরা ভাবলাম..."

"তা ভাবতেই পারে। যা দিনকাল! তবে কী জানো ভাই, আমার গায়ে হাত ভোলার মতন মানুষ এ-পাড়াতে নেই। বউবাজার পাড়ার পুরনো লোক হে, মাস্টার। দু-একজন ইয়ে আমাদেরও আছে।" বলে হাসতে লাগলেন।

চন্দন কৌতূহলের সঙ্গে মানুষটিকে দেখছিল। পান চিবোতে-চিবোতে দিব্যি খোশগল্প করে যাচ্ছেন ভদ্রলোক।

"তোমার সেই ম্যাজিশিয়ানের খবর কী?"

তারাপদ সতর্ক হয়ে বলল, "এমনিতে ভালই। তবে পা নিয়ে.."

"পা! পায়েও খেলা আছে নাকি হে। হাতের খেলাটা তো ভালই তোমার গুরুদেবের।" মিহিরবাবু ঠোঁট চেপে হাসলেন, "ওঁকে বললো, আমার লাইটারটা ফেরত দিয়ে যেতে।"

তারাপদ অপ্রস্তুত। সামলে নিয়ে চালাকি করে বলল, "উনি নিজেই বলছিলেন সেদিন একটা ইয়ে হয়ে গেছে..."

"ম্যাজিক?"

"না, মানে... ঠিক যে-কোনো পারপাস ছিল তা নয়! ভুলো মনে.."

"বুঝেছি। ...তা ওঁকে আসতে বলো।"

"উনি আসবেন। বলেছেন আসলের সঙ্গে সুদ নিয়ে আসবেন।"

"সুদ?"

তারাপদ হাসল। বলল, “কিকিরা বড় ভালমানুষ। সত্যিই উনি বড় ম্যাজিশিয়ান ছিলেন।”

“হুঁ! তা যে কাজ হাতে নিয়েছেন সেটা তো ম্যাজিশিয়ানের কর্ম নয়, ভাই। যার সঙ্গে রণে নামতে চাইছেন, সেই লোকটাও কম নয়।”

চন্দন কিছু বলল না। তারাপদর হাত টিপল আড়ালে।

তারাপদ বলল, “কিকিরা এখন অমলেন্দুর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।”

“তাই নাকি?”

“স্যার?”

“বলো।

“কিছু যদি মনে করেন একটা কথা বলব?”

“বলে ফেলো।”

“অমলেন্দু আপনার কাছে আসে?”

মিহিরবাবু সামান্য সময় তাকিয়ে থাকলেন তারাপদর দিকে। পরে বললেন, “আমি তো সেদিনই বলে দিয়েছি, সময়মতন তাকে তোমরা দেখলেও দেখতে পারো।”

রিকশাঅলা ঘন্টি বাজাল।

মিহিরবাবু তাকালেন একবার। তারাপদকে বললেন, “চলি ভায়া। ম্যাজিশিয়ানকে তাড়াতাড়ি আসতে বলল।”

চলে গেলেন মিহিরবাবু।

চন্দন কয়েক মুহূর্ত রিকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ফেরাল.। তারাপদকে বলল, “চল, আমরা ওই রিকশাটা ধরি। আমি মেসের কাছে নেমে যাব। তুই চলে যাস হোটেল পর্যন্ত।”

অন্য রিকশাটা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, মিহিরবাবু চলে যাওয়ার পর সে তার রিকশার হাতল তুলে নিচ্ছিল।

তারাপদ আর চন্দন দু-পাঁচ পা এগিয়ে গিয়ে রিকশাঅলাকে বলল, “এই, রোখ যাও। যানা হ্যায়…।”

রিকশাঅলা রিকশা থামাল না। “দুসরা গাড়ি দেখিয়ে।”

“কাহে?”

মাথা নাড়ল রিকশাঅলা। সে যাবে না।

তারাপদ বলল, “তুমি বাপ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপচাপ; এখন বলছ যাবে না। তোমার মরজি।”

“হামকো পেট দুখাতা হ্যায়। নেহি জায়গা।”

তারাপদ চন্দনকে বলল, “কারবার দেখছিস! এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল–আর আমরা যাব বলতেই বেটা পেটব্যথার অজুহাত খাড়া করল! ব্যাটা মহা বদমাশ তো।” বলে তারাপদ রিকশার কাছ থেকে সরে আসছিল।

চন্দন হাত ধরল তারাপদর। “দাঁড়া! ওর পেট ব্যথা আমি দেখাচ্ছি।” বলে সোজা দু পা এগিয়ে রিকশার হাতল ধরে ফেলল। এই, রিকশা উতারো। পেট দুখাতা হ্যায়? ঠিক হ্যায় থামা মে চল...। হাম থানাকা বাবু। আ যাও...”

রিকশাঅলা ভয় পেয়ে গেল। বোধ হয় ক’ মুহূর্ত মাত্র হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর অদ্ভুত কাণ্ড করল। রিকশার হাতল ফেলে দিয়ে দে দৌড়। ক্রিক রোয়ের গলি দিয়ে ছুট।

চন্দনরাও কম হতভম্ব হল না। এরকম হবে তারা ভাবতেই পারেনি। রিকশাঅলা পালাল।

তারাপদ বলল, “কী হল রে?”

চন্দন বলল, “আশ্চর্য! ব্যাটা পালাল কেন? ও কে রে?”

তারাপদর কেমন খটকা লাগল চন্দনের কথায়। “লোকটা অমলেন্দু নয় তো?”

“রাবিশ। অমলেন্দু রিকশাঅলা হবে কেন? এব্যাটা রিয়েল-রিয়েল রিকশাঅলা। কিন্তু ব্যাপারটা কী হল? মিহিরবাবুর ফেরার পথে কেউ নজর রাখছে নাকি?

১০.

নিজের বৈঠকখানাতেই ছিলেন মিহিরবাবু; সাদরে অভ্যর্থনা করলেন কিকিরাদের। কিকিরা আর তারাপদর সঙ্গে চন্দনও এসেছে আজ।

মিহিরবাবু বললেন, “আসুন ম্যাজিকবাবু! আসুন। বসুন।” বলে রহস্যময় চোখ করে চন্দনকে ইশারা করলেন। “এটি কি আপনার দু নম্বর অ্যাসিস্ট্যান্ট?”

কিকিরা যেন কতই লজ্জা পেয়েছেন এমন মুখ করে বললেন, “আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, আমার এজেন্সির পার্টনার?”

“পার্টনার! কী এজেন্সি আপনার?”

“কুটুস!”

“কুটুস! তার মানে?”

“স্যার, হওয়া উচিত ছিল কিকিরা-তারাপদ-চন্দন, ছোট করে কে. টি. সি.। তারাপদ একটু পালটে নিয়ে নাম দিয়েছে “কুটুস’।”

মিহিরবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসি আর থামতে চায় না। শেষে বললেন, “রিয়েলি, আপনি ফানি লোক মশাই। বসুন বসুন। তোমরা বসো। সিট ডাউন। তা ম্যাজিকমশাই, থিয়েটারে আমরা আজকাল ডিরেক্টর, মিউজিক, আলোকসম্পাত রাখি। আপনার এ দুটি বোধ হয় তাই, সঙ্গীত আর আলো, তাই না?”

কিকিরা হাতজোড় করে বললেন, “থিয়েটারের খোঁজ আমি রাখি না স্যার। সেই বড়বাবু, মানে শিশিরবাবুর আমলে রাখতাম।”

মিহিরবাবু মজার মুখ করে দেখলেন কিকিরাকে, চোখের ভঙ্গি থেকে মনে হল, তিনি যেন ঠাট্টা করে বলছেন, তাই নাকি?

কিকিরা এবার পকেট থেকে দুটো লাইটার বের করে মিহিরবাবুর সামনে টেবিলে রাখলেন। বললেন, “স্যার, আমায় আপনি মাফ করবেন। ম্যাজিশিয়ানদের হাত বড় চঞ্চল। লোভ সামলাতে পারে না। নো থিফিং সার, জাস্ট মজাফ্যায়িং… ।”

“থিফিং? মানে?”

“মানে, ইয়ে, বলছি চুরি করিনি স্যার, মজাফ্যায়িং-মানে ইয়ে মজা করেছিলাম।”

মিহিরবাবু আবার হেসে উঠলেন জোরে। বিষম খান আর কি! কাশি সামলে বললেন কোনোরকমে, “মশাই, আপনি আমায় নাকের জলে চোখের জলে করে ফেলবেন! ইংরেজরা এদেশে থাকলে আপনাকে শূলে চড়াত।”

“থাকল কোথায়! তাড়িয়ে ছাড়লাম… ।”

“বেশ করলেন। তা একটু চা হোক।” বলে টেবিলের সঙ্গে লাগানো ঘন্টি-বোম বাজালেন।

মানে, খবর গেল ভেতরে। “দুটো লাইটার কেন? নিয়েছিলেন একটা, দিচ্ছেন দুটো।”

“একটা স্যার আমার প্রণামী! উপহার। বেলজিয়ান লাইটার। যখন জ্বলে তখন লাইটারটার বডিও কালারফুল হয়ে যায়। বেশ দেখতে দেখুন না!”

মিহিরবাবু নতুন লাইটারটা জ্বেলে দেখলেন। দেখতে ভাল–তবে সামান্য বড়। ছোট সিগারেটের প্যাকেটের সাইজ। খুশি হলেন। “দাম কত?”।

“দামের জন্যে কী স্যার!...এটা হল টেবল লাইটার, মানে টেবিলে রাখার। সাইজটা একটু বড় দেখছেন না!”

“না না, তবু...”

“প্লিজ! এটা আমার গুরুদক্ষিণা।”

“গুরুদক্ষিণা?” মিহিরবাবু অবাক।

চন্দন আর তারাপদ মুখ টিপে হাসছিল।

বাড়ির ভেতর থেকে কাজের লোক এল। দাঁড়াল এসে। মিহিরবাবু চায়ের কথা বললেন। তারপর বললেন, “জলুকে বলে দিস, কেউ এলে যেন বলে দেয়, আজ দেখা হবে না, আমি ব্যস্ত রয়েছি। কাল সকালে আসতে।”

লোকটি চলে গেল।

মিহিরবাবু ডিবে থেকে পান তুলে নিতে-নিতে বললেন, “কিকিরাবাবু আপনি মজাদার লোক, ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যান, আবার গোয়েন্দা। ম্যাজিশিয়ান-গোয়েন্দা। তা এ-সবই না হয় মানলুম। কিন্তু মশাই, আপনার গুরুদক্ষিণার ব্যাপারটা তো বুঝলাম না?”

কিকিরা অমায়িক মুখ করে হাসলেন। “বোঝার কী আছে?”

“নেই?”

“না স্যার। যেটুকু আছে পরে বুঝিয়ে দেব।”

“আপনি মশাই আমার পেছনে দুই চেলাকে লাগিয়েছেন?” বলে তারাপদদের দেখালেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জিভ বের করে নিজের কান মললেন কিকিরা। “ছিঃ ছিঃ, আপনি বলছেন কী! আপনার পেছনে লোক লাগাব! না না, আপনি ভুল বুঝছেন। আমাদের একটু দেখার ইচ্ছে হয়েছিল–অমলেন্দু আপনার সঙ্গে ওই ক্লাবের আশেপাশে দেখা করে কি না! কৌতূহল মাত্র।...তা এক রিকশাঅলা..” বলতে বলতে কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। বললেন, “রিকশাঅলার কথাটা বলো তো?”

তারাপদ বলল সব।

মিহিরবাবু শুনলেন। চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। কপাল কুঁচকে দুশ্চিন্তার ভান করলেন। পরে বললেন, “ব্যাপারটা নতুন মনে হচ্ছে! তা পাড়ার মধ্যে আমাকে কাবু করার সাহস কার

হবে? লোচনেরও হবে না।”

“ধরুন, ও যদি আপনার ওপর নজর রাখার জন্যে...”

মিহিরবাবু এবার সকৌতুক মুখে বললেন, “না, আপনারা ভুল করছেন। রিকশাঅলা আমারই লোক। কদিন ধরে ওকে রাখছি। একটু নজর রাখে।”

কিকিরা থ হয়ে গেলেন। “আপনার লোক?”

“হুঁ”

“আমাকে স্যার কে যেন শাসিয়েছে উড়ো চিঠি দিয়ে। বলেছে, দাদু, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও।”

তারাপদ বলল, “একটা উটকো লোক এসে কিকিরাদের ট্রামের ওপর ঠেলে ফেলে দিতে গিয়েছিল।”

মিহিরবাবু কিছু বললেন না। জর্দা মুখে দিলেন।

কিকিরা বললেন, “লোচনের সঙ্গে আমি গত পরশু দেখা করেছিলাম।”

পান-জর্দা মুখে মিহিরবাবু শঙ্কিত গলায় বললেন, “অমলেন্দুর কথা বলেছেন নাকি?”

“পাগল নাকি! তা আমি বলি?”

“তবে কী বললেন?”

“বললাম, জাল মোহনকে প্রায় ধরে ফেলেছি। আর দু-চারটে দিন।”

“বিশ্বাস করল?”

“বুঝতে পারলাম না। তবে জাল মোহনকে দেখতে ওর খুব আগ্রহ।”

“দেখিয়ে দিন।”

কিকিরা একটু হাসলেন। বললেন, “লোচনকে নিয়ে একটু খেলা খেলতে চাই। এখন আপনার দয়া।”

“দয়া?” সন্দেহের চোখে কিকিরাকে দেখলেন মিহিরবাবু, “আপনার মতলবটা কী মশাই? খোলসা করে বলুন তো?”

কিকিরা হাত বাড়িয়ে মিহিরবাবুর সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিলেন। যেন কিছুই নয়, ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, “স্যার, আমার মতলব ভেরি সিম্পল। আমি লোচনকে আপনার এখানে হাজির করাতে চাই।”

এরকম একটা মামুলি কথা শুনতে হবে, মিহিরবাবু ভাবেননি। খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, “এর মধ্যে দয়া করার কী আছে, মশাই? লোচন থাকে কাছেই। ক’-পা দূরে; পাড়ার ছেলে,

তাকে হাজির করাতে চান, করাবেন।”

“সেইসঙ্গে আপনাকে যে একটা কাজ করতে হবে।”

“কী কাজ?”

“মোহনকে এখানে হাজির করাতে হবে।”

“মোন?” মিহিরবাবু অবাক। “মোহনকে আমি কোথায় পাব?”

কিকিরা সিগারেটে টান মেরে ধোঁয়া গিললেন। কাশলেন অল্প। তারাপদ আর চন্দনকে এক পলক নজর করে নিলেন। আবার মিহিরবাবুর দিকে তাকালেন। বললেন, “আপনি ছাড়া একাজ কে করবে! আপনিই পারেন

“ধ্যুত মশাই, আমি কি ভগবান? না, আপনার মতন ম্যাজিশিয়ান যে, মরা মানুষ আবার জ্যান্ত করতে পারি?”

“আপনি স্যার আসল। মানে আপনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র।“

“তার মানে?”

“তার মানে, এই রহস্যের চাবিকাঠিটি আপনার হাতে। আপনি যতক্ষণ না তালাটা খুলে দিচ্ছেন, কিস্যু করার নেই।”

মিহিরবাবু চুপ। তাকিয়ে থাকলেন কিকিরার দিকে। শেষে বললেন, “মোহনকে আমি কোথায় পাব! সে আর নেই।” বলার সঙ্গে সঙ্গে মিহিরবাবুর চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠল। কেমন যেন হতাশ, ক্রুদ্ধ!

কিকিরা বললেন, “জাল মোহনের কথা বলছি। আমি জানি আসল মোহন আর নেই।”

মিহিরবাবু কথা বললেন না। তাঁর মুখ আরও থমথমে হয়ে উঠল। দুটি চোখ যেন কঠিন হল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

কিকিরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শেষে মিহিরবাবু বললেন, “আপনি কি সব বুঝতে পেরেছেন?”

মাথা হেলিয়ে কিকিরা বললেন, “খানিকটা। আমি বুঝতে পেরেছি এই জাল মোহনকে আপনি এনেছেন? ঠিক কি না?”

মিহিরাবাবু তাকিয়ে থাকলেন অন্যদিকে। তবে মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, তিনিই এনেছেন।

কিকিরা বললেন, “লোচনকে আপনি সব দিক থেকে কোণঠাসা করে ফেলতে চান, তাই না?”

“হ্যাঁ।”

"কেন?"

মিহিরবাবু এবার যেন আচমকা জ্বলে উঠলেন। বললেন, "সে খুনি। মাডারার। শয়তান।"

"আপনি কি শুধু খুনি লোকটাকে ধরার জন্যে এত চেষ্টা করছেন?"

মিহিরবাবুর আর যেন ধৈর্য থাকল না। বললেন, "শুধু খুনি বলে...? না, তার চেয়েও বেশি। আপনি কেমন করে জানবেন মোহনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী ছিল! আপনি জানেন না। আমি ওকে নিজের ছোট ভাইয়ের। চেয়েও বেশি ভালবাসতাম। বলতে পারেন, ছেলের মতনই। ও এত ভাল, সরল, শান্ত ছিল। সবাই ওকে ভালবাসত। তা ছাড়া রামদা, মানে মোহনের বাবা আমায় বিশ্বাস করতেন, স্নেহ করতেন। তিনি আমায় বারবার বলেছেন, "মিহির, সংসার বড় খারাপ জায়গা, আমার ছেলেটাকে তুমি দেখো।" আমি তখন অত কিছু ভাবিনি, বলেছিলাম, আপনি ভাবছেন কেন, নিশ্চয় দেখব।'

মিহিরবাবু থেমে গেলেন। কে যেন আসছিল।

বাড়ির লোক ঘরে এল। চা রেখে গেল টেবিলের ওপর। চায়ের সঙ্গে কিছু প্যাসট্রি।

মিহিরবাবু বললেন, "নিন, চা খান...যা বলছিলাম। সংসার বড় অদ্ভুত জায়গা। এখানে কী না হয়। আমি তো কিছুকাল ওকালতি করেছি। ক্রিমিনালও না ঘেঁটেছি এমন নয়। লোচন একটা পাক্কা ক্রিমিনাল। মোহনকে সে মেরেছে। হি হ্যাজ কিলড হিম।"

"আমারও তাই সন্দেহ।"

"সন্দেহ নয়, সত্যি। ...আপনি বলবেন, প্রমাণ কী? প্রমাণ নেই। লোচন অত্যন্ত চালাক, ওর মগজ ক্রিমিনালের। ভাইকে খুন করার পর ও এমনভাবে জিনিসগুলো ওর তরফে সাজিয়ে নিয়েছে যে, আইনমাফিক ওকে ধরবার উপায় রাখেনি। আইন প্রমাণ চায়–অনুমান সন্দেহ এ-সব স্বীকার করে না। লোচন এক দেহাতি ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেট জোগাড় করেছে। থানা আর ডাক্তারকে টাকাও খাইয়েছে নিশ্চয়। আইডেনটিফিকেশন করিয়ে নিয়েছে ওর মেজো শ্যালক আর অমলেন্দুকে দিয়ে। সব পথ ও মেরে রেখেছে।"

"তা হলে?"

"তা হলেও সব চাপা দেওয়া যায় না। আইন আইন, মানুষ মানুষ। অমলেন্দুর মুখে সব শুনে আমি বুঝতে পারি, লোচন কেমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে একাজ করেছে।"

"অমলেন্দু কী বলেছে?"

"বলেছে, ঝরনা দেখতে যাওয়ার প্ল্যানটা লোচনের। অবশ্য তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। কিন্তু পাহাড়ের যে-জায়গায় মোহনকে সে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে মোহন যেতে চায়নি। মোহন বরাবরই ভিতু ধরনের। সাবধানী। লোচন তাকে ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।"

"অমলেন্দুরা কাছে ছিল না?"

"না। যাওয়ার সময় পাহাড়ের মাথায় লোচনের মেজো শ্যালক চালাকি করে এক জায়গায় বসে পড়ল। বলল, পায়ের শিরায় টান ধরে গিয়েছে, একটু ম্যাসাজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। সে অমলেন্দুকে ছুতো করে কিছুক্ষণ আটকে রাখল। ততক্ষণে লোচন আর মোহন

অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ গজ এগিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া পাহাড়ি জায়গা, ওরা খানিকটা আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। লোচন যখন মোহনকে ঠেলে দেয় ঝরনার স্রোতে, তখন আশেপাশে কেউ ছিল না।”

চন্দন বলল, “একেবারে প্ল্যানড ব্যাপার।”

“একেবারে ছক কেটে খুন করা। ...আমার মনে হয় না, মোহনের বডি যখন দেড়দিন পরে পাওয়া গেল–ওকে পোস্টমর্টেম করলেও প্রমাণ করা যেত এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, অন্য কিছু?” বলে চন্দনের দিকে তাকালেন মিহিরবাবু।

চন্দন বলল, “আমারও মনে হয় না, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে বলা যেত কেউ মোহনকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ঝরনার স্রোত, জল, পাহাড়, পাথর, খানাখন্দ–শরীরের কোন “জখম কেমন করে হয়েছে তা বলা যেমন মুশকিল ছিল, তেমন বলা যেত না, ওটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, কিলিং। আমারও তাই মনে হয়। তা ছাড়া ডেডবডিও পাওয়া গেছে প্রায় দেড়দিনের মাথায়। ...তা পোস্টমর্টেম যখন হয়নি, হওয়া সম্ভব ছিল না ওখানে, তখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ!”

মিহিরবাবু বললেন, “আমি এসব কথা অমলেন্দুর মুখে শুনেছি।”

“ও কি আপনাকে আগেই এসব কথা বলেছিল?”

“ফিরে এসেই বলেছিল। মোহনকে সে খুবই ভালবাসত। তবে–গোড়ায় তার সন্দেহ ততটা হয়নি। আমার হয়েছিল। আমি যখন বারবার তাকে খুঁচিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, তখনই তার সন্দেহ হতে লাগল।”

কিকিরা বললেন, “ও দিল্লি চলে গেল কেন? ঘটনাটার পরই যেন পালাল।”

“একটা কাজ পেয়ে গেল। তা ছাড়া আমিও ওকে চলে যেতে বললুম। বলা কি যায়, কোনো কারণে যদি লোচনের সন্দেহ হয় ওর ওপর, তাতে বিপদ হতে পারে।”

তারাপদ কথা বলল এবার। বলল, “তখন থেকেই কি আপনি...”

তারাপদকে কথা শেষ করতে না দিয়েই মিহিরবাবু বললেন, “অমলেন্দু দিল্লি যাওয়ার আগে আমি তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলুম, একদিন না একদিন–এই খুনের শোধ আমরা নেব। লোচনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব।”

কিকিরা বললেন, “আজ পাঁচ বছর ধরে আপনারা সে-চেষ্টা করেছেন?”

“হ্যাঁ, পাঁচ বছর ধরে। ধীরে ধীরে। ...লোচনকে ভুলে যেতে দিয়েছি তখনকার ঘটনা। ভুলে যেতে দিয়েছি তার ওপর কোনো সন্দেহ রয়েছে। কারও। সে ভাবতেই পারেনি তার কোনও চরম শত্রু আছে, যে তাকে খুনের মামলায় আসামি করতে পারে। সে এই ক’ বছর নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে, সম্পত্তি ভোগ করেছে। নিজের খেয়ালে যা পেরেছে বেচেছে, দেনা বাড়িয়েছে, এমনকী অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার তোড়জোড় করছে নতুন বাড়ি করে। আর আমি তলায়-তলায় নিজের কাজ করে গিয়েছি।”

চা শেষ হল কিকিরাদের। একটা পান নিলেন তিনি।

মিহিরবাবু অন্যমনস্কভাবে সিগারেট নিলেন। লাইটার জ্বালিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন কিকিরা।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মিহিরবাবু বললেন, "আমি তাড়াহুড়ো করে কিছু করিনি। ধৈর্য ধরে ধীরে-ধীরে করতে হয়েছে যা করার। একদিকে লোচন যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটিয়েছে, ভেবেছে সে নিরাপদ, তার কোনো ভয়। নেই, অন্যদিকে তার গলায় ফাঁস বাঁধার সবরকম চেষ্টা আমি গুছিয়ে নিয়েছি।"

কিকিরা বললেন, " আপনি জাল মোহনকে আসল মোন করতে চেয়েছেন বুদ্ধি করে।"

"হ্যাঁ। জালকে আসল করা যায় না। কিন্তু ধোঁকা দেওয়া যায়।"

তারাপদ বলল, "অনিলবাবু, সতীশবাবু, তুলসীবাবু-মানে এদের সকলকে আপনিই বেছে নিয়েছিলেন?"

মিহিরবাবু মাথা নাড়লেন। "ভেবে-ভেবে এদেরই বেছে নিয়েছিলাম। এরা কেউ লোচনের আত্মীয়, কেউ বন্ধু, কেউ পুরনো কর্মচারী। লোচন যখন এদের কাছ থেকে একে একে মোহনের কথা শুনবে, ধাঁধায় পড়ে যাবে। পাপের মন যার, সে কি আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে। লোচনের এখন মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। তার ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে।"

কিকিরা বললেন, "আপনাকে অনেক খবর জোগাড় করতে হয়েছে।"

"অনেক। লোচনরা আমাদের প্রতিবেশী। তাদের বাইরের খবর কম-বেশি আমি জানি। তা ছাড়া রামদার কাছে শুনেছি নানা কথা। ...তবু বাড়ির ভেতরের খবর? সে সব তো আমার অত জানা নেই। এক-এক করে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এখান-ওখান থেকে সেগুলো জোগাড় করতে হয়েছে কাঠখড় পুড়িয়ে। ওই খবরগুলো যদি না জানা থাকে, নকল মোহনকে আসল মোহন বলে ধোঁকা দিয়ে চালানোর চেষ্টা করা যেত না।"

"ছাপাখানার খবরও নিয়েছেন দেখছি?"

"নিয়েছি। না নিলে কেমন করে লোচন আর তুলসীবাবু ধোঁকা খাবে।"

"তুলসীবাবুর কাছে আপনি অমলেন্দুকে মোহন সাজিয়ে পাঠিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ। কারণ তুলসীবাবু নোচনের বিশ্বস্ত কর্মচারী। কর্মচারী বিশ্বস্ত হলেও, ভদ্রলোক এখন চোখে ভাল দেখেন না। এই সুযোগটা নিয়েছি। তা ছাড়া আপনাকে আগেই বলেছি, অমলেন্দু মেক-আপটা ভাল নিতে পারে; গলার স্বর পালটাবারও ক্ষমতা রয়েছে ওর। ... শুনতে চান তো শুনিয়ে দিতে পারি।"

তারাপদ বলল, "শুনি একটু।"

মিহিরবাবু তাঁর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের তালা-লাগানো ড্রয়ার খুলে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার মেশিন আর টেপ বের করলেন। দেখেই বোঝা গেল, বিদেশি মেশিন।

"এখন যার গলা শুনবেন এটা আসলে অমলেন্দুর, কিন্তু নকল মোহনের।" বলে মিহিরবাবু মেশিন চালিয়ে দিলেন। ব্যাটারি তাজাই ছিল। টেপ বাজতে লাগল। তারাপদরা ঝুঁকে পড়ে শুনতে লাগল নকল মোহনের গলা।

কিছুক্ষণ পরে মিহিরবাবু বললেন, “এই গলার সঙ্গে আসল মোহনের গলার স্বর আপনারা চট করে ঠাওর করতে পারবেন না। শোনাচ্ছি সেই আসল গলা।”

মেশিন থেকে ক্যাসেটটা খুলে নিয়ে অন্য একটা ক্যাসেট ঢুকিয়ে দিলেন মিহিরবাবু। বললেন, “এই গলাটা আসল মোহনের। তবে এখানে যা শুনবেন–সেটা আমাদের নাটক থেকে। মাঝে-মাঝে শখ করে আমরা নাটকের কিছু কিছু অংশ টেপ করে রাখি। শুনুন এবার।”

মেশিন চালিয়ে দিলেন মিহিরবাবু।

দু জনের গলার স্বরের পার্থক্য ধরা সত্যিই মুশকিলের। হয়ত বারবার শুনলে.ধরা যেতে পারে। নয়ত ধরা যাবে না।

কিকি বললেন, “বুঝেছি। আর দরকার নেই।”

মেশিন বন্ধ করলেন মিহিরবাবু। বললেন, “অমলেন্দু প্র্যাকটিস করে গলাটা ধরেছে বেশ।”

কিকিরা হঠাৎ বললেন, “হাতের লেখা? সেটাও কী..”।

মিহিরবাবু একটু হাসলেন। বললেন, “মোহন আমাদের নাটকের সময় রিহার্সাল দেওয়ার কপি তৈরি করত। পার্ট মুখস্থ করার কপি লিখত। তার হাতের লেখা আমার কাছে অনেক আছে। অমলেন্দুকে দিয়ে দিনের পর দিন তা নকল করিয়েছি।”

“এখানে?”

“না, দিল্লিতে থাকতেই এ-সব করেছে অমলেন্দু। একাজ দু-একদিনে হয় না। সময় লাগে।“

কিকিরা চুপ করে থাকলেন। মিহিরবাবুর ধৈর্য ও অধ্যবসায়কে প্রশংসা করতে হয়। বুদ্ধিকেও।

শেষমেশ কিকিরা বললেন, “আপনি এত কষ্ট করলেন যে-জন্যে তার চৌদ্দ আনাই কাজে লেগেছে। লোচনকে চারপাশ থেকে আপনি চেপে ধরেছেন। সে ভয় পেয়েছে। ভীষণ অশান্তির মধ্যে রয়েছে।”

“আমি তাই চেয়েছিলাম। চারদিক থেকে প্রেশার দিয়ে ওর মনের ডিফেন্সট্রা আগে ভেঙে দিতে.”

“বাকি দু আনা কাজই আসল। তাই না, স্যার?...ওটা আমায় করতে দিন।”

“কী কাজ?”

“লোচনকে আমি আপনার কাছে নিয়ে আসতে চাই। ...ওকে এখানে আনার পর বাকি কাজটাও আপনি করবেন।”

“সে আসবে?”

“মনে হয় আসবে। জাল মোহনকে ধরার জন্যে সে উন্মাদ। লোচন বুঝতে পেরেছে, এই

জাল মোহনকে ধরতে না-পারা পর্যন্ত তার শান্তি হবে না। যদি নকল মোহন এইভাবেই থেকে যায়, সে তাকে জ্বালাবে। দিনের পর দিন।”

মিহিরবাবু কী যেন ভাবলেন। বললেন, “লোচনকে আপনি আনবেন কেমন করে?”

কিকিরা রহস্যময় হাসি হাসলেন। “আনব। সে-দায়িত্ব আমার।”

“আপনি বলবেন, জাল মোহন আমার কাছে আসা-যাওয়া করে, এই তো?”

“ধরেছেন ঠিক। বলব, জাল মোহন আপনার কাছে হালে বার কয়েক এসেছে। সে চাইছে আপনার পরামর্শ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা কিছু একটা লাগিয়ে দিতে। তাকে ভয় দেখাব। বলব, মামলা যদি একবার লেগে যায়–এ সেই দীনরাম মামলার মতন হয়ে যাবে। কত বছর চলবে কেউ জানে না।“ বলে কিকিরা হাত বাড়িয়ে ডিবে থেকে একটা পান নিলেন। বললেন, “লোচনের কাগজে নোটিস ছাপার উদ্দেশ্য কী ছিল? কী চেয়েছিল সে? চেয়েছিল জাল মোহনের খোঁজ। কে সে, কোথায় আছে, কী তার মতলব, দেখে নিতে। তা স্যার, এখন যদি লোচন সেই জাল মোহনকে সরাসরি হাতে পায়, ছাড়বে কেন?”

মিহিরবাবু মাথা হেলালেন। “বেশ, আনুন। কিন্তু..”

“কিন্তুর কিছু নেই। আপনি তৈরি থাকুন। একেবারে পাকাপাকিভাবে।” বলে কিকি নতুন লাইটারটা দেখিয়ে ইঙ্গিতে কিছু বুঝিয়ে দিলেন।

মিহিরবাবু ভাবলেন কিছুক্ষণ। “কবে আনবেন লোচনকে?”

“আপনি বলুন?”

“আসছে বুধবার আনুন। আমি ক্লাবে যাব না।”

“সন্ধেবেলাতেই আসব।”

“আসুন। ..আমি তৈরি থাকব।”

১১.

আসার কথা ছিল সন্ধে সাতটা নাগাদ, ঘড়িতে সোয়া সাতটা বেজে যাওয়ার পরও লোচন আসছে না দেখে মিহিরবাবু চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। ব্যবস্থা তিনি সবই করে রেখেছেন, এখন শুধু নোচনের অপেক্ষা।

সাড়ে সাতটা নাগাদ কিকিরা এলেন। সঙ্গে লোচন। তারাপদও ছিল।

ঘরে ঢুকেই লোচন উত্তেজিত গলায় বলল, "এ-সমস্ত কী হচ্ছে মিহিরকাকা? শেষ পর্যন্ত আপনি...!"

মিহিরবাবু স্বাভাবিক গলায় বললেন, "বোসো। আমি আবার কী করলাম হে?"

লোচন উত্তেজিত। ক্রুদ্ধ। বলল, "এঁরা বলছেন, আপনি একটা চোর-জোচ্চোরকে বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে দিচ্ছেন?"

মিহিরবাবু হাসিমুখে বললেন, "আমি উকিল মানুষ, আমার কাছে সাধুও যা, চোরও তাই। মক্কেলের জাত-বিচার থাকে না।"

"আপনি ওকালতি ছেড়ে দিয়েছেন?"

"তা দিয়েছি। তবে মাঝে-মাঝে পুরনো মক্কেলদের অ্যাডভাইস দিতে হয় বইকি! কমলা ছাড়লেও কমলি কি আর ছাড়ে! বাসো বোসো। দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

লোচন বসল না। রাগের গলায় বলল, "এঁরা বলছেন, আপনার এখানে সেই জোচ্চোরটা লুকিয়ে লুকিয়ে আসে?"

মিহিরবাবু শান্তভাবেই বললেন, "আগে বোসো। তুমি তো এসেই রাগারাগি শুরু করলে! বোসো আগে, তারপর তোমার কথা শুনি।"

লোচন বসল।

কিকিরারা আগেই বসে পড়েছিলেন। বসে পড়ে অন্যমনস্কভাবে টেবিল থেকে সেই নতুন লাইটারটা তুলে নিয়ে জ্বালালেন। নিভিয়ে দিলেন আবার।

মিহিরবাবু বললেন, "এবার বলো, কী বলছিলে?"

লোচন বলল, "আমি সেই জোচ্চোর লোকটার কথা বলছি। "

"মোহনের কথা?"

"কে মোহন? জাল-জালিয়াত একটা লোককে আপনি মোহন বলছেন?"

"জাল-জালিয়াত...!" মিহিরবাবু বললেন। বলে মাথা নাড়ালেন, "তুমি বলছ জাল-জালিয়াত। সে বলছে, ও মোটেই জাল নয়।"

“ও বলছে! ও কে?...আপনি মোহনকে চেনেন না? তাকে ছেলেবেলা থেকে দেখেননি? মোহন না আপনার আদরের ছেলে ছিল?”

মাথা হেলিয়ে মিহিরবাবু বললেন, “মোহনকে আমি সব দিক দিয়েই ভাল করে চিনি বলেই বলছি, ও মোহন। “

লোচন একেবারে হতভম্ব। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মিহিরবাবুর দিকে। কী বলবে যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। ক্রমেই তার মাথায় যেন রক্ত চড়তে লাগল। চেঁচিয়ে বলল, “আপনি বলছেন মোহন। আশ্চর্য! আপনি একটা জালিয়াতকে মোহন বলছেন?”

“তুমি কি ভাবছ, আমার মাথা খারাপ হয়েছে?”

রাগে যেন ফেটে পড়ল লোচন। “আপনি, আপনি একটা জালিয়াতকে কেমন করে মোহন ভাবছেন আমি জানি না।”

“প্রমাণ না পেলে ভাবতাম না।”

“প্রমাণ? কী বলছেন? সত্যিই আপনার মাথার গোলমাল হয়েছে। আপনি কি সেই চিঠির হাতের লেখার কথা বলছেন? ওটা কোনো প্রমাণ?”।

মিহিরবাবু বললেন, “লেখা না,হয় নকল হল, কিন্তু মোহনের বন্ধুবান্ধব।” হলে তিনি বইয়ের আলমারির দিকে হাত তুলে কী যেন দেখালেন। বললেন, “ওই যে ওখানে যে-ছেলেটি বসে আছে সে মোহনের ছেলেবেলার বন্ধু।”

লোচন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। আলমারির পাশ ঘেঁষে আড়ালে চন্দন বসে ছিল। তাকে দেখল লোচন। অচেনা মানুষ।

মিহিরবাবু বললেন, “ওকে জিজ্ঞেস করো?”

জিজ্ঞেস করতে হল না। চন্দনকে শেখানো ছিল। সে নিজেই বলল, “মোহনদা আমার স্কুলের বন্ধু। আমরা সেন্ট পলস স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম। তখন আমি পিসির কাছে গড়পারে থাকতাম। আমার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র ছিল মোহনদা। সিনিয়ার হলেও বন্ধু ছিল। কলেজে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে যাই। মোহনদা সেন্ট পলসেই ছিল, আমি স্কটিশে...। তারপর আমি ডাক্তারিতে..”

লোচন অদ্ভুত চোখে চন্দনকে দেখছিল।

চন্দন বলল, “আমি এখন ডাক্তার। মোহনদা..”

“কোথায় বাড়ি আপনার?” লোচন বলল হঠাৎ।

“বাড়ি বহরমপুর। এখানে থাকি কোয়ার্টারে, মেডিকেল মেস...”

“আপনি মোহনকে দেখেছেন?”

“দেখব মানে? কী বলছেন আপনি! আগে প্রায়ই দেখাশোনা হত, তারপর আর হয়নি। শুনেছিলাম মোহনদা মারা গেছে। সেটাই জানতাম। হঠাৎ মাসখানেক আগে দেখা। ট্রামে।

আমি অবাক।”

লোচন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ার মতন করে দাঁড়িয়ে পড়ল। “বাজে কথা। মিথ্যে কথা। মোহন নয়। মোহন হতেই পারে না।”

“মানে! মোহনদা নয়!...আলবাত মোহনদা। আমরা ট্রাম থেকে নেমে চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। কত পুরনো গল্প হল!”

অবিশ্বাসের মুখ করে লোচন বলল, “কখনোই নয়। এ-সবই সাজানো।” বলে মিহিরবাবুর দিকে তাকাল। “আপনি ওকে মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়েছেন।”

“আমি! কেন?”

“ওই জালিয়াত আপনাকে ব্রাইব করেছে। ছি ছি, মিহিরকাকা... ছি!”

মিহিরবাবু শান্তভাবেই বললেন, “নোচন, আমাদের পরিবারের কাউকে টাকা দিয়ে এ-পর্যন্ত কেউ কেনেনি। তুমি খুব খারাপ কথা বললে। অন্য সময় হলে তোমাকে আমি এখানে দাঁড়াতে দিতাম না। ...যাকগে, সাক্ষীও শুধু একা নয়, আরও আছে।”

চন্দন সঙ্গে-সঙ্গে বললে, “আছে বইকী! মোহনদাকে নিয়ে আজ কদিন আমি অন্তত চার-পাঁচ জায়গায় গিয়েছি। আদিত্য, হরিহর, বিজন... সকলেই আমাদের বন্ধু। ওরা সবাই শুনেছিল মোহনদা মারা গিয়েছে। আজ জানতে পারছে, খবরটা ভুল। “

লোচন মিহিরবাবুর দিকে তাকাল। রাগে গা জ্বলছে, চোখ লাল। গলার স্বর রুক্ষ। বলল, “আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি একটা জাল লোকের হয়ে মামলসা সাজাচ্ছেন।”

“হ্যাঁ, সাজাচ্ছি। তবে জাল লোকের নয়, আসল লোকের হয়ে। ...হয়ত এ-নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। চিঠিটাও জাল বলে ভেবে নিতাম। কিন্তু মোহন জাল নয়। জাল হলে ও বারবার আমার কাছে আসত না। মাঝে-মাঝে এখন সে এখানে আসছে। ওর পুরনো জানাশোনা লোকেদেরও আনছে সঙ্গে করে। আমি এখন কনভিনড় যে, জাল নয়, এই মোহনই আসল।”

“অসম্ভব। হতেই পারে না।”

“তুমি যতই অসম্ভব বলল, আমি মনে করছি, মোহন মারা যায়নি। সে বেঁচে আছে। আর এখন সে কলকাতায়।”

লোচন পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠল। “কোথায় সে! ডেকে আনুন তাকে। আমার সামনে এসে দাঁড়াক। দেখি সে কেমন মোহন?”

কিকিরা এমন মুখ করে বসে থাকলেন যেন তিনি নীরব দর্শক। অবশ্য চোখে-চোখে যেন কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন মিহিরবাবুকে।

মিহিরবাবু বললেন, “লোচন, তুমি যদি মোহনকে দেখতে চাও দেখাতে পারি। কিন্তু আমি বলি দেখাটা আদালতে হওয়াই ভাল।”

লোচন কাঁপছিল। বলল, “মিহিরকাকা, আমাকে আপনারা ব্ল্যাকমেইল করতে চান? লোচন

দত্ত অত সহজে ভয় পায় না।”

“তোমায় কেন ব্ল্যাকমেইল করব হে?”

“করেছেন। আপনি না করুন আপনার মক্কেল করেছে। জাল মোহন। আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। নেয়নি?”

এবার কিকিরা কথা বললেন। মাথা নেড়ে বললেন, “ওটা আপনারই চলি দত্তবাবু! একবেলার জন্যে ছেলেকে ভবানীপুর পাঠিয়েছিলেন, আপনার এক ভায়রার বাড়ি। নিজেই ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে দেখাতে চাইছিলেন জাল মোহন আপনাকে ব্ল্যাক মেইল করতে চায়।”

লোচন থতমত খেয়ে গেল। “আমি? আমি আমার ছেলেকে সরিয়ে রেখেছিলাম? কে বলল?”

“আপনার পালোয়ান দরোয়ান। একশো টাকা খসিয়ে খবরটা পেয়েছি। তারপর ভবানীপুরেও খোঁজ করেছি। ...আপনি মশাই, ডালে-ডালে যান, গোয়িং ব্রাঞ্চেস, আর আমি যাই পাতায়-পাতায়, গোয়িং লিফ। আপনি দত্তমশাই আমার পেছনে গুণ্ডাও লাগিয়েছেন। উড়ো চিঠি পাঠিয়েছেন ভয় দেখিয়ে।”

লোচন থরথর করে কাঁপছিল। খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। “ভাঁড়ামি করবেন না। আমার ছেলেকে আমি সরাইনি।”

“কেন মিথ্যে কথা বলছেন দত্তবাবু! ধোপে টিকবে না।”

“তাই নাকি!” লোচন যেন ব্যঙ্গ করে হাসল। আপনাদের মোহন ধোপে টিকবে?”

“টিকবে না?”

“না, না, না। নেভার। এ-জন্মে নয়। হাজার চেষ্টা করলেও নয়।”

“নয় কেন? এত সাক্ষীসাবুদ, তবু নয়?”

“বলছি নয়। মোহন নেই। সে ফিরে আসতে পারে না।”

কিকিরা বললেন, “মোহন ফিরে এসেছে। আপনি কি তাকে দেখতে চান?”

লোচন থতমত খেয়ে গেল। কী বলছে ওই ম্যাজিকঅলা! লোকটার গালে থাপ্পড় মারার জন্যে হাত উঠে যাচ্ছিল লোচনের। বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠে সে বলল, “হ্যাঁ, চাই। দেখান তাকে।”

কিকিরা মিহিরবাবুর দিকে তাকাল।

মিহিরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ধীরে ধীরে। বললেন, “দেখাচ্ছি। সে এখানেই আছে। আনছি তাকে।” বলে উনি ডান দিকে এগোলেন। পরদা ফেলা ছিল। পরদা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

লোচন একেবারে খেপে গিয়েছিল। নিজের মনে চেঁচাতে লাগল, গালমন্দ শুরু করল

কিকিরা আর মিহিরবাবুকে।

কিকিরা বললেন, "অনর্থক চেঁচাচ্ছেন কেন? দু দণ্ড অপেক্ষা করতে পারছেন না? মোহনকে আগে দেখুন!"

"শাট আপ! মোহনকে দেখুন? আপনারা আমায় মোহন দেখাবেন? যত্তসব ধাপ্পাবাজ চোর-জোচ্চোরের দল! আপনাদের আমি কোর্টে নিয়ে যাব।"

"যাবেন। তার আগে মোহনকে দেখুন।"

"আমায় মোহন দেখাবেন! বেশ, দেখান। তবে জেনে রাখবেন-সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে না। মোহনও আর ফিরে আসবে না। আমার চোখের সামনে সে মারা গেছে।"

"মারা গেছে! ...আপনিই তাকে আর কত মারবেন দত্তবাবু! এতকাল তো মেরেই এসেছেন। এবার জ্যান্ত হতে দিন।"

লোচন যেন বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলল হঠাৎ। উত্তেজনার মাথায় চেঁচিয়ে উঠল, "না, সে জ্যান্ত হবে না। আমি তাকে মেরেছি। আমি। আমি নিজে। মরা মানুষ বেঁচে ফিরে আসে না।"

কিকিরা যেন হাসলেন। "আপনি স্বীকার করলেন আপনি মোহনকে মেরেছেন।"

"করলাম। মুখে করলাম। তাতে আমার কী হবে! আপনারা আমার কী করবেন মশাই! পুলিশে নিয়ে যাবেন? বলব, বাজে কথা, আমি কিছু বলিনি। কোর্ট-কাছারি করবেন? বলব, বানানো কথা সব... ।"

লোচনের কথা শেষ হল না, মিহিরবাবু ঘরে এলেন। সঙ্গে অমলেন্দু।

অমলেন্দুকে দেখে লোচন যেন বুঝতেই পারল না, কাকে দেখছে? চেনা, না, অচেনা কাউকে। স্তম্ভিত। মুখে আর কথা নেই।

মিহিরবাবু লোচনকে বললেন, "একে চেনো না? অমলেন্দু। মোহনের বন্ধু। তোমাদের সঙ্গে সেদিন ছিল।"

লোচনের মুখ কালো হয়ে উঠেছিল। গলা কাঠ। বলল, "ও এখানে কেন? কোত্থেকে এসেছে?"

কিকিরা ততক্ষণে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সেই বেলজিয়ান টেবিল লাইটার তুলে নিয়েছেন। তুলে নিয়ে মিহিরবাবুকে বললেন, "এই নিন স্যার। এটা রেখে দিন যত্ন করে। টেপ হয়ে গেছে সব কথাবার্তা। দত্তমশাই স্বীকার করছেন–নিজের ভাইকে তিনি মেরেছেন।" বলে কিকিরা লাইটার-টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলেন।

লোচন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। সে বুঝতে পারছিল না কী করবে। পালাবে, না, কিকিরার হাত থেকে জিনিসটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

মিহিরবাবু বললেন, "লোচন, ওই টেপে তোমার স্বীকারোক্তি ধরা থাকল। আর দু নম্বর প্রমাণ, সাক্ষী থাকল এই অমলেন্দু। তুমি মোহনকে ধাক্কা দিয়ে ঝরনার স্রোতে ফেলে

দিয়েছিলে। এবার তুমি কেমন করে বাঁচো তা আমরা দেখব। তুমি বাঁচতে পারবে না। ভাইকে তুমি মেরেছ। তুমি ভেবেছিলে তুমিই একমাত্র চালাক লোক, তোমায় কেউ ধরতে পারবে না। তুমি ধরা পড়েছ। পাঁচ বছরের চেষ্টা আজ আমার সফল হয়েছে।”

লোচন পালাবার চেষ্টা করল। পারল না। অমলেন্দু যেন লাফ মেরে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।

শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ ও কিকিরা

০১.

তারাপদ এসে দেখল, কিকিরা বসে বসে ফ্লুট বাজাচ্ছেন। দেখে অবাক হয়ে গেল। যাত্রাদলের বাজনদারদের মতন চোখ বুজে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে ফ্লুট বাজানোর শখ যে কেন চাপল কিকিরার কে জানে। হাসিও পাচ্ছিল তারাপদর। কিকিরার ওই ছাতিতে কী ফ্লুট বাজে। প্যাঁ-পোঁ অদ্ভুত খাপছাড়া সং ছাড়া আর কিছুই আওয়াজ বেরোচ্ছিল না ফ্লুট থেকে। অথচ কিকিরার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন মেডেল-পাওয়া ফ্লুটমাস্টার।

তারাপদ হেসে ফেলে ডাকল, "স্যার?"

সাড়া দিলেন না কিকিরা, তারাপদকে দেখলেন মাত্র।

তারাপদ খুব বিনীতভাবে বার-তিনেক 'স্যার স্যার' করল।

কিকিরা মুখের সামনে থেকে বাদ্যযন্ত্রটি সরালেন শেষ পর্যন্ত। বললেন, "এসো।" বলে দম নিতে লাগলেন।

তারাপদ বলল,"স্যার, এটা কী বাজাচ্ছিলেন?"

"ক্ল্যারিনেট। তোমরা বলো, ক্ল্যারিওনেট।"

"ফ্লুট নয়?"।

"গোলাপও চেনো না, গাঁদাও চেনো না। যা তোমার মুখে আসে বলে যাচ্ছ।" বলে বাদ্যটি কোলের ওপর রাখলেন। "ফু-লু-ট। ঘা, ও ভদ্রলোকে বাজায়।"

তারাপদ হাত জোড় করে হাসতে হাসতে বলল, "সত্যিই স্যার, কোনোটাই চিনি না। তা আপনি হঠাৎ প্যাঁ-পোঁ শুরু করলেন কেন? যাত্রাদল খুলবেন নাকি।"

কিকিরা মুখ-চোখের অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে বললেন, "আমি কিকিরা দি গ্রেট, আমি খুলব যাত্রার দল। বলছ কী?"

তারাপদ হাসির তোড়েই বলল, "আপনি কিকিরা দি ওয়ান্ডার... : গ্রেট ম্যাজিশিয়ান। কখন কী মতি হয় আপনার কে জানে।"

কিকিরা এবার খানিকটা খুশি-খুশি মুখ করে বললেন, "ব্যাপারটা কী জানো তারাপদ। এই জিনিসটি আমি নটবর কর্মকারের কাছ থেকে কালই কিনেছি। চোর-বাজারের নটবর। বেটা নিজেও পয়লা নম্বর থিফ। আমায় বলল, অ্যালফ্রেড থিয়েটারের শশী শীল এই ক্ল্যারিওনেটটি বাজাতেন। গায়ে নাম লেখা আছে এস এস।"

"শশী শীল কে?"

"তোমাদের নিয়ে জ্বালা। কিস্যু জানো না। শশীবাবু ছিলেন পয়লা নম্বর ক্ল্যারিওনেট হ্যান্ড। মাস্টার লোক। পিয়ানোয় দু'কড়ি, বেহালায় ছোটু বড়াল আর ক্ল্যারিওনেটে শশী শীল–এরা ছিলেন থ্রি মাস্টারস। লোকে বলত, থ্রি মাসকেটিয়ারস। সেকালের থিয়েটারপাড়া কাঁপিয়ে রাখতেন ওঁরা। তিনজনেই মারা যান ভিখিরির মতন। ছেলেপুলেগুলো যে যা পেরেছে বাপ-ঠাকুরদার জিনিস বেচে দিয়েছে।"

তারাপদ বলল, "ও! ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলাম। শশীর ছেলে কাশী বাপের জিনিস চোরা বাজারে ঝেড়ে দিয়েছিল কবে, সেই জিনিসটি আপনি কিনেছেন। এই তো?"

কিকিরা বললেন, "শশীর ছেলে, কাশী না ঋষি–আমি জানি না বাপু। জিনিসটা নটবরের কাছে এসেছিল, কিনে নিলাম। কত মূল্যবান জিনিস বলো?"

তারাপদ মাথা নাড়ল। কিকিরা যা কিনে এনে জড়ো করেন, সবই যে মহামূল্যবান–এটা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। পাথুরেঘাটার কোন যদু মল্লিক যে কলকেটিতে দম মেরে নিয়ে টপ্পা গাইতেন, সেই বাঁধানো কলকেটিও যে অতি মূল্যবান–কিকিরার কাছে তাও স্বীকার করে নিতে হবে। নয়ত বিপদ।

কিকিরা এবার উঠলেন, "জল খেয়ে আসি বোসো। চায়ের কথা বলে দিই বগলাকে। কী খাবে চায়ের সঙ্গে। বার্মিজ ওমলেট খাও। চট করে হয়ে যাবে।"

তারাপদ মুখ টিপে হাসল, বলল, "যা হোক হলেই হল। আপনার এখানে এত রকম খাবার খেয়েছি যে, চাঁদু বলে কুকিং-এর ব্যাপারেও আপনি অরিজিনাল... ।"

"কোথায় সেই স্যান্ডেল উড?"

"পরে বলছি, আপনি জল খেয়ে আসুন।"

কিকিরা আর দাঁড়ালেন না। ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

কিকিরা চলে যাবার পর তারাপদ অন্যমনস্কভাবে ঘরের চারদিক দেখতে লাগল। মানুষটির সঙ্গে এই ঘরটির অদ্ভুত মিল। বিচিত্র ছাঁটের, আর বেয়াড়া রংচং-অলা এক আলখাল্লা-পরা কিকিরাকে বাড়িতে যেমনটি দেখায় এই ঘরটিও সেইরকম অদ্ভুত দর্শন। এ-ঘরে কী নেই? কিকিরার সিংহাসন-মাক চেয়ার ছাড়াও যত্রতত্র বিচিত্র সব জিনিস ছড়ানো। পুরনো দেওয়ালঘড়ি, চিনে মাটির জার, বড় বড় পুতুল, কালো ভুতুড়ে আলখাল্লা, চোঙাঅলা সেকেলে গ্রামোফোন, ম্যাজিকঅলার আই বল, ফিতে জড়ানো ধনুক, পাদরিসাহেবের টুপি, ম্যাজিক ছাতা আর তলোয়ার, পায়রা-ওড়ানো বাক্স, টিনের চোঙ-কোনটা নয়! তার সঙ্গে এক-দু'মাস অন্তর জমানো ম্যাজিক-মশাল, গাঁজার কলকে, বাহারি মোমদান-এ-সব তো জমেই যাচ্ছে দিনের পর দিন। চন্দন ঠাট্টা করে। বলে, "কিকিরা আপনার এই মিউজিয়ামটির নাম দিন "ছানাবড়া ঘর, সত্যিই এই দৃশ্য দেখলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।"

কিকিরা ফিরে এলেন। আজ তাঁর পরনে হাফ-আলখাল্লা, মানে জামার হাত দুটো কনুই পর্যন্ত লম্বা, কোমরের ঝুল হাটুতক, জামার-রং নীল। মাথায় টুপি। নেই। রুক্ষ বড় বড় চুল ঘাড় পর্যন্ত ছড়ানো। লম্বা নাক, বসা গাল, সরু থুতনি আর বোগা হাড়জিরজিরে কিকিরার চেহারার মধ্যে কিন্তু কী-যেন একটা আকর্ষণ আছে। উনি মজাদার মানুষ এটা বোঝা যায়, আবার নজর করলে ওঁর ভালমানুষি স্বভাবটাও ধরা পড়ে। তারাপদরা অবশ্য জানে, কিকিরার বুদ্ধির ধারেকাছেও তারা পৌঁছতে পারবে না।

কিকিরা নিজের জায়গায় বসতে বসতে বললেন, "স্যান্ডেল উডের খবর কী যেন বললে?"

"চাঁদু হসপিটালে ডিউটি দিচ্ছে।"

"ওর এমনি খবর ভাল?"

"হ্যাঁ। তবে বলছিল, এবার না- ট্রান্সফার করে দেয়। কোনো গাঁ-গ্রামে পাঠিয়ে দেবে।"

"আগে দিক। তোমার খবর কী?"

"এমনিতে ভাল। তবে আপনার কাছে একটা খবর নিয়ে এসেছি।"

"কী খবর?"

তারাপদ পকেট থেকে কিছু-একটা বার করতে করতে বলল, "দেখাচ্ছি। আপনাকে। তার আগে গৌরচন্দ্রিকাটা সেরে নিই।"

"বলো?"

"আমাদের অফিসে জগন্নাথ দত্ত বলে একজন আছে। আমার চেয়ে বয়েসে খানিকটা বড়। আমরা বলি জগুদা। জগুদারা থাকে বিডন পার্কের দিকে। মানে সেকেলে পুরনো কলকাতা পাড়ার এক গলিতে। পৈতৃক বাড়ি। সাত শরিক। জগুদা মানুষটি খুব ভাল। মাটির মানুষ। কিন্তু জগুদার কতক রোগ আছে অদ্ভুত। কাছে গিয়ে আচমকা গায়ে হাত দিলে বা জোরে ডাকলে ভূত দেখার মতন চমকে ওঠে, সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে যায়, কেমন তোতলাতে শুরু করে, কথা বলতে পারে না অনেকক্ষণ। আমরা ঠাট্টা করে জগুদার নাম দিয়েছি নার্ভাস সিস্টেম, মানে ওর নার্ভাস সিস্টেমে গোলমাল আছে।"

কথার মাঝখানে চা নিয়ে এল বগলা।

বগলার সঙ্গে আগেই বাড়িতে পা দিতে-না-দিতেই তারাপদর কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। তারাপদ বলেছিল, "বগলাদা আমার পেটে আগুন জ্বলছে। আমাকে তুমি লুচি আর বেগুনভাজা খাওয়াবে। কিকিরার ওইসব মুলতানি আলুর দম, খানদানি কচুরি, কিসমিসের পকৌড়া আমায় খাওয়াবে না। আমার পেটের নাড়িভুড়ি আমারই বুঝলে তো, কিকিরার নয়। প্লিজ বগলাদা, সেরেফ লুচি আর বেগুনভাজা। কিকিরাকে কিছু বোলো না। উনি যখন জানবেন, তখন জানবেন। জানলেও তো গলা কাটতে পারবেন না।"

তারাপদর কথা মতনই বগলা লুচি-বেগুনভাজা নিয়ে এসেছে। অবশ্য কিকিরা খানিকটা আগেই সেটা ধরতে পেরেছেন। বগলাকে বার্মিজ ওমলেট বানাবার পরামর্শ দিতে গিয়ে দেখেন, সে লুচির ময়দা মেখে নিয়েছে।

বগলার সঙ্গে, তারাপদর চোখাচোখি হল। মুখ টিপে হাসল বগলা। তারাপদ একবার কিকিরার দিকে চোরের মতন তাকিয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে হাসল একটু।

খাওয়া শুরু করার আগেই তারাপদ একটা ইনল্যান্ড লেটার কার্ড এগিয়ে দিল কিকিরাকে।

কিকিরা বললেন, "কী আছে এতে?"

“পড়ে দেখুন।”

“পড়ছি। আগে মুখে শুনি।”

তারাপদ লুচি মুখে দিল। চিবোতে চিবোতে বলল, “ক্লীং রিং হিং…”

ইনল্যান্ড চিঠিটা দেখতে দেখতে কিকিরা বললেন, “মানে?” বলে চোখ তুলে তারাপদর দিকে তাকালেন, “হিং টিং ছট?”

তারাপদ বলল, “আপনি চিঠিটা মন দিয়ে পড়ুন–আমি ততক্ষণে একটু ইট করে নিই, ভেরি হাংগরি, স্যার।”

কিকিরা চিঠি পড়তে লাগলেন।

তারাপদর সত্যিই খিদে পেয়েছিল খুব। খেতে-খেতে কিকিরার চোখ-মুখ দেখছিল। কিকিরা চিঠি পড়তে পড়তে এতই অবাক হচ্ছিলেন যে, তাঁর চোখের পলক পড়ছিল না, মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছিল।

বার-দুই চিঠিটা পড়ে কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন। “কী ব্যাপার হে! এই শুদ্ধানন্দ প্রেসিদ্ধ কল্পবৃক্ষঃ-টি কে?” কল্পবৃক্ষঃ-এর বিসর্গটি বেশ জোরের সঙ্গে মজার গলায় উচ্চারণ করলেন। তারপর ঠাট্টা করে বললেন, “এ যে তোমার স্যাংসক্রিট ট্রি।”

খানিকটা খাওয়ার পর তারাপদর আর তাড়া ছিল না। জলও খেয়েছে আধগ্লাস মতন। কিকিরার কথায় হেসে ফেলল। তারপর ধীরেসুস্থে খেতে লাগল। বলল, “কে আমি কেমন করে জানব স্যার। উনি নিজেই বলেছেন প্রেতসিদ্ধ এবং কল্পবৃক্ষঃ।”

কিকিরা বললেন, “তা তো দেখছি। উনি আবার বিশুদ্ধ প্রেসিদ্ধ। মানে দাগমারা খাঁটি প্রেত-সিদ্ধপুরুষ। ভেজাল নয়। এরকম মহাত্মা ব্যক্তি তো আগে আমি দেখিনি, তারাপদ।…ক্লীং রিং হিং…বাঃ, এ যেন ভূতের হাতে বেল রিংগিং…ছন্দ আছে হে, বাজছে ভাল…ক্লীং রিং হিং…।”

তারাপদ বলল, “চিঠিটা স্যার আমি জগুদার কাছ থেকে কেড়েকুড়ে নিয়ে এলাম। বললাম, আমাকে দাও, আমি একজনকে জানি, যিনি ভূত-প্রেতের ব্যাপারে মাস্টার। এ টু জেড পর্যন্ত জানেন ভূতপ্রেতদের। ওঁর কাছে ভূতপ্রেতদের ডিরেক্টরি আছে–খুঁজে বার করে নেবেন নামধাম…” বলে তারাপদ হাসতে লাগল, “ঠিক বলিনি স্যার?”

কিকিরা বললেন, “দাঁড়াও, আরও একবার পড়ি চিঠিটা। তুমিও শোনো।”

কিকিরা চিঠি পড়তে শুরু করলেন

“ক্লীং রিং হিং

কাঁঠালতলা গলি

টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট (উঃ)

কলিকাতা

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫

মহাশয়,

আমাদের পরমারাধ্য গুরু প্রেতসিদ্ধ কল্পবৃক্ষঃ শুদ্ধানন্দজির আশীর্বাদ জানিবেন। তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী এই পত্র লিখিতেছি।

গত ২০ অগ্রহায়ণ রাত্রিকালে গুরু শ্রদ্ধানন্দজি যখন সূক্ষ্ম শরীরে আত্মালোকে বিচরণ করিতেছিলেন তখন আপনার পরমারাধ্যা পরলোকবাসী মাতৃদেবী সুরমা দেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। আপনার দুর্দশা বিষয়ে মাতৃদেবী সবিশেষ অবগত আছেন। তাঁহার ব্যাকুলতারও অবধি নাই। আপনি যে আর্থিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহাতে তিনি অতীব কাতর। আপনার ভগ্নির বিবাহ অবশ্যই হইবে, অর্থ ও অলঙ্কারের জন্য আটকাইবে না। আপনার মাতৃদেবী তাঁহার ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অলঙ্কারগুলি গোপনে এমন স্থানে গচ্ছিত রাখিয়াছেন, যাহা আপনারা কেহই জানেন না। আকস্মিক মৃত্যু হেতু তিনিও আপনাকে কিছু জানাইয়া যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে জানাইতে চান। প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে জানানো সম্ভব নয়, যেহেতু তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে আত্মালোকে বিচরণ করিতেছেন, আর আপনি মর্ত্যলোকে। যাহাই হউক, প্রেতসিদ্ধ শুদ্ধানন্দজি মারফত নিজ পুত্রকন্যার সুখ শান্তির জন্য তিনি গোপন বিষয়টি জানাইতে ইচ্ছুক। তিনি যে কী পরিমাণ ধনরত্ন রাখিয়াছেন আপনি জানেন না। এ-বিষয়ে আপনি যত শীঘ্র সব শুদ্ধানন্দজির সহিত সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ করুন।

আমাদের পরমারাধ্য গুরু শুদ্ধানন্দজি একাদশ তন্ত্রমন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ। মাত্র চতুর্দশ বৎসর বয়েসে গৃহত্যাগ করিয়া ইষ্ট গুরু অন্বেষণ করিয়াছেন। পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, জনপদ-শ্মশান–এই দেশের কোথায় না ভ্রমণ করিয়াছেন, কত মহাসাধন্দ্রে সংস্পর্শেই না আসিয়াছেন। দুঃখীর দুঃখ মোচন, দুর্গতজনের দুর্গতি দূর করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত।

আপনি অবিলম্বে শুদ্ধানন্দজির সহিত সাক্ষাৎ করুন। উদ্বেগ দুশ্চিন্তা দূর হইবে। আসিবার পূর্বে পত্র দিবেন।

গুরুজির আশীবাদ লইবেন। ইতি

নিবেদক, কৃষ্ণমূর্তি।

পুনশ্চ পত্রটি সঙ্গে আনিবেন। পত্র-বিষয়ে গোপনতা অবলম্বন না করিলে আপনর শত্রুজন হইতে ক্ষতির আশঙ্কা।“

চিঠি পড়া শেষ হল। কিকিরা যেন হাঁফ ছাড়লেন।

তারাপদ চা খেতে শুরু করেছিল। লুচি খাওয়ার পর্ব শেষ।

কিকিরাও চায়ের কাপ টেনে নিলেন। বললেন, “হাতের লেখাটি বেশ। ছাপার হরফ যেন।”

“হ্যাঁ, মুক্তাক্ষর। কিন্তু কিকিরা চিঠি থেকে কী আন্দাজ হচ্ছে আপনার?”

“কী আন্দাজ করতে বলছ?”

“বাঃ, আপনি হলেন কিকিরা দি গ্রেট! ভুজঙ্গ কাপালিকের ভুতুড়ে খেলা আপনি ধরতে

পেরেছিলেন, আর এ তো কোন শুদ্ধানন্দ। আপনার কাছে ছেলেমানুষ স্যার।”

কিকিরা চা খেতে-খেতে বললেন, “তোমার অফিসের বন্ধুর নাম যেন কী বললে?”

“জগন্নাথ দত্ত। আমরা জগুদা বলি।”

“মা নেই?”

“না, মা মারা গিয়েছেন বছরখানেকের ওপর। বাবা অনেক আগেই।”

“বোন আছে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। একটি মাত্র বোন। জগুদার নিজের কোনো ভাই নেই। বোনই সব।”

“বোনের বিয়ে?”

“কথাবার্তা হয় মাঝে-মাঝে, এগোতে পারে না। বিয়ে দেবার ক্ষমতা জগুদার নেই। যা মাইনে পায় দুই ভাই-বোনের চলে যায় কোনোরকমে। আমারই মতন অবস্থা, কিকিরা। আমি তবু ঝাড়া হাত-পা। একা মানুষ।”

কিকিরা হাত বাড়িয়ে চিঠিটা রেখে দিলেন, দিয়ে চুরুটের খাপ টেনে নিলেন।“কী তুমি বলছিলে তখন? সাত শরিকের বাড়ি…?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। কলকাতার সেকেলে বনেদি পরিবার একটা বাড়ি আছে তিন-চার পুরুষের। সে বাড়ির চেহারা দেখলে মনে হবে, মাথার ওপর বাড়ি পড়ো-পড়ো।”

কথাটা আর তারাপদকে শেষ করতে দিলেন না। কিকিরা বললেন, “বুঝেছি। ইট বার করা, ভাঙা, অশ্বত্থ গাছের ডালপালা গজিয়েছে ভাঙা, ফাটা দেওয়ালে। গঙ্গাজলের, ফাটাফুটো ট্যাংক, গিরগিটি, টিকটিকির আড়ত…এই তো।”

“ইয়েস স্যার।”

“কজন শরিক?”

“মুখে বলি সাত শরিক। তা জগুদা বলে চার শরিক।”

“শরিকরা তোমার জগুদারই আত্মীয় তো?”

“হ্যাঁ, খুড়তুতোর খুড়তুতো, জেঠতুতোর জেঠতুতে। ভেরি কমপ্লিকেটেড স্যার।“

“জগন্নাথের সঙ্গে সম্পর্ক নিশ্চয় ভাল নয়।”

“কেমন করে হবে। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অভাবী সকলেই। তাদেরও ঘাড়ে বড় বড় সংসার। ওর মধ্যে দু-একজন ধড়িবাজও আছে।”

“বুঝেছি।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিকিরা একটা চুরুট ধরালেন। আঙুলের মতন সরু, লম্বায় ছোট।

তারাপদ বলল, “ব্যাপারটা পুরো চিটিংবাজি। নয় কি?”

“তা আর বলতে। তবে দেখতে হবে প্রেতসিদ্ধ কল্পবৃক্ষ শুদ্ধানন্দটি কে? কী তার মতলব? কে তাকে বলেছে জগন্নাথের মা মারা যাবার আগে বেশ কিছু গয়নাগাটি ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন?”

“আমিও তাই বলি। এমন কে আছে যে এই কাজ করবে? কেনই-বা করবে? কিসের স্বার্থ তার? নাকি জগুদার সঙ্গে কেউ তামাশা করছে?”

কিকিরা চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুরুট ফুকলেন। তারপর বললেন, “তোমার জগুদা কী বলছে? তামাশা?”

তারাপদ মাথা নাড়ল। বলল, “জগুদা ভীষণ ভাল, নিরীহ। ভিতু। যে যা বলে জগুদা বিশ্বাসও করে নেয়। আমি কথা বলেছি জগুদার সঙ্গে। দেখলাম মায়ের কথাটা সে বিশ্বাস করে নিয়েছে।”

কিকিরা বললেন, “কোন কথাটা? মায়ের সঙ্গে শুদ্ধানন্দর দেখা হওয়া, না গয়নাগাটি লুকিয়ে রাখা?”

“দুটোই। বলে তারাপদ চায়ের কাপ সরিয়ে রাখল। ঢেকুর তুলল বড় করে। বলল, “জগুদা খুবই মাতৃভক্ত। বাবা মারা গিয়েছেন বছর আট-নয় আগে। তখন জগুদার বয়েস কম। মাথার ওপর মা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। বোনও ছোট। কত কষ্ট সহ্য করে মা তাদের মানুষ করেছেন। জগুদা বলে, মা না থাকলে ওরা ভেসে যেত। শক্ত হাতে মা হাল ধরেছিলেন বলে ওরা বেঁচে গিয়েছে।”

কিকিরা অন্যমনস্কভাবে বললেন, “বেশ তা না হয় হল। কিন্তু মা যে যথেষ্ট সোনাদানা লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করছে তোমার জগুদা?”

তারাপদ বলল, “আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। জগুদা বলল, ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। মা ছিলেন হিসেবি, বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ। ভবিষ্যতের কথা সব সময় ভাবতেন। বিশেষ করে বোনের কথা। তা ছাড়া সেকালের বনেদি বাড়ির বউ, জগুদার দাদামশাই-দিদিমাও একসময়ের পয়সাঅলা লোক। নিজের মায়ের কাছ থেকে জগুদার মা নিশ্চয় অনেক কিছু পেয়েছিলেন। জগুদারা ছেলেবেলায় মায়ের গয়নাগাটি দেখেছে।”

“না হয় দেখল। কিন্তু তারাপদ, জগুদার মা সব সোনাদানা লুকিয়ে রাখবেন কেন?”

তারাপদ বলল, “বাড়ির অন্যদের ভয়ে। জগুদার যেসব জ্ঞাতিরা ও বাড়িতে থাকে তাদের দু-একজন পয়লা নম্বরের শয়তান। চোর, গুণ্ডা, বদমাশ। ওদের ভয়েই মা সোনাদানা লুকোতে পারেন।”

কিকিরাও চা শেষ করে চায়ের কাপ সরিয়ে রাখলেন। নিজের মনেই কিছু ভাবছিলেন। ঘর বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। শীত এখনও পড়েনি। তবে এই সন্ধের মুখে গা শিরশির ভাব হয়। উঠলেন কিকিরা। বাতি জ্বালিয়ে দিলেন ঘরের।

“তা হলে?” কিকিরা বললেন হঠাৎ।

তারাপদ বলল, “আপনি বলুন?”

“তুমি বলছ, এই প্রেতসিদ্ধ শুদ্ধানন্দ মহারাজকে একবার দেখা দরকার। তাই না?”

“রাইট স্যার।”

“তোমার জগুদা কি মহারাজের কাছে গিয়েছে?”

“না। তার যাবার ইচ্ছে। ভয়ে যেতে পারছে না।”

“চিঠিটা কতদিন হল পেয়েছে ও?”

“দিন পাঁচেক।”

“কাকে কাকে দেখিয়েছে?”

“আমাকে আর ঘোষালদাকে।“

“ঘোষালদা লোকটি কে?”

“আমাদের সিনিয়ার। জগুদার খুব বন্ধু।”

“চিঠি দেখে কী বলল, ঘোষাল?”

“বলল, বাজে ব্যাপার, ফালতু। জগুদার সঙ্গে কেউ মজা করেছে। ভিতু মানুষ জগুদা, ভয় দেখিয়ে তামাশা করেছে।”

কিকিরা নিজের জায়গায় এসে বসলেন। মাথার চুল ঘাঁটলেন। বললেন, “তা তোমার জগুদাকে নিয়ে এলে না কেন?”

“আনতাম। ভাবলাম আপনাকে না বলে আনা কি ভাল হবে। তা ছাড়া জগুদাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনতে হবে। বললেই যে জগুদা আসবে মনে হয় না। ধরে আনতে হবে।”

কিকিরা বললেন, “তবে তাই নিয়ে এসো। কথা বলে দেখি। ভাল কথা, চন্দনকে কিছু বলেছ?”

“না। সময় পেলাম না। কাল-পরশু বলব।”

“ঠিক আছে।...আপাতত তুমি তোমার জগুদাকে ম্যানেজ করো। করে এখানে নিয়ে এসো। দেখি, কথা বলে দেখি। তারপর কিছু একটা করা যাবে।”

০২.

দিন তিনেক আর দেখা নেই তারাপদর।

চারদিনের দিন সন্ধের মুখে তারাপদ হাজির, সঙ্গে চন্দন আর নতুন একটি ছেলে। পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই কিকিরা বুঝে নিলেন, ছেলেটি জগন্নাথ।

ঘরে পা দিয়েই তারাপদ বলল, "কিকিরা-স্যার, আপনার স্যান্ডেল উডকে ধরে এনেছি। আর এই আমাদের জগুদা।"

কিকিরা হাসিমুখে বললেন, "এসো। বোসো হে জগন্নাথবাবু, বোসো।" বলে চন্দনের দিকে তাকালেন। "কিসের এমন ডিউটি তোমার স্যান্ডেল উড? আজ মাসখানেক বেপাত্তা হয়ে রয়েছ?"

চন্দন বলল, "বলবেন না, হাসপাতালে গণ্ডগোল, অর্ধেক লোক ছুটিতে। খেটে-খেটে মরছি। তার ওপর শুনছি, জানুয়ারিতে নাকি আমাকে বাইরে ট্রান্সফার করে দেবে। কোথায় দেবে কে জানে! অজ গাঁ-গ্রামে ঠেলে দেবে! আমার মন-মেজাজ বড় খারাপ, কিকিরা!"

কিকিরা বললেন, "জানুয়ারি! তার এখন মাস-দুই দেরি। এখন থেকে মেজাজ খারাপ করছ কেন! এখন সবেই নভেম্বরের গোড়া!"

চন্দন বলল, "আপনার আর কী? ভিলেজ ডাক্তারির ঝক্কি তো জানেন না। হাসপাতালের দরজায় বড়ি ফেলে দিয়ে পালায়। ডেঞ্জারাস?"

তারাপদ রগড় করে বলল, "তোর বডিও একদিন ফেলে দেবে, চাঁদু তুই বরং চাকরি ছেড়ে দে, দিয়ে নফর কুণ্ডু লেনে পি. পি. শুরু কর।

কিকিরা বললেন, "পি. পি-টা কী?"

"প্রাইভেট প্র্যাকটিস" বলে হাসতে লাগল তারাপদ। হাসতে হাসতে বলল, "খুব কম খরচে বসে যেতে পারবি। একটা টেবিল, দু-তিনটে চেয়ার, বেঞ্চি একটা। ব্যস! আর তোর লাগবে নাম-ছাপানো প্যাড। একটা স্টেথো। সেটা তোর আছে। কত কম খরচে ব্যবসা বল!"

কিকিরা, চন্দন, দুজনেই হেসে উঠলেন।

জগন্নাথ হাসল না। সে একে নতুন লোক, তায় কিকিরার চেহারা, পোশাক, এই অদ্ভুত ঘরটি দেখে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারাপদ তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথায় ধরে এনেছে? কিকিরাকে দেখলে তো সাকাসের জীব মনে হয়। আর এই ঘরটা যেন চিতপুরের থিয়েটারের সাজ-ভাড়া দেওয়া কোনো দোকান-টোকান।

জগন্নাথ রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ছিল। তারাপদ অবশ্য আগেই বলে দিয়েছিল, "জগুদা, তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে ভড়কে যাবে না, আমাদের কিকিরা রহস্যময় পুরুষ, মিস্টিরিয়াস ক্যারেকটার কিকিরা দি গ্রেট, কিকিরা দি ওয়াভার। ওঁর বাইরের স্টাইল দেখে ভেতরের ব্যাপার বুঝবে না। বাইরে উনি সাকাসের ক্লাউন, ভেতরে হুডিনি। ম্যাজিশিয়ান হুডিনি নাম শুনেছ তো? কিকিরা হলেন হুডিনি প্লাস শার্লক হোমস।"

জগন্নাথের মনে হল, তারাপদ বাজে কথা বলেছে। কিকিরার ওপর ভরসা করা মানে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া।

তারাপদ জগন্নাথের মুখ দেখে বুঝতে পারছিল জগুদা বেশ হতাশ। কিকিরার দিকে তাকাল সে। বলল, “কিকিরা-স্যার, জগুদার সঙ্গে আপনি কথা বলুন। জগুদা ভাবছে, এ-কোথায় তাকে নিয়ে এলুম! ঘাবড়ে গিয়েছে বেচারি।”

কিকিরা জগন্নাথের দিকে তাকালেন, বললেন, “আগে কথা, না, চা?”

“চা আসছে। বগলাদাকে বলে এসেছি।”

কিকিরা বললেন, “ভাল করেছ। তা জগন্নাথবাবু, আপনি কি প্রেসিদ্ধ কল্পবৃক্ষর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন?” মজার ঢঙেই বললেন কিকিরা।

জগন্নাথ থতমত খেয়ে গেল। কিকিরার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল, কথা বলতে পারল না।

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, “কিকিরা, হাউ স্ট্রেঞ্জ! আপনি কেমন করে জানলেন?”

কিকিরা হেসে বললেন, “ভৌতিক উপায়ে। আমি স্পিরিট ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। দু’দিন চেষ্টা করে লাইন পেলাম। কলকাতার টেলিফোনের মতন ওদের লাইনেও গোলমাল, জট পাকিয়ে আছে। আমাদের যেমন বর্ষা ওদের তেমন শীত–বেশি কুয়াশা হলেই লাইন নষ্ট বারবার রং নাম্বার।” বলে কিকিরা হাসতে লাগলেন।

তারাপদরা হেসে ফেলল।

শেষে তারাপদ বলল, “আপনি ঠিকই ধরেছেন। জগুদা শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।”

“কবে?”

তারাপদ জগন্নাথের দিকে তাকাল। মানে সে জগুদাকেই জবাবটা দিতে বলল।

জগন্নাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বলল, “গত পরশু।”

“দেখা হল প্রেতসিদ্ধর সঙ্গে?”

“আমি বাড়িটার মধ্যে ঢুকিনি। ঢুকতে ভয় হল। বাইরে থেকে দেখে এলাম।”

“বাইরে থেকে! কী দেখলে?”

“গলির নাম কাঁঠালতলা নয়। লোকে বলে, কাঁঠালতলা। গলির মুখে বিরাট এক কাঁঠালগাছ। কত কালের গাছ কে জানে! সরু গলি, বাই লেনের মতন। ইট বাঁধানো গলির একদিকে কোনো বড় গুদোম-টুদোম হবে, কিসের জানি না, পাঁচিল তোলা রয়েছে। মাথায় পুরনো টিনের ছাউনি। লঙ্কার ঝাঁঝ নাকে আসছিল। বোধ হয় মশলাপাতি থাকে ওখানে। মশলা-গুদোম। বাঁ দিকে গুদোম, ডান দিকে ভাঙাচোরা কয়েকটা বাড়ি। অনেক পুরনো। ওখানে কারা থাকে জানি না, জনকতক মুটে-মজুর, ঠেলাওয়ালা দেখলাম। গলির শেষে একটা

পোড়ো বাগানবাড়ির মতন বাড়ি। সামনের দিকে ঝোঁপঝাড়, আগাছা। ভেতরে এক বাড়ি। কম সে কম শ' সোওয়া-শো বছরের হবে।"

কিকিরা বললেন, "তুমি বাড়ির কাছে গিয়েছিলে?"

মাথা নেড়ে জগন্নাথ বলল, "খুব কাছে যাইনি। যেতে ভয় করছিল।"

"ভয় ছিল! কিছু দেখলে ওখানে?"

"আজ্ঞে দেখেছি।"

"কী দেখলে?"

"দু-তিনজনকে দেখলাম, বাড়িটার মধ্যে ঢুকছে।"

"একসঙ্গে?"

"প্রথমে ঢুকল দু'জন। খানিকটা পরে একজন।"

"সাজপোশাক কেমন, বয়েস কত হবে আন্দাজে, বাঙালি না অন্য কিছু?"

জগন্নাথ বলল, "তিনজনেই বাঙালি বলে মনে হল না। অবাঙালিও রয়েছে। বয়েস কম নয়। আমার চেয়ে বড়। একজনের তো মাথার চুলই সাদা-সাদা লাগল। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, জ্যোৎস্নাও ফুটেছিল। তবু আমি ভাল করে দেখতে পাইনি। আমার ভয়ও করছিল। আমি যেখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানটায় বোধ হয় আগে দরোয়ানের ঘর ছিল। এখন সব ভাঙাচোরা, চারদিকে কুলঝোঁপ!"

কিকিরা বললেন, "কতক্ষণ ছিলে তুমি?"

"বড়জোর আধ ঘণ্টা।"

"আর কিছু দেখোনি?"।

"আজ্ঞে, আর-একটা জিনিস দেখেছি। একটা লোক বড় প্লাস্টিকের বস্তার মধ্যে কাকে যেন পুরে কাঁধে করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।"

চন্দন আর তারাপদ চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিকিরাও যেন অবাক হলেন।

তারাপদ কিকিরাকে বলল, "জগুদা আমাকে বলেছে, স্যার। আমার মনে হয়, জগুদা ভুল দেখেছে। আজকাল কত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়, আপনি দেখেছেন! জগুদা বলছে, বাড়িটার কাছাকাছি কোনো আলোও জ্বলছিল না। ব্যাপারটা চোখের ভুল।"

কথার মধ্যে বাধা দিয়ে জগন্নাথ বলল, "চোখের ভুল নয়। আমি দেখেছি। অন্ধকার হয়ে এলেও এখন শুক্লপক্ষ। চাঁদের আলো ছিল। গতকাল পূর্ণিমা গিয়েছে।"

কিকিরা বললেন, "প্লাস্টিকের ব্যাগে লোক ঢোকে কেমন করে?"

জগন্নাথ বলল, “বড় ব্যাগ। মুড়ি-অলারা যেমন প্লাস্টিকের ব্যাগ মাথায় নিয়ে মুড়ি বিক্রি করতে যায়, সেইরকম।“

“ব্যাগের মধ্যে মানুষ ছিল তুমি বুঝলে কেমন করে?”

“দেখলাম।”

“ভুল দেখোনি?”

“কী জানি, আমার চোখে তো মানুষই মনে হল।”

চন্দন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবারে বলল, “একজন মানুষের ওজন কত হতে পারে? রোগাসোগা হলেও মিনিমাম চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কেজির মতন। সাবালকের কথা বলছি। বাচ্চা-কাচ্চা হলে অন্য কথা। একজন সাবালক, মানুষকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা কথা?”

জগন্নাথ বলল, “বাঃ, ঘাড়ে-পিঠে করে আমরা মানুষ বই না! আগের দিনে কলকাতার বাবুরা ঝাঁকামুটের মাথায় চেপে অফিস-কাছারি যেত।”

চন্দন হেসে ফেলে বলল, “সেই মুটে, সেই বাবু এখন আর নেই। জগন্নাথবাবু! অবশ্য হ্যাঁ, ঘাড়ে-পিঠে আমরা মানুষ বই বইকি এখনও। তবে তার প্রসেস আলাদা।”

কিকিরা বললেন, “তুমি কি ঠিকই দেখেছ, জগন্নাথ?”

“আমার তাই মনে হয়।”

কিকিরা কথা ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন, “তুমি তারপরই চলে এসেছ।

“হ্যাঁ। আমার এমনিতেই ভয় করছিল। তার ওপর লোকজন ঢুকছে, প্লাস্টিকের ব্যাগে-ভরা মানুষ, এইসব দেখে আমি পালিয়ে এলাম”।

তারাপদ বলল, “কিকিরা-স্যার, জগুদা এমনিতেই ভিতু মানুষ, নার্ভাস, নিরীহ। জগুদা যে কেমন করে ওখানে গিয়েছিল, কোন সাহসে, তাই আমি বুঝতে পারছি না। না।”

জগন্নাথ কোনো জবাব দিল না।

এমন সময় চা নিয়ে এল বগলা। গোল বড় ট্রে করে চা এনেছে। চায়ের সঙ্গে ডালপুরি, আলুর দম; একটা করে ডবল শোনপাপড়ি।

কিকিরা বললেন, “নাও হে তোমরা, হাত লাগাও। এ ডালপুরি হাউস মেড নয়, গণেশের দোকানের। ভালই করে। খাও।”

নিজে কিকিরা কিছু নিলেন না, শুধু চায়ের কাপটি তুলে নিলেন।

চন্দন খাবারের দিকে হাত বাড়াল। বলল, “গরম আছে রে তারাপদ, নিয়ে নে। আপনিও নিন জগন্নাথবাবু।“

ওরা খাওয়া শুরু করল।

কিকিরা জগন্নাথকে লক্ষ করতে লাগলেন। আধময়লা রং জগন্নাথের। মাথায় মাঝারি। সামান্য গোলগাল চেহারা। মাথায় চুল কম। মুখটি দেখলেই বোঝা যায়, ছেলেটি নিরীহ ধরনের, গোল-গোল চোখ, মোটা নাক, ছোট কপাল। কত আর বয়েস হবে। বড়জোর ঊনত্রিশ-ত্রিশ।

কিকিরা জগন্নাথকে বললেন, "এবার একটা কথা বলো তো?"

তাকিয়ে থাকল জগন্নাথ।

"তুমি যে ওই প্রেতসিদ্ধ কল্পবৃক্ষটির কাছে গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে?"

জগন্নাথ চুপ। যেন তার মুখে কোনো জবাব জুটছে না। ইতস্তত করতে লাগল। চোখ নিচু করল।

কিকিরা নিজেই বললেন, "তুমি ওই প্রেতসিদ্ধর চিঠির কথা বিশ্বাস করো?"

জগন্নাথ চোখ তুলে তারাপদর দিকে তাকাল, চন্দনকেও দেখল। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। বোধ হয় তার সঙ্কোচও হচ্ছিল। শেষে ভাঙা-ভাঙা ভাবে সামান্য আড়ষ্ট হয়ে বলল, "দেখতে গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"মনে হল..."

"তোমার মনে হল, ওই লোকটার কথা যদি সত্যি হয়। তাই না?"

জগন্নাথ আবার চোখ নিচু করল। অল্প সময় চুপ করে থেকে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ..আপনি আমাদের বাড়ির কথা কিছু জানেন না। আমার বাবা একজন জুয়েলার ছিলেন। অবস্থা পড়ে যাবার পর তিনি নিজে আর তেমন ব্যবসাপত্র করতে পারতেন না। কলকাতার কয়েকটা বড়-বড় জুয়েলারের দোকানে আসা-যাওয়া করতেন। তাদের পাথর-টাথর পরখ করে দিতেন। নিজে কোনো অডার পেলে দোকান থেকে কিনিয়ে দিতেন। তাঁর একটা কমিশন থাকত।" কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল জগন্নাথ। যেন বাবার কথা ভাবছিল। খানিকটা উদাস বিষণ্ণ হয়ে থাকল অল্পক্ষণ। পরে আবার বলল, "আমার বাবা অদ্ভুতভাবে মারা যান। একদিন বর্ষার সময় রাত করে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি যখন, তখন একটা মোটর সাইকেল এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। বাবা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান রাস্তায়। তাঁর কোমরের কাছে লেগেছিল। বাবাকে রাস্তায় পড়ে যেতে দেখে দুজন পাড়ার রিকশঅলা হইচই করে ওঠে। মোটর সাইকেলঅলা পালিয়ে যায়। বাবাকে ওরা বাড়ি পৌঁছে দেয়। কিন্তু বাবার কোথায় যে লেগেছিল কে জানে, দিন-তিনেকের মাথায় হাসপাতালে মারা যান। বাবা কম বয়েসেই মারা গেলেন।"

কিকিরা জগন্নাথের বিষণ্ণ মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন, তারপর নরম গলায় বললেন, "কী আর করবে! তোমার ভাগ্য! ওই তারাপদরও তো একই অবস্থা। ওকেও মা বাবা হারাতে হয়েছে কম বয়েসেই।"

তারাপদ বলল, "আমি জগুদাকে বলেছি সব। ও-নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ নেই। আমাদের মতন আরও কত ছেলেমেয়ে আছে!"

কিকিরা বললেন, জগন্নাথকে, "তোমার মা কতদিন হল নেই?"

"মা আজ প্রায় দেড় বছর হল নেই। গত বছরের গোড়ার দিকে মা মারা যান।"

"কী হয়েছিল?"

"বুকে ব্যথা। আমি তখন অফিসে। খবর পেয়ে বাড়ি গিয়ে দেখি, মা নেই। মাকে হাসপাতাল নিয়ে যাবারও সুযোগ হয়নি। আগেই মারা গিয়েছেন।"

"হার্ট অ্যাটাক?"

"হ্যাঁ। মায়ের হার্টের রোগ ছিল। তবে হঠাৎ এমন হবে কেউ ভাবেনি।"

চন্দন বলল, "হার্টের রোগের ব্যাপারটা বড় ট্রেচারাস। কখন কী হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। "

কিকিরা চা শেষ করে চুরুটের খাপটা টেনে নিলেন। মাঝে-মাঝে শখ করে চুরুট খান। বড় চুরুট পছন্দ করেন না। সরু-সরু আঙুলের মতন পাঁচ-দশটা চুরুট তাঁর সব সময়েই মজুত থাকে।

চুরুট ধরিয়ে কিকিরা জগন্নাথকে বললেন, "এবার একটু অন্য কথা বলা যাক। আমার প্রথম কথা হল, ওই প্রেসিদ্ধ শুদ্ধানন্দ কল্পবৃক্ষটির কথা তুমি বিশ্বাস করছ কেন?"

জগন্নাথ মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল। জবাব দিতে পারছিল না। শেষে বলল, "পুরো বিশ্বাস করিনি।"

"বিশ্বাস না করলে চিঠিটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

জগন্নাথ মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "ঠিক বিশ্ব নয়, তবে এরকম হয় শুনেছি।"

"কী শুনেছ?"

কী শুনেছে জগন্নাথ বলতে যেন লজ্জা পাচ্ছিল। কিংবা সঠিকভাবে জানে না বলে চট করে বলতে পারছিল না। ইতস্তত করে বলল, "আমার এক পিসেমশাই সাহেব কোম্পানিতে হেড ক্যাশিয়ার ছিলেন। একবার ক্যাশ থেকে হাজার চল্লিশ টাকা তছরুপ হয়। পিসেমশাইয়ের হাতে হাতকড়া পড়ার অবস্থা। পিসেমশাই, তো লজ্জায়, অপমানে, ভয়ে আত্মহত্যাই করতে যাচ্ছিলেন। পিসিমাই তাঁকে বাঁচিয়ে দেন। পিসিমা আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর আত্মা এসে পিসেমশাইকে বলে দেয়, টাকাটা কে নিয়েছে, নিয়ে কোথায় রেখেছে?"

তারাপদ আর চন্দন হেসে উঠল। কিকিরা হাসলেন না।

তারাপদদের হাসিতে জগন্নাথ ক্ষুণ্ণ হল। বলল, "বিশ্বাস না করলে আমি আর কী করব। তবে এরকম ঘটনা আমি আরও শুনেছি। আমাদের পাড়ার মথুরজেঠা একবার বিশেষ দরকারে বাড়ির সিন্দুক থেকে দরকারি দলিলপত্র বার করেছিলেন। পরে সেই দলিলপত্র হারিয়ে যায়।

ওই দলিল শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল মথুরজেঠারই বইয়ের আলমারির নিচের তাকে, পুরনো পাঁজির আড়ালে। জেঠার বাবার আত্মা এসে বলে গিয়েছিল। নয়ত ওই পুরনো দলিল আর সময়মতন খুঁজে পাওয়া যেত না।”

চন্দন এবার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। তারাপদকে সিগারেট দিল। বলল, “জগন্নাথবাবু, এসব হল গল্প। আপনি এগুলো বিশ্বাস করেন?”

জগন্নাথ বলল, “বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, তবু মনে হয়, হতেও তো পারে। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে কেমন করে বলব! এই তো সেদিন কাগজে পড়ছিলাম, একজন নামকরা বিজ্ঞানী যাচ্ছিলেন বিদেশে, এক সেমিনারে। সকালে তাঁর প্লেন। রাত্রে ঘুমের মধ্যে মাকে স্বপ্ন দেখলেন। মা বারণ করলেন ওই প্লেনে যেতে। ভদ্রলোকের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। তিনি শেষ পর্যন্ত সকালের প্লেনে গেলেন না। দুপুরে দিল্লির প্লেন ধরলেন। সকালের প্লেনটায় অদ্ভুতভাবে অ্যাকসিডেন্ট হল। মারা গেল কত প্যাসেঞ্জার। এ-সব কেন হয় কে জানে! হয়।”

তারাপদ সিগারেট ধরিয়ে বলল, “কাকতালীয় ব্যাপার…!”

কিকিরা কিছুক্ষণ কথা বলেননি। এবার বললেন, জগন্নাথকে, “হয় কি হয় না সেটা পরের কথা। তার আগে তুমি আমায় বলল তো, বোনের বিয়ে নিয়ে তুমি খুব চিন্তায় আছ, তাই না?”

জগন্নাথ মাথা হেলিয়ে বলল, “হ্যাঁ। মা বেঁচে থাকতে কত খোঁজখবর করতেন। মা তো মারা গেলেন। আমার আর কেউ নেই, এই বোনটি ছাড়া। ওর জন্য আমি সারাদিন ভাবি। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমার দায়িত্ব চুকবে।”

কিকিরা বললেন, “বিয়ের কি সব ঠিকঠাক হয়েছে!”

“আজ্ঞে না। কথাবার্তা এক-একবার হয়। আর এগোয় না। আমরা গরিব মানুষ। বাবা মারা যাবার পর মা আমাদের বড় কষ্ট করে মানুষ করেছিলেন। মা আর নেই। আমি যে কেমন করে ঝুমুর বিয়ে দেব কে জানে?”

কিছুক্ষণ আর কথা বলল না কেউ।

শেষে কিকিরা বললেন, “জগন্নাথ, একটা কথা বলো তো? তোমার একথা কেন মনে হচ্ছে যে, তোমার মা তোমার বোনের বিয়ে-থার জন্য কিংবা তোমাদের আপদ-বিপদের জন্য কম হোক, বেশি হোক–কিছু সোনাদানা, টাকা কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।”

জগন্নাথ বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। পরে বলল, “আমার মনে হত না। ওই চিঠিটা পেয়ে আমি প্রথমে বিশ্বাসও করিনি। ভেবেছিলাম, কোনো বাজে লোক আমার সঙ্গে তামাশা করেছে। ওটা উড়ো চিঠি। পরে পাঁচরকম ভাবতে-ভাবতে আমার মনে হল, মা মাঝে-মাঝে বলতেন, ঝুমুর বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে না, একটা ব্যবস্থা মা করে রেখেছেন। কী ব্যবস্থা, মা অবশ্য বলতেন না। কথাটা মনে হবার পর আমার কেমন…।” কথাটা আর শেষ করল না জগন্নাথ।

কিকিরা ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বললেন, “বুঝেছি। তোমার মনে হচ্ছে হয়ত মা কোথাও কিছু রেখে গেছেন লুকিয়ে।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

কিকিরা তাঁর মাথার লম্বা-লম্বা চুল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আচমকা বললেন, “জগন্নাথ, তোমার বাবা না জুয়েলার ছিলেন? দামি পাথর-টাথর পরখ করতে পারতেন?”।

“হ্যাঁ। বাবার খুব নামডাক ছিল। বাবা পাথর যাচাইয়ে এক্সপার্ট ছিলেন। দামটামও ঠিক করতে পারতেন। হীরের ব্যাপারে বাবার চেয়ে বড় আর কেউ ছিল না।”

“হুঁ। তোমার বাবা মোটর সাইকেলের ধাক্কায় ভীষণ জখম হন। মারাও যান। এইখানটায় যে গোলমাল লাগছে, জগন্নাথ। উনি জখম হন, না, ওঁকে জখম করা হয়? একটু তো ভাবতে হয় হে। দু-একটা দিন সময় দরকার। না কি হে চন্দন?”

চন্দন কোনো জবাব দিল না।

০৩.

জগন্নাথকে বলেননি কিকিরা, আড়ালে তারাপদকে বলে দিয়েছিলেন।

পরের দিন শনিবার। বিকেল-বিকেলই এল তারাপদ। চন্দনকে সঙ্গে নিয়েই এসেছে।

কিকিরা মোটামুটি তৈরি ছিলেন। বললেন, "আমি রেডি। শুধু তোমাদের জন্যে বসে ছিলাম। একটু টি টেকিং করে চলো বেরিয়ে পড়ি। বগলাকে বলি।"

কিকিরাকে যেতে হল না, তারাপদই হাঁক মেরে বলল, "বগলাদা তিন কাপ চা। শুধু চা। একটু তাড়াতাড়ি।"

চন্দন বলল, "আটটা নাগাদ ফিরতে হবে, কিকিরা। আমার একটা জরুরি কাজ আছে।"

কিকিরা বললেন, "আগেই ফিরে আসব।"

"আজ আপনি কী দেখতে যাচ্ছেন?"

"শুদ্ধানন্দজির ঘাঁটি। জায়গাটা একবার নিজের চোখে দেখে নেওয়া উচিত।" বলে উঠে গিয়ে একটা কাগজ তুলে আনলেন টেবিল থেকে। ভাঁজ করা কাগজ। কাগজটা খুলে নিতে নিতে বললেন, "কলকাতার ম্যাপ। বছর বিশ-পঁচিশ আগে ছাপা। রাস্তা থেকে একটা কিনে রেখেছিলুম। এত বড় শহর, কয়েকশো পাড়া, হাজার কয়েক গলি, বাই-গলি, মানে বাই লেন, কে তার হিসেব রাখে গো! আর নামের কত বাহার বাবা! গুমঘর লেন, কর্ক লেন, ঝাঁপতলা বাই লেন..., গুলু ওস্তাগর...নামের ফুলঝুরি। তা এই ম্যাপ থেকে দেখছি–চিতপুর দিয়ে এগোলেই বা ব্র্যান্ড রোড ধরেও আমরা যেতে পারি।"

তারাপদ আর চন্দন ম্যাপ দেখায় গা করল না। ইশারায় বোঝাতে চাইল, ম্যাপের দরকার নেই, জায়গাটা খুঁজে নেওয়া যাবে।

কিকিরা ম্যাপটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, "জগন্নাথের খবর কী?"

"নতুন কিছু নয়, তারাপদ বলল।

"কিছু বলছিল?"

"না, ওই বলছিল–কিকিরা কী করেন? ম্যাজিক দেখান? ...আমি বললাম,

এখন আর স্টেজে ম্যাজিক দেখান না, রিয়েল লাইফে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ান।" বলে তারাপদ ঘসতে লাগল।

কিকিরাও হাসলেন।

চন্দন জগন্নাথের চিঠির ব্যাপারে কাল থেকেই খুঁতখুঁত করছিল ।বলল, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা ঠাট্টা-তামাশা। কোনো বন্ধু বান্ধব বা জানাশোনা কেউ জগন্নাথের সঙ্গে মজা করেছে।"

তারাপদ বলল, “তা কেমন করে হবে!” বলে কিকিরার দিকে তাকাল, বলল আবার, “চাঁদু একটা জিনিস বুঝছে না। এটা যদি মজা হত, ঠাট্টা হত–জগুদা কাঁঠালতলার গলিতে গিয়ে ওরকম একটা বাড়ি দেখত না। না হয় বাড়িটাই শুধু দেখত, কলকাতায় পুরনো অলিগলিতে অমন বাড়ি নিশ্চয় অনেক আছে। কিন্তু জগুদা কি প্লাস্টিকের বস্তার মধ্যে একটা মানুষকে পুরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখতে পেত? না কি, ওই যে তিনটে লোক ঢুকছে–তাদের দেখত?…জগুদা মানুষটা ভিতু, গোবেচারা, বোকাসোকা, কিন্তু কিকিরা-স্যার, একটা কথা ঠিক, জগুদা কখনোই মিথ্যে কথা বলবে না এ ব্যাপারে। বলে কী লাভ!”

কিকিরা মাথা নাড়লেন। বললেন, “আমারও সেরকম মনে হয়। জগন্নাথ সাদাসিধে, সরল ছেলে। ওর কথাবার্তা থেকেই সেটা বোঝা যায়। মিথ্যে কথা জগন্নাথ বলেনি। তবে ও যে ঠিক কী দেখেছে, ভুল দেখেছে চোখে, না। সত্যি-সত্যি যা দেখেছে সেটাই বলছে, সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।”

চন্দন বলল, “কিকিরা, ভয়ের সময় মানুষ অনেক ভুতুড়ে জিনিস দেখে। এটা তার দোষ নয়, আমাদের সকলেরই চোখ মাথা বুদ্ধি ভয়ের সময় স্বাভাবিক। কাজ করতে পারে না। তারাপদকে মর্গের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একদিন রেখে দিলেই দেখবেন ওর কী হাল হয়েছে!”

তারাপদ বলল, “চাঁদু, জগুদা ভিতু ঠিকই, কিন্তু সে মিথ্যে কথা বলার লোক নয়।”

চন্দন বলল, “মিথ্যে কথা বলছে জগন্নাথ–তা তো বলিনি। আমি বলছি, চোখে ভুল দেখেছে। একটা সার্বালক মানুষকে ওভাবে মুড়ির ব্যাগে করে ভরে মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। অসম্ভব।”

কিকিরা বললেন, “স্যান্ডেল উড, তুমি সাবালক মানুষ বলছ কেন?”

চন্দন তাকাল। কিছু বুঝতে পারল না। বলল, “কেন?”

“ধরো ওটা মানুষ নয়, মানুষ-পুতুল। মানে, মানুষের নকল বা ডামি?”

“ডামি?”

“আর ওটা যে ঠিক সাবালকই ছিল, জগন্নাথ এমন কথাও বলেনি।“

চন্দন তাকিয়ে থাকল। কথা বলল না। ডামি? কথাটা যেন সে ভাবছিল অন্যমনস্কভাবে।

কিকিরা বললেন, “কাপড়চোপড়ের দোকানে, বড়-বড় টেলারিং শপে যে ডামি দেখো তার ওজন কত হে? আজকাল তো আবার শুনি প্লাস্টিকের, পেপার পাল্পের ছাঁচ করে মুখ হাত পা তৈরি হচ্ছে। এতে ফিনিশ ভাল হয়। আর ওজন…? হালকা, একেবারেই হালকা…।”

চন্দন আগে কথাটা ভাবেনি, এখন তার মনে হল, সত্যি তো একটা ডামির আর ওজন কত হবে। নিতান্ত ফাঁপা ফাঁকা বস্তু, ওপরের খোলটাই সব। প্লাস্টিকের ব্যাগে করে ও-জিনিস অনায়াসেই বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, ব্যাগের মধ্যে ধরে এমন ডামি হতে হবে। মুড়ি মাথায় করে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের প্লাস্টিকের ব্যাগের মাপটা আন্দাজ করলে মনে হয়, সাবালক ছেলেমেয়েকে দাঁড় করানো অবস্থায় তার মধ্যে ঢোকানো মুশকিল। নাবালক বাচ্চাকাচ্চাকে অবশ্য ঢোকানো চলে।

চন্দন এবার একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "ডামির কথা আমি ভাবিনি, কিকিরা, সরি। আপনার তো বেশ মাথায় এসেছে।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "স্যার, আমি সেদিন কোথায় যেন একটা ছবি। দেখছিলাম সিনেমার। একটা ডামিকে পাঁচতলার ছাদ থেকে ফেলে দিচ্ছে।"

কিকিরা বললেন, "একসময় মাটি দিয়ে, ছেঁড়া কাপড়চোপড়, তুলো, কাঠের গুঁড়ো পুরে ডামি করা হত। দিনকাল পালটে গিয়েছে। এখন যা ডামি করে আসল-নকল বোঝা যায় না।"

বগলা চা নিয়ে এসেছিল। চা রেখে দিয়ে চলে গেল।

চায়ের কাপ তুলে নিয়ে তারাপদ বলল, "নিন, চা খেয়ে নিন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে।"

কিকিরা বললেন, "সন্ধের মুখে-মুখে পৌঁছতে পারলেই ভাল।"

"কেন?"

"লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখতে হবে প্রেতসিদ্ধর আখড়া। কারও চোখে পড়তে চাই না। তবে আজকাল তো পাঁচটা বাজলেই অন্ধকার হয়ে যায়। আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব।"

চন্দন চা খাচ্ছিল; বলল, "স্যার, আজ শনিবার। আজ প্রেতসিদ্ধর আখড়ায় গ্যাদারিং বেশিই হতে পারে। তাই নয়?"

কিকিরা মজার গলায় বললেন, "শনিবার বারবেলার পর টাইমটা ভাল। মনে হয়, মক্কেল ভালই হবে। চলো, দেখা যাক কী হয়!"

চা খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে সামান্য সময় লাগল। তারপর উঠে পড়ল তিনজনে।

.

ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে কিকিরা বললেন, "তারাপদ, জগন্নাথের জ্ঞাতিগুষ্ঠি যারা একই বাড়িতে থাকে ওর সঙ্গে, তাদের তুমি চেনো?"

মাথা নাড়ল তারাপদ। বলল, "চেনা বলতে দু'-একজনকে দেখেছি। জগুদার বাড়িতে আমি বার তিন-চার গিয়েছি। তখনই যা দেখেছি। সকলকে নয়, দু-একজনকে চিনি।"

"জগন্নাথ তার জ্ঞাতিদের সম্পর্কে কিছু বলে না?"

"কারও কারও সম্পর্কে বলে।"

"যেমন?"

তারাপদ রাস্তা দেখছিল। কলকাতার রাস্তায় বাতি জ্বলে উঠেছে। আজ খানিকটা মেঘলা রয়েছে। বৃষ্টি হবার আশা অবশ্য নেই। কিন্তু মেঘলার দরুন, ধুলো আর হালকা কুয়াশা মিলে অন্যদিনের তুলনায় ঝাপসা ভাবটা বেশিই হয়েছে আজ।

তারাপদ বলল, “জগুদা কী বলে জানতে চাইছেন?...জগুদার মুখে দু’জনের। কথা বেশি শুনেছি। একজন তার কাকা, জ্ঞাতিসম্পর্কে। পুরো নাম জানি না, জগুদা বলে, কুমারকাকা। অন্যজন জগুদার দাদা হয় সম্পর্কে, বাচ্চুদা। দু’জনেই নচ্ছার টাইপের। জগুদাকে বিরক্ত করে, খোঁচায়, তামাশা করে তাকে নিয়ে। আসলে ওরা জগুদাকে পছন্দ করে না। জগুদাও ওদের দেখতে পারে। না।”

চন্দন বলল, “তুই একদিন একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিলি কলেজ স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে, সেই লোকটা?” বলে চন্দন তারাপদকে ইশারায় যেন বোঝাতে চাইল, ঘাড়ে-গদানে হওয়া একটা লোক কি না!

তারাপদ ভাবল একটু। বলল, “কবে বল তো?”

“আরে সেই যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নাটক দেখতে গেলাম..”

“ও! না, না, সে তো আমাদের বিল সেকশানের জয়ন্তদা। জয়ন্তকুমার। এ অন্য। এর নাম জানি না। জগুদা বলে কুমার কাকা। আমি ভদ্রলোককে দেখেছি। চোখে চিনি। হিন্দি সিনেমার ফাইটারদের মতন দেখতে। সলিড বডি।”

“বয়েস কত?” কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

“ক-ত আর! বছর বিয়াল্লিশ-চুয়াল্লিশ। দারুণ বডি।”

“ও! আর তোমার ওই বাচ্চুদা?”

“সেটাকে একেবারে পাড়ার গুণ্ডা বদমাশের মতন দেখতে। চেহারা দেখলে আপনি হাসবেন। ল্যাকপ্যাক করছে। তবে স্যার, তার ড্রেস, চোখে গগলস, গলায় রুপোর চেন, মাথার চুল দেখলে বুঝতে পারবেন পাড়ার ঘাঁটিতে তার প্রেস্টিজ আছে। রেসিং সাইকেল নিয়ে ঘোরে। সাইকেলে নাকি ব্রেক নেই, ঘন্টিও নয়।”

চন্দন হেসে ফেলে বলল, “ব্রেকলেস বাচ্চু। ...ব্রেক থাকবে না পায়ে ব্রেক মেরে সাইকেল থামাবে, ঘণ্টি থাকবে না–তোর ঘাড়ে পড়তে পড়তে পড়বে না, বেরিয়ে যাবে শাঁ করে, এ-সব হল কায়দা। যার যত কায়দা সে তত বড় হিরো। জানিস?”

জানে তারাপদ।

কিকিরা বললেন, “ব্রেকলেসবাবার বয়েস কত?”

“জগুদার চেয়ে এক-আধ বছরের বড়। জগুদা যা বলে।

“এরা দু’জন করে কী?”

তারাপদ বলল, “বাচ্চু কিছুই করে না। পাড়ার কাছে কোথায় একটা লন্ড্রি খুলেছিল একবার। বলত, শালকরের দোকান। কিছু শাল ঝেড়ে দিয়ে দোকান বন্ধ করে দেয়। তারপর কিছুদিন ও-পাড়ার কোনো সিনেমা হাউসের টিকিট ব্ল্যাকে নেমেছিল। পুলিশ ওকে ধোলাই দেবার পর সেটাও ছেড়ে দেয়। এখন কী করে জানি না।”

কিকিরা বললেন, “বাঃ! দুটিই রত্ন। কাকা-ভাইপো। বডিবিল্ডার-কুমার আর ব্রেকলেস বাচ্চু!

ভেরি গুড।”

চন্দনের খেয়াল হল। বলল, “এখানে নেমে পড়া ভাল।“

তারাপদ সঙ্গে-সঙ্গে ট্যাক্সি থামাতে বলল।

.

খানিকটা আগেই নেমে পড়েছিল তারাপদরা। হাঁটতে লাগল। রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করছিল মাঝেসাঝে। উত্তর কলকাতার এই জায়গাটার যেমন কেমন মরা-অবস্থা। আদ্যিকালের এলাকা বলেই বোধ হয় তার আর কোনো শোভা নেই। রাস্তা, দোকান, বাড়িঘর সবই খাপছাড়া, ভাঙাচোরা। পুরনো দিনের গন্ধও বুঝি পাওয়া যায়।

অনেকটা এগিয়ে এসে তারাপদ বলল, “কিকিরা-স্যার, আমরা কি গঙ্গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি?”

কিকিরা মাথা নাড়লেন।

চন্দন বলল, “চিতপুরের এইসব এলাকা এককালে কলকাতার বনেদি পাড়া ছিল, তাই নয় কিকিরা?”

কিকিরা বললেন, “ছিল বই কি!” বলে তারাপদর দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, “তারাপদ, তুমি জগন্নাথের বাবা সম্পর্কে কিছু জানো?”

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, “জগুদার বাবা! না, জগুদার বাবা সম্পর্কে কেমন করে জানব! জগুদার বাবা! না, জগুদার মুখে আপনি যা শুনেছেন আমিও তাই শুনেছি। বরং সেদিন আপনার কাছে জগুদা বাবার কথা খানিকটা বলল, আমি অতটাও আগে শুনিনি।”

চন্দন বলল, “যাচ্ছি আমরা প্রেতসিদ্ধকে খুঁজতে, আপনি জগন্নাথের বাবার কথা তুলছেন কেন?”

কিকিরা বললেন, “গাছের শেকড়টা বোধ হয় ওই বাবাতেই ছড়িয়ে আছে। এ যা দেখছ– এগুলো ওপরের ডালপালা।”

“মানে?”

“মানেটা বোঝবার চেষ্টা করো স্যান্ডেল উড! তুমি তো ডাক্তার। একটা লোক এসে তোমায় বলল, তার মাথা ব্যথা করছে, তুমি তখন কী করবে? ব্যথাটা কেন, কী থেকে হচ্ছে জানার চেষ্টা করবে না। এটাও হল সেইরকম। শুদ্ধানন্দ বাবাজি হল পরের ব্যাপার, আগের ব্যাপারটা তো জানতে হবে।”

তারাপদ হঠাৎ বলল, “স্যার, আমরা বোধ হয় এসে গিয়েছি।”

চন্দন দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক’দিন আগে পূর্ণিমা গিয়েছে। আজ কোন তিথি কে জানে। এখনো চাঁদ ওঠেনি। কৃষ্ণপক্ষ। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

কিকিরা ভাল করে দেখলেন। বললেন, “এই গলিটাই মনে হচ্ছে।”

চন্দন বলল, “হ্যাঁ, এই গলি। গাছটাও রয়েছে।”

“তবে এসো,” বলে কিকিরা পা বাড়ালেন।

জগন্নাথ যেমন-যেমন বলেছিল, গলির বাঁ দিকে লম্বা একটানা টিনের চালা, গুদোমখানার মতনই দেখতে। ডান দিকে ঠেলাঅলাদের আস্তানা। সরু গলি, ইট বাঁধানো। ভাঙা ঘরবাড়ি, আগাছা আর স্যাঁতসেঁতে জমিজায়গার এক ঘন গন্ধ রয়েছে। এই গলিতে বাতিও জ্বলে না।

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, গুদোমখানা বা ঠেলাগাড়ির আস্তানার পেছন দিকের গলি এটা। এই গলি দিয়ে মানুষই কোনোমতে চলতে পারে, আর কিছু করা সম্ভব নয়।

কবেকার এক পুরনো ভাঙা মন্দির, ভেঙে পড়া বাড়ির স্তূপ, গাঁ-গ্রামের মতন শ্যাওড়া আর কুলঝোঁপ, জোনাকি উড়ছিল কয়েকটা।

খানিকটা এগিয়ে কিকিরা বললেন, “ওহে, একসঙ্গে এসো না। পজিশন নিয়ে এগোও।“

চন্দন ঠাট্টা করে বলল, “আমরা কি যুদ্ধে যাচ্ছি, না, ডাকাতি করতে যাচ্ছি যে পজিশন নেব?”

কিকিরা মজার গলায় বললেন, “স্পাইয়িং করতে যাচ্ছি। স্পাইয়িং করার সময় ঘাপটি মেরে যেতে হয়, বুঝলে?”

“বুঝলাম।”

“তোমাদের কাছে টর্চ নেই?”

“না।”

“আমার কাছে আছে। আমি এখন টর্চ জ্বালাব না। নেহাত দরকার না পড়লে জ্বালাবই না। আমি আগে-আগে যাচ্ছি। তোমর পেছন-পেছন এসো। তফাতে থাকবে। কেউ যেন কাউকে চেনো না, এইভাবে আসবে।”

তারাপদ বলল, “ঠিক আছে। আপনি এগিয়ে যান।”

কিকিরা বিশ-পঁচিশ পা এগিয়ে গেলেন। তারাপদ বলল, “চাঁদু, তুই এগো। আমি সবার শেষে।”

সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে চন্দনও পা বাড়াল।

তারাপদ অপেক্ষা করতে লাগল।

সামান্য পরে তারাপদর মনে হল, পেছনে যেন কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। আসছে কেউ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে কি দেখবে না করেও সে ঘাড় ঘোরাল না। গলি দিয়ে লোকজন আসতেই পারে। কৌতূহল দেখানো উচিত নয়।

তারাপদ খুব আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগল, যেন তার পায়ে চোট রয়েছে, জোরে-জোরে হাঁটতে পারছে না।

শব্দটা ক্রমশই কাছে এসে গেল।

হঠাৎ তারাপদর মনে হল, শ্রদ্ধানন্দর কোনো চেলা তাদের ওপর নজর রাখছে না তো? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে। ওরা যে আজ কাঁঠালতলার গলিতে গোয়েন্দাগিরি করতে আসছে এ-কথা অন্য কেউ জানে না। জগুদাও নয়।

তারাপদ ঘাবড়াল না। আগের মতনই হাঁটতে লাগল। সামনে চন্দন রয়েছে, তার আগে কিকিরা। বেমক্কা কিছু ঘটলে তারাপদ চেঁচাবে। তার চিৎকার শুনলে চন্দনরা ছুটে আসবে।

একেবারে ঘাড়ের ওপর কে যেন এসে পড়ল। দাঁড়াল তারাপদ। ঘাড় ঘোরাল।

অন্ধকার এমন নয় যে লোক দেখা যায় না। তারাপদ লোকটাকে দেখল। দেখে অবাক হল। কুচকুচে কালো, নাদুসনুদুস, টাক মাথা বয়স্ক এক ভদ্রলোক। ধুতি-জামা পরা। চোখে চশমা। হন্তদন্তভাবে হাঁটছিল। ঘাড়ে এসে পড়েছে।

তারাপদ ইচ্ছে করেই বলল, "দাদা, একটু সামলে...। ঘাড়ে এসে পড়ছেন যে!"

লোকটি কোনো কথা বলল না। যেন কানেই তুলল না কথাটা। দেখলেও না তারাপদকে। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেল। ওর তাড়া দেখে মনে হল, কোনো দিকে খেয়াল রাখার মতন অবস্থা এখন আর মশাইটির নেই। আশ্চর্য!

হাঁটতে-হাঁটতে তারাপদ লোকটিকে দেখছিল। ও কি প্রেতসিদ্ধর কাছে যাচ্ছে? বোধ হয় সেখানেই যাচ্ছে।

গলিটা একেবারে সোজা নয়, ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক আছে। লোকটা কোথায় মিলিয়ে গেল।

চন্দন বা কিকিরাকেও দেখতে পাচ্ছিল না তারাপদ। আড়ালে পড়ে গিয়েছে ওরা। খানিকটা এগোতেই বাঁ দিকের এক ভাঙাচোরা একতলা বাড়ির সদর খুলে গেল আচমকা। শব্দ হল। এরকম একটা দরজা এখানে থাকতে পারে কে জানত! দরজার চেহারা দেখলেই ভয় করে। কালো ঝুল যেন। বোঝাই যায় না ওটা দরজা না অন্য কিছু।

দরজা খুলে ঢ্যাঙামতন একটা লোক বেরিয়ে এল। তার পেছন-পেছন এক নেড়ি কুকুর। কুকুরটা ডেকে উঠেছিল। তারাপদর পায়ের কাছে ছুটে আসতে-না-আসতেই ঢ্যাঙা লোকটা ধমক দিল কুকুরটাকে।

তারাপদকে দেখতে-দেখতে লোকটা বলল, "কোন বাড়ি চাই?" ওর গলার স্বর ভাঙা, খসখসে।

তারাপদ ঘাবড়ে গেল। বলল, "এটা কাঁঠালতলার গলি নয়?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে শুদ্ধানন্দ গুরুজি?"

“ও!...সিধে হাঁটতে হবে।”

“কতটা?”

“পাঁচ-সাত মিনিট।” বলে লোকটা উলটো দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল। বলল, “ঘন্টা পড়েছে?”

“ঘণ্টা?”

“ঘণ্টা পড়ার পর বাবার ওখানে ঢোকা যায়।”

“ও।”

“প্রথম ঘণ্টাও পড়েনি?”

“শুনিনি।..তবে একজনকে যেতে দেখলাম।”

“আজ শনিবার না? ঘণ্টা পড়ে যাবে।” বলে লোকটা আর দাঁড়াল না। এগিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল।

০৪.

বাড়িটা যে কার ছিল, কিসের ছিল–কিছুই বোঝা যায় না। অনেকটা কুঠিবাড়ির মতন দেখতে। চারপাশে গাছপালার জঙ্গল। ভাঙাচোরা পাঁচিল। একসময় হয়ত কোনো সাহেব কোম্পানির ঘাঁটি ছিল, কিংবা কোনো সাহেবসুবো থাকত, ব্যবসা বাণিজ্য দেখাশোনা করত। এখন বাড়িটার কিছু কিছু কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে, বাকিটা ভেঙে পড়েছে।

তারাপদ ভাঙা ফটকের কাছেই কিকিরাদের পেয়ে গিয়েছিল। কিকিরাই নিচু গলায় ডেকে নিয়েছিলেন তারাপদকে।

ওরা তিনজনে গাছপালার আড়ালে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল যে, এই বাড়িতে কারা আসছে সেটা নজর করা যায়। এখনো চাঁদ ওঠেনি। চাঁদ না উঠলেও অন্ধকার সামান্য ফিকে হয়েছে। আকাশের একপাশে চাঁদ উঠি-উঠি করছে।

কিকিরা ভেবেছিলেন, জায়গাটা একবার দেখেশুনে আজ চলে যাবেন। বেশি উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করবেন না। প্রথম দিনে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। কিছুই যে জানেন না। সাবধান হতে পারবেন না। প্রেসিদ্ধর চেলারা কখন কোন দিক থেকে দেখে ফেলবে কে জানে!

কিন্তু প্রেতসিদ্ধর আখড়ায় পৌঁছে দেরি হতে লাগল। ২০১২

এর মধ্যে দুটো ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজানোর মতন করে ঢং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল কেউ।

এখন আর ঘণ্টা বাজছে না।

চন্দন হাত বাড়িয়ে কিকিরাকে ঠেলা দিল। চাপা গলায় বলল, “সাহেব!”

কিকিরা তাকালেন। তারাপদও দেখল।

কোট-প্যান্ট পরা একটা লোক ভাঙা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছিল। অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে সামনের দিকে পা বাড়াল। দাঁড়াল, আবার। বুঝতে পারছিল না কোন দিকে যাবে। কিকিরাদের বড় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে লোকটি।

লোকটা জোরে-জোরে কাশল। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল, “কে আছে?”

বারকয়েক ডাকাডাকির পর সাহেব যখন বিরক্ত হয়ে পায়চারি করছে, বাড়ির দিক থেকে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

সাহেব কিছু বলার আগেই লোকটা যেন কী বলল। শোনা গেল না।

পকেট হাতড়ে সাহেব এক টর্চ বার করেছিল বোধ হয়। আলো জ্বলল। ছোট টর্চ নিশ্চয়। সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত থেকে টর্চ কেড়ে নিল লোকটা, প্রেতসিদ্ধর চেলা। টর্চ নিবিয়ে দিল।

সাহেব এবার খাপ্পা হয়ে উঠেছিল। চেঁচিয়ে বলল, “এটা কী?”

লোকটা বলল, “এখানে আলো নিয়ে আসা বারণ। লিখে দেওয়া হয়েছিল। চিঠি কই?”

সাহেব পকেট থেকে কী-একটা বার করল।

অন্ধকারেই লোকটা চিঠি দেখল, না, চিঠির চেহারা দেখেই বুঝে নিল সব কে জানে! বলল, “জোয়ারদার?”

“বিশ্বনাথ জোয়ারদার। পাতিপুকুর থেকে আসছি।...কী জায়গা তোমাদের! খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন জায়গায় মানুষ আসে?”।

“দরকার পড়লেই আসে। ...কথা বলবেন না। আসুন।” বলে লোকটা ফিরতে লাগল। ফিরতে-ফিরতে বলল, “দেরি করে এলে ঘরে ঢুকতে দেবার নিয়ম নেই। গুরুজি আসনে বসে পড়েছেন। ঘর বন্ধ। দেখি কী বলেন।“

দু’জনের কথাবার্তা অস্পষ্টভাবেই শোনা যাচ্ছিল। শেষে আর কথা শোনা গেল না, ওরা এগিয়ে তফাতে চলে গেল।

তারাপদ বলল, “বাঙালিসাহেব।”

কিকিরা বললেন, “জোয়ারদার। বাবা বিশ্বনাথ।”

চন্দন বলল, “ক’জন হল কিকিরা?”

“সাহেবকে নিয়ে পাঁচজন। প্রথমে এসেছিল টাক, সেকেন্ড এল দাড়িঅলা বুড়ো, তিন নম্বর এল–রোগাসোগা চশমা চোখে, মাস্টার-মাস্টার চেহারার লোকটা, চার নম্বর হল তোমার সেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ছোকরা। আর লাস্ট এই জোয়ারদার।”

তারাপদ বলল, “আরও আসবে নাকি?”

“শনিবারের বাজারে পাঁচজন–মন্দ কী! এখানেই তো পঞ্চমুখী হয়ে গেল।”

ধীরে-ধীরে কথা বলছিল ওরা। গলার শব্দ উঠছিলই না। গায়ে-গায়ে তিনজনে দাঁড়িয়ে আকাশে চাঁদ উঠে এল।

চন্দন বলল, “দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ আছে?”

কিকিরা ভাবলেন সামান্য। তারপর বললেন, “না। আজকের মতন এখানেই ইতি। ভেতরে উঁকি মারার চেষ্টা করে লাভ নেই, ধরা পড়ে যাব। ওটা পরে হবে। জায়গাটা তো দেখা হয়ে গেল। আমি সকালের দিকেও খোঁজ নিতে পারব দু’-একদিনের মধ্যেই।”

“তা হলে ফেরা যাক।”

“চলো।”

সাবধানেই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে এল তিনজনে। জ্যোৎস্না ফুটতে শুরু করেছে। হাওয়া আসছিল গঙ্গার দিক থেকে। কাছেই গঙ্গা। এই সরু গলিটা দিয়ে এগিয়ে গেলে কি গঙ্গা পাওয়া যাবে? কে জানে!

ফিরতি পথে তারাপদ বলল, "কিকিরা-স্যার, কী মনে হচ্ছে আপনার?"

কিকিরা বললেন, "মনে হচ্ছে, কল্পবৃক্ষটির গাছে রাই ফ্রুট ভালই ফলেছে।"

চন্দন জোরে হেসে উঠল।"রাইপ ফ্রুট!"

"গাছে ফল-ফুল ছাড়া আর কী ধরবে হে! এ-গাছ আবার ফুল ধরার গাছ নয়, ফলং বৃক্ষঃ। মানে ফল-ধরা গাছ।" কিকিরা রগুড়ে গলায় বললেন, পাকা লোক, প্রেতসিদ্ধ মহাপুরুষ উনি! পাকা ফল ফলাতে কতক্ষণ!"

তারাপদ বলল, "মহাপুরুষকে একবার যে দেখতে ইচ্ছে করছে, কিকিরা?"

"হবে। তর সও। এত তাড়াতাড়ি কি সব হয়! ধৈর্য ধরতে হবে, মাথা খাটাতে হবে। তবে না!"

হাঁটতে-হাঁটতে গলি দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল তারাপদরা।

সঙ্গে-সঙ্গে লোডশেডিং। কলকাতা বলে শহর। আলো না গেলে কি হয়!

ঝপ করে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় তিনজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অচেনা জায়গা। কোন দিকে এগোবে যেন ঠাওর করতে পারছিল না। চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগল সামান্য। ধীরে-ধীরে জ্যোৎস্নাও ফুটে উঠেছিল। এ-দিকটায় দোকানপত্র বেশি নেই। বসতবাড়িও কম। পর-পর বুঝি গুদোম-ঘর। কাঠগোলাও রয়েছে। লণ্ঠন, কুপি, মোমবাতি জ্বলে উঠতে লাগল একে-একে।

কিকিরা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পা বাড়াতে যাচ্ছেন এমন সময় তারাপদ সেই ঢ্যাঙা লোকটিকে আবার দেখল। সঙ্গে তার নেড়ি কুকুরটাও। লোকটি বোধ হয় বাড়ি ফিরছে।

তারাপদর সঙ্গে লোকটির চোখাচুখি হয়ে গেল। চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হয়ত তারাপদদের তিনজনকে দেখছিল। তখন তারাপদ ছিল একলা মানুষ; এখন তিনজন হয়ে গেল কেমন করে?

তারাপদ কিছু বলার আগেই লোকটি নিজেই বলল, "দেখা হয়নি?"

মাথা নাড়ব কি নাড়ব না করে তারাপদ এমনভাবে মাথা নাড়ল যে হ্যাঁ-না কোনোটাই ঠিক করে বোঝা যায় না।

"তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?" লোকটি বলল। গলার স্বরে যেন খানিকটা উপহাস। ওর হাতে একটা পাতায় মোড়া খাবারের ঠোঙা।

তারাপদ বুদ্ধি করে বলল, "আজ লোক বেশি। চলে এলাম।"

"ও! শনি-মঙ্গল বুঝি!"

"শুদ্ধানন্দজি এখানে কত দিন আছেন, দাদা?"

"কত দিন! ওই তো...গত বছর...তা ধরেন দেড় বছরটাক। "

"তা হলে বেশিদিন নয়।"

"ওই হল।...আয় ল্যাংড়া...।" লোকটি আর দাঁড়াল না, তার লেজুড়টিকে ডেকে নিয়ে গলির মধ্যে চলে গেল। নেড়ি কুকুরটার নাম ল্যাংড়া, না কি সে এক পায়ে ল্যাংড়া তারাপদ বুঝতে পারল না।

কিকিরা বললেন, "কে হে লোকটা?"

"এই গলিতে থাকে। যাবার সময় দেখা হয়েছিল।"

"প্রেতসিদ্ধর এজেন্ট নয় বলেই মনে হল।"

"কী জানি!"

"নাও, চলো।"

চন্দন বলল, "কিকিরা, এতরকম ঝাট না করে এখানকার থানায় একটা খবর দিয়ে দিলেই তো হয়।"

তারাপদ বলল, "থানায় খবর!..চাঁদু, তুই থানা দেখাস না। যা না, গিয়ে খবর দে। কচু হবে।"

কিকিরা বললেন, "থানা-টানা পরে, আগে কল্পবৃক্ষটিকে দেখি। আলাপ-পরিচয় হল না মহারাজের সঙ্গে, আগে থেকেই থানা-পুলিশ কেন! নাও, চলো। হাঁটতে হবে খানিকটা।"

.

চন্দনের জরুরি কাজ ছিল, সে নেমে গিয়েছিল আগেই, কিকিরা আর তারাপদ বাড়ি ফিরলেন সাড়ে আটটার পরই। তারাপদর বোর্ডিংয়ে ফিরতে ফিরতে রাত হবে। কিকিরার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে সে নিজের আস্তানায় ফিরবে। মাসের মধ্যে চার-পাঁচটা দিন তার এইভাবেই কাটে।

বাড়ি ফিরে বগলাকে চা করতে বললেন কিকিরা। তারপর আরাম করে বসলেন।

তারাপদও গা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কিকিরা বললেন, "তারাপদ, তোমার অফিসের বন্ধু জগন্নাথের বাড়িতে এমন কেউ নেই যে হাঁড়ির খবর-টবর দিতে পারে?"

মাথা নাড়ল তারাপদ। বলল, "না। হাঁড়ির খবরে আপনি কী করবেন?"

কিকিরা বললেন, "জগন্নাথের বাবা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা দরকার।"

"কেন?"

"আসল রহস্যটা বোধ হয় ওখানে।"

"আপনি তখনও কথাটা বললেন, স্যার। আমি কিন্তু বুঝিনি। জগুদার বাবা কবে মারা

গিয়েছেন, এখন তাঁকে টানাটানি কেন? মরা মানুষের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক...”

“তুমি কিছু বুঝলে না.” তারাপদকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কিকিরা বললেন। “একটু মাথা খাটাও।”

“আপনিই বলুন।”

দু-চার মুহূর্ত কথা বললেন না কিকিরা, তারপর বললেন, “জগন্নাথের বাবা কী ছিলেন? না, জুয়েলার! তাঁর নিজের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তাঁর পেশা এবং নেশা কোনোটাই ছেড়ে দেননি। ভদ্রলোক একজন নামকরা স্টোন স্পেশ্যালিস্ট ছিলেন। বড় বড় কয়েকটা দোকানে আসা-যাওয়া করতেন, তাদের পাথর-টাথর পরখ করে দিতেন। ওঁর নিজের হাতে কোনো মক্কেল এলে উনি চেনা দোকান থেকে মালপত্র কিনিয়ে দিতেন। তাতে নিজের একটা কমিশন থাকত। তাই না? রাইট?”

“রাইট!” তারাপদ মাথা হেলাল।

বগলা চা এনেছিল। এগিয়ে দিল। দিয়ে চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে কিকিরা আরামের শব্দ করলেন। পরে বললেন, “এই ভদ্রলোক, জগন্নাথের বাবা, একদিন বর্ষাকালে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন সন্ধে। এমন সময় এক মোটরবাইকঅলা এসে তাঁকে বাড়ির কাছাকাছি, পাড়ার মধ্যে আচমকা ধাক্কা মারে ভদ্রলোক রাস্তায় পড়ে যান। আশেপাশের রিকশাঅলারা চেঁচামেচি করে উঠতেই মোটরবাইকঅলা পালিয়ে যায়। রাইট?”

মাথা হেলিয়ে সায় দিল তারাপদ। চা খেতে লাগল।

কিকিরা বললেন, “জগন্নাথের বাবাকে ধরাধরি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখান থেকে হাসপাতাল। দিন-তিনেক পরে তিনি মারা যান।”

“কোথায় যে চোট লেগেছিল জগুদা জানে না। বলতে পারে না, তারাপদ বলল।

“কোমরের কোনো বেকায়দা জায়গায় লাগতে পারে বা ধরো পড়ে যাবার পর মাথাতেও লাগতে পারে। হেড ইনজিউরি।”

“হতে পারে। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট...”।

কিকিরা তারাপদকে দেখতে-দেখতে বললেন, “আমি যদি বলি ওটা অ্যাকসিডেন্ট নয়!”

“নয়?” তারাপদ অবাক হয়ে বলল।

“ধরো, জগন্নাথের বাবার কেউ পিছু নিয়েছিল। যে-লোকটা পিছু নিয়েছিল সে জেনেশুনে ইচ্ছে করে জগন্নাথের বাবাকে ধাক্কা মেরেছে।”

“জেনেশুনে? আপনি বলছেন কী, কিকিরা?জগুদার বাবাকে কি তবে জখম করার, খুন করার চেষ্টা হয়েছিল?”

“খুন না হোক, অন্তত জোর জখম।“

“কেন?”

“কেন!...কেন তা ভেবে দেখে আমার মনে হয়েছে, জগন্নাথের বাবার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু ছিল। কী থাকতে পারে? সোনাদানা, না, পাথর? সোনাদানা থাকার চেয়েও যেটা সম্ভব সেটা হল পাথর। দু-চার টুকরো দামি হীরে, চুনি, ক্যাটস আই..”

“কী বলছেন আপনি, কিকিরা? হীরে, চুনি নিয়ে একটা লোক বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফিরবে? তা ছাড়া জগুদার বাবা ওসব পাবেনই বা কেমন করে?”

“কেন? ওঁর পক্ষেই তো পাওয়া সম্ভব।” কিকিরা হাত বাড়িয়ে চুরুটের খাপ টেনে চুরুট বার করতে লাগলেন। বললেন, “কোনো জুয়েলারের দোকান থেকে আনছিলেন। কিংবা কোনো জুয়েলারের দোকানে বেচতে নিয়ে গিয়েছিলেন।”

“বেচতে? জগুদার বাবা! আপনি ভুলে যাচ্ছেন–জগুদার বাবার যা অবস্থা ছিল...”

“জানি হে জানি। অবস্থা ভাল ছিল, না ওঁর। কিন্তু এই কলকাতা শহর বলে নয়, সর্বত্র স্মাগল্ড বা চোরাই সোনা, পাথর বেচাকেনা হয়। ধরো, কোনো চোরাইঅলা জগন্নাথের বাবার মারফত কিছু পাথর বিক্রি করতে চেয়েছিল। বলবে, তা কি সম্ভব? আমি বলব, সম্ভব। সম্ভব ওই জন্যে যে, সব কারবারের মতন এ-সব কারবারেরও একটা সার্কেল আছে। রিং। ওরা। পরস্পরকে চেনে। কারবার করে। বিশ্বাসও করে।”

তারাপদ চুপ। সে যেন ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিল না। আবার এত কথা শোনার পর সরাসরি অবিশ্বাস করতেও বাধছিল।

চুরুট ধরিয়ে কিকিরা বললেন, “দুটো জিনিস হতে পারে। হয় কোনো চোরাইঅলার কিছু মাল জগন্নাথের বাবার কাছে ছিল; না হয়, কোনো দোকান থেকেই জগন্নাথের বাবা কিছু সোনাদানা, পাথর চুরি করে আনছিলেন। জিনিসগুলো ওঁর ফতুয়ার ভেতরের পকেটে, না হয় কোমরে কষির মধ্যে ছিল। হাতে ছিল না, পকেটেও নয়। মোটরসাইকেলঅলা যদি সহজে সেগুলো পেত, ছেড়ে পালাত না, কেড়েকুড়ে নিয়ে চলে যেত। ও জগন্নাথের বাবাকে ফলো করে এসেছিল জিনিসগুলো হাতাতে, পারেনি। তারপর তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়।”

তারাপদর চোখের পলক পড়ছিল না। কিকিরা কি ঠিক বলছেন? পাথর-টাথরের কথা যদি সত্যি হয়, জগুদার বাবা যে কোনো জুয়েলারের দোকান থেকে দু-দশটা দামি পাথর চুরি করে আনছিলেন, একথা সে বিশ্বাস করে না। ছি ছি। জগুদার বাবা চোর? কিকিরার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এক মৃত ভদ্রলোকের নামে তিনি চোর অপবাদ দিচ্ছেন। তারাপদ মনে-মনে অসন্তুষ্ট, বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। ক্ষুব্ধ হয়েই বলল, “আপনি জগুদার বাবাকে চোর ভাবছেন?”

কিকিরা বললেন, “না, চোর ভাবিনি। আমি বলছিলাম, হয় এটা না হয় ওটা! যুক্তিতে তাই বলে। অঙ্কের নিয়ম আর কি! তা ছাড়া তুমি কেমন করে বুঝছ, একটা মানুষ, খুব একটা খারাপ অবস্থায় পড়ে হঠাৎ একদিন লোভের বশে এমন কাজ করবে না! করতেও তো পারে। তবু চোর কথাটা বাদ দিচ্ছি। চোরাই মাল তো বটেই..।”

“আপনি কি বলতে চাইছেন, এই চোরাই জিনিসগুলো জগুদার বাবা জগুদার মাকে লুকিয়ে রাখতে বলে মারা যান?”

“আমার তাই মনে হয়।”

“আপনি ভুল করছেন কিকিরা-স্যার।”

“হতেই পারে ভুল। চাণক্য শ্লোকে নাকি বলেছে, বুদ্ধিমানে আধাআধি ভুল করে, বোকারা পুরোটাই ভুল করে।”

তারাপদ জবাব দিল না কথার।

কিকিরা চুরুট টানতে টানতে চোখ বুজে থাকলেন সামান্যক্ষণ। তারপর চোখ চেয়ে তারাপদকে দেখলেন। “এতক্ষণ যা শুনলে সেটা হল স্টেজের পেছনের ব্যাপার। যবনিকার অন্তরালে। তোমার-আমার চোখে পড়ছে না। পরের ব্যাপারটা বাপু অন্ দি স্টেজ। শুদ্ধানন্দ প্রেসিদ্ধ।...যাক্ সিনেমার এখানে ইন্টারভ্যাল, পরের ব্যাপারটা কাল-পরশু হবে। তুমি শুধু জগন্নাথদের বাড়ির ব্যাপারটা খোঁজখবর করো। ওর বাবা, ওর জ্ঞাতিগুষ্টি...যা যা পারো জেনে নেবার চেষ্টা কোরো।”

তারাপদ শুনল। মনে হল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে।

০৫.

পরের দিন সাতসকালে কিকিরা একা-একাই বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতা শহরের নানান এলাকায় তাঁর চেনাজানা লোজন রয়েছে, কেউ-কেউ বন্ধুর মতন, কেউ বা মুখচেনা, কিন্তু পাতিপুকুরে কেউ আছে বলে তাঁর মনে পড়ল না। না পড়ুক খোঁজ করতে করতে একটা হদিস তো পাওয়া যেতে পারে। সম্ভাবনা রয়েছে।

কিকিরা ঠিক করে নিয়েছিলেন, এ-বেলা অন্তত চার জায়গায় তিনি যাবেন। প্রথম যাবেন বদ্যিনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি। মানিকতলায় থাকেন বদ্যিনাথ, জমি কেনাবেচার ব্যবসা ছিল, হয়ত এখনো আছে, বেলগাছিয়ার দিকে কাজ-কারবার করেছেন ভদ্রলোক। দেওঘরে আলাপ হয়েছিল কিকিরার সঙ্গে। ঠাকুর-দেবতায় ভীষণ ভক্তি। মানুষটিও আলাপী। কিকিরার সঙ্গে বার দুই-চার দেখাও হয়েছে পরে। পাতিপুকুরের খোঁজ দিলেও দিতে পারেন। কেননা ওপাশের জমি-জায়গার কারবার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব।

মানিকতলার বাড়িতে বদ্যিনাথকে পাওয়া গেল না। উনি শরীর সারাতে ভুবনেশ্বর গিয়েছেন। মানিকতলা থেকে সোজা পল্টনবাবুর কাছে গ্রে স্ট্রিটে। পল্টনবাবু নেই। মধ্যমগ্রামে গিয়েছেন।

কিকিরার লিস্টে তিন নম্বর ছিল সুবল দেব। সুবল থাকে বেলগাছিয়ায়। সরকারি চাকরি করে আর নাটক করে বেড়ায়। হাসি-তামাশার অভিনয় ভালই করে। বকেশ্বর, ফাজিল, তবে কাজের লোক।

সুবলকে পাওয়া গেল। সবে ঘুম থেকে উঠে এক পট চা আর মগের মতন দুটো কাপ নিয়ে বসে-বসে চা খাচ্ছে, সামনে সকালের টাটকা কাগজ! রবিবারের সকাল বলে কথা।

কিকিরাকে দেখে সুবল প্রায় লাফিয়ে উঠল।“আরে দা-দ্দা–আপনি। শুভ প্রাতঃকাল! সকালে উঠে এ কার মুখ দেখছি..”

“দি গ্রেট কিকিরার মুখ দেখছ!”

“বসুন বসুন, আমার কী সৌভাগ্য!”

“তোমার মতন লুডিক্রাম লয়টারিং ল্যাল্যাফায়িং…”

“দাদা, প্লিজ, নো মোর “এল’! আপনি কি আজ “ল’-এর ঝাঁকা মাথায় করে এনেছেন! হরিফায়িং ব্যাপার!”

দু’জনেই হেসে উঠলেন জোরে।

কিকিরা বসলেন।

সুবল বলল, “দাদা, আগে চা হোক, তারপর দুটো টোস্ট ডিম…”

মাথা নাড়লেন কিকিরা। বললেন, “নো টোস্ট! গরম জিলিপি খাব। আনাও। তোমার সেই বুলেটটা, আছে?”

“না। বেটা নবদ্বীপ চলে গেছে। ওর মায়ের কাছে।...আপনি ভাববেন না। ব্যবস্থা আছে। চা দিয়ে শুরু করুন।”

সুবল এক মগ চা ঢেলে দিল। বলল, “দুধ-চিনি মিশিয়ে নিন, আমি আসছি।” সুবল ভেতরে চলে গেল।

কিকিরা দুধ-চিনি মিশিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন। বাহুল্য নেই, কিন্তু গোছানো, ফিটফাট ঘর। বইয়ের আলমারি, রেকর্ড-প্লেয়ার, একরাশ রেকর্ড, পেপার পাল্পের মা দুগ, দু-চারটে ফোটো। সুবলের থিয়েটারের ফোটোও টাঙানো রয়েছে।

ফিরে এল সুবল। বসতে বসতে বলল, “বলুন দাদা? এই সকালে আমার মতন বখাটেকে মনে পড়ল?”

কিকিরা বললেন, “বলছি। তার আগে বলি, তুমি সেদিন আসছি বলে পালালে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলাম হাঁ করে, শেষে চলে এলাম।”

সুবল হাতজোড় করে বলল, “ভীষণ অপরাধ হয়ে গিয়েছিল। হল কী জানেন, আমাকে যে ডেকে নিয়ে গেল সে একটা গুণ্ডা-ক্লাসের ছেলে। এক দোকানে ঢুকে গণ্ডগোল শুরু করে দিল। তার ক্যামেরা খারাপ করে দিয়েছে। মারপিট লেগে যাবার উপক্রম। ওদিকটা সামলে যখন এলাম, আপনি চলে গেছেন। আমি দাদা, ভেরি ভেরি সরি।”

কিকিরা হাসলেন। চুমুক দিলেন চায়ে। রাস্তাঘাটে গুণ্ডামি করার বয়েস সুবলের আর নেই। মাথায় তো টাক পড়ে গিয়েছে।

কিকিরা বললেন, “পাতিপুকুর চেনো?”

“পাতিপুকুর চিনব না, বলেন কী! ঘাড়ের পাশে পাতিপুকুর।“

“আসা-যাওয়া আছে?”

“আছে। আমাদের এক কোলিগ থাকে সেখানে। বঙ্কিম। তা ছাড়া হিরো রয়েছে।”

“হিরো?”

“নাটকের হিরো মধুময়।”

“একটা লোকের ঠিকানা আমার দরকার। পাতিপুকুরে থাকেন ভদ্রলোক। জোয়ারদার। বিশ্বনাথ জোয়ারদার। তাঁর বাড়ির ঠিকানা প্লাস কাজ-কারবারের ঠিকানা।”

“ছোকরা?”

“না, ছোরা নয়। মাঝবয়েসির ক্লাস।”

“কী নাম বললেন?”

“বিশ্বনাথ জোয়ারদার।”

সুবল কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "ক'টা বাজল? আট, সোয়া-আট হবে!...দাঁড়ান, হিরোকে পেয়ে যেতে পারি। আজ রবিবার হলেও হিরো ভেরি বিজি। হয়ত কোথাও রিহার্সাল দিতে যাবে। ওকে একটা ফোন করি। হিরোর বাড়িতে ফোন আছে। আমার নেই। পাশের ফ্ল্যাট থেকে ধরতে হবে।...ভেরি আর্জেন্ট, কিকিরা?"

"ইয়েস, ভেরি-ভেরি।"

"তা হলে আপনি বসুন। গরম জিলিপি আসছে, খান। আমি ফোন করে আসি। বিশ্বনাথ জোয়ারদার, মাঝবয়েসি..."

"সাহেব-সাহেব পোশাক...?"

"ও. কে।"

সুবল চলে গেল।

কিকিরা চা শেষ করতে লাগলেন। কাল প্রেতসিদ্ধর বাড়ির বাগানে যে জোয়ারদার সাহেবের দেখা পেয়েছিলেন কিকিরারা, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে চান কিকিরা। জগন্নাথ প্রেতসিদ্ধর মুখোমুখি হয়নি, জোয়ারদার হয়েছিলেন। তিনিই বলতে পারেন, ওখানে কী হয়, কল্পবৃক্ষটি কী ধরনের ভেলকিবাজি দেখায়, কোন খেলা দেখায়!

গরম জিলিপির প্লেট এসে গেল সামান্য পরেই। যে-ছেলেটি জিলিপি এনেছিল তাকে দেখতে নেপালি-নেপালি। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, মাথার চুল ছোট। পরনে পাজামা, গায়ে কটকটে লাল গেঞ্জি। সুবলের পছন্দ আছে।

খানিকটা পরে সুবল ফিরল। ফিরেই বলল, "পেয়েছেন জিলিপি? দারুণ।"

"তুমি খাও।...হাত লাগাও।"

"লাগাচ্ছি। আগে জোয়ারদারের খবরটা দিয়ে নিই।" সুবল বসে পড়ল। বলল, "বিশ্বনাথ জোয়ারদার পাতিপুকুরেই থাকেন। পাড়ার পুরনো লোক। পয়সাঅলা। তাঁর একটা দোকান আছে এজরা স্ট্রিটে। ইলেকট্রিক্যাল গুডস বিক্রি হয়। বড় দোকান, চালু দোকান। পুরনো দোকানও। ভদ্রলোকের এমনিতেই মাথায় একটু ছিট ছিল। হালে তাঁর ছোট ভগ্নিপতি অ্যাকসিডেন্টে মারা যাওয়ায় কেমন খেপাটে হয়ে গিয়েছেন। ছোট ভগ্নিপতিটি ওঁর বন্ধু এবং ব্যবসার পার্টনার ছিলেন।"

কিকিরা মন দিয়ে শুনলেন সব। তারপর বললেন, "ভগ্নিপতির নাম?"

"জানি না। ভগ্নিপতির নামে কী হবে।"

"এজরা স্ট্রিটে দোকান?"

"হ্যাঁ।"

"কোনো নাম নিশ্চয় আছে দোকানের?"

"জিজ্ঞেস করিনি। নামকরা পুরনো দোকান। ওখানে কাউকে বললে নিশ্চয় দেখিয়ে দেবে।"

কিকিরা ঘাড় হেলালেন। অর্থাৎ বোঝালেন, হ্যাঁ, তা ঠিকই।

জিলিপি খাওয়া শেষ করে কিকিরা উঠে পড়লেন। বললেন, “চলি হে সুবলস।”

“আসুন। কিন্তু, আপনি মশাই শরৎকালের বৃষ্টির মতন এলেন, আবার চলে যাচ্ছেন, ব্যাপারটা বোধগম্য হল না আমার! জোয়ারদার ভদ্রলোকটি কে? আপনি তার খোঁজ নিতে বেরিয়েছেন সাতসকালে!”

কিকিরা গম্ভীর মুখ করে ডান হাত তুলে তিনটে আঙুল দেখালেন। “ক্লীং রিং হিং।” চোখ নাচিয়ে-নাচিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন জোরে জোরে।

সুবল অবাক হয়ে বলল, “মানে? ক্রিং ক্রিং!”

“না, সাইকেলের ঘণ্টি নয়, সংস্কৃত মন্ত্র। ক্লীং রিং হিং!”

সুবল উঠে পড়েছিল। কিকিরাকে এগিয়ে দেবে নিচে পর্যন্ত।

বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কিকিরা বললেন, “সুবল, আমি এখন এক বিশুদ্ধ প্রেতসিদ্ধ কল্পবৃক্ষের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি। শুনলাম সেই মহাপুরুষ রাত্রের দিকে আত্মালোকে বিচরণ করেন। তাঁর দেহটি বিছানায় পড়ে থাকে, চৈতন্যটি বায়ুলোকে সাঁতার কাটতে কাটতে আত্মালোকে চলে যায়...”

সুবল হেসে ফেলেছিল। “দারুণ তো! মহাপুরুষটি কে? থাকেন কোথায়?”

“টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট...কাঁঠালতলা গলি। শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ কল্পবৃক্ষঃ।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমায় নিয়ে যাবেন?”

“দাঁড়াও। মহাপুরুষকে আগে দেখি!”

নিচে রাস্তায় এসে কিকিরা বললেন, “চলি। পরে দেখা হবে।”

.

বাড়ি ফিরলেন না কিকিরা। সোজা তারাপদর বোর্ডিংয়ে।

ছোট একফালি ঘর নিয়ে থাকে তারাপদ। একাই। কোনোরকমে একটা তক্তাপোশ পাতার মতন জায়গা ঘরে, অবশ্য একটি টেবিলও আছে ছোট মতন, আর একটি মাত্র চেয়ার।

কিকিরা এসে দেখেন, তারাপদ দাড়ি কামাবার ব্যবস্থা করছে। সেফটি রেজার, সাবান, ব্রাশ, আয়না নিয়ে তৈরি।

তারাপদ বলল, “কিকিরা-স্যার, আপনি?”

“সাত-তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাতে বসেছ?”

“আপনার জন্যেই। ভাবছিলাম একবার জগুদার বাড়ি যাব। আজ রোববার, জগুদা বাড়িতেই

থাকবে।”

কিকিরা বিছানাতেই বসলেন। বললেন, “খুব ভাল কথা। যাও, ঘুরে এসো।”

“আপনি কোথায় বেরিয়েছিলেন? সোজা আমার কাছে?

মাথা নাড়লেন কিকিরা। বললেন, “আমি গিয়েছিলাম বিশ্বনাথ জোয়ারদারের খোঁজ করতে। কালকের সেই জোয়ারদার-সাহেব মনে পড়ছে?”

“হ্যাঁ। তাঁর কাছে কেন?”

“ভেবে দেখলাম, সাহেব প্রেতসিদ্ধর ক্লায়েন্ট। বোধ হয় নতুন ক্লায়েন্ট। কালকের কথাবার্তা থেকে তাই মনে হল। তা সাহেব তো দেখলাম কাল শেষ পর্যন্ত প্রেতসিদ্ধ ভবনে চলে গেল। গিয়ে কী হল, কী দেখল, কী হয় সেখানে তার কিছু খোঁজ-খবর যদি নেওয়া যায়, ভালই হবে। তোমার জগুদা সরাসরি প্রেতসিদ্ধর কোনো খেলাই এখন পর্যন্ত দেখেনি। জোয়ারদার দেখেছেন।”

তারাপদ বলল, “খোঁজ পেলেন জোয়ারদারের?”

“পেয়েছি। আজ রবিবার। কাল সাহেবের দোকানে যাবার ইচ্ছে।” বলে কিকিরা সুবলের কাছে যাওয়া এবং জোয়ারদারের হদিস খুঁজে বার করার বৃত্তান্ত শোনালেন।

তারাপদ চা আনাতে যাচ্ছিল, বারণ করলেন কিকিরা। টেবিল থেকে তারাপদর সিগারেটের প্যাকেট-দেশলাই উঠিয়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, “তারাপদ আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে দেখলাম, জগন্নাথের বাবার এবং মায়ের একটা ব্যাপার এখানে জড়িয়ে আছে। তোমায় আগেই বলেছি, জগন্নাথের বাবার অ্যাকসিডেন্ট আমার কাছে সাধারণ বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর কাছে নিশ্চয়ই কিছু ছিল।” বলে কিকিরা চুপ করে থাকলেন। ভাবছিলেন কিছু। লম্বা করে সিগারেট টানলেন, বললেন আবার, “জগন্নাথের বাবা এই জিনিসগুলো তাঁর স্ত্রীকে রাখতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এমনভাবে লুকিয়ে রাখতে যেন কেউ টের না পায় কোনো দিন। জগন্নাথের মা স্বামীর কথামতনই জিনিসগুলো রেখেছিলেন। হয়ত একদিন জগন্নাথ তার মায়ের মুখ থেকেই জানতে পারত সব, কিন্তু ভদ্রমহিলা হঠাৎ মারা যাওয়ায় সেটা হয়নি।”

তারাপদ বলল, “আমিও আপনার কথা ভেবেছি স্যার। আমার মনে কিন্তু একটা খটকা রয়েছে। ...আপনার প্রথম কথা আমি না হয় ধরে নিচ্ছি, জগুদার বাবা কিছু গুপ্তধন রেখে গেছেন। জগুদার মা ছাড়া সে-কথা অন্য কেউ জানত না। কিন্তু একটা কথা বলুন-জগুদা তার মায়ের একমাত্র ছেলে। মা কি ঘুণাক্ষরেও ছেলেকে এই গুপ্তধনের আভাস দেবেন না? বিশেষ করে জগুদারা যখন অত দুঃখকষ্ট করে মানুষ হচ্ছে, সংসার চালাচ্ছে?”

কিকিরা মাথাটা উঁচু করে ছাদের দিকে তুলে কিছু যেন লক্ষ করতে-করতে বললেন, “হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ! কিন্তু ধরো সেই গুপ্তধন যদি এমনই হয়, যা সাধারণ অবস্থায় ছেলের কাছে বলা যায় না। হয়ত বলতে লজ্জা করে। হয়ত বললে ছেলে বিগড়ে যেতে পারে। তার ধারণা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বা, এমনও হতে পারে তারাপদ, জগন্নাথ সাদামাটা নিরীহ ছেলে। কথাটা তার জানা থাকলে যদি পাঁচকান হয়ে যায়।”

“পাঁচকান?”

“জগন্নাথের বাড়ির শরিকদের কারও কারও কানে যেতে পারে।”

“আপনি কী বলতে চাইছেন?”

“আমি বলতে চাইছি,” বাধা দিয়ে কিকিরা বললেন, “দুটো জিনিস হালে ঘটতে পারে। এক, জগন্নাথদের বাড়ির কেউ-না-কেউ কোনোভাবে এই খবরটা জেনেছে, বা জানত। জগন্নাথের মায়ের জীবিত অবস্থায় সে বা তারা। গুপ্তধন হাতাবার সাহস করতে পারেনি। ভেবেছিল মহিলা অনেক বুদ্ধিমতী এবং শক্ত ধাতের মানুষ, সুবিধে হবে না। এখন অবস্থা পালটে গেছে।”

দাড়ি কামিয়ে গাল মুছতে মুছতে তারাপদ বলল, “বেশ, আপনার একটা অনুমান শুনলাম। দ্বিতীয়টা কী হতে পারে?”

“দ্বিতীয়টা এই হতে পারে–যার জিনিস জগন্নাথের বাবার কাছে ছিল, কিংবা ধরো চুরি গিয়েছিল–সেই লোক এতদিনে হাজির হয়ে পড়েছে। সে চাইছে নিজের জিনিস ফেরত নিতে।”

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, “প্রেসিদ্ধ কি সেই লোক?”

কিকিরা বললেন, “প্রেতসিদ্ধ তার এজেন্ট হতে পারে।”

তারাপদ কথা বলতে পারল না।

০৬.

জোয়ারদারের দোকান খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। নাম বলতেই দেখিয়ে দিল অন্য-এক দোকানের কর্মচারী।

দোকানটা যে পুরনো বোঝাই যায়। সাবোর্ডের মাথায় লেখা আছে শুভারম্ভের সালটা। হিসেব করলে প্রায় পঞ্চাশে দাঁড়ায় এখন। তা পঞ্চাশ বছরের চেহারায় খানিকটা ভাঙাচোরা ময়লা ছাপ তো পড়বেই।

বড় দোকান বইকি! রাস্তার গা ঘেঁষে দোকান, মালপত্র সাজানো; কাঠের তক্তার "ল'; বোধ হয় ওখানে আরও মালপত্র ঠাসা আছে। কাঠের এক পার্টিশান একদিকে। পার্টিশানের ওপাশে জোয়ারদারের অফিস।

নানান ধরনের পাখা, ল্যাম্প, বাহারি আলোর শেড থেকে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, হিটার, মিটার কী না আছে দোকানে! ইলেকট্রিক তার, সুইচ, প্লাগ, মায় ইনভারটার পর্যন্ত।

দোকানে জনা-তিনেক কর্মচারী, একজন বুড়োসুড়ো ক্যাশবাবু।

তারাপদ সঙ্গেই ছিল। কিকিরা তারাপদকে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেম যেন সে সঙ্গে-সঙ্গে থাকে তাঁর।

দোকানের এক কর্মচারী এগিয়ে এল। অন্যরা খদ্দের সামলাচ্ছে। ভিড় এমন কিছু নেই।

"কী চাই আপনার?" কর্মচারী এগিয়ে এসে বলল।

কিকিরা আগেভাগেই সব ছকে এসেছিলেন। বললেন, "মিস্টার জোয়ারদার কে? আপনাদের মালিক না?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। দোতলা একটা বাড়ির ইলেকট্রিকের সবরকম কাজ হবে। ফিটিংস সুদ্ধু। আমার এক বন্ধু মিস্টার জোয়ারদারের কথা বললেন। এখানে কোনো ঠগ-জোচ্চুরি নেই, খারাপ মাল বিক্রি হয় না, দামটাও ঠিকঠাক...। তাই না, তারাপদ?"

তারাপদ মাথা নাড়ল।

কর্মচারীটি যেন ধাঁধায় পড়ে গেল। দোতলা একটা বাড়ির ইলেকট্রিকের সমস্ত কাজকর্মের জিনিস যাবে এই দোকান থেকে? সে তো অনেক টাকার কাজ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হাজার বারো-চোদ্দ। মালপত্র দামি কিনলে আরও বেশি।

কর্মচারীটি বলল, "দাঁড়ান দেখছি," বলে পার্টিশানের ওপারে এক ঘরে ঢুকে গেল।

কিকিরা ফিসফিস করে তারাপদকে বললেন, "সাইনবোর্ডে দেখলাম লেখা আছে, কনট্রাকটারস। ঢিল ছুড়লাম। দেখি কী হয়!"

সামান্য পরেই কর্মচারীটি ফিরে এসে বলল, "আসুন।"

পার্টিশানের গা-লাগানো কাঠের এক খুপরি। চেয়ার, টেবিল, ফোন, লোহার আলমারি, ছোট এক লোহার সিন্দুক।

কিকিরাদের খুপরির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে লোকটি চলে গেল।

টেবিলের ওপাশে জোয়ারদারসাহেব বসে।

কিকিরা নমস্কার করে বলল, "আমার নাম কে, কে, রায়। আপনিই তো। মিস্টার বিশ্বনাথ জোয়ারদার? পাতিপুকুরে থাকেন?"

জোয়ারদার একটু অবাক হলেন। নমস্কার জানিয়ে বললেন, "বসুন।"

লোহার হালকা চেয়ার। দু জনেরই বসার ব্যবস্থা ছিল। কিকিরা তারাপদকে বসতে বলে নিজে বসলেন।

তারাপদ বসল।

কিকিরা জোয়ারদারকে দেখছিলেন। প্যান্ট-শার্ট পরে বসে আছেন। ভদ্রলোক। গায়ের কোটটা আলমারির পাশে দেওয়ালে গাঁথা হুকে। হ্যাঙারসমেত ঝোলানো। ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চাশ কি সামান্য বেশি। লম্বাটে মুখ। গালের হাড় উঁচু। আধ-ফরসা গায়ের রং, মাথার চুল কিছু-কিছু পাকতে শুরু করেছে। চশমাটা টেবিলে নামানো। টেবিলে কাগজপত্র, বিল, চেই পড়ে আছে। জলের গ্লাস, চায়ের কাপ।

কিকিরার মনে হল, জোয়ারদারসাহেব তেমন স্বাস্থ্যবান নন। চোখে-মুখে অসুস্থতার ছাপ ফুটে রয়েছে।

জোয়ারদার বললেন, "বলুন, কী দরকার। আমার কথা কে বলল আপনাদের?"

কিকিরা খুব সহজেই সুবলের নাম বলে দিলেন। পারলে সুবলের বাবার নামই বলে ফেলতেন। নামটা তিনি জানেন না।

"আপনার দোকানের পুরনো কাস্টমার," কিকিরা হেসে-হেসে বললেন।

জোয়ারদার কিছুই মনে করতে পারলেন না। খদ্দের কত আসে কত. যায়। কে আর মনে রাখে সকলকে। তবে জোয়ারদার ব্যবসাদার মানুষ, কথা বলতে জানেন। হেসে বললেন, "ও!...আচ্ছা! পুরনো খদ্দের আমার অনেক। বাবার আমলে এখানে ক'টা আর দোকান ছিল। এখন তো গিজগিজ করছে।...তা বলুন, আপনার দরকারটা শুনি।"

কিকিরা হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, "আপনারা তো ইলেকট্রিকের সমত রকম কাজকর্মের কনট্রাক্ট নেন।"

"কনট্রাক্ট ...ইয়ে, মানে...সেভাবে এখন আর নিই না। আগে নিতাম। আজকাল লোকজন পাওয়া বড় মুশকিল। হাতেপায়ে ধরতে হয়। কাজে ফাঁকি মারে। পাটির কাছে কথা শুনতে হয় আমাদের। অনর্থক ফ্যাচাং আর ভাল লাগে না। বয়েসও হচ্ছে।"

"কনট্রাক্ট আর নিচ্ছেন না?"

"একেবারে নিই না-তা বলব না। নিই।"

কিকিরা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন জোয়ারদার হিসেব করে কথা বললেন। অর্থাৎ এখন ঝামেলার কাজ নেন না বড় একটা, তবে তেমন কাজ হলে নিতে আপত্তি নেই।

তারাপদ হতাশ হবার ভান করে বলল, "তা হলে আমরা..."

"আপনাদের ব্যাপারটা আগে শুনি।"

কিকিরা বেশ গুছিয়ে দোতলা বাড়ির ইলেকট্রিকের কাজকর্মের কথা বললেন।

জোয়ারদার ততক্ষণে সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছেন। কিকিরাদেরও দিয়েছেন। তারাপদ সিগারেট নেয়নি।

শেষে জোয়ারদার বললেন, "বাড়িটা কোথায়?"

"টেগোর ক্যাসেল স্ট্রিট।"

"টে-গোর ক্যাসেল!" জোয়ারদার কেমন থতমত খেয়ে গেলেন।

কিকিরা কথা বললেন না, জোয়ারদারকে দেখছিলেন।

নিজেকে সামান্য সামলে নিয়ে জোয়ারদার বললেন, "বলেন কী মশাই! ওখানে বাড়ি! ও জায়গাটা তো সেই কী বলে, ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে। ওখানে বাড়ি। এত জায়গা থাকতে শেষে..."

কিকিরা বললেন, "খুব সস্তায় পেয়ে গিয়েছিলাম। মর্টগেজ প্রপারটি থেকে কোর্টকাছারি... তা সে যাক, বলতে গেলে মহাভারত। সেই বাড়ি ভেঙেচুরে নতুন করে করাতে হল। আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

"কোথায় বাড়িটা? মানে, ঠিক কোন জায়গায়!"

"কাঁঠালতলা বলে লোকে।"

জোয়ারদার যেন চমকে উঠলেন। "কাঁঠালতলার গলি!...বলেন কী! ওই গলিতে ভদ্রলোক বাড়ি করে। আরে ছি-ছি, সে তো একরকম ব্লাইন্ড লেন। ওখানে নতুন বাড়ি কোথায়? আরে মশাই, ওখানে এক বেটা তান্ত্রিক...ডেঞ্জারাস! সে বেটা ওখানে..."

"শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ কল্পবৃক্ষঃ...! "কিকিরা কল্পবৃক্ষ-এর বিসর্গে জোর দিলেন।

জোয়ারদারের মুখ হাঁ হয়ে থাকল। চোখের পাতা পড়ছিল না। শেষে বললেন, "চেনেন বেটাকে?"।

"না। নাম শুনেছি।"

"নাম শুনেছেন। দেখেননি?"

"না।" কিকিরা মাথা নাড়লেন, "আপনাকে দেখেছি।"

"আমাকে?" জোয়ারদারের যেন ফাঁস লেগে গেল গলায়, "কবে দেখলেন আমাকে?"

"গত পরশু! শনিবার সন্ধের পর।"

জোয়ারদার রীতিমত হতবাক। বিহ্বল। তাকিয়ে থাকলেন বোকার মতন।

কিকিরা হাসি-হাসি মুখে বললেন, "কী! ঠিক বলিনি?"

"আপনি কে মশাই? ডিটেকটিভ? লালবাজারের লোক?"

মাথা নেড়ে হাসতে-হাসতে কিকিরা বললেন, "না।"

"না!" জোয়ারদার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন। ঢোক গিললেন বার দুই। নানারকম ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "তা হলে কি আপনি ওই কালো আলখাল্লার দলে ছিলেন?"

"কালো আলখাল্লা "

"বুঝেছি। ওদের দলে আপনি ছিলেন। ওখান থেকেই আপনি আমার নাম শুনেছেন। জোয়ারদার হঠাৎ কেমন খেপে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কিকিরা বাধা দিলেন।

কিকিরা বললেন, "না, আপনাকে আমি আগেই দেখেছি। প্রেতসিদ্ধর চেলা এসে আপনাকে যখন হাত চেপে ধরল।"

জোয়ারদার যেন অগাধ জলে পড়েছেন! কে এই লোকটা? কাস্টমার না পুলিশের লোক? না চিটিংবাজ!

কিকিরা বললেন, "জোয়ারদারসাহেব, আপনি খুব অবাক হচ্ছেন। অবাক হবারই কথা। আপনাকে আমি আরও অবাক করতে পারি। আচ্ছা দেখুন আপনাকে একটা জিনিস দেখাই।" বলে নিজের পকেটে হাত দিলেন কিকিরা। স্টিলের একটা সুচ বার করলেন। ইঞ্চি-দেড়েক লম্বা। একটু মোটা। সুচের মুখ সামান্য ভোঁতা। সুচটা নিজের ডান চোখে ছোঁয়ালেন, ভুরুর তলায়, চোখের আর নাকের কাছে গর্তে। বললেন, "এই দেখুন, এই সুচটা আমি চোখে ঢুকিয়ে দিচ্ছি সবটা।" বলে কিকিরা চোখের কোলে মুচ ঢোকাতে লাগলেন।

জোয়ারদার ভয় পেয়ে গেলেন। আজব মানুষ তো! চোখে সুচ ঢুকিয়ে যাচ্ছে। মরবে নাকি! মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল জোয়ারদারের। "মশাই, করছেন কী! প্লিজ স্টপ। প্লিজ।...আমার এ-সব সহ্য হয় না।"

কিকিরা বারো আনা সুচ ঢুকিয়ে ফেলেছিলেন। বার করলেন এবার। বার করে চোখ বন্ধ রেখেই পকেট থেকে রুমাল টেনে নিয়ে চোখটা চাপা দিলেন। মুছলেন সামান্য। তারপর রুমালটা নিয়ে টেবিলের ওপর ফেলে দিলেন। তাকালেন এবার। ডান চোখ খুলেই।

হাসি-হাসি মুখ করে কিকিরা প্রথমে রুমালটা দেখালেন। দেখিয়ে টেবিলের ওপরই ফেলে রাখলেন। তারপর ডান চোখটা দেখালেন। বললেন, "কী? রক্তটক্ত দেখলেন?"

"না।"

"সুচটা তো আমি চোখে ঢুকিয়ে ছিলাম।"

"হ্যাঁ।"

"আরও কিছু দেখবেন?"

"না, মশাই। থাক।"

কিকিরা রুমালটা তুলে নিলেন টেবিল থেকে। "আপনি যদি একটা চেক লেখেন এখন, আপনার কালির রং পালটে যাবে!"

"মানে?"

"দেখুন না। পরীক্ষা করুন।"

জোয়ারদার চোখ নামিয়ে চেক বই টানতে যাচ্ছিলেন। বই নেই। কাগজপত্র সরালেন। ড্রয়ার টানলেন। চেক বই? টেবিলের ওপরেই তো ছিল।

কিকিরা এবার হেসে ফেললেন। রুমাল তোলার সময় চেক বইটা তুলে নিয়েছিলেন। জোয়ারদার বোঝেনি।

চেক বই ফেরত দিতে-দিতে কিকিরা বললেন, "জোয়ারদারসাহেব, কিছু মনে করবেন না। এ হল লোককে ধোঁকা দেবার খেলা। চোখে যেটা ঢোকালাম ওর মধ্যে স্প্রিং ছিল। গাড়ির শক অ্যাবজরভার বোঝেন! সেইরকম অন্যটা ক্লিন হাত সাফাই। দুটোই। আমি একজন ওল্ড ম্যাজিশিয়ান, ক্লাসিক্যাল টাইপ। লোকে আমাকে বড় চেনে না। এই ছোকরারা চেনে," বলে তারাপদকে দেখালেন।

তারাপদ বিনয় করে বলল, "উনি হলেন কিকিরা দি ওয়ান্ডার, কিকিরা দি গ্রেট!"

জোয়ারদার ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। বললেন, "আমার এখানে ম্যাজিক কেন? ম্যাজিক দেখাবার জায়গা এটা? আশ্চর্য লোক মশাই.আপনারা!"

কিকিরা বললেন, "না, ম্যাজিক দেখাবার জায়গা এটা নয়। কিন্তু সাহেবমশাই, আপনি গত পরশু দিন, শনিবার, সন্ধেবেলা কী দেখতে গিয়েছিলেন কাঁঠালতলা গলিতে?"

জোয়ারদার বললেন, "আমি দেখতে যাইনি। আমাকে একজন বলল, ওখানে গেলে ওই শুদ্ধানন্দ আমাকে বাসুর গলা শোনাবে।"

"বাসু কে?"

"আমার বন্ধু।"

"আপনার ভগ্নিপতি এবং পার্টনার।"

"কেমন করে জানলেন?"

“আমি পিশাচসিদ্ধ।” বলে কিকিরা হাসতে লাগলেন।

“আপনি মশাই লোকটি কে?”

“কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান।...এখন বলুন তো, স্যার, সেদিন কি আপনি বন্ধুর গলা শুনেছিলেন?”

“একটা গলা শুনেছিলাম।”

“বন্ধুর?”

“মনে হল না বাসুর! সর্দিতে গলা বসে গেলে, কিংবা ফোনের লাইনে গোলমাল হলে যেরকম গলা শোনা যায়, সেইরকম এক গলা শুনলাম।”

“আচ্ছা! তা আপনি কি গলা শুনতেই গিয়েছিলেন, না, কোনো বিশেষ কথা ছিল?

জোয়ারদার খানিক চুপ করে থেকে বললেন, “ছিল। বিজনেস সিক্রেট। পার্সোনাল ব্যাপার।”

“কথা হল?”

“না।...গলাটা শুনলাম, বুঝলাম না। শুদ্ধানন্দ বলল, বাসুর আত্মা একটা লেভেলের এপারে আসতে পারছে না। কোথাও গোলমাল হচ্ছে। আত্মারা নিজের মরজিতে আসে; আবার আসতে চাইলেও সব-সময় পারে না ভিড়ে আটকে যায়। আসছে হপ্তায় আবার চেষ্টা করা যাবে।”

তারাপদ মুচকি হাসল। কিকিরাও হাসিমুখে বললেন,কত নিল? মানে কত টাকা?”

“একশো এক। বেটা বলল, পরের দিন যদি ঠিকঠাক এসে যায় বাসু, কথা বলে, পাঁচশো এক লাগবে।“

কিকিরা মাথা দুলিয়ে বললেন, “বাঃ!...দুশো, পাঁচশো, হাজার...! বাঃ! ভাল ব্যবসা।...তা জোয়ারদারমশাই, কালো আলখাল্লার ব্যাপারটা একটু বলবেন। শুনতে ইচ্ছে করছে।”

জোয়ারদার বললেন, “সে এক ভুতুড়ে কাণ্ড মশাই। ও আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি বললেও ধরতে পারবেন না। চোখে দেখতে হবে আপনাকে। অবশ্য চোখে দেখবেনই বা কী! সব অন্ধকার, কালো; যারা থাকে তাদেরও একটা করে কালো আলখাল্লা পরতে হয়। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত তো বটেই, ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা থাকে, অনেকটা সেই ইংরেজি সিনেমায় দেখা সেকেলে সাধুসন্ন্যাসীর মতন, যাকে ওই ‘রোব’-টোব বলে। ধরুন না, মেয়েদের ওয়াটার পুফের মাথা ঢাকার যেমন ব্যবস্থা থাকে–সেইরকম মাথা ঢাকা।...মশাই, একে অন্ধকার তায় কালো আলখাল্লা, তার ওপর ঘাড়-মাথা ঢাকা, কেউ কারও মুখও আঁচ করতে পারে না।”

তারাপদ বলল, “আলখাল্লা সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়?”

না, না, ঘরে ঢোকার আগে এক জায়গায় বসিয়ে দেবে। দিয়ে বলবে, জামা-জুতো খুলে ওই আলখাল্লা পরে নিতে। ওরাই দেয় আলখাল্লা।”

কিকিরা বললেন, “যে ঘরে আপনারা ঢুকলেন, ঘরটা কেমন? সেখানে কী কী আছে?”

“আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। আমি বলতে পারব না। জীবন আমার বেরিয়ে যাচ্ছিল। ..আপনি নিজেই যান না, দেখুন গিয়ে।”

“যাবার খুব ইচ্ছে। যাব কেমন করে?”

জোয়ারদার যেন কিছু ভাবলেন। বললেন, “সত্যি সত্যি যাবার ইচ্ছে?”

“হ্যাঁ। একশো ভাগ ইচ্ছে।”

“বেশ, আমার সঙ্গে যাবেন।...তবে আপনি কার জন্যে যাবেন? আছে কেউ যাকে ডাকতে চান?”

কিকিরার, একবার তারাপদর দিকে তাকালেন তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, “আছে। ও আপনি ভাববেন না! আপনার সঙ্গে যেতে পারলেই হল।”

“আমি নিয়ে যাব। যারা ওখানে যায়, তারা আগে থেকে বলে রাখলে সঙ্গে অন্য একজনকে নিয়ে যেতে পারে।”

“মানে, নতুন খদ্দের।”

জোয়ারদার মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, “আমি আপনাকে নিয়ে যাব। কিন্তু আপনার টাকাটা আপনি দেবেন।”

কিকিরা হেসে বললেন, “ঠিক আছে।”

০৭.

দিন দুই-তিন তারাপদর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

রবিবার বিকেলে তারাপদ এল; সঙ্গে চন্দন।

কিকিরা বললেন, "ছিলে কোথায়? তোমাদের দিয়ে কুটোটিও নড়ানো যাবে না। এজেন্সি তুলে দাও।"

তারাপদ আর চন্দন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বুঝল না কিছু! তারাপদ বলল, "কিসের এজেন্সি কিকিরা?"

"কুটুস এজেন্সি।"

"সেটা কী?"

"কিকিরা-তারাপদ-চন্দন ডিটেকটিভ এজেন্সি। কে. টি. সি। মিষ্টি করে বলতে পারো 'কুটুস'।"

তারাপদরা হেসে উঠল।

চন্দন হাসতে হাসতে বলল, "এটা আপনি মন্দ বলেননি, কিকিরা। ভাল আইডিয়া। কলকাতায় আজকাল প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের অনেকগুলো কোম্পানি হয়েছে। আমরাও একটা লাগিয়ে দিতে রাজি। কুটুস এজেন্সি।"

তারাপদ হেসে বলল, "আপনি হবেন ব্যুরো চিফ। ম্যাজিশিয়ান ডিটেকটিভ। ভাবা যায় না, স্যার। জগতে এমন জিনিস দুটি নেই।"

কিকিরা রাগের ভান করে বললেন, "তোমরা তো আমাকে ওই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছ! ছিলাম ভাল; বাজাচ্ছিলাম বাঁশি, হয়ে গেল ফাঁসি।"

তিনজনেই হেসে উঠল।

শেষে তারাপদ বলল, "আমি স্যার, আপনার হুকুমের নফর। যেমন যেমন হুকুম করেছিলেন তেমনটি করছি। জগুদার পেছনে লেগে আছি। ওর বাড়িতে যাচ্ছি-আসছি। আমায় আপনি দোষ দিতে পারবেন না।"

চন্দন বলল, "আমাকে চাকরিতেই মেরে দিয়েছে, কিকিরা। তবু তারার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছি।"

কিকিরা তারাপদকে বললেন, "তোমার জগুদা অন্তর্ধান করে গেল গো!"

"আজ আসবে," তারাপদ বলল, "সন্ধের আগেই। বলে দিয়েছে "

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকিয়ে বললেন, "খবরটবর জোগাড় করতে পারলে?"

“অল্পস্বল্প।“

“বলো, শুনি।”

কিকিরার এই জাদুঘরে তারাপদ নিজের একটি বসার জায়গা করে নিয়েছে, সেখানেই সে বসে। চন্দনও বরাবর জানলার দিকে এক ছোট সোফাতেই বসে সাধারণত। ঘরে জায়গা কম। ওরই মধ্যে বসার ব্যবস্থা করে রেখেছেন কিকিরা।

ঘরে দু-চারটে মশা উড়ছিল। এবার যেন শীতের আগেই মশার উৎপাত শুরু হয়েছে। এক মশা-মারা ধূপ জ্বলছিল। খুব হালকা একটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

তারাপদ বলল, “জগুদাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে যা জানতে পারলাম, তাতে মনে হল, ওর বাবা যে কিছু রেখে গেছেন সেটা ও বিশ্বাস করে। কেননা, মায়ের কথা থেকে মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, বোনের জন্যে অত ভেবে মরার কারণ। নেই। মা এর বেশি কিছু বলতেন না। আর-একটা কথা মা বলতেন, বাবার কোনো পুরনো বন্ধুবান্ধব যদি গায়ে পড়ে মেলামেশা করতে চায় বা সাহায্য করতে চায়, জগুদা যেন কখনোই তা না নেয়। বাবার পুরনো বন্ধুরা বাড়িতে কোনো কাজেকর্মে নেমন্তন্ন করলেও জগুদার মা ছেলেকে বলে দিতেন–কোন বাড়িতে সে যাবে, কোন বাড়িতে যাবে না।”

কিকিরা শুনতে শুনতে মাথা নাড়লেন। “আচ্ছা! মায়ের কথামতনই চলতে হত জগন্নাথকে।”

“হ্যাঁ।”

“ওর বাবা কোন-কোন বড় দোকানে আসা-যাওয়া করতেন, খোঁজ নিয়েছ?”

“নিয়েছি।” বলে তারাপদ পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে কিকিরাকে দিল। বলল, “প্রথম দু-তিনটে নাম নজর করবেন। বাকি দু-তিনটে তেমন নয়। তবে ছোটখাটো দু-চারজন জুয়েলারও ছিল যারা জগুদার বাবার কাছে। আসত। তাদের কথা জগুদার মনে নেই বড়।”

কিকিরা কাগজটা নিয়ে দেখলেন। চন্দন বলল, “কিকিরা, তারাপদ ওর জগুদার বাড়ির এক বুড়োকে ক্যাচ করেছে। তার কথা শুনুন।”

কিকিরা তারাপদকে বললেন, “কী কথা?”

তারাপদ বলল, “জগুদার এক জেঠা আছে। বছর-পঁচাত্তর বয়েস। সম্পর্কে জেঠা। ওই বাড়ির নিচের তলায় একটা ঘরে থাকেন। ঘরটা বোধ হয় কোনো সময়ে আস্তাবল ছিল। কী বিশ্রী দেখতে। ঘরের সামনে চৌবাচ্চা, শ্যাওলা-পড়া উঠোন, গোটা-দুই ডালিম গাছের ঝোঁপ, গোবর, খুঁটে–সে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। জেঠা ভদ্রলোক, একাই থাকেন; নিজের ঘরেই তাঁর কেরোসিন স্টোভে রান্না হয়। কতকগুলো ছোট-ছোট হাঁড়ি, কড়াই, মালা। পাশে একটা সরু তাপোশে চিট-বিছানা। জেঠামশাই করেন না কিছুই। সকাল-বিকেল তাঁকে বাড়ির সামনে দেখা যায়। সকালে পাড়ার চায়ের দোকান থেকে চা আনিয়ে টিনের চেয়ার টেনে বসে থাকেন আর বিড়ি ফোঁকেন। সন্ধেবেলায় খান আফিং।”

“বা-বা, বেশ মানুষটি তো। ওঁর চলে কেমন করে?”

“চলে আর কই? কোনোরকমে দুটো জুটে যায়। উনি কয়েকটা দৈব ওষুধ জানেন। পোড়া,

অম্লশূল, একজিমা, হাঁপানি–এই সব। এগুলো তৈরি করে দেন। তাতেই যা পান। তা ছাড়া দু'-দশ টাকা পাড়ার লোকও দেয়।"

"কী নাম?"

"মণিবাবু।"

"ওঁর সঙ্গে তুমি আলাপ করেছ?"

"উনি নিজেই একদিন ডেকে আলাপ করলেন। জগুদার কাছে। যাচ্ছি-আসছি দেখে।"

"কী বললেন?"

"বুড়ো মানুষ–সাত কাসুন্দি শোনালেন দত্তবাড়ির।"

"জগন্নাথের বাবা-মা সম্পর্কে কী বললেন?"

"বললেন, আজকাল সংসারে ধর্মও নেই, ধর্মের কলও নেই, বাতাসে আর কিছুই নড়ে না। তবে হ্যাঁ, ওই ওপরে একজন আছেন, তাঁর চোখে সবই পড়ে।

"তুমি জগন্নাথের বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে না?"

"করেছি।"

"কী বললেন?"

"বললেন, কুকুরের পেটে কি ঘি সয় গো? যেমন ছিলি, তেমন থাকলে তো খেয়ে-পরে থাকতে পারতিস। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। সংসারটাকে ভাসিয়ে গেল।"

কিকিরার কান ছিল কথায়, বললেন, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!"

"তাই তো বললেন।"

"তুমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না?"

"অ্যাকসিডেন্টের কথা জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, ওপর থেকে প্রথমে অতটা বোঝা যায়নি, পরে দেখা গেল কোমরের কাছে জোর জখম হয়েছিল জগুদার বাবা। ভেতরে ভীষণ লেগেছিল। দু-চার ঘণ্টার পর আর হুঁশও ছিল না।"

কিকিরা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় জগন্নাথ এসেছে বোঝা গেল। ফ্ল্যাটের সদরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল বগলার সঙ্গে।

জগন্নাথ ঘরে এল একটু পরেই।

কিকিরা বললেন, "এসো হে জগন্নাথ! আছ কেমন?"

জগন্নাথ বলল, "ভাল নয়।"

"তোমায় বেশ শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে। বসো!"

বসল জগন্নাথ।

বগলার চা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। চা আর কচুরি এনে দিয়ে গেল।

চা খেতে-খেতে কিকিরা জগন্নাথকে বললেন, "নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?"

"আজ্ঞে, নতুন বলতে কাল বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার একটা চিঠি পেলাম।"

"প্রেতসিদ্ধর?"

"হ্যাঁ। কাল শনিবার ছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে একবার আমার এক মামার কাছে গিয়েছিলাম। জেলেপাড়ায়। নিজের মামা নয়। মায়ের মাসতুতো দাদা। হাত ভেঙে পড়ে আছেন বুড়ো বয়েসে। মামাকে দেখে বাড়ি ফিরে চিঠিটা পেলাম।"

"বয়ান কী? সেই আগের মতন? এনেছ চিঠিটা?"

জগন্নাথ পকেট থেকে চিঠি বার করে কিকিরাকে দিল।

তারাপদ ইশারায় কচুরি তুলে চা নিতে বলল জগন্নাথকে। এই চিঠির কথা সে জানে না। জগুদা সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে গিয়ে চিঠিটা পেয়েছে, কাল ছিল শনিবার, আজ রবি, জগুদার সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

কিকিরা চিঠি পড়া শেষ করে বললেন, "চিঠি তো একই। এবার তাড়া বেশি। তোমার মায়ের আত্মার সঙ্গে শুদ্ধানন্দর বড় ঘন ঘন দেখা হয়ে যাচ্ছে। তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা তুমি চুপ করে বসে আছ কেন? জানিয়ে দাও, তুমি শুদ্ধানন্দর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।"

"যাব?"

"অবশ্যই যাবে।"

জগন্নাথ ভয়ে-ভয়ে বলল, "যদি কিছু হয়?"

"কী আর হবে। হবে না কিছু।"

"আমার কিন্তু ভয় করছে।"

"ভয় পাবার ব্যাপার নেই জগন্নাথ! তুমি জানিয়ে দাও, তুমি যাবে। কবে যাবে তাও আমি বলে দিচ্ছি।" বলে কিকিরা কিসের হিসেব করলেন মনে-মনে। শেষে বললেন, "আগামী শনিবার। ...না, শনিবার থাক, রবিবার। আগামী রবিবার।"

জগন্নাথ তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা হেসে বললেন, "ভয় করার কারণ নেই। আমি থাকব। কিন্তু একথা যেন কেউ না জানতে পারে। তোমার সঙ্গে থাকব আমি। প্রেতসিদ্ধর খাস ঘরে। যেখানে তিনি আত্মাদের আনেন-টানেন। আর বাইরে থাকবে এরা, তারাপদ আর চন্দন। দু-চারজন বাইরের লোক আরও থাকতে পারে। সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

জগন্নাথ ঘাড় নাড়ল।

কিকিরা বললেন, "তুমি শুধু চিঠিতে লিখে দিও প্রণামী' সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করিবেন না। আমি যথাযোগ্য পুস্পাঞ্জলি দিব। তবে সামান্য নিরিবিলিতে কথাবার্তা বলিতে চাহি।"

.

০৮.

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় কিকিরা বললেন, “স্যান্ডেল উড, পাঁজিতে আজ কী লিখেছে জানো? মঙ্গলবার কালরাত্রি–ঘ ৬/২৭ গতে ৮/৫ মধ্যে। যোগিনী-পূর্বে। মাসদগ্ধা। ক্লীং রিং হিং…।”

চন্দন আর তারাপদ হেসে উঠল। কিকিরাও হাসছিলেন। চন্দন বলল, “আপনি কি পঞ্জিকা-পণ্ডিত?”

“কে বলেছে হে! সংসারে সব জিনিস একটু-একটু চেখে রাখতে হয়। চিংড়ি মাছের পায়েস থেকে পঞ্জিকার কালরাত্রি পর্যন্ত। আজ মঙ্গলবার। যাচ্ছি তন্ত্রাচার্য শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ কল্পবৃক্ষর কাছে। এমন শুভ বা অশুভ দিন-যাই বলো একবার দেখে নিতে হয় বইকি! জয় মা তারা।”

তারাপদ হাসতে-হাসতে বলল, “আপনাকে কিন্তু সুপার্ব দেখাচ্ছে। মেটে ফিরিঙ্গি।”

কিকিরা হেসে ফেললেন। চন্দন বলল, “মেটে ফিরিঙ্গি কাকে বলে, জানেন?”

“না।”

“মেটেবুরুজের ফিরিঙ্গি।”

তিনজনে হাসতে হাসতে নিচে রাস্তায় নেমে এল। সন্ধে হয়নি তখনও তবু এই হেমন্তের মরা বিকেলে অন্ধকার নেমে গিয়েছিল।

কিকিরাকে সত্যিই অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। লম্বা লম্বা ডোরাকাটা এক প্যান্ট পরেছেন। ডোরাগুলো কালো। প্যান্টের জমিটা খয়েরি রঙের। এ-প্যান্টের কাটছাঁট কোন দরজির কে জানে! পাগুলো সরু-সরু, কোমরের কাছে ঢোললা। গায়ে চেক শার্ট, শার্টের ওপর এক হাফ হাতা সোয়েটার। গায়ের কোটটা কুচকুচে কালো, তার ঝুল নেমেছে হাঁটু পর্যন্ত। গলায় এক সিল্কের মাফলার। মাথায় ফেলট হ্যাট। চোখে গোল কাঁচের চশমা। ফ্রেমটিও সেই রকম, তারের ফ্রেম কানে জড়ানো সেকেলে ছিরি, চশমার।

রাস্তায় এসে কিকিরা বললেন, “আমার নাম কী জানো?”

“কী?”

“বিভুপদ হংস।”

“হংস?”

“আজ্ঞে, হংস। হাঁস। ডাক্।” কিকিরা হাতের ছড়িটা দোলাতে দোলাতে গম্ভীরভাবে বললেন, “বিপদ হাঁস হল আদ্রা পুরুলিয়ার লোক। বাবা ষষ্ঠীপদ। হাঁস। বিভুপদ কাঠ, সিমেন্ট, মাটি, মশলা, গুড়-এর কারবারি। তার গাঁটে-গাঁটে দশ-পঞ্চাশ-একশোর বাজারি নোট গোঁজা থাকে। ভেরি রিচ, বাট ড্যাম্প ফুল। বিভুপদ তার বাবার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চায়। বাবা পাঁচ বছর আগে হেভেনে চলে গেছেন। তাঁর একটা উইল ছিল। সেই উইল যে কেমন করে

আগাগোড়া পালটে গেল কে জানে। বিভুপদ তার বাবার কাছে দুটো কথা জানতে চায়। ব্যস। ...”

চন্দন একটা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে হাত তুলে চেঁচাল, “ট্যাক্সি।”

ট্যাক্সি দাঁড়াল।

কিকিরারা উঠে পড়লেন। ট্যাক্সিঅলা যেন মজার চোখে দেখলেন কিকিরাকে।

“যাবেন কোথায়?”

কিকিরা বললেন, “নিমতলার দিকে।”

ট্যাক্সিঅলা অদ্ভুতভাবে “ও,” বলল।

ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে তারাপদ বলল, “আচ্ছা স্যার, জোয়ারদারকে তো আপনি বিশ্বাস করলেন। ওই সাহেব যদি ফাঁসিয়ে দিয়ে থাকে।”

“দেবে না। ও নিজে বেশ চটে আছে।”

“তবু...”

“কোনো চিন্তা নেই। আমি কিকিরা দি ওয়ান্ডার। আমার এই মেটে ফিরিঙ্গি ড্রেসের তলায় ম্যাজিশিয়ান কিকিরা বিরাজ করছে হে! কল্পতরু আমার কিছু করতে পারবেন না। তবে ষণ্ডাদের দিয়ে মারধোর করলে মরে যেতে পারি। দেহ অতটা সইতে পারবে না।”

চন্দন বলল, “আমরা থাকব কিকিরা, ওয়াচ রাখব। আপনি শুধু একবার ত্রাহি-ত্রাহি চেঁচাবেন।”

তারাপদ হেসে বলল, “আগে বললে ক’টা পটকা কিনে আনতাম কিকিরা। কালীপুজোর রেশ চলছে।”

কিকিরা বললেন, “তারাপদ, ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ার ক্লাবে যাত্রা হত। তাতে একবার আমি এক সেনাপতির পার্ট করেছিলাম। কথা কম কাজ বেশি মাকা পার্ট। মানে যখন-তখন আমাকে তরোয়াল বার করতে হত খাপ থেকে আর ঢোকাতে হত। আর বলতে হত, যথা আজ্ঞা মহারাজ।’ তা অন্য সময় তরোয়াল কোনো গণ্ডগোল বল না, খুললাম বন্ধ করলাম। কিন্তু মহারাজের যখন বিপদ, গুপ্তশত্রু এসে লাফিয়ে পড়েছে মহারাজের ঘাড়ে তখন আমার তরোয়াল খাপে আটকে গেল। কিছুতেই খুলল না। ওদিকে মহারাজেরও যাই-যাই অবস্থা। তখন কী করলাম বলো তো?”

“কী?”

“কোমর থেকে খাপসুষ্ঠু তরোয়াল খুলেই লড়তে লাগলাম। সে কী হাসির ধুম। লোকে চেঁচাতে লাগল–ওরে বেটা, খাপ থেকে তরোয়াল বার কর, খাপ নিয়ে কি লড়া যায়?”

তারাপদ আর চন্দন হো-হো করে হাসতে লাগল।

কিকিরাও হাসতে-হাসতে বললেন, “ম্যানেজ আমি করে ফেলব। তোমরা ভেব না।”

.

যথাস্থানে জোয়ারদার অপেক্ষা করছিলেন। কিকিরাকে দেখে চমকে গেলেন। বললেন, “ব্যাপার কী মশাই?”

“কিছু নয়। বিভুপদ হাঁস, আদ্রা-পুরুলিয়ার লোক, নানা ধরনের ব্যবসা। টাকার গাছ। ব্য–এই পর্যন্ত আপনি। বাকিটা আমি। আমার ওপর ছেড়ে দেবেন।”

“তা না হয় দেব। পারবেন?”

“দেখবেন তখন।”

“ওর কতকগুলো ষণ্ডামার্কা চেলা আছে..”

“আমার কাছে পিস্তল আছে।”

“পিস্তল?” জোয়ারদার আঁতকে উঠলেন।

“আসল নয়। নকল। ম্যাজিশিয়ানের পিস্তল। ফায়ার হবে, গুলি বেরোবে না। ... চলুন।”

দু’জনে পা বাড়ালেন গলির দিকে। চন্দন আর তারাপদ তফাতে থেকে গেল। তারা সামান্য পরে যাবে।

ব্যবস্থায় কোনো ফাঁক নেই। কিকিরার মনে হল, এ যেন কোনো নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকার মতন।

শুদ্ধানন্দর বাড়ির বাইরে থেকে ভেতর বোঝার উপায় নেই। বাইরেটার যতই ভাঙাচোরা, ঝোঁপঝাড়ভরা চেহারা হোক না কেন, ভেতরটা তেমন নয়। বাড়ি যে বেশ পুরনো, আদ্যিকালের, সেটা বোঝা যায়; বোঝা যায় এককালে সাহেব-সুবোই থাকত, কুঠিবাড়ির ছাদ আর বাংলোবাড়ির খোলামেলা বারান্দা। বারান্দাগুলো বড়, চওড়া। দেওয়ালের থাম মোটা-মোটা। আর্চগুলোও বেশ বড়। তবে সবই ভাঙাচোরা, ফাটাফুটো। ইলেকট্রিকও আছে। মিটমিটে আলো এদিকে-ওদিকে জ্বলছে। গুটি দুয়েক। তাতে আলো তেমন হয় না।

শুদ্ধানন্দর এক চেলা জোয়ারদারকে ডেকে নিয়ে গেল। এই লোকটা সেদিনের সেই ষণ্ডা কি না বোঝা গেল না। হতে পারে, নাও পারে। লোকটাকে দেখলে মনে হয়, গঙ্গার ঘাটে দলাইমলাই করে বেড়ায় পালোয়ান ধরনের চেহারা।

কিকিরার কোনো অসুবিধে হল না। জোয়ারদার যে শুদ্ধানন্দর স্থায়ী মক্কেল একথা জানার পর তার খাতির বোধ হয় বেড়ে গিয়েছে। তা ছাড়া জোয়ারদার আগে থেকেই বলে কয়ে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন বলে কিকিরাকে ষণ্ডা-লোকটা কিছু বলল না। শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখল বিচিত্র পোশাকের কিকিরাকে।

ঘরের গালাগানো প্যাসেজ দিয়ে দু-তিনটে ঘর পেরিয়ে একটা মাঝারি ঘরে নিয়ে গিয়ে জোয়ারদারদের বসাল লোটা। তারপর বলল, “মহারাজকে খবর দিচ্ছি।”

এই ঘরটায় দেখার মতন কিছুই নেই। ন্যাড়া দেওয়াল। একপাশে এক টিমটিমে বাতি। বসার জন্য কাঠের বেঞ্চি। একটিমাত্র চেয়ার। দেওয়ালের রং বোঝা যায় না, এমন ময়লা। ফাটা দাগ। সিমেন্টের মেঝেও ফেটে গিয়েছে। দেওয়ালে অবশ্য টিকটিকি-গিরগিটির অভাব নেই।

জোয়ারদার কী বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন, তারপর ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারায় বোঝালেন, এখানে কথাবার্তা না বলাই ভাল।

খানিকটা পরে অন্য একজন এল। এর চেহারা ঠিক ষণ্ডামার্কা নয়। ছিপছিপে। বড় বড় বাবরি চুল। পরনে গেরুয়া লুঙ্গি, গায়ে আলখাল্লা, একটা সুতির মোটা চাদর রয়েছে গায়ে।

ইশারায় ডাকল জোয়ারদারদের।

পাশের ঘরে এনে লোকটি বলল, "জুতো খুলুন। টুপি পরা চলবে না। পকেটে চামড়ার জিনিস থাকলে রেখে দিন। টর্চ রাখবেন না। এখানে রেখে যান। "

জোয়ারদার জানেন সব। ক' দফা এলেন। জুতোটুতো খুলতে লাগলেন।

লোকটা চলে গেল।

জোয়ারদার নিচু গলায় বললেন, "এরপর সার্চ হবে।"

কিকিরা বললেন, "আন্দাজ করেই এসেছি।" বলে বেশ জোরে হেঁচে ফেললেন।

"হাত দিয়ে ঘেঁটেঘুঁটে দেখবে।"

"বুঝতে পারছি।" বলতে না বলতে আবার হাঁচি।

"হল কী আপনার?"

"সিজন চেঞ্জ, ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে।"

সামান্য পরে আবার সেই লোকটি ফিরে এল। এসে বলল, "রেখেছেন সব?"

"আজ্ঞে?"

"আপনি আসুন.." জোয়ারদারকে ডাকল।

এগিয়ে গেলেন জোয়ারদার। তাঁকে সার্চ করা হল।

কিকিরা আবার হাঁচলেন।

এবার কিকিরার পালা।

"নাম?"

"বিভুপদ হাঁস।"

"পাতি না রাজহাঁস?"

"রাজহাঁস। আমার বাবা ষষ্ঠীপদ হাঁসকে লোকে রাজাবাবু বলত আদ্রা-পুরুলিয়া বাউলডিঙ্গিতে আমাদের ঘরবাড়ি জমিজায়গা। চার-পাঁচ রকম কারবার, "বলতে বলতে কিকিরা আবার হাঁচলেন, বিরাট হাঁচি।

লোকটা দু পা পিছিয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হয়েছে আপনার?"

"ঋতু পরিবর্তন। নতুন শীত আসছে। সর্দি.."

"সর্দি নিয়ে এসেছেন কেন?"

"রাস্তায় হল।"

জোয়ারদার বললেন, "আমার বন্ধু। আসার কথা ছিল।"

"নাকে রুমাল চাপা দিন।"

"আজ্ঞে দিয়েছি।"

লোকটা আবার এগিয়ে এসে কিকিরার গা হাতড়াতে না হাতড়াতেই উনি হেঁচে ফেললেন।

"হল কী মশাই আপনার?"

"হাঁচি।"

"হাঁসদের হাঁচি হয় শুনিনি। ...যাকগে ওখানে গঙ্গাজল আছে, হাতটাত ধুয়ে নিন আপনারা। শুদ্ধ হয়ে নিন।"

কিকিরা শুদ্ধ হতে-হতে শুনলেন—প্রথম ঘণ্টা বাজছে।

ঘরের একদিকে একটা কাঠের বাক্স মতন ছিল। তালা খুলে তার ভেতর থেকে দুটো কালো জোব্বা বার করল লোকটি। বলল, "নিন পরে নিন। মাথা কান কপালও ঢেকে রাখবেন। খুলবেন না।"

জোয়ারদার কালো জোব্বা গায়ে চাপালেন।

কিকিরা একবার করে হাঁচছেন, আর কালো আলখাল্লা পরছেন। বুদ্ধি করে রুমালটা তিনি রঙিন এনেছিলেন, মেরুন রঙের। নয়ত ওই চেলা হয়ত রুমালটাও ফেলে দিতে বলত।

কিকিরাকে ভাল করে দেখে নিয়ে গেরুয়াধারী চলে গেল। বলে গেল, "আসছি।"

ও চলে যেতেই জোয়ারদার ফিসফিস করে বলল, "এবার ওই ঘরে যেতে হবে।"

কিকিরা মাথা হেলালেন।

"একটু হুঁশিয়ার থাকবেন। টাকা এনেছেন?"

“দুশো দুই।”

“দুশো দুই?”

“এখন দুশো; পরের দিন তিনশো। প্লাস একটা মোহর।”

“মোহর!”

“বাবার আমলের। কাজ হলে তবে...”

“মশাই, সাবধান।”

চেলাটি এসে পড়ল। “আসুন। প্রণামী হাতে রাখুন।”

সরু এক গলিপথের মতন প্যাসেজ দিয়ে কিকিরারা একটা ঘরের সামনে এলেন। দরজা বন্ধ।

শুদ্ধানন্দর চেলাটি দরজা খুলল ধীরে-ধীরে। কিকিরা আবার হাঁচলেন। লোকটা বিরক্ত হল। বলল, “যান, ভেতরে গিয়ে বসুন। মাটিতে। ...প্রণামীটা?”

দুজনেই টাকা দিলেন।

কিকিরার হাত থেকে দু’শো টাকা পেয়ে লোটা বোধ হয় খুশি হল না। বলল, “আজ স্পেশ্যাল ছিল। মাত্র দুশো টাকা?”

কিকিরা বললেন, “আবার আসব। তিনশো দেব। সঙ্গে একটা মোহর। পুরনো আমলের।”

“যান।”

ঘরে ঢুকে কিছু আর দেখা যায় না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ধুনোর ধোঁয়া। তার সঙ্গে ধূপের গন্ধ। গন্ধটা এতই উগ্র যে, ধুনোর গন্ধকেও ছাড়িয়ে যায়।

চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগল। ততক্ষণে ঘরের এক কোণে একটা লাল আলো, টুনি বাবের আলো যেমন হয়, এক ফোঁটা জ্বলে উঠেছে।

.

জোয়ারদার গায়ে ঠেলা মারলেন।

কাছেই একটা তক্তাপোশ। তার ওপর ফরাস পাতা। দেখা না গেলেও অনুমান করে নিতে হয়।

জোয়ারদারের দেখাদেখি কিকিরা ফরাসের ওপর বসলেন। হাঁটু ভেঙে আসন করে। পায়ে লাগে। কিন্তু উপায় কী?

কিকিরার চোখ খানিকটা সয়ে গিয়েছে। অনুমানে মনে হল, এই ঘরটা হলঘরের মতন। বড়ই বলা যায়। কিকিরা যে-জায়গায় বসে আছেন, সেই জায়গাটা কি সামান্য ঢালু? হতে পারে।

বেশ খানিকটা তফাতে, অন্তত গজ-তিরিশ দূরে একটা কী যেন রয়েছে। উঁচু মতন। ওখানেও কি কোনো তক্তাপোশ বা মঞ্চ পাতা আছে। হলঘরে কি কোনো স্টেজ বাঁধা আছে?

এমন সময় লাল মিটমিটে বাতিটা নিভে গেল। জ্বলল পর মুহূর্তে। আবার নিভল।

“উনি আসছেন?” জোয়ারদার বলল।

কিকিরা আবার হাঁচলেন, নাক পরিষ্কার করলেন।

এবার এক হালকা বেগুনি বাতি জ্বলে উঠল। বাতিটা এমন জায়গায় জ্বলল যাতে দূরের উঁচু জায়গাটা আবছাভাবে চোখে পড়ে।

কিকিরা ঠিকই অনুমান করেছিলেন। দূরে একটা মঞ্চ পাতা রয়েছে। ছোট। তক্তাপোশের ওপর মোটা কোনো জিনিস, তার ওপর কালো চাদর। দু পাশে দুই ধুনোর পাত্র, একটা থালায় গাঁদা ফুলের মালা। মঞ্চের দুধারে পেছনে দুই ত্রিশূল। একটা ত্রিশূলের ডগায় মরা কাক, অন্যটার মাথায় খুলি।

এমন সময় শব্দ হল ঘণ্টার। কে যেন পুজোর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, খুবই ধীরে খড়মের শব্দ করতে করতে পেছন থেকে এগিয়ে এল। মুখে অত সব শব্দ “ক্লীং রিং হিং। ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতা। যে ভূতাঃ বিকতারম্ভে পশ্য..চ হুং ফট। আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং হৌং হঃ...ফট...।”

ইনিই তবে শুদ্ধানন্দ? একাদশ তন্ত্রমন্ত্র-সিদ্ধ শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ কল্পং বৃক্ষঃ! ফট বাবাজি!

কিকিরা ভাল করে লক্ষ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বড়ই অস্পষ্ট। তবু শুদ্ধানন্দর চেহারা এবং পোশাকটি আন্দাজ করা যায়। পোশাক একেবারে ঘন রক্তবর্ণ। গায়ের চাদরটিও লাল। গলায় মোটা-মোটা রুদ্রাক্ষ-মালা। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত, বাবরি ছাঁট। রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। কপালে রক্তচন্দন। দুটি চোখ লাল। তবে চোখের তলা কালো। ভুরু মোটা। টানা টানা। কিকিরার সন্দেহ হল, শুদ্ধানন্দ চোখের ভুরু আর চোখের তলায় কাজল লেপেছেন।

শুদ্ধানন্দ বসলেন। আসনে বসার মতন করে। চোখ বন্ধ। নিজের মনে বিদঘুঁটে মন্ত্র আওড়াচ্ছেন–তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ...চ হুং ফট...ক্রোং যং বং লং হে হঃ...ফট।’

কিছুক্ষণ মন্ত্র আওড়ানোর পর শুদ্ধানন্দ হাত উঠিয়ে কী যেন ছুঁড়ে দিলেন। একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। ধুনোর পাত্র থেকে ধক করে আগুন জ্বলে উঠল। নিভেও গেল।

সেই আগুনের আলোয় কিকিরা শুদ্ধানন্দকে দেখে নিতে পারলেন অল্পের জন্য। চেহারায় না থোক সাজে-পোশাকে চারপাশের সাজেসজ্জায় একটা গা-ছমছমে ভাব হয়।

আগুন নিভে যাবার পর শুদ্ধানন্দ আরও একবার মন্ত্র আওড়ালেন। তারপর কথা শুরু করলেন।

“জোয়ারদারবাবু, তুমি এসেছ?”

“আজ্ঞে!”

"পরশু তিন যামে ভন্তরালিকা স্তরে তোমার আত্মীয় বাসুদেবের সঙ্গে দেখা হল। আহা, বেচারি ব্রীহিবৃক্ষের তলায় অবস্থান করছিল। বলল, কোন্ অপরাধে কে জানে সে নিম্নগামী হতে পারছে না। বাধা পাচ্ছে। আগামী অমাবস্যার পর সে আসতে পারবে।"

"আর কিছু জানাল মহারাজ?"

"বলল, ও যখন আসবে মুখোমুখি তোমায় শুনিয়ে যাবে।"

"বড় বিপদে পড়েছি মহারাজ! ব্যবসার ব্যাপার। বাড়িতেও খানিকটা অসুবিধে হচ্ছে। ভাগনেটা..."

"ধৈর্য ধরো জোয়ারদার। আত্মা দেহধারী জীব নয়। তার আসতে কষ্ট, যেতেও কষ্ট। সে কষ্ট তুমি বুঝবে না।"

"আগামী অমাবস্যা?"

"হ্যাঁ।"

"সে কবে?"

"দেরি নেই।"

জোয়ারদার চুপ করে গেলেন।

সামান্য পরে শুদ্ধানন্দ বললেন, "তোমার সঙ্গীটি এসেছে দেখছি।"

কিকিরা হাতজোড় করে বিনীতস্বরে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কী নাম?"

"বিভুপদ হাঁস। পিতার নাম ষষ্ঠীপদ হাঁস। তিনি পাঁচ বছর আগে স্বর্গে গিয়েছেন। নিবাস বাউলডিঙি, আদ্রা-পুরুলিয়া।"

"পেশা?"

"মহারাজজি, পেশা আর কী বলব! ব্যবসা! কাঠগোলা, সিমেন্ট, মশলাপাতি, গুড়, এই সব। একটা ছোট কলকারখানা...ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি।"

"কী বিপদ?"

"কী বলব মহারাজ! আমার শিবতুল্য বাবা একটা উইল করে গিয়েছিলেন। আমরা তিন ভাই। উইলে আমার ছিল অনেক কিছু। এখন এক অন্য উইল বার করে ভাইরা...কী বলব, মহারাজ!"

"বুঝেছি।...উইল জাল হয়েছে।"

"কেমন করে হল! জগতে কাউকে বিশ্বাস নেই।" বলতে বলতে আবার হাঁচলেন কিকিরা।

নাকে-মুখে রুমাল চাপা দিলেন।

"পিতা গিয়েছেন কবে?"

"তা পাঁচ বছর। "

"পাঁচ বছর!...পঞ্চম হল ভৌরিক স্তর, পঞ্চদশ গৌরিব। পাঁচ হলে সেই আত্মা অর্ধ-নিদ্রিত। ...তা এই সব আত্মাকে আনানো কঠিন। ওঁদের নিদ্রাকাল তো মানুষের মতন নয়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ...কিন্তু কী করব! আপনি আমায় সাহায্য করুন।"

শুদ্ধানন্দ চুপ করে থাকলেন। তারপর আবার কী যেন ছুঁড়লেন ধুনোর পাত্রে। এবারে আর আগুন জ্বলল না, ধোঁয়া হল সামান্য।

নিজের মনে কয়েকটা অদ্ভুত মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে শুদ্ধানন্দ বললেন, "দেখি...। খোঁজ করতে হবে। সময়সাপেক্ষ।"

কিকিরা বললেন, "আমি আপনার কাছে এসে পড়েছি। আপনি না পারলে কে পারবে মহারাজজি। খরচের জন্যে আপনি ভাববেন না। আমি ব্যবসাদার মানুষ...বিপদ উদ্ধারের জন্যে দু-চার হাজার টাকা খরচ করায় আমার আটকাবে না।"

"বুঝলাম, কিন্তু তুমি বড় অধৈর্য হচ্ছ! এ-সব কাজ.."

"জানি। আপনি ইচ্ছে করলে পারেন মহারাজ।"

"পারি?" শুদ্ধানন্দ একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ তালি দিলেন হাতে। ঘন্টি নাড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে সব অন্ধকার। ঘুটঘুটে হয়ে গেল ঘর।

একেবারে স্তব্ধ ভাব। নিঃসাড়।

কিছুক্ষণ পরে শুদ্ধানন্দের গম্ভীর গলা শোনা গেল, "হে ধেনুক, আপনি কি এসেছেন?"

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

অপেক্ষা করে শুদ্ধানন্দ বললেন, "হে সর্বগামী ধেনুক, আমি আপনাকে আহ্বান করছি। যদি এসে থাকেন–দেখা দিন।"

কেউ দেখা দিল না।

শুদ্ধানন্দ আবার ডাকলেন, "ধেনুক! আপনি কি আসবেন না?"

হঠাৎ যেন একটি জোনাকি জ্বলে উঠল শুদ্ধানন্দের পিছনে, ত্রিশূলের দিকে। জোনাকির আলো বারকয়েক নাচল। মনে হল, মরা কাকের মাথার দিকেই জোনাকি নাচল।

"আপনি এসেছেন?"

একটা শব্দ হল। খট খট।

“হে ধেনুক। আমার এখানে একজন হতভাগ্য অতিথি এসেছেন। তিনি “তাঁর পিতার কাছে একটি কথা জানতে চান। পিতা ভৌরিক স্তরে আছেন। পুত্রের নাম বিভুপদ। ...আপনি কি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন?”

জোনাকির মতন আলোর কণাটি স্থির হয়ে থাকল।

শুদ্ধানন্দ বললেন, “ঠিক আছে।”

আলোর কণাটি নিভে গেল।

শুদ্ধানন্দ বললেন, “বিভুপদ?”

“মহারাজ?”

“আপনি আসুন অন্য একদিন।”

“রবিবার আসব মহারাজ। সোমবার আমাকে একবার আদ্রা যেতে হবে।”

“রবিবার?”

“আমাকে কৃপা করুন মহারাজ।”

“আসুন।..অর্থাৎ অর্থাদি বিষয়ে...”

“আপনি ভাববেন না।”

০৯.

ঘোলাটে মেঘলা-মেঘলা আকাশ দেখে বোঝা যায়নি ঝপ করে অমন বৃষ্টি নামতে পারে। একটা দিন সন্ধে থেকে ঘণ্টা-দুই মোটামুটি বৃষ্টি হয়ে গেল। কলকাতার রাস্তাঘাটে কোথাও-কোথাও যদিবা জল দাঁড়িয়ে থাকে, পরের দিন আবার সব শুকনো।

বিকেলবেলা তারাপদ এল অফিস ফেরত। কিকিরা বাড়ি নেই।

সামান্য পরে এল জগন্নাথ। কথা ছিল আমার। তারাপদর সঙ্গেই আসতে পারত সে, পারেনি অন্য একটা কাজে আটকে গিয়ে।

তারাপদ আর জগন্নাথ বসেবসে গল্পগুজব করছে, চা খাচ্ছে, এমন সময় কিকিরা এলেন। হাতে একটা মোটা প্যাকেট।

"গিয়েছিলেন কোথায়?" তারাপদ বলল।

"আজ একটু শীত শীত লাগছে! ম্যালারু হবে নাকি হে?" প্যাকেটটা রাখতে রাখতে কিকিরা বললেন, "ছেলেবেলায় যদি মাকে বলতাম, মা আমার শীতশীত করছে, সঙ্গে-সঙ্গে মা বলতেন, তোর কম্পজ্বর হবে। আমাদের ওদিকে কম্পজ্বরটা ভালই হত। কত যে কুইনিন মিকশচার খেয়েছি তারাপদ, খেয়ে-খেয়ে লিভারটাই নষ্ট হয়ে গেছে।"

তারাপদ ঠাট্টার গলায় বলল, "আপনাকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়। যা বলছিলুম, গিয়েছিলেন কোথায়?"

নিজের জায়গায় বসতে বসতে কিকিরা বললেন, "দরজির কাছে।"

"দরজি?"

"আফজল খলিফা। আমার পেয়ারের দরজি।...তা জগন্নাথবাবু, তুমি কেমন আছ?"

"একরকম।"

"যা যা বলেছিলাম করেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার কথা মতন পরের দিনই চিঠি লিখে দিয়েছি।"

"জবাব পাওনি?"

"না।"

"পেয়ে যাবে। আজ মাত্র বৃহস্পতিবার। এখনও দু'দিন আছে। শনিবারের মধ্যে জবাব পেয়ে যাবে। রবিবার আমাদের যাত্রা।"

"যদি না পাই?"

"পাবে। আমি আন্দাজ করছি পাবে। তোমার কাছে তো আগের চিঠিও রয়েছে।"

কিকিরার জন্যে চা এল। বোধ হয় তৈরি করাই ছিল আগে থেকে।

চা খেতে-খেতে কিকিরা তারাপদকে বললেন, "এই প্যাকেটটা খোলো হে। তারাপদ।"

তারাপদ উঠে গিয়ে প্যাকেটটা নিল। খুলল। ভেতরের জিনিসগুলো বার করতে করতে বলল, "এ-সব কী?"।

"কালো আলখাল্লা। তিনটে আছে।"

"কী হবে এগুলো দিয়ে?"

"আমরা পরব। ওয়ান ফর মি, ওয়ান ফর ইউ, তিন নম্বরটা স্যান্ডেল উডের জন্যে।...তুমি একটা ট্রাই করো।"

তারাপদ বলল, "প্রেতসিদ্ধর কালো আলখাল্লা!"

"ইয়েস।"

তারাপদ আলখাল্লা গায়ে গলাল। মাথা ঢাকল। বলল, "কিকিরা এ যে ভূতের মতন দেখাচ্ছে।"

"তাই দেখাবে। ভূতের নাচ নাচতে হলে কি ঝলমলে পোশাক পরতে হবে। "

তারাপদ ঘরের মধ্যে ঘুরেফিরে নিজের পোশাক দেখতে দেখতে বলল, "কিন্তু স্যার, প্রেতসিদ্ধ যদি.."

কিকিরা বুড়ো আঙুল দেখালেন। বললেন, "ছাঁটকাট কোথাও কোনো অদলবদল নেই। যেমনটি চুরি করে এনেছিলাম—অবিকল তেমনটি। দেখো না তুমি, অরিজিনালটাও রয়েছে। শেষেরটা।"

তারাপদ বলল, "স্যার, ওদের যদি হিসেব থাকে! ধরুন গুনতি করে রেখে দিয়েছে। একটা শর্ট দেখে যদি..."

"না রে বাবা না, অত হিসেব না ওদের। আর থাকলেও আমার কী! আমি কি চোর? বিভুপদ হাঁস। ষষ্ঠীপদ হাঁসের ছেলে। টাকা-পয়সায় আমার ছাতা পড়ছে।"

তারাপদ বলল, " ঠিক।"

কিকিরা জগন্নাথের দিকে তাকালেন। বললেন, "রবিবার তুমি অবশ্যই যাবে। তারাপদ তোমাকে নিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। গলির মুখে ছেড়ে দেবে। তারপর তুমি একলা।"

"আমি কী করব?"

"কিছুই করবে না। ওরা যা-যা করতে বলবে করবে। ওরা তোমাকে এইরকম কালো আলখাল্লা পরতে বলবে। পরবে। হাত ধুতে বলবে গঙ্গাজলে। ধোবে। তোমাকে আত্মা-নামানোর ঘরে নিয়ে বসিয়ে রাখবে। বসবে। ভয় পাবে না। ঘাবড়াবে না। বরং প্রেতসিদ্ধর গায়ে লুটিয়ে পড়তে পারো এমন ভাব করবে।"

তারাপদ বলল, "কিন্তু কিকিরা, আপনাকে আর জগুদাকে যদি একসঙ্গে না। ডাকে। আলাদা-আলাদা করে তলব করে?"

"করতে পারে। আবার না-ও করতে পারে। জোয়ারদারসাহেব যা। বললেন, তাতে তো শুনলাম, সব মক্কেলই একসঙ্গে ডাক পায়। স্পেশ্যাল। কেস হলে আলাদা। জেনারেল কেস হলে একই সঙ্গে সিটিং। তাতে জমে ভাল। একই খেলা দুবার খেলতে হয় না। যারা থাকে তারা একেবারে স্পিক্-টি-নট, চক্ষু ছানাবড়া। প্রেতসিদ্ধর নাম ছড়িয়ে যায়।...তবে হ্যাঁ, অনেকে তো ঘরের কথা অন্যকে শোনাতে চায় না। সেগুলো স্পেশ্যাল কেস। ভিজিটও বেশি।"

"জগুদার তো স্পেশ্যাল কেস হবে।"

"মনে হয় তাই।..আমিও স্পেশ্যাল চেয়েছি।...তবে শুদ্ধানন্দর কথা থেকে মনে হল, রবিবার উনি এক মতলব ভেঁজে রেখেছেন। জানি না, জগন্নাথের চিঠি পেয়ে ব্যবস্থা করে রাখছেন কি না। আমি একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে ওই দিনটাই নিলাম।"

জগন্নাথ বলল, "আমায় যদি কিছু করে?"

"কী করবে! ওর ক্ষমতা কী!...আমি তো থাকব।... তারাপদরাও থাকবে কাছাকাছি। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?"

তারাপদ আলখাল্লা খুলে ফেলল। "স্যার!"

"বলো?"

"চাঁদু বলছিল দু-চারটা হাড় ও সাপ্লাই করতে পারে। হাড় দিয়ে পেটালে যা লাগে।"

"একটা খুলি থাকলে ভাল হত। দরকার নেই।"

"আমাদের আরও একটু লোকবল হলে ভাল হত না?"

"যা আছি এতেই হবে।"

চা খাওয়া শেষ হল।

জগন্নাথ যেন কী বলব বলব করছিল, বলতে পারছিল না। শেষে অনেক কষ্টে বলল, "আমি কি সত্যি আমার মায়ের গলা শুনতে পাব?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "না'। ওটা অসম্ভব জগন্নাথ!"

"তবে যে লোকে বলে...।"

"লোকে অনেক কথাই বলে।...তবে কী জানো, অনেক সময় আমাদের মনের ভুল হয়, কানের ভুল হয়। কেউ আমাকে ডাকল না, হঠাৎ মনে হল, আমায় কেউ ডাকছে। দরজায় কড়া নড়ল না, অথচ মনে হল, কেউ যেন কড়া নাড়ছে। এগুলো হয় মনের ভুলে।"

"আমাদের বাড়িতে আমরা মাত্র দুটো ঘর পেয়েছিলাম," জগন্নাথ বলল, "বারান্দার একপাশে

আমাদের রান্নাঘর। কলঘর নিচে। মায়ের ঘরেই মা ঠাকুর পুজো করতেন। আমার মা সকাল-সন্ধে পুজোআচা করতেন। একটা ঠাকুর ঘরও ছিল না আমাদের। আমি সব তন্নতন্ন করে দেখেছি। কোথাও কিছু পাইনি। আপনি বিশ্বাস করুন।”

কিকিরা বললেন, “তোমার কথা অবিশ্বাস করব কেন জগন্নাথ! ...আমি দু’-চারটে দোকানেও খোঁজ করেছি, তোমার বাবা যেখানে আসা-যাওয়া করতেন। আমায় তো কেউ মন্দ কথা বলেনি। শুধু একজন, তাকে আমার ভাল লাগেনি।”।

“কে?”

“ত্রিদিবেশবাবু! ওরিয়েন্টাল জুয়েলারি।”

জগন্নাথ অবাক হয়ে বলল, “ত্রিদিবেশবাবু! এ নাম আমি কখনও শুনিনি।”

কিকিরা বললেন, “ভালই করেছ। ...যাকগে, আর মাত্র দুটো দিন, তারপর বোঝা যাবে কল্পবৃক্ষ তোমাকে কী দেন।”

১০.

কিকিরার ডাক পড়ল আগে।

শুদ্ধানন্দর সেই ভুতুড়ে ঘরে যাবার আগে কিকিরা চোখে-চোখে ইশারা করে গেলেন জগন্নাথকে। জগন্নাথ বুঝতে পারল। কিকিরা যেমন যেমন শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন সেইভাবেই সব করতে হবে জগন্নাথকে। চেষ্টা সে করবে, কিন্তু কতটা পারবে কে জানে! ভয়ের কিছু নেই। তারাপদ, চন্দনবাবু, জোয়ারদারসাহেব–সকলেই আশেপাশে আছে। ঝামেলা দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সেই একই ঘর। কিকিরার শুধু মনে হল, আগের দিনের সঙ্গে আজ একটিমাত্র তফাত যেন রয়েছে। শুদ্ধানন্দ যেখানে বসেন, তাঁর সেই তন্ত্রমন্ত্রের আসনে–সেই মঞ্চমতন জায়গার ডান পাশে, ঘরের একেবারে কোণ ঘেঁষে একটা কিছু আছে। কাঠের খোপ মতন। কী আছে বোঝা যাচ্ছে না, তবে মনে হয় পাতলা কোনও পরদা ঝোলানো আছে। অন্ধকারে এতটা দূর থেকে কেমন করেই বা আর বেশি ঠাওর করা যায়!

আগের দিনের মতনই একফোঁটা লাল আলো জ্বলছিল একপাশে। জ্বলতে জ্বলতে নিভেও গেল, আবার জ্বলল, আবার নিভল। তারপর সেই পুজোর ঘণ্টা বাজতে লাগল। লাল আলোটা জ্বলল। শেষে শুদ্ধানন্দ দেখা দিলেন। অবিকল আগের মতনই, মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে–তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ থেকে শুরু করে হ্রীং ক্রোং যং রং লং হৌং হঃ সঃ.ক্লীং রিং হিং পর্যন্ত টানা মন্ত্র।

বসলেন শুদ্ধানন্দ নিজের আসনে। দু পাশের ধুনোর পাত্রে কী যেন ছুঁড়ে দিলেন, দপ করে আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। নিভে এল সামান্য পরে। লাল বাতিও আর জ্বলছিল না, তার বদলে অনেকটা তফাতে, আড়ালে রাখা ফিকে বেগুনি আলো, যা প্রায় কালো ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে, আশেপাশে জ্বলতে লাগল।

শুদ্ধানন্দ আরও খানিকটা পরে কথা বললেন, "বিভুপদ?"

কিকিরা হাত জোড় করে বসে, ভয়-ভক্তি মেশানো গলায় বললেন, "মহারাজ!"

শুদ্ধানন্দ সামান্য অপেক্ষা করে বললেন, "পুরোপুরি হল না, বিভূপদ। তোমায় আগেই বলেছিলাম, তোমার বাবার আত্মা যে স্তরে আছেন, সেখান থেকে তাঁকে দু'-চারদিনের চেষ্টায় টেনে আনা মুশকিল।"

"হল না?" কিকিরা চশমাটা পালটে নিলেন সাবধানে।

"তুমি দুঃখ কোরো না।...প্রেতসিদ্ধ কখনও ব্যর্থ হয় না। একাদশ তন্ত্রসাধনায় আমার সিদ্ধি, আমি তোমায় একেবারে হতাশ করব না।"

"সিদ্ধমহারাজ আপনিই আমার একমাত্র ভরসা।"

শুদ্ধানন্দ হাসলেন। প্রায় অট্টহাসি। বললেন, "তোমার ভাইরা উইল জাল করেছে। যে জাল করেছে তার বাম দেহাংশে বড় তিল আছে, হাঁটার সময় তার শরীর একপাশে ঝুঁকে যায়, দক্ষিণ নৈঋত দিকে বাস,...তার বাম শয়ন, ক্ষুধা ভয়ঙ্কর।

কিকিরা অদ্ভুত এক শব্দ করে যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন। মহারাজ, আমার মেজোভাই, মায়াপদ। ...হ্যাঁ মহারাজ তার অনেক তিল আছে গায়ে, সে বেঁকে-বেঁকে হাঁটে। বাঁ দিকে কাত হয়ে শোয়, রাক্ষসের মতন তার খাওয়া-দাওয়া।"

"খুবই শঠ, চতুর..."

"ঠিকই মহারাজ।"

"তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। দুষ্কর্মের প্রতিফল তাকে পেতে হবে। কিন্তু বিভুপদ, আসল উইল কোথায় লুকনো আছে সেটা জানতে হলে যে সময় লাগবে। তোমার পিতৃদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না-হওয়া পর্যন্ত..."

"আমি রাজি মহারাজ। দু-দশদিন দেরি হোক, আমার ক্ষতি নেই। আমি আমার কাজ সেরে আবার ফিরে আসব কলকাতায়।"

"খুবই ভাল হয়। এর মধ্যে তোমার জন্যে আমি একটি কবচ করে রাখব। সেকবচের কথা কেউ জানে না, হিঙ্গুলহরিতি কবচ।"

"আপনি যা আজ্ঞা করবেন।"

"ব্যয় একটু বেশি হবে বিভুপদ, আঠারোশো থেকে দু হাজারের মতন।"

"আপনি চিন্তা করবেন না।"

"ঠিক আছে। এক পক্ষ সময় লাগবে।"

"ক্ষতি কিসের মহারাজ!...আপনার জন্য আজ আমি একটা মোস্ত্র এনেছিলাম।"

"মোহর!...আচ্ছা! তুমি যেখানে বসে আছ, তার নিচে রেখে দাও।"

"আপনি নেবেন না?"

"নেব।" শুদ্ধানন্দ একটু হাসলেন, "এখন আমি পবিত্রাচারে রয়েছি। সাধনাসনে বসে আছি। আমায় কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। কাছে আসাও বারণ।"

"আমি কি তবে যাব?...মোহর রেখে যাই।"

"এসো।"

দু মুহূর্ত পরে কিকিরা বললেন, "যদি অপরাধ না নেন তো একটা কথা বলি?"

"বলো।"

"একটি ছেলেকে দেখলাম। অপেক্ষা করছে।"

"হ্যাঁ, ওর আসার কথা।"

"কিন্তু মহারাজ, ছেলেটি বোধ হয় মৃগী রোগী।"

“মৃগী রোগী!”

“আমার কেমন সন্দেহ হল। ওর চোখ-মুখ কেমন যেন দেখাচ্ছিল। ঠোঁটের পাশে ফেনা-ফেনা ভাব।”

“বলো কী বিভুপদ!”

“আজ্ঞে, ও কেন এসেছে আমি জানি না, কিন্তু ওকে যেমন দেখলাম–এখানে এসে বসলে তো মূৰ্ছা যাবে।”

শুদ্ধানন্দ কেমন চুপ করে গেলেন।

কিকিরা বললেন, “ওকে বরং আপনি ফেরত পাঠিয়ে দিন আজ। এখানে এসে বসে একটা কিছু যদি হয় আপনি কী করবেন?”

চুপ করে থেকে শুদ্ধানন্দ বললেন, “তাই তো বিভুপদ! ফেরত পাঠালে আবার কবে আসবে ...ওর আবার জরুরি দরকার।”

“আপনি যদি আজ্ঞা করেন আমি একটা কাজ করতে পারি।”

“কী?”

“আমি যদি ওকে সঙ্গে নিয়ে আসি! ওর পাশে থাকি। তাতে একটু সাহস পাবে। তা ছাড়া মৃগীদের আমি সামলাতে পারি। আমার পরিবারের ওই রোগটি আছে।”

শুদ্ধানন্দ কিছু ভাবলেন। বললেন, “বেশ, নিয়ে এসো।

কিকিরা বললেন, “আজ্ঞে, তাতে কোনো অসুবিধে যদি হয়...”

“না, অসুবিধে কিসের! সাবধানের মার নেই।”

কিকিরা উঠলেন।

.

জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে কিকিরা এসে নিজেদের জায়গায় বসার সময় দেখা গেল, শুদ্ধানন্দ মন্ত্র আওড়াচ্ছেন।

মন্ত্র আওড়ানোর পর্বটা দীর্ঘ হল না এই যা রক্ষে।

ক’ মুহূর্ত পরে শুদ্ধানন্দ বললেন, “কে? জগন্নাথ এসেছে?”

জগন্নাথ ঘরের চেহারা আর ভুতুড়ে অন্ধকার দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সাড়া দিতে পারল না।

শুদ্ধানন্দর মাথার পেছন দিকে ত্রিশুলের মাথায় গাঁথা মরা কাকের চারপাশে সেই জোনাকির মতন আলো জ্বলল, নিভল। তারপর ওই আলোয় বিন্দুই অন্যদিকের ত্রিশুলের ওপর রাখা

মাথার খুলির চোখের কোটরে জ্বলে উঠল বার কয়েক। নিভে গেল।

কিকিরা জগন্নাথের হাত ধরে চাপ দিলেন। অর্থাৎ বোঝাতে চাইলেন-”ভয়। পেয়োনা, কথা বলো।

“জগন্নাথ না? কথা বলছ না কেন?” শুদ্ধানন্দর গলা। গম্ভীর।

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জগন্নাথ।“

“অতুল দত্তর ছেলে?”

“হ্যাঁ।”

“মায়ের নাম সুরমা দত্ত।”

“আজ্ঞে।”

“এতদিন আসোনি কেন?” জগন্নাথ জবাব দিল না।

“তোমার মা যে কতবার আমার ষঃ চেতনায় এসে দেখা করে গেলেন! মায়ের জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?”

“খুব হয়।”

“তা হলে আসোনি কেন?”

জগন্নাথ কথা বলল না।

“তোমার মা এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর কায়া-শরীর আর নেই। কিন্তু উনি তো মা জননী। আমরা মা বলি কাকে? যিনি আমাদের জন্ম দেন তিনিই শুধু মা নন, যিনি মায়া, মমতা, প্রাণ দিয়ে আমাদের লালন করেন, পালন করেন, আমাদের দুঃখে-বিপদে ঘিরে রাখেন, তিনিই মা। মায়ের বড় কেউ নেই জগন্নাথ। সংসারে মা ভিন্ন আর কেউ উপাস্য নন।” শুদ্ধানন্দ একটু থামলেন। তাঁর গলার স্বরটি ভরাট গম্ভীর শোনাচ্ছিল। ক’ মুহূর্ত পরে বললেন, “তুমি তোমার মাকে ভুলে গেছ, তিনি তো ভোলেননি।”

“মাকে আমি ভুলিনি,” জগন্নাথ বলল।

“তা হলে তুমি আছিলে না কেন?”

“আজ্ঞে, আমার নানান দুশ্চিন্তা, তার ওপর ঠিক বুঝতে পারছিলাম না–মায়ের সঙ্গে আপনার...”

শুদ্ধানন্দ হেসে উঠলেন। জোরে। হাসিটা গা ছমছমে।

“তোমার মাকে যদি এখানে দেখতে পাও, তাঁর গলা শুনতে পাও–কেমন লাগবে জগন্নাথ?”

জগন্নাথের গলা কাঠ, দম বন্ধ হয়ে আসছে। বিহ্বল। ভয়ে কাঁপছিল।

কিকিরা জগন্নাথের হাঁটুর কাছটায় খোঁচা মারলেন। নিশ্বাসের সুরে বললেন, “বলো, হ্যাঁ দেখতে চাই।”

জগন্নাথ চুপ।

“দেখতে চাও না? শুদ্ধানন্দ বললেন, “মায়ের সূক্ষ্ম আত্মার রূপটি তুমি দেখতে চাও না? তাঁর গলা আর শুনতে চাও না?”

জগন্নাথ যেন হঠাৎ কেঁদে ফেলল, “চাই।”

“বেশ। আমি তোমায় দেখাব। তবে আত্মা রক্তমাংসের বস্তু নয়, তার স্পষ্ট। অবয়ব নেই। ছায়ার চেয়েও সূক্ষ্ম, অ-স্পর্শ যোগ্য। তুমি শুধু মাকে দেখবে। তাঁর কথাও শুনবে। মানুষ আর আত্মালোকের মধ্যে যে যোজন ব্যবধান, তাতে আত্মার আসা-যাওয়ার বড় কষ্ট হয়। সব সময় তাঁরা আসেন না। তুমি তাঁকে ধ্যান করো–তাঁর কথা একমনে ভাবো।” বলে শুদ্ধানন্দ মন্ত্রপাঠ শুরু করে দিলেন। ফ্রি হোঃ হ, ভূত প্রেত ইমা ক্রোং যং যে,ভূতাঃ ভবি..”

শুদ্ধানন্দর মন্ত্রপাঠের মাঝামাঝি সময় থেকে ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে এল। যে ফিকে বেগুনি রঙের বাতিটা তফাতে জ্বলছিল সেই বাতি নিভে গেল ধীরে ধীরে। ঘরের ধোঁয়া আরও বুঝি ঘন হল।

কিছুক্ষণ পরে শুদ্ধানন্দ নীরব। ঘরে কোনো শব্দ নেই। অদ্ভুত স্তব্ধতা। হঠাৎ দেখা গেল, সরু, খুব সরু কিছু একটা অন্ধকারের মধ্যে শুদ্ধানন্দের সামনে দিয়ে ছুটে গেল। একবার, দুবার, তিনবার। ঘড়ির কাঁটার মতন সরু লম্বা এই জিনিসটা বার-তিনেক ছুটে যাবার পর শেষে এক জায়গায় গিয়ে স্থির হল। পরে মিলিয়ে গেল। শুদ্ধানন্দর গলা শোনা গেল।

“আপনি কি এসেছেন?”

শব্দ হল খটখট।

“আপনার অনেক কষ্ট। মার্জনা করবেন।...আপনি আপনার ছেলে জগন্নাথকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। সে এসেছে। আপনি কি তাকে দয়া করে দেখা দেবেন একবার?”

প্রথমে কোনো শব্দ নেই। তারপর খটখট শব্দ হল।

শুদ্ধানন্দ বললেন, “জগন্নাথ, তোমার মা এসেছেন। দেখা দেবেন। মাত্র কয়েক মুহূর্তই তুমি তাঁকে দেখবে। দূর থেকে। তাঁর কথা শুনবে। তোমার মাকে ডাকো, তাঁকে প্রণাম জানাও।”

ধীরে-ধীরে কখন–কিকিরার বসার জায়গার একেবারে ডান পাশে ঘড়ির কাঁটার মতন সরু একটু আলো যেখানে গিয়ে থেমে গিয়েছিল সেখানে অতি ক্ষীণ আলো যেন দেখা গেল। ক্রমশ একটি মুখের আদল ভেসে উঠতে লাগল। অতি অস্পষ্ট। সাদাটে। পুরো শরীর নয়, বুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

কিকিরা সবই লক্ষ করছিলেন। তাঁর অনুমান মোটামুটি ঠিক। শুদ্ধানন্দর বসার উঁচু জায়গাটির হাত ছয়-সাত তফাতে বাক্স ধরনের একটা কী রয়েছে। লম্বাভাবে দাঁড় করানো। হয়ত কাঠের ওয়ার্ডরোব। বোধ হয় পেছন দিকে কিছু নেই, শুধু মাথার দিক, পায়ের দিক, দু'পাশে তক্তা আছে। সামনের দিকে কালো মিহি প্রদা। পরদার পেছনে সাদা এক মুখ।

কালের আড়ালে মুখটি সাদা নয় খানিকটা সাদাটে দেখাচ্ছে।

শুদ্ধানন্দ বললেন, “জগন্নাথ, তোমার মা এসেছেন।”

জগন্নাথ ফুঁপিয়ে উঠল।

“কথা বলো! ওঁকে যেমন দেখছ, এইভাবেই তাঁকে দেখবে। সূক্ষ্ম আত্মার পক্ষে কায়ারূপ ধারণ সম্ভব নয়। কথা বলো?”

জগন্নাথ ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, “মা!”

সঙ্গে-সঙ্গে কোনো সাড়া নেই। সামান্য পরে ভাঙা অস্পষ্ট গলায় সাড়া এল।“জগু! কেমন আছ তুমি?”

“মা, আমরা বড় কষ্টে আছি।”

“বোন ভাল আছে?”

“আছে। তোমার জন্যে আমরা...”

“দুঃখ কোরো না, বাবা! মানুষের আয়ু! কে বলতে পারে কার কখন..”

“মা?”

“আমি এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। বড় কষ্ট হচ্ছে। ...শোনো, বাড়িতে একটা চাবি আছে। লোহার সেফের চাবি। আর একটা ছেঁড়া কাগজ। এই দুটো নিয়ে তুমি মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। তোমার বাবা যা রেখে গেছেন–বোনের বিয়ে দিতে পারবে রাজকন্যের মতন। তোমারও থাকবে বাবা...”

“কোথায় আছে মা চাবি?”

“ঘরেই আছে।”

মাকে আর দেখতে পেল না জগন্নাথ। আবার সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ে না।

শুদ্ধানন্দর গলা শোনা গেল।“তোমার মা চলে গিয়েছেন জগন্নাথ!”

“আর আসবেন না?”

“না।”

“আমি কী করব?”

“চাবি আর ছেঁড়া কাগজটা খুঁজবে। খুঁজে নিয়ে ওঁর কাছে যাবে–যাঁর কথা তোমার মা বললেন?”

“তাঁকে আমি চিনি না।”

“খুঁজে নিও। পেয়ে যাবে। ..এখন যাও, পরে এসো। আমার এই শরীর আর সহ্য করতে পারছে না। ওঁদের ডেকে আনতে আমার বড় কষ্ট হয়। তোমরা যাও।“

কিকিরা ঠেলা দিলেন জগন্নাথকে।

১১.

মথুরবাবুকে খুঁজে বের করতে দিন-দুই সময় গেল। উনি থাকেন গিরিবাবু লেনে। বাইরে থেকে বাড়ির চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরের ছাঁদ-ছিরি কেমন। ঘরে ঢুকেও বোঝা যায় না, তবে কথাবাতার থেকে, তাঁর। খাস বসার ঘরের দু-তিনটে সেফের বহর দেখে আন্দাজ করা যায়–মানুষটি লেনদেন ভালই করেন।

জগন্নাথ একা আসেনি। সঙ্গে কিকিরা আর তারাপদ। চন্দন বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি। বাইরে আছে।

মথুরবাবুর বয়েস বছর পঞ্চান্ন। চেহারার বাঁধুনি আছে। গায়ের রং তামাটে। মাথার চুল ছোট-ছোট। চোখ দুটি ওপরে যত শান্ত মনে হয়, তেমন নয়। নজর করলে বোঝা যায় উনি শুধু চতুর নন, নিষ্ঠুর।

জগন্নাথ নিজের পরিচয় দিল।

মথুরবাবুর খাস বসার ঘরে চেয়ার নেই, ফরাস পাতা। এক ফরাসে তিনি বসেন। অন্যরা বসে আলাদা ফরাসে।

মথুরবাবু সিগারেট খেতে-খেতে বললেন, “ও! তুমি অতুলদার ছেলে! কোথায় ছিলে এতদিন?”

জগন্নাথ বলল, “আপনার কথা আমি জানতাম না।”

“তোমার মা জানতেন।”

“মা নেই।”

“জানি।...তোমার সঙ্গে এঁরা কে?”

জগন্নাথ কিকিরাকে দেখিয়ে বলল, “ইনি আমার উকিল!” বলে তারাপদকে দেখাল। “আমার বন্ধু!”

মথুরবাবু কিকিরাকে দেখলেন। “উকিল কেন?”

“আমি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।”

“কেন?”

জগন্নাথ যেন হাসল একটু। কিকিরা যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিল সেইভাবেই কথা বলছিল সে। কিকিরা না থাকলে জগন্নাথ আজ এখানে আসতে পারত না।

“আপনার সঙ্গে লেখাপড়া করতে হবে।”

“কিসের?”

“আমি সেই চাবি আর কাগজ নিয়ে এসেছি।”

মথুরবাবু যেন সজাগ হলেন, নড়েচড়ে বসলেন। “কোথায় পেলে?”

“মায়ের বাঁধানো লক্ষ্মীর পটের পেছন দিকে।“

“সে কী! এতদিন..”

“লক্ষ্মীর বাঁধানো ছবিটার পেছন দিকটা অ্যালুমিনিয়াম শিট দিয়ে ঢাকা ছিল। ছবির পেছনে কাগজ থাকে, বোর্ড থাকে। পোকা ধরার ভয়ে অনেকে টিন দিয়ে মুড়ে নেয়। মায়ের এই লক্ষ্মীর পট আমাদের তিন পুরুষের। মা পটটিকে যত্ন করে রাখতেন। পুজো করতেন রোজ।”

“আচ্ছা, তা হলে তোমার মা লক্ষ্মীর পটের মধ্যে–মানে বাঁধানো ছবির মধ্যে চাবি রেখেছিলেন। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে ছবির পেছনটা ঢাকা রেখেছিলেন।...তোমার মায়ের বুদ্ধি তো ভীষণ।...যেভাবে রেখেছিলেন চাবিটাবি তাতে কার বাপের সাধ্যি ওর খোঁজ পাবে।”

জগন্নাথ জানে, লক্ষ্মীর পটের পেছনে চাবি আর কাগজের টুকরো খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভাগ্যিস কিকিরা সেদিন বাড়িতে গিয়ে তন্নতন্ন করে সব দেখেছিলেন–তাই না পাওয়া গেল।

“এই চাবিটা...”

“আমার এখানে একটা সিন্দুক আছে। সেকেলে সাবেকি আমলের সে। তার তিনটে ভাগ। তিন দরজা। শেষ ডালাটার দুটো আলাদা চাবি। একটা চাবিতে ডালা খোলা যাবে না। ডাবল লক সিস্টেম। একে বলত, পারসন্ কোম্পানির দুশো বারো নম্বর আয়রন সেফ। তোমার বাবা সেখানে কিছু জিনিস জমা রেখে গিয়েছেন। আমি একটা চাবি রেখেছি, অন্যটা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। ...চাবিটা তুমি এনেছ?”

“হ্যাঁ।“

“কিন্তু একটা কথা কি তুমি জানো? ওর মধ্যে যা আছে তার অর্ধেক তোমার, বাকি আমার?”

“জানি।”

“আরও একটা কথা আছে হে! আমরা দুজনে একটা কাগজে বখরার শর্ত লিখে নিজেদের নাম সই করেছিলাম। সেই কাগজের অর্ধেকটা ছিঁড়ে আমার কাছে রেখেছি। বাকিটা তোমার বাবার কাছে ছিল। সেই কাগজটাও যে চাই।”

কিকিরা এবার কথা বললেন, “কাগজটাও আপনি পাবেন। কিন্তু একটা কথা আপনি বলুন? জগন্নাথের বাবা যেদিন চাবি আর কাগজ নিয়ে ফিরছিলেন সেদিনই কি তিনি মোটর সাইকেলের ধাক্কা খাননি?”

মথুরবাবু নিজের কপাল দেখালেন। “বরাত! একেই বরাত বলে উকিলবাবু! আহা, বেচারি অতুলদা...কী বলব...এমন করে তিনি চলে যাবেন...।”

“তিনি গেছেন? না, তাঁকে আপনি যাওয়াবার চেষ্টা করেছিলেন?”

মথুরবাবু চমকে উঠলেন, "এ কী কথা বলছেন আপনি!"।

"উনি চলে যাবার পর আপনি লোক লাগিয়ে সেই দিনই ওঁর কাছ থেকে চাবি আর কাগজটা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। আপনি চোর, ডাকাত, খুনি..."।

মথুরবাবু রাগের মাথায় সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখ জ্বলছিল যেন। বাঁধানো দাঁত আলগা হয়ে উঠে যাচ্ছিল। "আপনাকে আমি চাবকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি, জানেন।"

"আপনাকে আমি জেলে ভরতে পারি! চোর, জোচ্চোর আপনি?"

"আমি চোর, না, জগন্নাথের বাবা চোর! চোরাই মাল বোঝেন, স্মাগণ্ড, মাল। সেই মালহীরে, চুনি, নীলা আমার জিম্মায় রেখে যে চলে যায় তাকে আপনি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলবেন! লাখ দুই আড়াই টাকার জিনিস। আজ তার বাজার দর..."

জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল। "আমার বাবা চুরি করেছিলেন। পাপের ফল তিনি ভোগ করেছেন। আপনি কিন্তু বেঁচে আছেন?" বলতে বলতে জগন্নাথ পকেট থেকে একটা বড় চাবি বার করল। করে দেখাল চাবিটা। বলল, "নিন, আপনার চাবি।" বলে চাবিটা মথুরবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিল।

মথুরবাবুর কপালে এসে লাগল চাবিটা।

"এই কাগজটা কিন্তু আপনি পাবেন না। আমি ছিঁড়ে ফেললাম।" জগন্নাথ পুরনো ময়লা ছেঁড়া একটা কাগজ কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

মথুরবাবু চাবি কুড়িয়ে নিলেন।

কিকিরাও উঠে দাঁড়ালেন। তারাপদ উঠে পড়ল।

কিকিরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলি মথুরবাবু। নাকি শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধর মালিক মহারাজ!"

মথুরবাবু আঁতকে উঠলেন।

কিকিরা বললেন, "আপনি পাকা লোক। অনেকে মন্দির-চন্দির বসিয়ে ভাল রোজগারের পথ করে নেয়। আপনি বন্ধক তেজারতি চুরি জোচ্চুরির কারবারের সঙ্গে আর-একটি ভাল কারবার ফেঁদেছেন। কিন্তু আপনার চেলাটি–প্রেসিদ্ধ একেবারে নবিশ। কিস্যু জানে না।"

"জা-জা...জানে না?"

"আজ্ঞে না। ওর খেলায় অনেক খুঁত। গন্ধকের গুঁড়ো ছড়িয়ে কি বোকা বানানো যায়! আপনার নাক থাকলে গন্ধ পাবেন। আর ওই মরা কাক, মড়ার খুলির মাথায় আলোর পিটপিট করে জ্বলে ওঠা মশাই, বাচ্চাদের যে জ্ঞানের আলো' খেলনা পাওয়া যায়–এ তো তাই, ব্যাটারি আর তার নিয়ে বসে খেলা। দেখানো! বলবেন। আত্মা এলে যে আলোর কাঁটা ছোটে–সেটা কী? ঘড়িতে রেডিয়াম দেখেননি? ছি ছি–এগুলো কি খেলা! নবিশ একেবারে!...আরও একটা কথা মথুরামোহনমশাই! জগন্নাথের মা বলে যে জিনিসটিকে প্রেসিদ্ধ হাজির করেছিলেন, তার জন্যে দুটো বেশি পয়সা খরচ করলে পারতেন। কারিগর ভাল নয়; মামুলি ডামিও করতে পারে না। নাইলনের পরদা ফেলে কত আর সামলানো

যাবে। টেপ-রেকর্ডটাও খারাপ। জগন্নাথের মায়ের গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল বাজে টেপ…।”

মথুরবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ভয়ে কাঠ। ঘামছিলেন। “চলি, প্রেতসিদ্ধ বাবামশাই। একটা কথা বলে যাই। জোয়ারদারসাহেব পুলিশ নিয়ে আপনাদের আখড়ায় গিয়েছেন। নিচে আমাদের সঙ্গে এসেছেন এক অফিসার, লালবাজার থেকে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের কোনো ক্ষতি হলে…”

মথুরবাবুর গলা উঠছিল না। “আপনি কে?”

“কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান। ওরফে বিভুপদ হাঁস।”

“আপনি এত জানলেন কেমন করে?”

“সর্দি, রুমাল, ইনফ্রা রেড চশমা। একসময় স্নাইপারস্কোপিক বাইনোকুলার বলা হত যাকে, তারই একটা লেটেস্ট মডেল। আমি ওই মজার চশমাটি পরে নিতাম ঘরে বসে। প্রেতসিদ্ধর চেলারা ভাবত, আমার সর্দি হয়েছে বলে নাকে রুমাল চাপা দিচ্ছি। এ-হল আমাদের রুমালের খেলা! চশমা বদল করে নিতাম ঘরে ঢুকে। অন্ধকারে আপনার প্রেসিদ্ধর বাহাদুরি প্রায় সবই দেখতে পেতাম।..যাক, চলি। চলো হে জগন্নাথ, চলো তারাপদ।“

ওরা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

মথুরবাবু হতভম্ব হয়ে বললেন, “এই চাবিটা..?”

জগন্নাথ বলল, “ওটা মামুলি চাবি। নকল। আসলটা গঙ্গার জলে ফেলে দেব।”

মথুরবাবু মাথার চুল ছিঁড়ে পাগলের মতন দাপাতে লাগলেন।

কিকিরা হাসতে-হাসতে বললেন, “একটু মাথা ঠাণ্ডা করে নিন। পুলিশ এলে দুটো কথা তো বলতেই হবে।”